জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
'পরিষদ ভবন'
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৭০

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1970

চিত্রসূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | জুলাই, 1970 | সপ্তম সংখ্যা

উদ্ভিদ-হর্মোন

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে হর্মোন কথাটি বর্তমানে সুপ্রচলিত হয়েছে, যদিও এর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অনেকেরই নেই। হর্মোন কথাটি গ্রীক horman শব্দটি থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ—চালিত করা। প্রাণি-দেহে যে সকল নালীহীন বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে, তারা প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ধরণের জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে এবং ঐ সকল পদার্থ রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দূরবর্তী কোষ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে বিশেষ ধরণের কাজ করে। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে হর্মোন নাম দেওয়া হয়েছে। দেহযন্ত্রের যে সকল অভ্যা-ন্তরিক ক্রিয়ার ফলে প্রাণীদের বৃদ্ধি পাওয়া, বংশ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি অজস্র ধরণের কাজ সম্পন্ন হয়, তাদের একক ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করে ঐ সব হর্মোন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাণীরা হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে তাদের অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোন রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয়, যার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি গুলি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পিটুইটারি হর্মোন নিঃসৃত হয়। তাদের মধ্যে কোনটি দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, কোনটি পুরুষের বিশেষ বয়সে গোঁফ-দাড়ি গজাতে সাহায্য করে, কোনটি পুংজনন-কোষের বৃদ্ধি সাধন করে, কোনটি ডিম্বকোষকে পরিণত করে। প্যানক্রিয়াস গ্রন্থিতে উৎপন্ন ইনসুলিন হর্মোন রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ করে। সম্মুখবর্তী পিটুইটারী গ্রন্থিকে আবার সর্বপ্রধান গ্রন্থি বলা হয়, কারণ এথেকে নিঃসৃত বিভিন্ন হর্মোন অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির হর্মোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রাণিদেহের সুস্থ অবস্থায় হর্মোনের ক্রিয়াকে নানা বাদ্যযন্ত্রসমন্বিত অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্কেষ্ট্রার প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র তার নিজের নির্দিষ্ট কাজটি যেমন সম্পন্ন করে, তেমনি অন্য প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গতিও রক্ষা করে। আবার সব যন্ত্রগুলিই এক প্রধান নির্দেশকের নির্দেশ মেনে চলে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতায় উপযুক্ত পরিমাণে হর্মোন নিঃসৃত করে এবং প্রত্যেকে একজন প্রধান নির্দেশকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে যে অপূর্ব জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তারই পরিণতি হলো সুস্বাস্থ্য।

প্রাণিদেহের হর্মোনের মত উদ্ভিদদেহেও হর্মোন আছে কিনা, তা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকাল স্থির করতে পারেন নি। প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের গঠন, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কাজ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পূর্বে নানারূপ অদ্ভুত মত পোষণ করতেন। এক সময়ে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, এক রহস্যময় প্রাণশক্তি এই সব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, আবার কেউ কেউ জৈব বিদ্যুৎ-শক্তিকে এগুলির নির্ধারক বলে চিন্তা করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নির্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয় কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা, যাদের নাম দেওয়া হয় হর্মোন। চার্লস ডারউইন 1880 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Power of Movement in Plant' নামক গ্রন্থে এরূপ ধারণা প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যারা তার বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে সাহায্য করে। ডারউইন এক জাতীয় ঘাসের অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা করেছিলেন। একটি শঙ্কুর মত আকৃতিবিশিষ্ট টিনের চোঙের মাথার ছিদ্র দিয়ে অন্ধকারে রক্ষিত অঙ্কুরের কলিওপ্‌টাইলের মাথায় সূর্যালোক ফেলা হচ্ছিল (ভুট্টা, ধান, গম প্রভৃতি এক-বীজপত্রী বীজের ভ্রূণমুকুল একটি পাত্‌লা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। একেই কলিওপ্‌টাইল বলা হয়); কিন্তু দেখা গেল—যে বিন্দুতে আলোকপাত করা হচ্ছিল, তার কয়েক মিলিমিটার নীচের অংশ আলোকের দিকে সবচেয়ে বেশী বক্রতা লাভ করছে। এথেকে ডারউইন ধারণা করেন যে, কলিওপ্‌টাইলের ডগা থেকে নীচের দিকে তন্তুগুলির মধ্যে কোন ধরণের উত্তেজনা সঞ্চালিত হচ্ছে। ডারউইন এই উত্তেজনাকে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন বলে ধারণা করেছিলেন, কিন্তু এর স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

1909 খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফিটিং যবদ্বীপে এক ধরণের অর্কিডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেন যে, পরাগনিষেকের পরে ফুলের পাঁপড়িগুলির রং দ্রুত বিবর্ণ হয়ে আসে এবং গর্ভকোষের বৃদ্ধি হতে থাকে। ফিটিং কতকগুলি মৃত পরাগরেণুকে জলে মিশ্রিত করে সেগুলিকে সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর ছড়িয়ে দেন। এতে স্বাভাবিক পরাগনিষেকের মতই ক্রিয়া হতে দেখা গেল। এক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলি মৃত, সুতরাং কোন প্রাণশক্তির কল্পনা করা যায় না। এথেকে ফিটিং-এর ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পরাগনিষেকের মূলে আছে কোন অজানা রাসায়নিক পদার্থ।

ধানগাছের একটা অদ্ভুত রোগ বহুদিন ধরে চাষীরা লক্ষ্য করে আসছেন। কতকগুলি ধানের চারা অন্যদের অপেক্ষা অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং হল্‌দে ও বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন তারা দীর্ঘ দিন সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত আছে। অবশেষে গাছগুলি শুকিয়ে মরে যায়। জাপানী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এরূপ রোগাক্রান্ত গাছ থেকে এক ধরণের পরজীবী ছত্রাকের সন্ধান পান, যাকে

তাঁরা এই রোগের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু 1926 খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী কুরোসাওয়া দেখালেন যে, ঐ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ঐ ছত্রাক নয়, কিন্তু ঐ ছত্রাক-নিঃসৃত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। তিনি ঐ ছত্রাক রসায়নাগারে পোষণ করেন এবং তাথেকে কাথ প্রস্তুত করে তা নির্বীজিত অবস্থায় সাধারণ ধান গাছের উপর প্রয়োগ করে দেখেন যে, গাছগুলি পূর্ববর্ণিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ছত্রাকগুলি মৃত ও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ঐ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ছত্রাক-নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ।

জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন এবং অবশেষে 1938 খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ইয়াবুতা এবং সুমিকি একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, যা ধানগাছের পূর্বোক্ত রোগটি সৃষ্টি করতে পারে। যে ছত্রাক থেকে এই পদার্থটি নিষ্কাশন করা হলো তার নাম Gibberella fujikuroi এবং ঐ রাসায়নিক পদার্থটির নাম দেওয়া হলো Gibberellin।

1946 খৃষ্টাব্দে হাগেন-স্মিট এবং তাঁর সহকর্মীরা অপরিণত ভুট্টার বীজ থেকে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, তার নাম ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই পদার্থটি প্রয়োগ করে বিনা পরাগনিষেকে অর্কিড ফুল ও টোম্যাটোর পরাগনিষেকের কাজ হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ জল, আলোক, উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় সাড়া দেয় ও সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালন কখনও অনুকূল এবং কখনও প্রতিকূল হতে পারে। ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে 'ট্রপিক মুভমেণ্ট' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পরে কাণ্ডের অংশটি আলোর অভিমুখে প্রসারিত হয়, আবার মূল অংশটি আলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাটির ভিতরে অন্ধকারে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের কাণ্ডাংশকে বলা হয় আলোকানুবর্তী এবং মূল অংশকে বলা হয় আলোক-প্রতিবর্তী।

'ট্রপিক মুভমেণ্টে'র বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে নানাবিধ উদ্ভিদ-হর্মোনের পরিচয় এবং তাদের ক্রিয়া-সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা হয়েছে। 1880 খৃষ্টাব্দে ডারউইন কলিওপ্‌টাইলের উপর আলোর ক্রিয়া লক্ষ্য করে যে উত্তেজনা প্রবাহের কথা বলেন, তার স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল ধরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ বলেছিলেন যে, আলোক উদ্ভিদের কোষগুলিকে 'পোলারাইজ' করছে এবং তার ফলে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উত্তেজনা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয় নি। 1910 খৃষ্টাব্দে বয়সেন-জেনসেন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, যদি অঙ্কুরের ডগাটিকে কেটে ফেলা হয় এবং এক বিন্দু জিলাটিন লাগিয়ে কলিওপ্‌টাইলের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও তার উপর আলোর ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, উত্তেজনার প্রবাহ কোষের 'পোলারাইজেশনে'র জন্যে হতে পারে না, কারণ এক্ষেত্রে ছিন্ন অংশ দুটির মধ্যে কোষের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চয়ই রাসায়নিক পদার্থের প্রবাহের জন্যে হয়েছে।

এর পর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়েণ্ট কলিওপ্‌টাইলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে একটি পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি কলিওপ্‌টাইলের আবরণটি অঙ্কুরের ডগা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাগার-জেলের একটি খণ্ডের উপর বসিয়ে দিলেন। এতে কলিওপ্‌টাইল থেকে কিছুটা রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে লেগে গেল। এর পর কলিওপ্‌টাইলটি ফেলে দিয়ে অ্যাগার-জেলের খণ্ডটি অঙ্কুরের মাথার এক দিকে বসিয়ে দিলেন। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল যে, যে ধারে অ্যাগার-জেল বসানো হয়েছে, তার

বিপরীত দিকে অঙ্কুরটির মাথা বেঁকে যাচ্ছে। এই বেঁকে যাওয়ার কারণ হলো, ঐ দিকের কোষের বৃদ্ধি অন্য দিক অপেক্ষা অনেক বেশী হচ্ছে। ওয়েন্ট আরো দেখলেন যে, যত বেশী সংখ্যক কলিওপ্‌টাইলের ডগা অ্যাগার-জেলের উপর রাখা যায়, অর্থাৎ যত বেশী কলিওপ্‌টাইলের রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে আসে, ততই অঙ্কুরের বক্রতা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কোষের বৃদ্ধি হয়।

উপরের পরীক্ষাগুলি এবং এরূপ আরও বহু পরীক্ষা থেকে এখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদের দেহেও প্রাণিদেহের মত নানারূপ হর্মোনের সৃষ্টি হয়। এই হর্মোনগুলি নানারূপ জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এগুলি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হয় এবং এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রাপক অংশটির বৃদ্ধি বা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। এগুলিই হলো উদ্ভিদের মৌলিক হর্মোন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে এই সব হর্মোনের অনুরূপ গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এদেরও উদ্ভিদ-হর্মোন বলা হয়। বর্তমানে এরূপ শতাধিক হর্মোনের আবিষ্কার হয়েছে এবং এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ তিনটি প্রধান শ্রেণীর নাম হলো—অক্সিন, জিবারেলিন এবং কিনিন। এক এক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক গঠনের পদার্থ আছে, তবে তাদের সকলেরই কার্যপ্রণালী প্রায় একরূপ। অক্সিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির মধ্যে বেনজোয়িক, ইনডোলিক, সিনামিক এবং ন্যাপথিল্যাসেটিক অ্যাসিডের নানা ধরণের যৌগ বর্তমান। অক্সিন শ্রেণীর হর্মোনকে বৃদ্ধি-উদ্বোধক হর্মোন বলা হয়। কারণ এদের প্রধান কাজ হলো, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিভাজন ও বৃদ্ধিসাধন। সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রভাগ, মূলের অগ্রভাগ, মুকুল ও পাতায় অক্সিনের সৃষ্টি হয়। অক্সিনগুলির আর একটি কাজ হলো পাতা, ফুল ও ফলের পতন নিবারণ করা।

জিবারেলিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির অধিকাংশই জিবারেলা ছত্রাক থেকে পাওয়া গেছে। জিবারেলিক অ্যাসিড এদের মধ্যে অন্যতম হর্মোন। এদের বিশেষ কাজ হলো বামনাকৃতি বা সাধারণাকৃতির উদ্ভিদকে দীর্ঘতর উদ্ভিদে পরিণত করা। এ-ছাড়া কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদ্গম, ফলের সৃষ্টি এবং অঙ্কুরোদ্গমেও এরা সাহায্য করে।

কিনিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির প্রধান কাজ, উদ্ভিদের মুকুলোদ্গম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করা। এই তিন শ্রেণীর হর্মোন ছাড়া আরও নানা প্রকার হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন জানা এখনও সম্ভব হয় নি।

এপর্যন্ত উদ্ভিদ-হর্মোনগুলির যে সব ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিভাজন বা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। কিন্তু হর্মোনগুলির এর বিপরীত ধরণের একরূপ ক্রিয়াও আছে, যাকে বলা হয় ইনহিবিশন বা বাধন; অর্থাৎ এরা কোন কোন বৃদ্ধির বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অক্সিন শ্রেণীর হর্মোন যেমন কাণ্ডের বৃদ্ধি করে, তেমনি তা মূলের বৃদ্ধি, মুকুলোদ্গম, ভ্রূণের বৃদ্ধি, বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদ্গম রোধ করে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সব ঋতুতে বাধন-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, সব ঋতুতে ও সব রকম আবহাওয়ায় সব রকম উদ্ভিদের সকল অংশের বৃদ্ধি বা বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি বা বংশবিস্তার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এটা তার আত্মরক্ষার একটা অঙ্গ। প্রতিকূল অবস্থায় বাধক হর্মোনগুলি সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি রোধ করে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ-হর্মোনের আবিষ্কার এবং হর্মোনসমূহের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান কৃষি-জগতে যুগান্তর

আনয়নে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার ফলে এমন হর্মোন সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, যাদের প্রয়োগে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শস্যের কোন ক্ষতি না করে আগাছার বৃদ্ধি রোধ করা বা তাদের ধ্বংস করা যেতে পারে। বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ-হর্মোন প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা বিচিত্র ধরণের উদ্ভিদ ও ফল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া অনিষিক্ত গর্ভকোষ থেকে ফলের সৃষ্টি, টোম্যাটো, শশা, আপেল প্রভৃতি ফলের দ্রুত উৎপাদন, অকালে দামী ফুল ও ফলের উৎপাদন, বীজহীন ফলের সৃষ্টি এবং হিমঘর বা বীজাগারে রক্ষিত আলু ও অন্যান্য বীজের অঙ্কুরোদ্গম রোধ প্রভৃতিতে হর্মোনের দান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এক বিরাট সাফল্যের সূচনা করছে।

আগ্নেয়গিরি

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়*

পৃথিবীতে বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প, ধস্ ইত্যাদির মত আগ্নেয়গিরিও প্রকৃতির শক্তি প্রকাশের অন্যতম উৎস। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল স্থানগুলির মধ্যে ছিদ্রপথে ভূগর্ভস্থ ধূম, ভস্ম, কর্দম, গলিত ধাতব পদার্থ প্রভৃতি প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে কোণাকৃতি পর্বতের উৎপত্তি হয়, তাকেই বলা হয় আগ্নেয়গিরি। যে গহ্বর দিয়ে ভস্ম, ধূম, গলিত ধাতব পদার্থ, শিলা প্রভৃতি বের হয়ে আসে তা Crater বা জ্বালামুখ নামে পরিচিত। এই জ্বালামুখের সঙ্গে নীচের Magma chamber-এর সংযোগকারী সুড়ঙ্গকে Vent বলা হয়। জ্বালামুখ থেকে নিক্ষিপ্ত গলিত পদার্থকে লাভা এবং লাভার উৎক্ষেপণকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যেখানে লাভা সঞ্চিত থাকে, তাকে Magma chamber বলা হয়। ম্যাগ্মা প্রধানতঃ অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন, অল্প পরিমাণে টিটানিয়াম, কার্বন, ফস্ফরাস এবং ক্লোরিন দিয়ে গঠিত।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে গ্যাস বের হয়, তার মধ্যে Hydrogen sulphide (H_2S), SO_2, কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), HCl, অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H), আরগন, ক্লোরিন (Cl) এবং ফ্লোরিন (F) প্রধান। এই সব গ্যাসের তাপমাত্রা প্রায় 100° সে.। বাষ্প বা বেরোয়, তার বেশীর ভাগই গ্যাসীয় পদার্থ।

তরল পদার্থের মধ্যে লাভাই প্রধান। লাভার গঠন ও ম্যাগ্মার গঠনে বিশেষ তারতম্য নেই, কেবল লাভার মধ্যে ম্যাগ্মার চেয়ে বাষ্প ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ কম। সিলিকার পরিমাণ কম-বেশীর উপর লাভাকে অ্যাসিড ও বেসিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লাভার রাসায়নিক প্রকৃতিই তার বাহ্যিক গঠন ও অগ্ন্যুৎপাত নির্ধারণ করে। বেসিক লাভা বেশী দূর গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু অ্যাসিড লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বেশী দূরে যায় না।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় গ্যাসের প্রচণ্ড চাপ ও বিস্ফোরণের ফলে জ্বালামুখ দিয়ে জ্বালামুখের কিছু অংশ এবং প্রচুর পরিমাণে লাভা বাইরে এসে জমাট বেঁধে যায়। মাকুর মত দেখতে 5-10 সেন্টিমিটার দীর্ঘ আগ্নেয় বোমা উপরের দিকে উঠে

* ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

25-30 কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারগুলিকে (1-3 সেঃ মিঃ দীর্ঘ) Lapilli বলে। এগুলি আগ্নেয়গিরির চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকৃতির পদার্থ, ভস্ম, বালি, Feldspur, Leucite, Augite, Magnetite প্রভৃতিও নির্গত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্মা পৃথিবীর ভিতর থেকে খুব কমই বেরিয়ে আসে। অনেক সময়েই ভূত্বকের গভীরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে বিভিন্ন রকমের আকৃতি ধারণ করে। এদের মধ্যে Batholith সহস্র বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট পাহাড়ের আকারে ভূত্বকের নীচে জমাট বাঁধে। এগুলি প্রধানতঃ অ্যাসিড শিলা Granite ও Granocliorites দিয়ে গঠিত।

Batholith-এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির Lacolith-ই ভূত্বকের নিকটে স্তূপাকারে দেখা যায়। এর উপর দিকে উত্তল অংশ এবং ভূমি সমান হয়। এর দৈর্ঘ্য 100-200 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। ভঙ্গিল পর্বতের ভাঁজের ঊর্ধ্বভঙ্গে Lacolith থেকে ছোট Phacolith দেখা যায়, দেখতে Lacolithe-এর মত—অনেক সময় ম্যাগ্মা সঙ্কীর্ণ ফাটলের মধ্যে জমাট বাঁধে এবং তার মধ্যে অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। এগুলি Sil নামে পরিচিত। যখন লম্বভাবে অবস্থান করে, তখন জমাটবাঁধা কঠিন ম্যাগমাকে ডাইক বলা হয়। এই ধরণের ডাইককে পার্শ্ববর্তী কোমল শিলা ভেদ করে উঠতে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা খনির খাদে ডাইক অনেক সময় দুই কয়লা স্তরের মধ্যে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে কয়লা উত্তোলনে অসুবিধা ঘটায়। অনেক সময় বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে অনুভূমিকভাবে ম্যাগ্মা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে তাকে Interbedded instrusion বলে।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আগ্নেয়গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক কারণ কি? কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য।

আগ্নেয়গিরিগুলি ভূত্বকের অস্থিতিস্থাপক অংশে অবস্থিত ও মালার আকারে সজ্জিত। অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সব বিভিন্ন রকমের শিলা বাইরে বেরোয়, তার শতকরা 90 ভাগই ব্যাসাল্ট শিলা। ভূত্বকের প্রায় 36 মাইল গভীরে মহাদেশগুলির নীচে গভীর ও মহাসাগরগুলির নীচে অগভীর একটি ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। ভূত্বকের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় প্রতি কিলোমিটারে 10° সেন্টিগ্রেড। অতএব 100 কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে তাপমাত্রা 1,000° সেন্টিগ্রেড, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগের 20 বা 30 কিলোমিটার নীচে উপরের শিলাস্তরের চাপ খুব বেশী না হওয়ায় শিলাস্তর কঠিন অবস্থায় আছে। পৃথিবীর ভিতরের stress-এর জন্যে পৃথিবীর বুকে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে অভ্যন্তরের ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পর্যন্ত নেমে যায় এবং শিলাস্তরের চাপ কোনও অজ্ঞাত কারণে কমে গেলে কিছু শিলা তরল অবস্থায় পৌঁছায় ও গ্যাস জমে ওঠে এবং উপরের আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই একটি মাত্র ফাটল ও আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতকে কেন্দ্রীয় অগ্ন্যুৎপাত বলা হয়। অনেক সময় একটি মাত্র ফাটলের পরিবর্তে অসংখ্য ফাটলের মধ্য দিয়েও লাভা বেরিয়ে আসে, তখন তাকে Fissure eruption বলে। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ভূত্বকের নিকটের ম্যাগ্মা চেম্বারে সঞ্চিত লাভাই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে। ব্যাথোলিথগুলিকে পৃথিবীর ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর কাছেই দেখা যায়। ব্যাথোলিথের উত্তপ্ত তরল ম্যাগ্মা উপরে উঠলেই পার্শ্ববর্তী শিলার সংস্পর্শে এসে তাদের তরল অবস্থায় পরিণত করে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। ব্যাথোলিথের উপরের

বস্তুর অংশকে cupolas বলে। তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিবাহী ধর্মের জন্যে অনেক সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত লাভা cupolas-এর উপরে যেখানে ভূত্বক পাতলা, সেখানে জমা হয়। ফলে সেখানে ফাটল দেখা দিলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাথোলিথগুলি সম্পূর্ণ কঠিন ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আগ্নেয়গিরিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্তন ও পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে ঘর্ষণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া নবীন ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর ভূতাত্ত্বিক গঠন সমুদ্রের গঠন অপেক্ষা ভিন্ন। ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর নিম্নে সুগভীর sial স্তর যেখানে রয়েছে, সেখানে granite শিলাস্তরের গভীরতা 50 কিঃ মিঃ-এরও বেশী। অ্যাসিড শিলার মধ্যে তেজস্ক্রিয় খনিজের পরিমাণ অন্য আগ্নেয়শিলার চেয়ে বেশী বলে অ্যাসিড শিলা প্রায় 50×10^{-13} ক্যালরী / সেণ্টিমিটার পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। বেসিক শিলা এর চেয়ে কিছু কম তাপ সৃষ্টি করে। এই তাপ বিকিরণের ফলে সিয়াল স্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গলিত অবস্থায় পৌঁছায়। এই তাপই ম্যাগ্‌মা চেম্বারের পদার্থগুলিকে অনেক সময় গলিত অবস্থায় পরিণত করে। গ্যাসই অগ্ন্যুৎপাতের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি। বাষ্পের মধ্যে 80–85% ভাগ থাকে এই গ্যাস। এই গ্যাসের অধিকাংশই ম্যাগ্‌মার মধ্যে জমা থাকলেও অনেকাংশ ভূগর্ভস্থ জলরাশি বা ভূত্বকের কয়েক সহস্র মাইল নীচে আগ্নেয়গিরির নীচেকার তরল শিলাস্তরে পৌঁছায় এবং তা অগ্ন্যুৎপাতের সহায়তা করে। যে সব আগ্নেয়গিরি সমুদ্রের নীচে বা খুব ধারে অবস্থিত, সেখানে অবশ্য সমুদ্রের জলই নীচে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানা আকৃতিবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। যে সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢালই সমান, তাদের আকৃতিকে Composite cone বলে। এই সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢাল ভূমির সঙ্গে 35° কোণ করে অবস্থিত। জাপানের ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরির ঢাল আরও কম, তাদের আকৃতিকে cinder cone বলে। ক্ষুদ্রাকৃতির আগ্নেয়গিরিকে spatter cone বলা হয়। অনেক সময় লাভা অত্যন্ত খাড়াভাবে স্তূপাকারে থাকে। তাকে গম্বুজাকৃতির আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন—মাউণ্ট পিলি।

অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা, কাদা ও ছাই বায়ুবাহিত হয়ে অধক্ষেপিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি করে, সেগুলি হলো লাভা সমভূমি। অগ্ন্যুৎপাতের গোড়ায় দিকে ধূলা, বালি, ঘনীভূত বাষ্প ও বৃষ্টির সঙ্গে মিশে কাদার মত বেরিয়ে আসে এবং আগ্নেয়গিরির ঢালের নীচের দিকে সমভূমির সৃষ্টি করে। এমনও দেখা গেছে যে, লাভাস্রোত অসংখ্য ফাটল থেকে বেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিরাট লাভা-মালভূমির সৃষ্টি করেছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সৃষ্টি এভাবেই হয়েছে। এখানে প্রায় 100,000 কিউবিক মিটার লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলিকে তাদের অগ্ন্যুৎপাতের ধরণ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। উনবিংশ শতকে আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো, যেমন—যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে জীবন্ত, যেগুলি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে সুপ্ত এবং যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে না, সেগুলিকে মৃত বলা হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (1908) Lacsix আগ্নেয়গিরিগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এগুলি হলো

(1) Hawaian (2) Stromblian, (3) Vulcanian এবং (4) Pelean। হাওয়াইয়ান শ্রেণী হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এই শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে গ্যাস ধীরে ধীরে নির্গত হয় এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত কম হয়। ট্রম্বলীয় শ্রেণী সিসিলির কাছে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত এক্ষেত্রে বেশী বলে একে ভূমধ্যসাগরের বাতিঘর বলা হয়ে থাকে। ভালকানীয় শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি সিসিলির উত্তরে ভালকানো দ্বীপে দেখা যায়। বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাতের জোর এসব আগ্নেয়গিরিতে বেশী। এর লাভাও ট্রম্বলীয় শ্রেণীর লাভার চেয়ে বেশী ঘন ও আঠালো। পিলীয় শ্রেণী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এখানে অতি উত্তপ্ত গ্যাস, প্রদীপ্ত ভস্ম বহু উঁচুতে উঠে উজ্জ্বল মেঘের সৃষ্টি করে। এছাড়া Solfatric শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে শুধুমাত্র গ্যাস নির্গত হয়। এই ধরণের আগ্নেয়গিরি ইটালীর নেপ্‌লসে দেখা যায়। অনেক সময় সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে দ্বিতীয় জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়, সেগুলি Somma নামে পরিচিত। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এই রকম দ্বিতীয় জ্বালামুখ দেখা যায়। এই শ্রেণীগুলি ছাড়া আইসল্যাণ্ড দ্বীপে বিরাট অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ফাটল থেকে লাভা নির্গত হয়ে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার লাভার আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কথা আগেই বলা হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় 500 আগ্নেয়গিরি আছে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরের দুই ধারে অবস্থিত। এই আগ্নেয়গিরিগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা (Pacific ring of fire) নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে কামচাট্কা উপদ্বীপে, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে, জাপান দ্বীপপুঞ্জে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, নিউগিনি, সলোমন, নিউহিব্রাইডিস ও নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে এই বলয়ের একটি অংশ দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের অপর তীরে দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো দ্বীপ থেকে উত্তরে অ্যাণ্ডিজ পর্বতের মধ্য দিয়ে সিয়েরা নেভেডা ও রকি পর্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কার মধ্যে বিস্তৃত আছে। এর শাখাটি অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে অন্য শাখার সঙ্গে যুক্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মোনা লোয়া ও কিলাউয়া আগ্নেয়গিরি, গ্যালাপেগোস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ইষ্টার ও জুয়ন ফার্নেনডিস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি ও টঙ্গা, সামোয়া, কারমাডেক ও অন্যান্য দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি আছে। এছাড়া আর একটি আগ্নেয়গিরিমণ্ডল আল্পস পর্বতমালা থেকেই ইটালীর অ্যাপেনাইন পর্বতের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে চলে গেছে। এখানে আছে ভিসুভিয়াস, এট্না, লিপারি দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ঈজিয়ান সাগরের আগ্নেয়গিরি, ককেশাস অঞ্চলের এলবার্স, কাজবেক ও তুরস্কের আরারাট ইত্যাদি। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রায় 19টি, জাভায় 15টি, সুম্বা দ্বীপে 3টি এবং মালাক্কাস দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এই মণ্ডলটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। আটলান্টিক মহাসাগরে আইসল্যাণ্ড দ্বীপে 25টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে হেক্লা বিখ্যাত। জন মাইয়েন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি ও ক্রেটার এন্টিলিসের মাউন্ট পিলি বিখ্যাত। তাছাড়া ক্যানারী দ্বীপ, অজোর দ্বীপ, কেপ ভার্ড দ্বীপ, গিনি উপসাগর, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ও ত্রিস্টান ডা কুনহা ও আফ্রিকার প্রস্তর উপত্যকায় আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো একটি মৃত আগ্নেয়গিরি, ভারত মহাসাগরে কমোরো, মরিশাস, রিইউনিয়ান দ্বীপ ও ব্যারণ দ্বীপে আগ্নে-

গিরি আছে। ব্যারন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি মৃত এবং এটাই ভারতের একমাত্র আগ্নেয়গিরি।

আগ্নেয়গিরিগুলির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশই নবীন পর্বতশ্রেণীর কাছে বা এমন সব দ্বীপপুঞ্জের কাছে, যেগুলি আধুনিক ভঙ্গিল পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমির উপরে আগ্নেয়গিরি দেখা যায় না বললেই হয়।

পৃথিবীর বিখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে (79 খৃঃ) হারকিউলিয়াম ও পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে (1883 খৃঃ) ক্রাকাতোয়া দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। অনেক সময় পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের ফলেই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চিরকালই মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান এর মধ্য থেকেই সৃষ্টির উপাদান খুঁজে বের করে তাকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করছে।

ইটালীর টাস্কানীতে এই আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত বাষ্প থেকেই ইটালীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির শতকরা 6 ভাগ উৎপন্ন হচ্ছে। বোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, বোরাক্স, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থও তৈরি হচ্ছে। এছাড়া ইটালীর বহু জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ আগ্নেয়গিরির নিকটে থাকায় সেখান থেকে রোগাক্রান্ত লোকেরা উপযুক্ত আরামের সুযোগ পেয়ে থাকে।

ডিটারজেণ্ট ও তার আধুনিক প্রয়োগ

সমীরকুমার রায়

মানুষ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করতে শেখে। অপরিষ্কার বলতে বোঝানো হয়—কোন বস্তুর অবাঞ্ছিত স্থানে অবস্থান। টোম্যাটো-সস্ খাবার প্লেটেই মানায়, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে লেগে থাকাকে নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্নতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। অতএব টোম্যাটো-সস্কে অবাঞ্ছিত স্থান থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা থেকেই মলিনতা দূরীকরণের প্রেরণা আমরা পেয়েছি এবং তার সার্থক প্রয়াসের মধ্যেই পরিষ্করণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি। মলিনতার প্রকারভেদে চার প্রকারের পরিষ্কার-প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে; যেমন—(1) হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা, (2) জলের সাহায্যে ধুয়ে ফেলা, (3) বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে স্থানচ্যুত করা এবং (4) বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে দ্রবীভূত করা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থের বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। তৃতীয় পর্যায়ের মলিনতা হলো, যা শুধুমাত্র হাত দিয়ে ঝাড়লে বা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে অপসারিত হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন—বিশেষ ধরণের পরিষ্কার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু। এই বিশেষ বস্তুটির আবিষ্কার হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে এবং সেই সময় থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত। সেই বস্তুটি হলো সাবান—প্রাকৃতিক ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম

ঘটিত একটি লবণ। সাবান প্রস্তুত-প্রণালীও সাধারণ। ফ্যাটি অ্যাসিডকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাসের দ্বারা saponify করলেই সাবান প্রস্তুত হয়; যেমন—

$CH_3(CH_2)_{16}COOH + NaOH =$
(ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড) (কস্টিক সোডা)

$CH_3(CH_2)_{16}COONa + H_2O$
(সাবান) (জল)

পরিষ্কার করবার এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী সাবান কি কারণে হলো, সে সম্বন্ধে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, Electrolytic dissociation-এর ফলে সাবান জলে দ্রবীভূত হয়; অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পজিটিভ চার্জযুক্ত সোডিয়াম বন্ধনমুক্ত হয়। এই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের OH আয়ন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে এবং জলের H আয়নটি কার্বোক্সিল গ্রুপের সঙ্গে মিলে আবার ফ্যাটি অ্যাসিড $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ উৎপন্ন করে। ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, জলের প্রতি সোডিয়ামের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু হাইড্রোকার্বন অংশটি ঠিক সোডিয়ামের বিপরীত। জলের প্রতি এর কোন আকর্ষণ নেই—তাই জল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বিজ্ঞানীরা এইরূপ আচরণকে hydrophilic বা water loving এবং hydrophobic বা water hating আখ্যা দিয়েছেন। এটাও ধ্রুব সত্য যে, এই বিপরীত-ধর্মী আচরণের মধ্যেই পরিষ্করণ-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ hydrophilic অংশটি জলের মধ্যে hydrophobic অংশকে টানতে থাকে এবং hydrophobic অংশটি সর্বদাই এই টান থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। ফলে hydrophobic অংশ জলের উপরিভাগে জমা হয় এবং জলের উপরিভাগের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়; অর্থাৎ জলের তলটান (Surface tension) কমিয়ে দেয়। তলটান কমে যায় বলেই ওয়েটিং, ফোমিং এবং পরিষ্করণ সম্ভব হয়। এই প্রকার পদার্থকে Surface active agent বলা হয়। এই সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে দেখলে দেখা যায়, জলের মধ্যে water repellent নেগেটিভ আয়নগুলি নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করে Spherical colloid কণা হিসাবে জটলা পাকায়। এদের বলে Micelles। এতে 50 থেকে 100টা আয়ন থাকে। Micelles এমন ভাবে তৈরি হয় যে, hydrophobic অংশগুলি গোলকের কেন্দ্রে থাকে এবং hydrophilic অংশের সাহায্যে সমস্ত গোলকটি আবৃত থাকে। ময়লা সাধারণতঃ hydrophobic এবং সেই কারণে ডিটারজেন্টের লম্বা শৃঙ্খলের নেগেটিভ আয়নগুলি ময়লার সঙ্গে জোট বাঁধে। এইভাবে water hating parts অর্থাৎ ময়লাকে water loving আস্তরণের মাধ্যমে জলে দ্রবণীয় করে তোলে। সাবানের এই ধর্মই হলো Surface active agent-এর স্বাভাবিক ধর্ম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা Surface active agent উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু হয়। 1913 সালের প্রথম দিকে একজন বেলজিয়ান রসায়নবিদ্ Reychler গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ডিটারজেন্ট আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারের বিষয় তিনি একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা থেকে 1917 সালে Dr. Fritz Gunthar কোলটারের (Coal tar) উপজাত পদার্থ হিসাবে ডিটারজেন্ট সংশ্লেষণে সক্ষম হন। 1925 সালে 'Nekal' নামে এই ডিটারজেন্ট বাজারে প্রথম বের হয় এবং এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের সঙ্গে সাবানের মূলগত পার্থক্য আছে। এই নূতন দ্রব্যটি খর জলের ক্যালসিয়াম এবং

ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সঙ্গে সাবানের মত কোন অ-দ্রাব্য লবণ প্রস্তুত করে না। ফলে খর জলে এর পরিষ্কার করবার ক্ষমতার কোন তারতম্য হয় না এবং অল্প মাত্রায় ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। T. E. Larsen. (Journal of the American Water Works Association, April, 1949) ভাল ডিটারজেন্টের কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন—(1) জলে সহজে দ্রবণীয়, (2) ডিটারজেন্ট মিশ্রিত জলের দ্রবণটি কৈশিক (capillary) স্তরের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং (3) Emulsion প্রস্তুতের ক্ষমতা।

সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে অল্প কথায় বলতে পারা যায়—ফ্যাটি অ্যাসিড একটি অনুঘটকের সাহায্যে উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

$R-COO-H+2H_2=$
(ফ্যাটি অ্যাসিড) (হাইড্রোজেন)

$R-CH_2-OH+H_2O$
(ফ্যাটি অ্যালকোহল) (জল)

এবারে এই ফ্যাটি অ্যালকোহলের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। ফলে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট উৎপন্ন করে।

$R-CH_2-OH+H_2SO_4-$
(ফ্যাটি অ্যালকোহল) (সালফিউরিক অ্যাসিড)

$R-CH_2-OSO_2OH+H_2O$
(ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট) (জল)

পরিশেষে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট কস্টিক সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেটের একটি সোডিয়ামঘটিত লবণ প্রস্তুত করে। এই লবণটিই হলো সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট।

Dr. Fritz Gunthar-এর পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু প্রকারের ডিটারজেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। Ionisation-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিটারজেন্টগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ—Anionic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$; দ্বিতীয় ভাগ—Cationic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}N(CH_3)_3Cl$ এবং তৃতীয় ভাগ—Nonionic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}-O-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$.

E. E. Dreger, G. I. Kein, G. D. Miles, L. Shedlovsky এবং J. Ross (Ind. Eng. Chem. 36, 610-617, 1944) কার্বনমালার দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ সীমা এবং হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যার ফলে কার্বনমালার দৈর্ঘ্য এবং হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠীর অবস্থান দেখেই তার Wetting property এবং Foam stability নির্ণয় করা সহজ হবে। দেখা গেছে, হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠী কার্বনমালার যত শেষের দিকে থাকবে, ততই তার পরিষ্করণের ক্ষমতা বাড়বে এবং যত দূরে অবস্থিত হবে, ততই Wetting property বাড়বে।

পরিষ্কার করবার ক্ষমতা অর্থাৎ detergency আরও দুটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল—তাপমাত্রা এবং pH (Hydrogen ion concentration)। আমরা অবগত আছি যে, উচ্চ তাপমাত্রায় সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের বেলায়ও তাপের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে ডিটারজেন্ট 12টি কার্বনের দ্বারা গঠিত, তারা স্বল্প তাপমাত্রায় ভাল কাজ করে; কিন্তু 18টি কার্বনের দ্বারা গঠিত ডিটারজেন্ট উচ্চ তাপমাত্রায় সক্রিয় হয়। তবে বেশীর ভাগ ডিটারজেন্টকেই দেখা যায় 100° থেকে 140° ফাঃ-এর মধ্যে সক্রিয় থাকে। সাবানের উপর pH-এর প্রভাব আমরা জানি। pH কমতে থাকলে

অর্থাৎ অ্যাসিডের মাধ্যমে সাবান মোটেই সক্রিয় থাকে না, কারণ সাবানের desaponification ঘটে। কিন্তু pH বাড়তে থাকলে ক্ষারের মাধ্যমে সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতা বজায় থাকে। দেখা গেছে সাবান pH 10·50 থেকে pH 11·0-এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হয়। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এত কড়াকড়ি নিয়ম নেই। pH 7·0-এর নীচেও এরা কার্যকর থাকে এবং ভরপুর ফেনা হতেও কোন অসুবিধা হয় না। তবে সাধারণতঃ 10·5 pH-এ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আধুনিক কালে Surface active agent-সমূহ যে শুধু মাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে কথা মনে করলে ভুল হবে। এর প্রয়োগের দিক থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, তা আলোচ্য বিষয়গুলি অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যাবে। 1935 সালে Domagk প্রকাশ করেন যে, Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride-এর জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। তারপর থেকেই এই বিষয় নিয়ে নূতনভাবে গবেষণা সুরু হবার ফলে জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি নূতন দিগন্তের আবরণ উন্মোচিত হয়। বিশদ পরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি যে, ক্যাটায়নিক এবং অ্যানায়নিক—এই উভয় প্রকার যৌগই জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু নন-আয়নিক যৌগসমূহের অধিকাংশ জীবাণুর উপর প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই। ক্যাটায়নিক যৌগ গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম-নেগেটিভ উভয় প্রকার জীবাণুকেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতার উপরও pH-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্যাটায়নিক যৌগগুলির জীবাণু প্রতিরোধ-ক্ষমতা pH বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। আবার অ্যানায়নিক যৌগের ক্ষেত্রে pH কমবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। Quisno এবং Foter (J. Bact. 1946, 52, 111) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, Cetyl pyridinum chloride-এর জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা pH 2·0 থেকে 10·0 পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকে। যাহোক, সংশ্লেষিত Surface active agent-সমূহ যে জীবাণুনাশক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

Fogelson এবং Shoch প্রমাণ করেন যে, gastric ও duodenal ক্ষতে Sodium alkyl sulphate ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। মলমের মধ্যে 2% Sodium lauryl sulphate ব্যবহার করে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ভগন্দর এবং ক্ষতের উপশমে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। কৃষিকার্যে Alkyl benzene sulphate (ABS) ব্যবহার করে যে সুফল পাওয়া গেছে, সে খবর আমরা 1954 সালে E. A. clark-এর গবেষণা থেকে জানতে পারি। তিনি দাবী করেন যে, ABS ব্যবহার করলে মাটিতে জল প্রবেশের এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে মাটির উন্নতি ঘটে এবং গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। যে সব মাটিতে হিউমাস কম থাকে, সেই সব মাটির হিউমাসের অভাব পূরণ করে। ফলে উদ্ভিদ তার পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আরও সম্ভবনাপূর্ণ সংবাদ হলো, অনুর্বর এবং ক্ষারধর্মী মাটি, যেখানে চাষ-আবাদ হয় না, সেই সব জমিতে ABS প্রয়োগ করলে জমি উর্বর হয় এবং সেখানে ফসল ফলানো সম্ভব হয়।

আমরা জানি, Froth flotation পদ্ধতির দ্বারা খনিজ পদার্থকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিতে খনিজ মিশ্রিত পদার্থকে ভেঙে গুঁড়া করা হয়। তারপর এই গুঁড়া Flotation cell-এর মধ্যে নিয়ে জল ও Flotation reagent মেশানো হয়।

এবারে একটি Agitator দিয়ে খুব বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। ফলে প্রচুর ফেনায় ভরে যায় এবং সেই ফেনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ উপরে ভেসে ওঠে আর অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ নীচে পড়ে থাকে অথবা এর ঠিক উল্টো ব্যাপারও ঘটতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন খনিজ পদার্থের পৃথকীকরণের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন Surface active agent ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Galena-কে পৃথক করতে হলে Alkyl xanthates ব্যবহার করা হয়, আবার Cassiterite সংগ্রহ করতে Sodium cetyl sulphate ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Surface active agent-এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলাফল যদি অনুধাবন করা যায়, তাহলে তার সার্থক প্রয়োগ দেখা যাবে Twitchell প্রক্রিয়ার মধ্যে—যেখানে চর্বির অণুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিতে চর্বিকে জল ও Anionic surface active agent-এর মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা হলে চর্বির hydrolysis ঘটে এবং Glycerol আর Free fatty acid উৎপন্ন করে। এখানে Surface active agent অনুঘটকের কাজ করে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

সীসা, ক্যাড্‌মিয়াম এবং পারদ ক্যাথোড যেখানে জৈব পদার্থের বিশেষ Electro-chemical reduction সংঘটিত করে, সেখানে Surface active agent বর্তমান থাকাতে তড়িৎ-প্রবাহের কার্যকর ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। ক্যাটায়নিক যৌগগুলি ক্যাথোডের উপরিভাগে লেগে থাকার ফলে জৈব পদার্থসমূহের reduction-এ বাধা দেয় অর্থাৎ সেগুলি ঐ Surface active পদার্থের আস্তরণ ভেদ করে ক্যাথোডে পৌঁছুতে পারে না।

সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট বা Synthetic surface active agent আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাতুবিদ্যা, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী এবং আরো অনেক দিকে Surface active পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এর উৎপাদনের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নি এবং প্রয়োগবিস্তার দিক থেকেও তেমন প্রসার লাভ করে নি। যেহেতু এই পদার্থগুলি কৃষিকার্যে বিশেষ উপযোগী, সেহেতু আমাদের দেশে, যেখানে খাদ্যসমস্যা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা—জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে এবং প্রচুর শস্য ফলনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। মাটির ক্ষয়প্রাপ্তি যেখানে ঘটেছে, সেখানে এই পদার্থগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে মানুষের শরীরে Surface active agent-এর প্রভাব কিরূপ, সে সম্বন্ধে সম্যক গবেষণা করলে আরও হয়তো বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ Surface active agent এখনও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক চমকপ্রদ ফলাফল হয়তো অপেক্ষা করে আছে।

প্রজাতির উদ্ভব

মৃদুলা মৌলিক*

প্রজাতি বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদের এমন স্বাভাবিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা অপর প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক গোষ্ঠী থেকে উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন, সংজননে স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, যারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে জীবের ক্রমবিকাশের ধারা বাহিত হচ্ছে। কিন্তু এদের উদ্ভব সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। বিগত দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এই বিষয়ে সম্যক ধারণা এনে দিয়েছে। ক্রোমোজোম** এবং জিন*-এর উপর ভিত্তি করে বংশগতি পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করলে আমরা প্রজাতির উদ্ভবের বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল কিছুটা আনুমানিক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। বিজ্ঞানী জিন ব্যাপটিষ্ট লামার্কের (1744-1829) মতে, জীবদ্দশায় অর্জিত সমস্ত দৈহিক গুণাগুণ বংশপরম্পরায় উত্তরপুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হবার ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রজাতিরমধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, লামার্কের মতে ঐগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক প্রভাব বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল। এই পার্থক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের সম্যক (1809-1882) ধারণা ছিল না, কিন্তু তিনি এই পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে কতকগুলি পার্থক্য স্থিতিলাভ করে। পরবর্তী কালে অগাষ্ট ওয়েজম্যান (1834-1914) উক্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

কারণ যে কোন জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত যাবতীয় গুণাগুণ তার উত্তর পুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে না। তাই চীনা মেয়েদের লোহার জুতা পরিয়ে পা ছোট করবার চেষ্টা করলেও পরবর্তী পুরুষে মেয়েদের পা জন্ম থেকেই ছোট হয় না। কাজেই উপরিউক্ত দুটি মতবাদের একটিও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়।

আজকের জিন-মতবাদ অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ভিন্ন বা পরিবর্তিত গুণাগুণ পেতে হলে ক্রোমোজোম ও জিন্-এর মধ্যে পরিবর্তন আনা বাঞ্ছনীয়। তাই ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও উপাদানের কোনও বিশেষ পরিবর্তন নতুন প্রজাতি গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্রোমোজোমের এই সংখ্যা বা উপাদানের পরিবর্তনকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রজাতিতেই ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু কোন বিশেষ ভৌতিক বা রাসায়নিক কারণে এদের

**ক্রোমোজোম—জীবদেহের কোষের নিউক্লিয়াসে বর্তমান—জটিল রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। কোষ-বিভাজনে এগুলি অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রজাতিতে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় জটিল রাসায়নিক অংশের দ্বারা ক্রোমোজোম তৈরি—প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে জিন* (Gene) বলে।

*জাতীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যান, হাওড়া-3

মোট সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন এদের বলা হয় পলিপ্লয়েড অথবা ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের গঠনের কিছু তারতম্য ঘটতে পারে ঐ একই কারণে। তখন তাকে বলা হয় জিন-মিউটেশন, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ খুবই কম। আবার বর্ণসঙ্কর (Hybrid) উৎপন্ন করবার সময় ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের সজ্জারীতিতে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে, যার ফলে আমরা ভিন্ন গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।

উপরিউক্ত তিনভাবে ক্রোমোজোমের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলীর প্রকাশ হয়, যদি এই নতুন গুণাবলীবিশিষ্ট জীব বংশবিস্তারে সক্ষম হয়, তবেই নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে পারে। তাই ক্রোমোজোমের পরিবর্তন যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রাকৃতিক নির্বাচনের।

উপরিউক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধিই প্রজাতি উদ্ভবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী মুক্টজিং-এর মতে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রজাতির উদ্ভব ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধির সাহায্যেই হয়েছে। ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ প্রাধান্য থাকলেও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভবও বিরল নয়।

জীবদেহের অভ্যন্তরে ঐ পার্থক্যগুলিই প্রজাতি উৎপত্তির সব কথা নয়, এর জন্যে অবস্থিতির পরিবর্তন বা বিচ্ছিন্নতা একান্ত প্রয়োজন। অবস্থিতির এই বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে; যেমন—ভৌগোলিক বাধা, ইকোলজিক্যাল বাধা প্রভৃতি। এই বাধার ফলে জীবের দেহকোষ বা জননকোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে। এভাবে একই গোষ্ঠীর কিছুটা পৃথক দুটি জীব যখন প্রাকৃতিক বাধা কাটিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করতে পারে, তখনই একটি সম্পূর্ণ আলাদা জীব-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই জীব-গোষ্ঠী সংজননে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা যদি বংশবিস্তারে সক্ষম হয়, তবেই এরা নতুন প্রজাতি হিসাবে পরিচিত হতে পারে। আমাদের অলক্ষ্যে কত শত পরিবর্তন হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হয়। কাজেই জিন এবং ক্রোমোজোমের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্টি হলেও এই পরিবর্তনের সাম্যের উপর নির্ভর করে এই নতুন জীবের বেঁচে থাকা, না থাকা।

বিভিন্ন ধরণের সূর্যরশ্মির প্রভাবে এবং তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে বিচিত্র ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীর বুকে আমরা দেখতে পাই। ক্ষুদ্র সরল অ্যামিবা-গোষ্ঠীর জীব থেকে অতি জটিল গঠনসমন্বিত জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ একই কারণে সম্ভব।

পৃথিবীর গভীরে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

পৃথিবীর কেন্দ্রের গভীরতা প্রায় 4000 মাইলের কাছাকাছি। তার অভ্যন্তরের সমস্ত রহস্য মানুষ এখনও উদ্ঘাটন করতে পারে নি। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশের খবর জানবার কোন প্রত্যক্ষ উপায় নেই। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ পর্যন্ত নল-কূপ বসাবার চিন্তা স্বপ্নবিলাস ছাড়া কিছুই নয়, কারণ পৃথিবীর গভীরতম তেলের (পেট্রোলিয়াম) কূপের গভীরতাও 5-6 মাইলের বেশী নয়। উপায়ান্তর না থাকায় ভূ-বিজ্ঞানীরা নানারকম অপ্রত্যক্ষ উপায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে খবরাখবর সংগ্রহ করেছেন, তা নেহাৎই অপ্রতুল।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, গলিত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। দুধের সরের মত পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি হয়েছে এক পাত্‌লা স্তর, যাকে বলা হয় ভূত্বক (Crust)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর উপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও অভ্যন্তর ভাগ কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে—কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে ধারণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে প্রতি 20 থেকে 100 মিটার গভীরতা বৃদ্ধির ফলে 1° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বেড়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র গভীরতা নয়, শিলাপ্রকৃতির উপরেও উষ্ণতাবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যেমন শক্ত আগ্নেয় অথবা পরিবর্তিত শিলার ক্ষেত্রে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার পাললিক শিলার চেয়ে বেশী। আবার যেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার তো বেশী হবেই। তাছাড়াও ভূত্বকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেশী রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতাবৃদ্ধির মাত্রা ভূ-অভ্যন্তরের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরণের পরোক্ষ প্রমাণ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতার হিসেব নিতান্তই আনুমানিক হতে বাধ্য। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপ কত? এই প্রশ্নের উত্তরে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী জেরহুগেন বলেছেন, পৃথিবীর অন্তস্তলের (Core) উপরিভাগের তাপমাত্রা 1500° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। অবশ্য গুটেনবার্গ, ড্যালি, আডাম্‌স্‌, জেফরী বা হোম্‌সের মতে এই তাপমাত্রা অনেক বেশী। এই মতের অমিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এই তাপমাত্রার পরিমাপ নিছক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। আর সেই কারণে এই সম্বন্ধে চুলচেরা গবেষণা আপাততঃ নিরর্থক।

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাপমাত্রাই নয়, চাপের পরিমাণও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইল নীচে চাপ প্রতি বর্গফুট জায়গায় প্রায় 450 টনের কাছাকাছি। এই গড় হিসেব থেকে কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়েছে, প্রতি বর্গফুটে প্রায় 20 লক্ষ টনের কাছাকাছি। তবে এই হিসেব যে নিতান্তই আনুমানিক, একথা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্রের গভীরে তাপ ও চাপের প্রাবল্য থেকে স্বভাবতঃই অন্তস্তলের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন পদার্থই আয়তনে বৃদ্ধি পায়। আবার অন্য দিকে চাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পদার্থের আয়তন হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথি-

---

* ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

বীর কেন্দ্রাঞ্চলে অতিরিক্ত চাপ ও তাপ—দুই বিরোধী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করছে। ফলে পৃথিবীর অন্তস্তলের পদার্থ অকঠিন অথচ অতরল—এমন এক অবস্থায় বিরাজ করছে বলে বিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন।

পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ধরণের শিলা দেখতে পাওয়া যায়, তার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gravity) প্রায় তিনের কাছাকাছি। অথচ সমগ্র পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ। স্বভাবতঃই ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আরো বেশী—হয়তো সাত বা আটের কাছাকাছি। কিন্তু শুধুমাত্র চাপের প্রভাবে পদার্থের ঘনত্বের এতখানি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অন্তস্তল নিশ্চয়ই কোন ভারী ধাতব পদার্থে গঠিত। মহাকাশের বুক থেকে ছুটে-আসা উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলি সাধারণতঃ লোহা ও নিকেলজাতীয় পদার্থে তৈরি। একথা বলাই বাহুল্য, বেশীর ভাগ উল্কাপিণ্ডই সৌরজগতের মৃত বাসিন্দা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে বাইরের অংশটুকু জলেপুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু ভিতরের লোহা ও নিকেলের মিশ্র অংশটুকু। একই সৌরজগতের অংশ বলে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর মূলগত সাদৃশ্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অন্তস্তল লোহা ও নিকেলে তৈরী—বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে ব্যাখ্যা করা সহজতর হয়েছে।

পৃথিবীগর্ভের আকৃতি ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছে ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণের উপর, যদিও তরঙ্গের বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল ছুড়লে যেমন জলের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবেই ভূকম্পনজনিত তরঙ্গমালা উৎসস্থল থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই সব তরঙ্গই ক্যামেরার ছবির মত সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রে ধরা পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় মাঝে মাঝে তরঙ্গের গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। এই গতিবেগের তারতম্য থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণভাবে তিন ধরণের ভূকম্পন তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। P বা প্রাথমিক তরঙ্গ, S বা গৌণ তরঙ্গ এবং L বা দীর্ঘ তরঙ্গ। এদের গতি ও প্রকৃতি পরস্পর থেকে আলাদা। যেমন P ও S তরঙ্গমালা কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে পারে, কিন্তু L তরঙ্গ কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে অক্ষম। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রকৃতি নির্ধারণে কেবলমাত্র P ও S তরঙ্গমালার বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করতে হয়েছে। সিস্‌মোগ্রাফ রেকর্ড থেকে দেখা গেছে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত তরঙ্গ দুটির গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে চলে। কিন্তু 60 থেকে 80 কিলোমিটার গভীরতায় তরঙ্গবেগ হ্রাস পায়। 160 কিলোমিটারের পর থেকে আবার গতিবেগ বাড়তে থাকে, যদিও 950 কিলোমিটার গভীরতায় কমে যায়। 950 কিলোমিটারের পর থেকে 2900 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু 2900 কিলোমিটার গভীরে তরঙ্গমালার গতিবেগ হঠাৎ অত্যন্ত কমে যায়। ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগের এরকম ওঠা-নামা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সব জায়গায় শিলার গঠন-প্রকৃতি এক রকম হতে পারে না। গতিবেগের তিনটি পর্যায় থেকে পৃথিবীরও তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন—সব চেয়ে উপরের স্তরের নাম ভূত্বক (গভীরতা 60 কিলোমিটার), মধ্যবর্তী স্তরের নাম ম্যাণ্টল (গভীরতা 2900 কিলোমিটার) ও সবচেয়ে

নীচের স্তরের নাম অন্তস্তল, যা পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অনেক বিজ্ঞানীর মতে অন্তস্তলের পদার্থ গলিত অবস্থায় রয়েছে, যদিও এই বিষয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী সংশয়াচ্ছন্ন।

পৃথিবীর অন্তস্তল, ম্যান্টল ও ভূত্বক।

ভূত্বক ও ম্যান্টল এবং ম্যান্টল ও অন্তস্তলের মধ্যে দুটি বিরতি (Discontinuity) রেখা কল্পিত হয়েছে। প্রথমটি বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী মহরোভিসিকের নামে এবং দ্বিতীয়টি ভূ-বিজ্ঞানী গুটেনবার্গের নামে পরিচিত। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিরতি রেখা রয়েছে। অবশ্য এগুলির গুরুত্ব অনেক কম।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীকে শামুকের খোলার মত আবৃত করে যে কঠিন স্তরটি বিরাজ করছে, তার নাম ভূত্বক। গভীরতা প্রায় 60 কিলোমিটার। এই ভূত্বকের মধ্যে আবার দুটি ভাগ। উপরাংশে সিয়াল (Sial—সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ) ও নিম্নাংশ সিমা (Sima—সিলিকা ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ)। ভূত্বকে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম বা সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী, যদিও লোহা ও ম্যাগ্‌নেশিয়ামের পরিমাণও কম নয়। ভ্যাণ্ডার গ্র্যাট, গুটেনবার্গ প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভূত্বকের তিনটি ভাগ করেছেন, যেমন—সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে গ্র্যানিট জাতীয় পাথর—প্রায় 10 কিলোমিটার পুরু। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমুদ্রের তলদেশে কিন্তু গ্র্যানিট পাথর দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় স্তরটি প্রায় 20 কিলোমিটার পুরু—ব্যাসাল্ট ও অ্যাম্ফিবোলাইট পাথরে তৈরী। আর সবচেয়ে নীচের স্তরে রয়েছে ডিউনাইট ও পেরিডোটাইটজাতীয় পাথর—প্রায় 30 কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে ভূত্বকে আগ্নেয়-শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়। ক্লার্কের মতে, ভূত্বকের প্রথম 1·6 কিলোমিটারে শতকরা প্রায় 95 ভাগ আগ্নেয়শিলা, বাকীটা পাললিক শিলা।

কোন কোন ভূবিদ্ কল্পনা করেছেন, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার নীচেই রয়েছে গলিত লাভার স্তর। কিন্তু ভূ-পদার্থবিদেরা এই ধারণাকে অমূলক বলে অভিহিত করেছেন। কারণ সে রকম কোন গলিত লাভার স্তর থাকলে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগে তারতম্য ঘটতো। স্বাভাবিক কারণে অনেকে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের সময় গলিত লাভা আসে কোথা থেকে? উত্তরে ভূ-পদার্থবিদ্‌রা বলেছেন, 40 কিলোমিটার গভীরতায় শিলার উত্তাপ বেশী হলেও সেখানে কোন গলিত শিলাস্তর নেই। হয়তো কোন কারণে শিলাগর্ভে ফাটলের সৃষ্টি হলে চাপের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তারই ফলে ভূগর্ভের শিলা গলিত হয়ে লাভার সৃষ্টি করে।

ভূত্বকের নীচে রয়েছে ম্যান্টল—এটি 2900 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ভূ-রসায়নবিদ্ গোল্ডস্মিথের মতে, ম্যান্টলের দুটি ভাগ। উপরে এক্লোগাইট স্তর, নীচে অক্সাইড-সালফাইড স্তর। এই স্তর দুটিতে অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহা ছাড়া নিকেলযুক্ত পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। এই স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব আনুমানিক 4 থেকে 5।

পেঁয়াজের ভিতরের কোয়ার মত পৃথিবীরও

রয়েছে অন্তস্তল। এটি ম্যান্টল বা ভূত্বকের চেয়ে অনেক বেশী ভারী পদার্থে গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি মূলতঃ লোহা, নিকেল ইত্যাদি ভারী পদার্থে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানী ব্যাজের মতে, ম্যান্টলের সঙ্গে অন্তস্তলের পদার্থের বেশী অমিল নেই। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি চাপের পরিমাণও বেড়ে যায়। ফলে অন্তস্তলের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। অকঠিন অথচ অতরল এমনি এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে অন্তস্তলের পদার্থ। সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুলেন ভূকম্পন-তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নতুন এক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর অন্তস্তলে লোহা-নিকেলের দুটি স্তর। 2900 কিলোমিটার থেকে 5000 কিলোমিটার পর্যন্ত তরল স্তর এবং তার নীচে কঠিন স্তর।

বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। চন্দ্রলোক আজ মানুষের পদানত। নিখিল বিশ্বচরাচরের বিচিত্র রহস্য উম্মিলিত হচ্ছে মানুষের অদম্য জ্ঞানস্পৃহায়। বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য প্রগতির যুগে নিজেদের পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্যই বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে একটি আপ্তবাক্য মনে পড়ছে—Nearest to the Church, farthest from the God.

চুলকুনি প্রসঙ্গে

সুধাংশুবল্লভ মণ্ডল

"যে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন থাকা মানবমনের পক্ষে এক অতি হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি। এই অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘ কাল সে সমর্থন করতে পারে না; যেমন করেই হোক—অভ্রান্ত সত্য নয় জেনেও এই অজ্ঞতাকে সে জয় করবেই। কারণ জ্ঞানের অভাবকে 'কিছুই নয়'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে আবৃত রেখে আত্মতুষ্ট থাকা মানবমনের ধর্ম নয়।"

—জে. জে. রুসো

কোন বর্ণাঢ্য, শব্দব্যঞ্জনাময় সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত না করলেও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই চর্মরোগের বিশেষ এই লক্ষণটিকে অতি সহজেই চিনতে আমাদের ভুল হয় না। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অনেক সময়েই ব্যাহত করে এই বস্তুটি এবং এমনি অস্বস্তিকর করুণ অভিজ্ঞতা যাদের আছে, সংসারে তাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। তাই অন্ততঃ সাধারণভাবে এই চুলকুনিকে চিনতে সচরাচর কোন চিকিৎসকের প্রয়োজনও হয় না।

এটা আসলে কোন রোগ নয় বরং একে কোন কোন চর্মরোগের বা অবস্থার অনুষঙ্গ বলাই সঙ্গত হবে। অনেক কারণেই এর প্রকাশ হতে পারে। খোস, পাঁচড়া, দাদ, কাউর, হাজা, লাইকেন, প্র্যানাস প্রভৃতি চর্মরোগের ক্ষেত্রে চুলকুনির উপস্থিতি প্রায় অবধারিতভাবেই লক্ষণীয়। আবার শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন রোগের বহিঃপ্রকাশের হেতু, যেমন—ন্যাবা, বহুমূত্র, হজ্‌কীন রোগ, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি অথবা বিষাক্ত কোন প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ বা কোন কীট-পতঙ্গাদির দংশন প্রভৃতি বহুবিধ কারণেই এর উদ্ভব হতে পারে। আবার আপাত গ্রহণের অযোগ্য কারণবিহীন অজ্ঞাত উৎস নিদারুণ এক চুলকুনি যাকে

যাকে আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলে—এমন কি, স্থানকাল নির্বিশেষে শালীনতা রক্ষার চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়, আপাত বিচারে যার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই চুলকুনির বিষয়েই এখানে আমরা আলোচনা করবো।

বস্তুতঃ চর্মরোগের বহুবিধ লক্ষণাদির মধ্যে যেগুলি প্রকাশবৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র, তাদের মধ্যে চুলকুনি অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে এই চুলকুনি রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছেই সমান অস্বস্তিকর ও সমস্যার বিষয়। ফরাসীরা তাই খুব সঙ্গত কারণে ও সার্থকভাবেই একে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই betenoire (বিশেষ অপছন্দের বস্তু) সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে থাকেন। কোন চর্মরোগকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যে চেষ্টার প্রয়োজন হয়, একমাত্র চুলকুনির ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য, কার্যকরী চিকিৎসার সূচনায় বিলম্ব হলে অবশ্যই চিকিৎসকের প্রতি আর্ত রোগীর নির্ভরতাবোধ ও আস্থার অভাব দেখা দেবে। ফলে চিকিৎসায় সুফল লাভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে না, উপরন্তু চর্মক্ষেত্রে রোগের প্রসারও হবে ব্যাপক। তাই যত সত্বর সম্ভব এই চুলকুনির প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়, ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক।

কিন্তু এই যে সমস্যাসঙ্কুল ব্যাধি বা রোগানুষঙ্গ—এর কারণই বা কি আর উৎসই বা কোথায়? নিদানশাস্ত্রের দুর্গমতা আর শারীরবিদ্যার জটিলতাকে যথাসাধ্য দূরে রেখে এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। চিকিৎসক সমাজে যদিও অদ্যাবধি এর প্রকৃত কারণ বহুবিতর্কিত ও সুস্পষ্ট বোধগম্যের অতীত, তথাপি হার্ডি, উল্ক ও গুডেল (1952), রডবেক্ট (1953), রথম্যান (1954), শেলী ও আর্থার (1957), লুইস ও কিলে (1957), উল্টেনহল্ম (1959) প্রমুখ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মোটামুটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, সম্ভবতঃ যন্ত্রণাপ্রবাহী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত উত্তেজনাই প্রকারান্তরে এই চুলকুনির সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রস্তাবিত সূত্র এর কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ, চর্মস্থিত আহত এপিডারম্যাল কোষসমূহের দ্বারা নিঃসৃত হিষ্টামিন বা হিষ্টামিনসদৃশ কোন রাসায়নিক পদার্থই সম্ভবতঃ একাধিক অ্যালার্জিঘটিত চর্মরোগের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ আমবাত শ্রেণীভুক্ত চর্মরোগে চুলকানি সৃষ্টিকারী প্রান্তিক জৈব রাসায়নিক বাহকের কাজ করে। কিন্তু অন্ততঃ কিছু কিছু চুলকুনির ক্ষেত্রে এই সূত্রের ব্যবহারিক প্রযুক্তির ব্যর্থতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সূত্রটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সমাদৃত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ ও ব্যাপক ক্ষতিকর উত্তেজনার ফলে এপিডারম্যাল কোষসমূহ আহত হলে প্রোটিনেজ নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। প্রোটিন ধ্বংসী বা আমিষজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করাই এর ধর্ম। এই রাসায়নিক পদার্থই পরিশেষে প্রান্তিক স্নায়বিক কলাকৌশলকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে চুলকুনি সৃষ্টির ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। চুলকুনির সংবেদন উত্তেজক হিসাবে এই প্রোটিনেজের সামর্থ্যের তথ্য অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই প্রমাণিত ও বিদিত। তাছাড়াও কেন্ডবার্গ ও শেকড (1954) বিড়ালের উপর সার্থক নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, কোন কোন সময়ে যোগ মস্তিষ্ককেন্দ্র থেকেও চুলকুনির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। হজকীন রোগ, ন্যাবা, বহুমূত্র, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে, যেখানে চর্মের কোন প্রাথমিক ব্যাধি ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ছাড়াই ব্যাপক চুলকুনি থাকে, তা সম্ভবতঃ এই মস্তিষ্ককেন্দ্র থেকেই উৎসৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কস্থিত সংবেদন কেন্দ্রের উত্তেজনা যে কোন প্রকার প্রান্ত-প্রবৃত্ত চুলকুনির তীব্রতাকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, চর্মপ্রান্তভাগ থেকে চুলকুনির সংবেদন-প্রবাহী সমস্ত স্নায়ুতন্তুর মূল ও চরম গন্তব্য স্থল হলো মস্তিষ্কস্থিত থ্যালামাসের নির্ধারিত অংশবিশেষ। এই সব বিশেষ স্নায়ুতন্তুসমূহ একত্রে কশেরুকার (Spinal cord) মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট, নির্ধারিত স্পাইনো-থ্যালামিক সড়কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংবেদন সঙ্কেতগুলিকে যথাস্থানে সরবরাহ করে। এই বিশেষ অংশ বা কেন্দ্র পরিশেষে সেই সঙ্কেতগুলিকে যথাযথ অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরিত সঙ্কেতই চুলকুনিরূপে অনুভূত হয়।

আবার প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদী চুলকুনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে ভাবোদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার এক মৌলিক উপাদান। কারণ এই দীর্ঘমেয়াদী চুলকুনিজাত কতকগুলি বিশেষ

1নং চিত্র
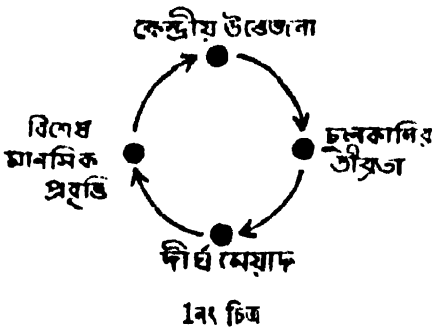
মানসিক প্রবৃত্তি, যেমন—অবসাদ, উদ্বেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি মূলতঃ থ্যালামাসের বিশিষ্ট কেন্দ্রকে উত্তেজিত ও কার্যকর করে। কেন্দ্রীয় এই উত্তেজনাই আবার চুলকুনির সংবেদনের সহনশক্তির সীমারেখাকে নিম্নমুখী করে চুলকুনির বোধকে তীব্রতর করে। এমনিভাবেই সৃষ্টি হয় এক বিষাক্ত বৃত্তের; অর্থাৎ মানসিক প্রবৃত্তি থেকে কেন্দ্রীয় উত্তেজনা এবং তা থেকে চুলকুনির তীব্রতা। অর্থাৎ এই বৃত্তপথেই আবর্তিত হতে থাকে একই ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

2নং চিত্রে চর্মপ্রান্ত থেকে মস্তিষ্কেকেন্দ্রগামী চুলকুনির সংবেদন-প্রবাহের সম্ভাব্য গতিপথকে চিত্রিত করা হয়েছে। চর্মপ্রান্তদেশের ক স্থানে সৃষ্ট সংবেদন-প্রবাহ স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে ক ক পথে কশেরুকার মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরে বিপরীত প্রান্ত অতিক্রম করে খ স্থানে যায় এবং সেখান থেকে সোজা ঊর্ধ্বগামী হয়ে খ খ পথে স্পাইনো-থ্যালামিক সড়কে গ স্থানে থ্যালামাসে পৌঁছায় এবং পরিশেষে করটেক্সের নির্ধারিত ঘ স্থানে উপনীত হয়। এই ঘ স্থান থেকেই সংবেদন-প্রবাহ সঙ্কেতসমূহ রূপান্তরিত হয়ে চুলকুনিতে পরিণত হয়। কশেরুকাকে বিশেষ এক স্তরে আড়াআড়িভাবে খণ্ডিত করে তার অভ্যন্তরভাগ ঙ অংশে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।

চিকিৎসালোচনা—বেতার যন্ত্র, দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অযাচিত ও অবাঞ্ছিত উপদেশ প্রবণ আত্মীয়পরিজনের পরামর্শে প্ররোচিত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচনায় রোগীদের মধ্যে নিজে নিজেই চিকিৎসা করবার প্রবণতা বেশ প্রবলভাবেই দেখা যায়। বর্তমান শতাব্দীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অবশ্য এর জন্যে যথেষ্ট দায়ী। কিন্তু সে যাই হোক, এর পরিণামে রোগী ও রোগের যে করুণ ও শোচনীয় পরিণতি হয়, সে অবস্থার সঙ্গে চর্মবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেরই সম্যক পরিচয় আছে। অনেক সময় আবার অনভিজ্ঞ ও হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারাও এই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ অকার্যকর কিছু ওষুধের কার্যাকার্য নির্বিশেষে অবাধ ব্যবহার যে কত নিরর্থক ও নিয়মের পরিপন্থী, তা এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যাবে। যেহেতু এই ব্যাধি দীর্ঘমেয়াদী, সেহেতু এর নিরা-

ষয়ের জন্তে সঠিক পদ্ধতিতে ত্বরিত এবং কার্যকর চিকিৎসার সূচনা যে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেবনযোগ্য যে সকল ওষুধ সাধারণতঃ ব্যবহার্য ও উপযোগী, তাদের মধ্যে সাইপ্রোহেপ্টাডিন হাইড্রোক্লোরাইড, ফেনিরামিন ও ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট, প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড, অ্যান্টাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড, ট্রাইপেলেন্নামিন

(1) চুলকুনি সৃষ্টিকারী প্রান্তিক কলাকৌশল অকার্যকর করে দেওয়া অথবা (2) চুলকুনির সংবেদন-সংকেতগ্রাহক মস্তিকস্থিত অনুভূতি-কেন্দ্রকে নিবৃত্ত করা।

অর্থাৎ 2 নং চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যথাক্রমে ক-স্থান অথবা ঘ-স্থানই এক্ষেত্রে আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থল। অতএব এই উদ্দেশ্য-প্রসূত ব্যাখ্যানুসারে মস্তিষ্ককেন্দ্রের উত্তেজনা-

2নং চিত্র

হাইড্রোক্লোরাইড, ডাইমেথিনডিন ম্যালিয়েট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সেবন-যোগ্য ওষুধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে চুলকুনি প্রশমনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দুটি।

বর্ধক ঔষধাদি (কেফিন বা অ্যামফেটামিন শ্রেণীভুক্ত) চুলকুনির বোধকে আরও বর্ধিত করে এবং উক্ত কেন্দ্রের নিবৃত্তিকারী ওষুধগুলি পক্ষান্তরে চুলকুনি প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুতরাং কর্টেক্সের নিম্নস্থিত মস্তিষ্কাংশের উত্তেজনা

লাঘবে উপযোগী ওষুধগুলিই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ চুলকুনির আবেগবাহী স্নায়ুতন্তসমূহ এই অংশেই সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পরে নির্দিষ্ট মস্তিষ্ককেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। সে জন্যেই উপরিউক্ত ওষুধগুলি এককভাবে অথবা একাধিক সংমিশ্রণের সঙ্গে অন্যান্য কেন্দ্র নিবৃত্তিকারী ওষুধের একত্র ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল প্রদান করে। আলোচনাপ্রসূত দৃষ্টান্ত হিসাবে মরফিন বা ওপিয়েট শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ওষুধগুলির চুলকুনি প্রশমিত করা উচিত। কিন্তু কার্যতঃ কেন্দ্রকে নিবৃত্ত করা সত্ত্বেও চুলকুনি প্রশমিত না করে বরং ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা আপাত বিচারে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে উল্লেখিত ওষুধের দ্বারা কর্টেক্সের নিবৃত্তিই আসলে থ্যালামাসের কার্যকারিতা বর্ধিত করে এবং তার ফলে চুলকুনির সংবেদন বোধের সীমারেখা নিম্নগামী হওয়ায় চুলকুনি বর্ধিত আকারে অনুভূত হয়। সে জন্যেই এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, চিকিৎসার বিষয়ে সুফল প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এমনি ধরণের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমের কার্যকারণ সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আলোচ্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোমেথাজিন, ফেনীরামিন, ক্লোরফেনীরামিন প্রভৃতি ওষুধগুলির ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়।

আমবাতজাতীয় চর্মরোগের ক্ষেত্রে আহার্য চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কোন ওষুধের চুলকুনিপ্রতিরোধ-ক্ষমতার মূল উৎস কিন্তু প্রধানতঃ প্রান্তদেশে নিঃসৃত হিষ্টামিন-প্রবাহ অবরোধের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই হিষ্টামিনবিরুদ্ধ ওষুধগুলি মুখ্যতঃ হায়ালইউরোনিডেজের কার্যকারিতাকে নিবৃত্ত করে। কাজেই সাইপ্রোহেপ্টাডিন, ডাইমেথিণ্ডিন, অ্যান্টাজোলিন প্রভৃতি হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধের ব্যবহারে সম্ভবতঃ হিষ্টামিন প্রতিরোধের চেয়ে বরং হায়ালইউরোনিডেজের সংহারকার্যই প্রবলতর হয়। ফলে কোন প্রদাহোত্তর চর্ম-প্রতিবেদন অতি সহজেই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং চুলকুনি প্রশমনের ব্যাপারে উল্লেখিত হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধগুলির কার্যকারিতা খুব আশাপ্রদও নয় এবং এদের অবদানের মাননির্ধারণও অতঃপর বিচারসাপেক্ষ।

আবার কতকগুলি বিশেষ নির্বাচিত তীব্র চুলকুনিযুক্ত চর্মরোগের ক্ষেত্রে স্থানিক (Topical or local) ও প্রণালীবদ্ধ (Systemic) পদ্ধতিতে চিকিৎসা-জগতের আধুনিকতম হাতিয়ার কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহারও আশাতিরিক্ত সুফলদায়ক। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চুলকুনি প্রশমনের সার্থকতা মুখ্যতঃ প্রদাহ-অন্বিত চর্মের প্রতিবেদনের নিরাময়-পথে পরিবর্তনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। কাজেই এসব ক্ষেত্রে আলোচ্য পদ্ধতির দ্বারা ব্যবহৃত স্টেরয়েড যদি প্রদাহ-অন্বিত চর্মের প্রতিক্রিয়াকে লাঘব করতে সক্ষম না হয়, তাহলে চুলকুনির তীব্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বা আশাপ্রদ পরিবর্তন সাধিত করতে পারে না।

অতএব এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে যে, এই ব্যাধির সার্থক চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন—সঠিক রোগনির্ণয়, তার প্রকৃতিগত কারণ সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও পরিশেষে যথোপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগের যৌক্তিকতা এবং তাদের প্রয়োগের পর দেহাভ্যন্তরে ঘটিত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান। কাজেই বিভ্রান্তিকর প্রচারের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বা স্ব-প্রণোদিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য, কখনও বা রীতিমত ক্ষতিকর আবার কখনও বা সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল কতকগুলি মেকী ওষুধের অবাধ ব্যবহারে শুধুমাত্র আর্থিক অপচয়ই হয় না, উপরন্তু ভবিষ্যতে চিকিৎসার সহজসাধ্য পথও

দুর্গম হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যে অত্যাবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য। বরং এসব ক্ষেত্রে চর্মরোগের বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা রোগ ও রোগী উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

গোখাদ্যের চাট্‌নি বা সাইলেজ

শ্রীমৃণালকান্তি ভৌমিক*

গবাদি পশুর উন্নয়নের কথা ভাবলে গোখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবতে হয়। মানুষের মতই গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু দুধ বা মাংস বৃদ্ধির জন্যে নয়, উন্নত ধরণের পশুপালন করতে গেলে এর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের সব দেশে সব ঋতুতে কাঁচা ঘাসের অভাব। কিন্তু এই অভাব বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব মেটানো যায়। গোখাদ্যের উপযুক্ত সংরক্ষিত কাঁচা ঘাসকে সাইলেজ (Silage) বলে। যে আধারে সাইলেজ তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় সাইলো (Silo)। আমাদের দেশে সারা বছর প্রয়োজনমত গো-খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; ফলে পশু-পালন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের কাঁচা ঘাস উৎপাদন করে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিকর সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব। এই উপায়ে সংরক্ষিত কাঁচা সবুজ ঘাসে গোখাদ্যের খাদ্যগুণাবলী বজায় থাকে।

প্রচুর পরিমাণে ফলনশীল এবং শর্করাযুক্ত ঘাসেই সাইলেজ ভাল হয়। বাংলা দেশে প্রধানতঃ নেপিয়ার, জই (Oat), জোয়ার, ভুট্টা এবং শুঁটি জাতীয় ঘাস সাইলেজ তৈরির পক্ষে উপযোগী। শুঁটিজাতীয় ঘাসে প্রোটিনের ভাগ বেশী থাকায় একে জই, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা উচিত। সাইলেজ তৈরির জন্যে ঘাসে উপযুক্ত রস থাকা দরকার। শুকনো ঘাসে খাদ্যের গুণাবলী পুরাপুরি না থাকায় তা সাইলেজ তৈরির পক্ষে অনুপযোগী। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ঘাস কতদিন পর কাটলে সাইলেজের উপযোগী হয়, তা বলা হলো।

ঘাসের নাম	কাটবার দিন	সাধারণ লক্ষণ
নেপিয়ার	60-65 ,,	ডাঁটাগুলি রসাল অবস্থায়
জই	65-75 "	দানায় দুধ প্রস্তুতির অবস্থায়
ভুট্টা	65-70 "	"
জোয়ার	80-90 "	ফুল আসবার সময়

সাইলো প্রস্তুত-প্রণালী—যেখানে জল জমবার সম্ভাবনা নেই এমন উঁচু জায়গায় 6-9 ফুট গর্ত করতে হবে। ইটের গাঁথুনী দিয়ে গর্ত পাকা করা দরকার। এর উদ্দেশ্য, গর্তের ভিতরে যাতে বাইরের জল ঢুকতে না পারে। এই গাঁথুনী মাটি থেকে অন্ততঃ $1\frac{1}{2}$-2 ফুট উঁচু করা দরকার। প্রস্থ, উচ্চতার সমান এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় তিন গুণ হওয়া দরকার। এই ধরণের সাইলোকে পিট সাইলো বলে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সাইলোতে সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব; যেমন—(1) বাক্স সাইলো—এতে মাটির

*বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ, কলিকাতা-37

উপরে 6/7 ফুট পাকা গাঁথুনী করতে হয়, (2) ট্রেঞ্চ সাইলো—এতে মাটির নীচে লম্বা ধরণের গর্ত করতে হয়, (3) বুরুজ সাইলো (Tower silo) এগুলি কাঠ বা ইটের তৈরি।

ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি—ঘাসের ডাঁটাগুলি রসালো অবস্থায় কেটে 1-1½" ইঞ্চি আকারে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট আঁটি খুলে গর্তের মধ্যে এমনভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে গোড়ার দিকটা উপরের দিকে থাকে। ঘাস ছোট না করেও সাইলেজ তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতে সংরক্ষণ ভাল হয় না বলে সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট হয়। ছোট করে ঘাস কাটলে বাতাসমুক্ত অবস্থায় খুব চাপে ঘাস রাখা যায়। এছাড়া এতে গবাদি পশুকে পরে আর কেটে খাওয়াতে হয় না এবং নষ্ট হবার সম্ভাবনাও কম থাকে। গর্ত ভর্তির পর ধারের দিকে ভালভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে হয়, এতে যতটা সম্ভব বাতাস বেরিয়ে যায়। কারণ ঘাসের ভিতর বেশী বাতাস থাকলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে ঘাস নষ্ট হয়ে যায়। ঘাস স্তরে স্তরে বিছিয়ে গর্ত ভর্তি করবার পর কমপক্ষে 2-2½ ফুট উঁচু করে ঠেসে দিতে হয়। এরপর শুকনো খড় 4 ইঞ্চি উঁচু করে বিছিয়ে দিয়ে এক ফুট কাঁদামাটি লেপে দিতে হয়। গর্তটি 4/5 দিনের মধ্যেই সবুজ ঘাসে ভর্তি করা উচিত। কয়েক দিন পরে চাপে ঘাস বসে গেলে মাটির ফাটল দেখা যায়। এই ফাটলগুলি কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়, যাতে হাওয়া বা জল ঢুকতে না পারে। গর্তের উপর ছাউনি দেওয়া ভাল; কারণ তাহলে বৃষ্টির জলে সাইলেজ নষ্ট হতে পারে না। উৎকৃষ্ট ধরণের সাইলেজ দেখতে উজ্জ্বল সোনালী রঙের, নিকৃষ্ট ধরণের সাইলেজ গাঢ় খয়েরী রঙের ও ছাতাধরা। এই ধরণের সাইলেজ থেকে এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। 70-80 দিনে ঘাস সাইলেজে পরিণত হয়। প্রয়োজন অনুসারে সাইলেজ গর্ত থেকে বের করে শুকনো খড়কুটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়।

গর্ত ভর্তির পর জীবন্ত ঘাসের কোষগুলি এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আরম্ভ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইয়োক্সাইড পরিত্যাগ করে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অক্সিজেন বহির্ভূত হয় এবং এতে কোন ছত্রাক বৃদ্ধি পায় না। কারণ অক্সিজেন ছাড়া ছত্রাক বাড়তে পারে না। এই সময়ে অম্ল প্রস্তুতকারী ব্যাক্টিরিয়াগুলি (Acid forming bacteria) খুব অস্বাভাবিকভাবে সাইলেজে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দু-দিন পরে প্রতি গ্রাম সাইলেজের রসে কয়েক বিলিয়ন ব্যাক্টিরিয়া জন্মায়। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি সাইলেজের শর্করাকে ভেঙ্গে প্রধানতঃ ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল তৈরি করে। এই অ্যাসিডগুলি খুবই প্রয়োজনীয়, যা অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং এতে সাইলেজ পচা ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়। যখন অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয়, তখন fermentation বন্ধ হয় এবং পরে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাতাস না ঢুকলেই সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী অনেকদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। যদি ঘাসে জলের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহলে *fermentation* ঠিক মত হয় না। এতে ল্যাকটিক বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে বিউটারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, যা সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট করে। এই সময়ে সাইলোতে 100° ফা. তাপ বর্তমান থাকে। ঘাসের প্রোটিনের ভাগ সাইলেজ তৈরির পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়, অবশ্য অন্যান্য খাদ্যগুণাবলী ঠিকই থাকে।

সাইলেজের শ্রেণীবিভাগ—(1) সুমিষ্ট গাঢ় বেগুনী সাইলেজ দেখতে উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী রঙের

এবং সুমধুর গন্ধযুক্ত। ভুট্টার ঘাসকে 113° ফা. তাপে টাওয়ার সাইলোতে দিয়ে এই ধরণের সাইলেজ তৈরি করা হয়।

(2) অ্যাসিড হাল্কা বেগুনী সাইলেজ—প্রধানতঃ জই ঘাসকে পিট সাইলোতে দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ধরণের সাইলেজ 80°-104° ফা. তাপে তৈরি হয়। অ্যাসিটিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এতে সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

(3) সবুজ শস্যের সাইলেজ—এই ধরণের সাইলেজ জই বা ভুট্টার ঘাস থেকে তৈরির উপযোগী। দানায় দুধ আসবার অবস্থায় ঘাস কেটে সাইলোতে সংরক্ষণ করা হয়। সবুজ রঙের এই সাইলেজের গন্ধ খুবই আকর্ষণীয়। এই ধরণের সাইলেজে অম্ল স্বাদ বর্তমান থাকে না। এই সাইলেজ সহজপাচ্য।

(4) টক সাইলেজ—দেখতে উজ্জ্বল বেগুনী রঙের। ঘাসের ডাঁটা রসালো অবস্থায় কেটে সংরক্ষণ করা হয়। বিউটারিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এই সাইলেজ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত।

(5) ছাতাধরা সাইলেজ—সাইলোতে বাতাস ঢুকলে সাইলেজ গেঁজে উঠতে পারে না। ফলে ছত্রাক জন্মে সাইলেজ নষ্ট হয়। সাইলোর উপরে বা কিনারায় এই ধরণের সাইলেজ উৎপন্ন হয়। এতে অ্যামোনিয়ার গন্ধ বর্তমান। এই ধরণের সাইলেজ গাভীকে খাওয়ালে উদরাময় হয়।

(6) এ. আই. ভি. সাইলেজ—প্রধানতঃ ফিনল্যাণ্ডে তৈরি করা হয়। সাইলোতে ঘাস সংরক্ষণ করবার সময় মৃদু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিতে হয়। ফলে যে কোন প্রকার ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রাক বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সাইলেজ অতি উপাদেয় খাদ্য। এর খাদ্যগুণ নির্ভর করে ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রকম ঘাসের গুণাবলীর উপর। উৎকৃষ্ট ধরণের সাইলেজে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ ও ডি থাকে। সাইলেজ মৃদু বিরেচক। গবাদি পশু শীতকালে যখন Non-legume খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তখন এদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। এই সময়ে সাইলেজ বেশ উপকারী বিরেচক। সাইলেজের জৈব অম্ল (Organic acid) গবাদি পশুর ক্ষতি করে না। কারণ ঐ অম্ল পদার্থ পরিপাকের সময় পাকস্থলীতে তৈরি হয়। এরা শর্করার মতই এই জৈব অম্লকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। সাইলেজ ব্যবহারে দুধের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি কারক বলে বলদের খাদ্য হিসাবে সাইলেজ ব্যবহার করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সাইলেজ সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা বদহজমের একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠতে পারে। দলানো পাকা ও ছাতাধরা সাইলেজ গবাদি পশুকে খেতে দেওয়া অনুচিত। নিম্নোক্ত পরিমাণে সাইলেজ বিভিন্ন গবাদি পশুর খাদ্যতালিকায় যোগ করা উচিত—

দুগ্ধবতী গাভী	দৈনিক	25-35 পাউণ্ড
হিপার (Heifer)	„	15-20 „
বলদ	„	30-50 „
ছাগল	„	2 „

সাইলেজের বৈশিষ্ট্য—1. অতি কম খরচে বছরের যে কোন ঋতুতে বিশেষতঃ শীত বা গ্রীষ্মে এটি একটি উচ্চ ধরণের রসালো খাদ্য। 2. আগাছা সমন্বিত শস্য, যাতে অতি নীচু মানের খড় তৈরি হয়, তাতেও সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব। 3. বিভিন্ন আবহাওয়ায় যখন খড় প্রস্তুত করা অসম্ভব, তখন অতি সহজেই সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব। 4. নির্দিষ্ট এলাকার শস্য অতি অল্প জায়গায় সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

রিয়্যাক্টর

মনোরঞ্জন বিশ্বাস*

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে প্রচারিত একটি ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল যে, তারাপুরের রিয়্যাক্টরটি Critical অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং পুরাপুরি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে আরও কিছু দিন সময় নেবে। সংবাদটি সাধারণ মানুষকে খুব একটা উৎসাহ যোগাতে পেরেছিল কিনা জানি না, তবে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ্, গবেষক এবং আরও অনেকের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিল। সাধারণ লোক—এমন কি, সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানতে চাইবেন—রিয়্যাক্টর যন্ত্র কি এবং Critical অবস্থায় কি তার পরিণতি?

রিয়্যাক্টর শব্দটির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সবাই পরিচিত। বিশেষ ব্যবস্থায় কোন কক্ষে যদি বিক্রিয়া ঘটানো হয়ে থাকে, তবে সেই বিশেষ ব্যবস্থাসহ কক্ষটিকে রিয়্যাক্টর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঐ কক্ষে ঘটানো হয়, তবে সেটাকে রাসায়নিক রিয়্যাক্টর বলা হয়। আর যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পরমাণুকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায় এবং ভাঙনের ফলে উদ্ভূত তাপকে অন্য কোন ভাবে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে পারমাণবিক রিয়্যাক্টর বা শুধু রিয়্যাক্টর বলা হয়। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় পরমাণু বিচূর্ণ করবার ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং এতে কারিগরি বাধাবিপত্তিও অনেক বেশী। কাজেই পারমাণবিক রিয়্যাক্টর তৈরি করতে যেমন অভিজ্ঞ পদার্থ-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারেরও। এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের দেশে কিছুকাল আগে গবেষণার জন্যে তৈরি হয়েছে অপ্সরা নামক রিয়্যাক্টর। এটি ভাবা-পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অবস্থিত। আর সেদিন তৈরি হলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ভারতের প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর। এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় 380 মেগাওয়াট। এর পরে রাণা প্রতাপ সাগর (রাজস্থান) ও কলপকমে (মাদ্রাজ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিয়্যাক্টর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই ভারত যে পারমাণবিক শক্তিতে বেশ এগিয়ে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ তো গেল ভারতের রিয়্যাক্টরের কথা। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু থেকে কিভাবে এত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে? খুব সহজ একটা হিসাবের সাহায্যে এই প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যেতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললেই এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটি ইউরেনিয়ামের (U-235) কেন্দ্রীনকে ধীরগতি নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করলে U-235-এর কেন্দ্রীন দু-ভাগে (Ba^{141} এবং Kr^{92}) ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তিনটি নিউট্রন। এই ভাঙনের ফলে যে শক্তি পাওয়া যায় (আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সূত্র থেকে বা গণিতের ভাষায় দাঁড়ায় $\Delta E = \Delta mc^2$), তার পরিমাণ প্রায় 200 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ 200 × 1·6 ×

---

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা—53

10^{-6} বা 3.2×10^{-4} আর্গ। যদি এই শক্তিকে অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা N-এর (Avogadro number) দ্বারা গুণ করা যায়, তবে এক গ্রাম পরমাণু থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় 1.93×10^{20} আর্গ। যদি এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ U-235 নেওয়া যায়, তবে তাথেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে আরও অনেক বেশী প্রায় 8.21×10^{20} আর্গ অথবা প্রায় 2×10^{10} কিলোক্যালরী। এই তাপ, 20,000 টন টি. এন. টি. বিস্ফোরণের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয়, প্রায় তার সমান। শুধু তাই নয়, হিসাব করে দেখা গেছে যে, রিয়্যাক্টরের মধ্যে এক কিলোগ্রাম U-235-এর বিভাজন ঘটিয়ে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়, তার পরিমাণ প্রায় 2500 টন কয়লা পোড়াবার ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সমতুল্য। যে চেম্বারের মধ্যে এত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, তার জন্যে কত সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন, তা বোধ হয় কাউকে আর বেশী বোঝাবার প্রয়োজন নেই। এসব হলো তাপের কথা। যে U-235-কে ভেঙে এরূপ প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যায়, সেটি আসলে কিন্তু সাধারণ পদার্থ নয়, সেটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং তার নিজস্ব এমন কতকগুলি রশ্মি আছে, যা মানুষকে রোগগ্রস্ত বা পঙ্গু করে দেয়। এসব বিপদের কথা জেনে নিয়ে কাজ করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রিয়্যাক্টরের Critical অবস্থার ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বোধ হয় এই সংবাদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করা হয়েছিল। একটি U-235 কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউট্রনের সাহায্যে যদি আর একটি পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটানো সম্ভব হয়, তা হলে আমরা বলি রিয়্যাক্টরের মধ্যে এক স্বনির্ভরশীল শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (Self-sustaining chain reaction) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রিয়্যাক্টরটিও Critical পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন বিভাজনক্ষম পদার্থের (যেমন U-235) কেন্দ্রীনকে যদি নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করা হয়, তবে ঐ পদার্থের কেন্দ্রীন দু-ভাগে ভেঙে যায় এবং কিছু নতুন নিউট্রনেরও সৃষ্টি হয়। এই নতুন নিউট্রনই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে শতকরা প্রায় 99.3 ভাগ থাকে U^{238} আইসোটোপ, বাকী 0.7 ভাগ অন্য আইসোটোপ U^{235}। U^{238} আইসো-টোপের কেন্দ্রীনকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে U^{235}-এর মত দু-ভাগ করা সহজ নয়। তাই যে সব নিউট্রন U^{238}-কে আঘাত করে, সে-গুলিকে U^{238} শুষে নেয় এবং এরই ফলে U^{238}-এর কেন্দ্রীন পরিবর্তিত হয়ে নতুন কেন্দ্রী-নের (Pu^{239}) সৃষ্টি হয়। এভাবে বা অন্য কোন ভাবে রিয়্যাক্টরের মধ্যে নিউট্রন নষ্ট হতে থাকলে বিক্রিয়া থেমে যেতে পারে। অপর পক্ষে, যদি সব নিউট্রন (একটা U^{235} কেন্দ্রীন ভাঙলে গড়ে 2.5টি নিউট্রন পাওয়া যায়) বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তবে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার হার ক্রমাগত এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, যখন তখন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাও অসম্ভব নয়। বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া বা বিক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটা—কোনটাই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত নয়। এসব অসুবিধা দূর করে এমন একটা অবস্থায় বিক্রিয়া চালানো প্রয়োজন, যখন একটা কেন্দ্রীন ভেঙে গিয়ে কেবলমাত্র অন্য একটাকেই ভাঙতে সাহায্য করে এবং রিয়্যাক্টরে এই বিশেষ অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে Critical অবস্থা। রিয়্যাক্টরের মধ্যে যখন একটি U^{235}-এর কেন্দ্রীন ভেঙে গড়ে একের চেয়ে কম নতুন কেন্দ্রীনকে ভাঙতে সাহায্য করে, তখনকার অবস্থাকে Sub-critical এবং যখন একা-ধিক নতুন কেন্দ্রীনকে ভাঙতে সাহায্য করে, তখন তাকে Supercritical অবস্থা বলা হয়। পার-মাণবিক রিয়্যাক্টরে Sub-critical ও Super-

critical অবস্থা এড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা সর্বদাই রাখা হয়, তা না হলে রিয়্যাক্টর চালু হবার পর নানা রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে।

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের বিশেষ বিশেষ অংশ ও বৈশিষ্ট্যগুলি শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে প্রথমতঃ নিউট্রনের শক্তির কথাই ধরা যাক। উচ্চশক্তি থেকে সুরু করে নিম্নশক্তির থার্মাল নিউট্রন এতে অংশ গ্রহণ করে বিভাজনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ জ্বালানী। জ্বালানীর মধ্যে সাধারণতঃ রিয়্যাক্টরে যেটা ব্যবহার করা হয়, তা হলো সাধারণ ইউরেনিয়াম, যার মধ্যে U^{235} আইসোটোপটি শতকরা 0·72 ভাগ বর্তমান থাকে। এছাড়া যেগুলি U^{235} আইসোটোপে সমৃদ্ধ, সেই সব অংশও জ্বালানীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। প্লুটোনিয়াম (Pu^{239}) এবং ইউরেনিয়ামের অপর একটি আইসোটোপ U^{233}-কেও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে এছাড়া রাখা হয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের মডারেটর, যেগুলির প্রধান কাজ হলো নিউট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। গ্র্যাফাইট, সাধারণ জল, ভারী জল (D_2O) অথবা বেরিলিয়ামই এই সব মডারেটরের কাজ করে থাকে। রিয়্যাক্টরের চালু অবস্থায় প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়—তাই একে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে বায়ু, CO_2 (কার্বন ডায়োক্সাইড), He (হিলিয়াম) অথবা সাধারণ জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন রিয়্যাক্টর সমসত্ত্ব (Homogeneous), না অসমসত্ত্ব (Heterogeneous), তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তার মধ্যে অবস্থিত জ্বালানী ও মডারেটরের উপর। সাধারণতঃ D_2O (ভারী জল) যদি মডারেটর হিসাবে কাজ করে, তবে রিয়্যাক্টরটি সমসত্ত্বই হয় এবং জ্বালানীকে এক্ষেত্রে দ্রবণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া গ্র্যাফাইটকে যখন মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন জ্বালানীকে কঠিন অবস্থায় রাখা হয় এবং এই ধরণের ব্যবস্থা যে সব রিয়্যাক্টরে বর্তমান থাকে, সেগুলিকে অসমসত্ত্ব রিয়্যাক্টর বলা হয়।

পৃথিবীতে U^{235}-এর পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, আমাদের দেশে এর বেশ অভাব আছে। সে যাহোক বর্তমানে যে ভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, জনৈক সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের মতে—এভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বের বার্ষিক ইউরেনিয়ামের খরচ দাঁড়াবে প্রায় কুড়ি থেকে চল্লিশ মিলিয়ন টন। ইউরেনিয়ামের এই বিপুল পরিমাণের কথা ভেবেই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জ্বালানীর বিষয় চিন্তা করছেন। এরই মধ্যে দুটি জ্বালানীর নাম (Pu^{239} এবং U^{233}) আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। U^{238}-কে নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করে বিভাজন ঘটানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নিউট্রনের দ্বারা U^{238}-এর কেন্দ্রীনকে আঘাত করা হয়, U^{238} সেটিকে শুষে নিয়ে নিম্নলিখিত নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনের মধ্য দিয়ে একটা প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়—

$$_{92}U^{238} + {_0n^1} \longrightarrow {_{92}U^{239}} + h\nu;$$

$$_{92}U^{239} \longrightarrow {_{93}Np^{239}} + e^-$$

(T=23 মিনিট)

$$_{93}Np^{239} \longrightarrow {_{94}Pu^{239}} + e^-$$

(T=2·3 দিন)

$$_{94}Pu^{239} \longrightarrow {_{92}U^{235}} + {_2He^4}$$

(T=25000 বছর)

1940 সালে McMillan এবং Abelson একটি নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেলেন। যার পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number=Z) 93। এই নতুন মৌলিক পদার্থের নাম হলো নেপচুনিয়াম (Np)। U^{238}-কে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে তাঁরা প্রথমে পেলেন $_{92}U^{239}$, যেটি পরবর্তী ধাপে বিটা রশ্মি ত্যাগ করে $_{93}Np^{239}$-এ

রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের জন্যে সময় লাগে প্রায় 23 মিনিট। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই $_{93}Np^{239}$ পরবর্তী ধাপে পুনরায় বিটা রশ্মি ত্যাগ করে $_{94}Pu^{239}$-এ পরিবর্তিত হয় এবং এর জন্যে সময় নেয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় 2·3 দিন। এই $_{94}Pu^{239}$ যদিও একটি আলফা কণিকা ত্যাগ করে $_{92}U^{235}$-এ রূপান্তরিত হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। রূপান্তরের সময় প্রায় পঁচিশ হাজার বছর। এই $_{94}Pu^{239}$-কে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা সম্ভব এবং দ্রুত ও ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা একে ভাঙাও যেতে পারে। ঠিক এভাবেই Th^{232}-কে U^{233}-এ রূপান্তরিত করে নতুন জ্বালানীর সংখ্যা আরও একটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই দুই জ্বালানীর সন্ধান পাবার পর রিয়্যাক্টরের আর এক নবযুগ আরম্ভ হলো এবং জন্ম নিল Fast Breeder Reactor। Breeder শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে জন্ম দান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পদার্থের যে ভোল পাল্টাবার কথা উল্লেখ করেছি, ব্রীডার রিয়্যাক্টরে তা অনায়াসেই করা সম্ভব। পরমাণুর বিভাজনে মুক্ত নিউট্রনগুলিকে মডারেটরের সাহায্যে মন্দীভূত করবার প্রয়োজন হয় না বলেই এই জাতীয় রিয়্যাক্টরকে ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর বলা হয়। এই রিয়্যাক্টরের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যেই জ্বালানী তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত জ্বালানীও এখান থেকে কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। সাধারণ রিয়্যাক্টরে যদিও কিছু Pu^{239} তৈরি হয়ে থাকে, তবুও এর রাসায়নিক পৃথকীকরণ বেশ জটিল। ব্রীডার রিয়্যাক্টরে অতিরিক্ত জ্বালানী তৈরির ব্যাপারটা ভারী চমৎকার। মনে করা যাক প্রতি বিভাজনে তিনটি নিউট্রন ছাড়া পাচ্ছে, যদিও এর গড় মান 2·5। এর মধ্যে একটি নিউট্রন শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখতে খরচ হবে। দ্বিতীয়টি U^{238}-কে Pu^{239}-এ রূপান্তরিত করে জ্বালানীর খরচ যোগাবে। তৃতীয় নিউট্রনটি একইভাবে U^{238} থেকে অতিরিক্ত জ্বালানী Pu^{239} প্রস্তুত করবে। এথেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, একটি U^{235}-এর পরমাণু খরচ হলেও দুটি Pu^{239} পরমাণু তৈরি হচ্ছে এবং এর ফলে একটি অতিরিক্ত জ্বালানী পরমাণু অনায়াসেই পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দুটির বেশী নিউট্রন প্রাথমিক বিক্রিয়ায় তৈরি হলেই জ্বালানীর খরচ ছাড়াও অতিরিক্ত জ্বালানী রিয়্যাক্টরের মধ্যেই জমা হয়। এই অতিরিক্ত জ্বালানী অন্য রিয়্যাক্টরে ব্যবহার করাও সম্ভব। এর ফলে জ্বালানীর অভাব অনেকাংশে কমানোও সম্ভব।

আমাদের দেশে বস্তুতঃ U^{235}-এর বেশ অভাব আছে। এজন্যেই এখানে ব্রীডার রিয়্যাক্টরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক খবরে প্রকাশ যে, আমাদের দেশে শীঘ্রই পরীক্ষামূলকভাবে একটি ফাষ্ট ব্রীডার-রিয়্যাক্টর তৈরি হতে চলেছে। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের পূর্ণ সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। এটা তৈরি হলে আমাদের দেশে যে প্রচুর প্রাকৃতিক থোরিয়াম (Th^{232}) রয়েছে, তাকে U-^{233}-তে রূপান্তরিত করে জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং ইউরেনিয়ামের স্বল্পতা আমাদের দেশের পরবর্তী পারমাণবিক কার্যসূচী বিঘ্নিত করতে পারবে না।

সাধারণ রিয়্যাক্টর অথবা ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর, যেটার কথাই ধরা যাক না কেন, এদের প্রধান কাজ হলো বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা। গবেষণাগারে অবশ্য শক্তি-উৎপাদন অপেক্ষা বিভিন্ন রেডিও আইসোটোপ তৈরি করাই রিয়্যাক্টরের প্রধান কাজ। ইতিমধ্যেই ভারতের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অনেক রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা হচ্ছে

এবং দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া কিছু উর্বর পদার্থকে বিভাজন-যোগ্য (Fissionable) পদার্থে পরিণত করাও রিয়্যাক্টরের কাজ। এজন্যে দিন দিন রিয়্যাক্টরের ভূমিকা বিজ্ঞানীদের নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীরা এই নতুন হাতিয়ারের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতেই পারমাণবিক শক্তিকে আরও অনেক কল্যাণকর কাজে লাগিয়ে মানবসমাজকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

উদ্ভিদ ও ফস্‌ফরাস

শচীনন্দন বাগচী *

সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ফস্‌ফরাস একটি। ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের ফল-ফুল ধারণ, শস্যের বীজ গঠন, শস্যের মান উন্নয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রোগ প্রতিরোধেও ফস্‌ফরাস উদ্ভিদকে সাহায্য করে থাকে। শুধু মাত্র উদ্ভিদেরই নয়, প্রাণিদেহেও হাড়, দাঁত প্রভৃতির গঠনে ফস্‌ফরাস অন্যতম প্রধান উপাদান। আমরা ফস্‌ফরাস পাই দুধ, ডিম প্রভৃতি থেকে প্রোটিনরূপে। আর উদ্ভিদ পায় মাটি থেকে ফস্‌ফেটরূপে। বিভিন্ন প্রকার ফস্‌ফেট সার ফস্‌ফরাসেরই নানা রকম যৌগ। মাটির এই ফস্‌ফেট ও উদ্ভিদের সম্পর্কের বিষয়ে দু-চার কথা বলছি। ফস্‌ফেট সার সব মাটিতেই যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তা নয়, কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। আমাদের দেশের মাটিতে ফস্‌ফেটের পরিমাণ কমই দেখা যায়। তবে মাটিতে ফস্‌ফেট বেশী থাকলেই যে তা উদ্ভিদের পক্ষে সহজপ্রাপ্য হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার জমিতে ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করলেই যে উদ্ভিদ তার সবটাই গ্রহণ করতে পারবে, তাও নয়। জমির মোট ফস্‌ফেটের খুব সামান্য অংশই উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে আর বাকীটা কতকগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাটি বন্ধন করে রাখে, যা উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মাটির এই বন্ধন করে-রাখা ফস্‌ফেটই কৃষি-বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, অনেক মাটিতেই দেখা গেছে যে, প্রচুর পরিমাণ ফস্‌ফেট থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে উদ্ভিদের ফল-ফুল ধারণ করবার ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। তাই কৃষি-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন, কেমন করে মাটির এই ধরে-রাখা ফস্‌ফেটকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়। ফলে আবিষ্কৃত হলো অনেক প্রকার পদ্ধতি।

মাটিতে ফস্‌ফেট থাকে প্রধানতঃ তিন প্রকারে—(1) মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে, যার পরিমাণ খুবই সামান্য, (2) জৈব পদার্থে, (3) অজৈব যৌগ ও বিভিন্ন প্রকার অজৈব পদার্থের দ্বারা শোষিত ফস্‌ফেটরূপে।

মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে যে ফস্‌ফেট থাকে, একমাত্র সেটাই উদ্ভিদ তার মূলের দ্বারা গ্রহণ করে থাকে। ফস্‌ফেটের জলীয় দ্রবণ

* কৃষিবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আসে জৈব ও অজৈব দুই প্রকার উৎস থেকেই।

মাটিতে phytin, nucleic acid, phospholipids প্রভৃতি জৈব পদার্থগুলিই হচ্ছে জৈব ফসফরাসের উৎস। তবে অনেকে মনে করেন, এগুলিই একমাত্র উৎস নয়, আরো অনেক জৈব পদার্থ আছে, যা থেকে জৈব ফস্‌ফরাস পাওয়া যেতে পারে। মাটিতে অজৈব ফস্‌ফেট পাওয়া যায় প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার যৌগরূপে। এসব অজৈব ফস্‌ফেটগুলি মাটির বিভিন্ন রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে উদ্ভিদকে ফস্‌ফরাস সরবরাহ করে থাকে। অম্লাত্মক মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বেশী পরিমাণে থাকে। তাই এই জাতীয় মাটিতে ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় ফস্‌ফেট সারকে অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে পরিণত করে, যার ফলে মাটিতে ফস্‌ফেট থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না।

এবার দেখা যাক, কি কি উপায়ে লৌহ প্রভৃতি ধাতব যৌগগুলি ফস্‌ফেটকে অদ্রবণীয় অর্থাৎ উদ্ভিদের পক্ষে অপ্রাপ্য পদার্থে পরিণত করে তোলে।

1. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের দ্বারা দ্রবণীয় ফস্‌ফেটের অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে অধঃক্ষেপণ।

$$Al^{+++} + 2H_2O + H_2PO_4 \rightleftharpoons Al(OH)_2H_2PO_4 + 2H^+$$

মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন — মাটিতে দ্রবণীয় ফস্‌ফেট — অদ্রবণীয় ফস্‌ফেট

2. জৈব ফস্‌ফেটের অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে রূপান্তর:—জৈব ফস্‌ফেটযুক্ত পদার্থ phytin উদ্ভিদকে ফস্‌ফেট সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু অম্লাত্মক মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি phytin-কে দ্রবণীয় ফাইটেটে পরিণত করে থাকে।

3. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির hydrated oxide-এর দ্বারা ফস্‌ফেটের আবদ্ধীকরণ:—মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির hydrated oxide, limonite, goethite ইত্যাদি দ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। তখন উদ্ভিদের পক্ষে কিছুতেই আর এই আবদ্ধ ফস্‌ফেট গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

4. মাটির montmorillnite, kaolonite, illite প্রভৃতি silicate mineralগুলির গঠন চওড়া পাত্‌লা প্লেটের মত। এরা ফস্‌ফেটকে নিজেদের প্লেটসদৃশ চাক্‌তির গায়ে ion exchange, adsorption প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা ধরে রাখতে পারে।

এ তো গেল অম্লাত্মক মাটিতে ফস্‌ফেটের আবদ্ধীকরণ। ক্ষারীয় মাটিও অম্লাত্মক মাটির ন্যায় ফস্‌ফেটকে বন্ধন করে রাখে। ক্ষারীয় মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি ধাতুগুলি বেশী পরিমাণে থাকে। এদের মধ্যে সোডিয়ামের ফস্‌ফেট ধরে রাখবার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অত্যধিক পরিমাণ ফস্‌ফেট বন্ধন করবার ক্ষমতা আছে। এই রকম মাটিতে ফস্‌ফেট প্রয়োগ করলে তা অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-ম্যাগ্‌নেসিয়াম ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর ঘটে এই ভাবে—

$$Ca(HPO_4)_2 + 2Ca^{++} \rightleftharpoons Ca_3(PO_4)_2 + 4H^+$$

দ্রবণীয় ফস্‌ফেট — ক্যালসিয়াম আয়ন — অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট

যদি অনেকদিন যাবৎ এই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফস্ফেট মাটিতে থাকে, তাহলে সেগুলি অধিকতর অদ্রবণীয় পদার্থ oxy, hydroxy, carbonate, fluor প্রভৃতি apatite যৌগে পরিণত হয়। এসব apatite সেই সব মাটিতেই হয়, যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে।

তাহলে দেখা গেল, অম্লাত্মক ও ক্ষারীয় দুই ধরণের মাটিই দ্রবণীয় ফস্ফেটকে অদ্রবণীয় ফস্ফেটে পরিবর্তিত করে থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই fixed, adsorbed, রূপান্তরিত অদ্রবণীয় ফস্ফেটকে দ্রবণীয় করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়।

বেশীর ভাগ উদ্ভিদের পক্ষেই উপযুক্ত হচ্ছে neutral মাটি। খুব সামান্য অম্লাত্মক বা খুব সামান্য ক্ষারীয় মাটিতেও অধিকাংশ উদ্ভিদ বেশ ভাল জন্মায়।

এবার দেখা যাক, কিভাবে মাটির অদ্রবণীয় ফস্ফেটকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, মাটিতে জৈব সার, যেমন— সবুজ সার, পাতা, গোবর ইত্যাদি পচা compost প্রয়োগের দ্বারা। এই জাতীয় সারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। এই জৈব পদার্থের সাহায্যে মাটিতে আণুবীক্ষণিক জীবাণু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা মাটির অদ্রবণীয় ফস্ফেটকে গ্রহণ করে নিজেদের দেহে আবদ্ধ করে। মাটিতে জৈব পদার্থ নিঃশেষিত হতে থাকলে এদের বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতাও কমে যেতে থাকে। অবশেষে জৈব পদার্থের অভাবে এদের সংখ্যা লোপ পেয়ে যায়। এই সব মৃত জীবাণুর দেহের ফস্ফেট মাটিতে ফিরে আসে উদ্ভিদের কাছে সহজলভ্য হয়ে। তাছাড়া জৈব সার থেকে নানারকম জৈব অ্যাসিড, হিউমাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এরা মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে থাকে। ফলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি এই জটিল যৌগে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মাটির ফস্ফেটের সঙ্গে কোন রকম বিক্রিয়া করতে পারে না। তখন ফস্ফেটও মোটামুটি মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে। জৈব সার থেকে উৎপন্ন হিউমাসের ফস্ফেট মুক্ত করবার ক্ষমতা উপরের লেখচিত্রের দ্বারা দেখানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ অম্লাত্মক মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে আবদ্ধ ফস্ফেট মুক্ত হয়ে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য হয়।

$$2Al(OH)_2H_2PO_4 + CaO + H_2O = Ca(H_2PO_4)_2 + 2Al(OH)_3$$

অদ্রবণীয় ফস্ফেট চুন জল দ্রবণীয় ফস্ফেট

চুন প্রয়োগের দ্বারা অদ্রবণীয় ফস্ফেটের রূপান্তর—এই প্রসঙ্গে চুন প্রয়োগজনিত উপকারের কথা একটু বলা দরকার। কারণ এথেকে চাষীরা বুঝতে পারবেন, জমিতে চুন প্রয়োগ কেন করতে হয় এবং এর আসল সার্থকতা কোথায়। জমিতে নাইট্রোজেন সার, যেমন—অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করলে মাটি ক্রমশঃ অম্লাত্মক হয়ে পড়ে। মাটির অম্লতা বাড়তে থাকলে তা অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষেই অসহ্য হয়ে পড়ে। অধিকাংশ উদ্ভিদই এই সব মাটিতে বাঁচতে পারে না। তাছাড়া অম্লাত্মক মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ফস্ফেট বন্ধন-প্রক্রিয়া তো আছেই। ঠিক পরিমাণ চুন প্রয়োগের দ্বারা অম্লত্ব ও ফস্ফেট বন্ধন দুই-ই কমানো যায়। তাছাড়া চুন জমির মাটির গঠন উন্নত করে এবং micronutrient ঠিক পরিমাণে পেতে উদ্ভিদকে সাহায্য করে।

চুন প্রয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন সারের জন্যে বিভিন্ন পরিমাণে হয়; যেমন—জমিতে 100 কে.জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে তার জন্যে জমিতে যে অম্লতা বৃদ্ধি পাবে, তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে 110 কেজি চুনাপাথর জমিতে দিতে হবে। তবেই জমির অম্লতা ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ঠিক আগের মত থাকবে। কতকগুলি বহুল প্রচলিত সারের ব্যবহারজনিত অম্লতা বৃদ্ধি রোধের জন্যে কি পরিমাণ সারের জন্যে কতটা চুন ব্যবহার করা উচিত, তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

	সারের নাম	সারের পরিমাণ	চুনের পরিমাণ
1.	শুষ্ক অ্যামোনিয়া (Anhydrous ammonia)	100 কেজি	148 কেজি চুনাপাথর
2.	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	100 „	128 „ „
3.	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	100 „	60 „ „
4.	অ্যামোনিয়াম সালফেট-নাইট্রেট	100 „	93 „ „
5.	অ্যামোনিয়াম সালফেট	100 „	110 „ „
6.	ইউরিয়া	100 „	80 „ „

সঞ্চয়ন

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাকাশ-গবেষণার সুফল

মানুষ এবং নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে পাঠানোই মহাকাশ-বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সাধন করতে গিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষেও সহায়ক বহু নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে।

মহাকাশযাত্রায় শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল নূতন আবিষ্কার হয়েছে—শরীরের যন্ত্র ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সেগুলি ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

1969 সালে জুলাই ও আগষ্ট মাসে স্বয়ংক্রিয় মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-6 ও মেরিনার-7 মঙ্গলগ্রহের যে সব ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল, সে সব ছবি এক বিশেষ পদ্ধতিতে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স-রে ছবি তোলবার ব্যাপারে এই কম্পিউটার পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে অবান্তর খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে মূল বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হয়ে থাকে।

মহাকাশচারীরা মাথায় যে টুপী পরে থাকেন, অক্সিজেন ব্যবহার সম্পর্কে সেই টুপী নিয়ে ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এই টুপী পরে অতি জোরে শ্বাস টানলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে কোন কষ্ট হয় না। রেস্পিরো-মিটার যন্ত্রটির ইদানীং কালে খুবই উন্নতি হয়েছে এবং শারীরবৃত্তীয় শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

আগেকার রেস্পিরোমিটার যন্ত্র যারা ব্যবহার করতেন, তাদের নাকে ক্লিপ এঁটে দেওয়া হতো এবং যে যন্ত্রটি লাগানো থাকতো, তা দিয়ে তারা মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেন। কাজের সময় এটি যথাস্থানে থাকতো না, সরে যেত।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের কল্যাণকর ভূমিকা রচনা করতে হয়েছে, ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও তা হয় নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা সমাধানে মহাকাশসংক্রান্ত কার্যসূচী যাতে সহায়ক হতে পারে, সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও কারিগরিবিদ্যাকেও রূপদান করা হয়েছে।

দেশে এবং বিদেশে মহাকাশ-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে যে সকল তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে, নূতন নূতন যে সব তথ্যাদির আবিষ্কার হয়েছে, সে সব সংগ্রহ করে তথ্যভাণ্ডারে মজুদ রাখা হয়। এই ভাণ্ডারে আড়াই লাখেরও বেশী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ক প্রামাণিক তথ্যাদি মজুদ রয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর 75 হাজার রিপোর্ট ও প্রবন্ধ এখানে জমা হচ্ছে। এই সব তথ্য কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউ-টারের ফিতার সূচীভুক্ত হয় এবং চতুষ্কোণ মাইক্রোফিল্মের উপর মুদ্রণের পর বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সূচীভুক্ত তথ্যাদির এই ভাণ্ডার থেকে যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্যাদি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে আটটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানী-সমাজে পরিবেশন করা হয় এবং

সকল কাজ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নানা সূত্র থেকেই তথ্যাদি সংগৃহীত হয়ে থাকে। যেমন—জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত এমস্ গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক বিজ্ঞানীর উপর মিটিওরাইট বা অতি ক্ষুদ্র উল্কাকণার অস্তিত্ব-সন্ধানী একটি সেন্সর নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। তিনি অতি সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এক সেন্টিমিটার উপর থেকে একটি নুনের কণা মাটিতে পড়লে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, সেই সংঘাতের এক হাজার ভাগের এক ভাগও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

এই সেন্সর নির্মাণের কিছুকাল পরে দু-জন জীববিজ্ঞানীর মধ্যে আলোচনাকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্চার হৃদ্‌স্পন্দন নিরূপণের বিষয়েই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল; অর্থাৎ ডিমের খোসাটি না ভেঙে কিভাবে হৃদ্‌স্পন্দন নিরূপণ করা যেতে পারে, সেই সমস্যা নিয়েই তারা আলোচনা করছিলেন।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ঐ বিজ্ঞানী এই সমস্যা সমাধানের পথ তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। তাঁর নির্মিত এই সেন্সর যন্ত্রটির সামান্য অদলবদল করে নিলেই যে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তা জানিয়ে দিলেন।

বর্তমানে পার্কিনসন্স রোগে মাংসপেশীর সামান্য কম্পন রেকর্ড করবার জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্নায়ুর শল্যচিকিৎসায়ও এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা অনেক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রেই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো।

সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ

হাজার হাজার বছর ধরেই মানুষ সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ করে আসছে। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পদ যে সমুদ্রে সঞ্চিত রয়েছে এবং তা আহরণের জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার কতখানি উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে মানুষ মাত্র গত দশ বছরের মধ্যে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছে।

আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে যা আছে, তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, সে দিন তাতে ফসল ফলিয়েই সেই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানো যাবে না। শিল্পোৎপাদন দ্রুতগতিতে বেড়ে গেলেও কাঁচা মালের উপরও তখন টান পড়বে। সে দিন মানুষের দিকে তাকানো ছাড়া মানুষের অন্য কোন গতি থাকবে না। খাদ্য ও কাঁচামালের সন্ধান যে তখন সমুদ্রেই করতে হবে, সেটা অবধারিত।

তবে সমুদ্রগর্ভে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান অনেক কাল যাবৎ সুরু হয়ে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খুব উন্নতিও হয়েছে। বহু প্রকার ধাতব সম্পদই সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু ঐ সকল সম্পদের মোট মূল্যের শতকরা 90 ভাগই পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভ থেকে আহরিত গ্যাস ও তৈলসম্পদ থেকে। বর্তমানে গ্যাস ও তৈলসম্পদ সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হচ্ছে এবং ম্যাগ্‌নেশিয়াম, দস্তা, তামা, রূপা, ইউরেনিয়াম, ব্রোমিন, ঝিনুক, হীরা, বালি প্রভৃতি সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মাত্র তীর-

সংলগ্ন এলাকা থেকেই এই সব সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে। তার জন্যে সমুদ্রের খুব গভীরেও যেতে হয় নি। সমুদ্রের মাত্র 656 ফুট অথবা 200 মিটার বা তারও কম নীচে গিয়ে মানুষ এই সব সম্পদ আহরণ করে। অন্তহীন বিশাল সমুদ্রের প্রায় সবটাই আজও এমনি পড়ে আছে, সেখানে সম্পদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই হয় নি।

তবে জলই সমুদ্রের সবচেয়ে মূল্যবান অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত-জল লবণমুক্ত করে মানুষের বিভিন্ন কাজে ও চাষ-আবাদে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার 680টি কারখানা চালু অথবা নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে।

আগামী দশ বছরে এই সব কারখানার সংখ্যা প্রতি বছরে শতকরা 25টি হারে বেড়ে যাবে। সমুদ্রের জল বর্তমানে লবণমুক্ত করতে খরচ খুবই বেশী পড়ে। ভবিষ্যতে কারিগরি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই খরচের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। পৃথিবীর বহু মরুঅঞ্চলকে এই জলের সাহায্যে শস্য-ফলনোপযোগী এবং বাসযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিনের অভাব পূরণেও সমুদ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সে দিন বিশেষ করে পৃথিবীর খাদ্যাভাবগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিনের অভাব পূরণে সামুদ্রিক মৎস্য প্রভৃতি খুবই সহায়ক হবে। এই সকল খাদ্য খুবই সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। তবে বর্তমানে সমুদ্রে যে পরিমাণ খাদ্য রয়েছে, মানুষ তার শতকরা মাত্র দুই ভাগ প্রতি বছর সমুদ্র থেকে আহরণ করছে। সমুদ্রে মাছের চাষ করবার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে মাছের উৎপাদন ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে।

তাছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রে নানা রকম ভেষজের সন্ধানও করছেন। সামুদ্রিক স্টোন মাছ একপ্রকার বিষ উদ্গীরণ করে থাকে। রক্তের চাপ হ্রাস পেলে এই বিষ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে পেঙ্গুইন পাখীর অন্ত্র পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা একটি নূতন ধরণের অ্যান্টিবায়োটিকেরও সন্ধান পেয়েছেন। এক্ষেত্রে সামান্য তথ্যানুসন্ধানই হয়েছে। বহু রকমের ভেষজ এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর বিষয় অনুসন্ধানের ফলে সমুদ্রগর্ভে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

পৃথিবীর তিন ভাগের দু-ভাগই রয়েছে সমুদ্রের তলায়। এই বিশাল অংশে লুকায়িত সম্পদের সন্ধানের উদ্যোগ সুরু হয়েছে মাত্র। কাঁচামাল যখন স্থলভাগে তেমন পাওয়া যাবে না, তখন কলকারখানা চালু রাখবার জন্যে সেই কাঁচামালের সন্ধান নিতে হবে সমুদ্রে। যে সব কারখানা ঐ সব সামুদ্রিক কাঁচামাল ব্যবহার করে গড়ে উঠবে, তাদের বিপুলভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়নে, কলকারখানায় তাদের 'প্রয়োগের' ব্যাপারে বেসরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও দেশের সরকার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এই বিষয়ে উদ্যোগী হলেই তবে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

ধাতুনিষ্কাশনী কোক কয়লা

হরেন্দ্রনাথ রায়

কয়লার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। সাধারণের কাছে কয়লা একটি অতি তুচ্ছ কালো রঙের কঠিন পদার্থ, যাহার ময়লা শত বার ধৌত করিলেও যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এই বস্তুটি একটি মূল্যবান সম্পদ। এই বস্তুটিকে তাঁহারা যত কাজে লাগাইয়াছেন, লাগাইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও লাগাইবেন—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—তা ফলিত বিজ্ঞানই হউক আর সাধারণ বিজ্ঞানই হউক—কয়লার দান অফুরন্ত।

ধাতুনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার সাম্প্রতিক নয়—সুপ্রাচীন। ধাতুর অক্সাইডকে কয়লা সহযোগে বিজারিত করিয়া মূল ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। এই প্রথা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। তবে আধুনিক যুগে কাঁচা কয়লার পরিবর্তে এক বিশেষ ধরণের কোক কয়লা ব্যবহার করা হয়। কোক কয়লা কাঁচা কয়লারই রূপান্তর মাত্র। ইহাকে বলা হয় মেটালার্জিক্যাল কোক বা ধাতুনিষ্কাশনী কোক।

ধাতুনিষ্কাশনী কয়লা বিশুদ্ধ কয়লা নয়। খনি হইতে উত্তোলিত কাঁচা কয়লাকে আংশিক পোড়াইয়া রন্ধনকার্যের জন্য জ্বালানী কয়লা উৎপন্ন করা হয় আর কাঁচা কয়লাকে বায়ুনিরুদ্ধ কক্ষে 1000° - 1200° ডিগ্রী তাপে অন্তর্ধূম পাতন করিয়া কোক কয়লা প্রস্তুত করা হয়। খনি হইতে উত্তোলিত কাঁচা কয়লার মধ্যে থাকে প্রায় 55—60 শতাংশ বিশুদ্ধ কয়লা বা কার্বন, 24—25 শতাংশ উদ্বায়ী পদার্থ (Volatile matter), যার মধ্যে থাকে কোল গ্যাস, আলকাতরা, ফিনোল, ন্যাপথ্যালিন ইত্যাদি আর বাকীটা (প্রায় 16-18 শতাংশ) থাকে ছাই বা অদাহ্য অজৈব পদার্থ (Mineral matter)। কোক কয়লার মধ্যে উদ্বায়ী পদার্থ থাকে না বলিলেই চলে। ইহার মধ্যে থাকে প্রায় 75 ভাগ কার্বন আর কিছুটা জলীয় পদার্থ (3 ভাগের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়); বাকীটা ছাই (প্রায় 20-22 শতাংশ)।

অন্তর্ধূম পাতনের দ্বারা কোক কয়লা উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে সব কোক কয়লাকে মেটালার্জিক্যাল কোক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মেটালার্জিক্যাল কোকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার নচেৎ ধাতুনিষ্কাশনে ইহা অচল হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার অভাব খুবই বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী কয়লার অভাব আরও বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উৎকর্ষ নির্ভর করে কয়লার ছাই এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে, যেখানে কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ 6½-7½ শতাংশ, আমাদের দেশে সেখানে 16-17 শতাংশ—এমন কি, আরও বেশী। ছাইয়ের এতটা আধিক্য মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। ছাই ব্যতীত কয়লার মধ্যে আরও কয়েকটি পদার্থের আধিক্যও অবাঞ্ছনীয়—সালফার, ফস্‌ফরাস এবং লৌহ ইহাদের অন্যতম। কয়লায় সালফার এবং ফস্‌ফরাসের আধিক্য উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুতের পক্ষে অন্তরায়। লৌহের আধিক্য ছাইয়ের রংটিকে লালচে করে এবং উহার গলনাঙ্কের তাপমাত্রাও (Ash fusion temperature) কমাইয়া আনে। ইহা কোকের পক্ষে ক্ষতিকর।

মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে কোকিং বা কোকিং কোলের প্রয়োজন। কোকিং মানে সুদৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধিবার ক্ষমতা। সকল কয়লার এই গুণ থাকে না। যে সকল কয়লার থাকে, তাহাদিগকে কোকিং কোল বলা হয়। কয়লাকে যদি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে 340°-450° ডিগ্রীর মধ্যে কয়লা নমনীয় বা প্লাষ্টিক হইয়া পড়ে। এই তাপে কয়লা ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইতে সুরু করে। তখন তাহার মধ্য হইতে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। আরও অধিক তাপে 450°-550° ডিগ্রীতে এই বিশ্লেষণ ক্রিয়ার গতিবেগ আরও দ্রুত হয় এবং ঐ নমনীয় কয়লা জমাট বাঁধিয়া কঠিন কোকে পরিণত হয়। যে সকল কয়লার এই গুণ থাকে না, তাহাদিগকে নন-কোকিং কোল বলা হয়। নন-কোকিং কোল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে অনুপযোগী। নন-কোকিং কোলে উদ্বায়ী পদার্থ 17 শতাংশের কম হইয়া থাকে। কোকিং কোলে এই জিনিষটি 20-35 শতাংশ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

মেটালার্জিক্যাল কোলের আর একটি বিশেষ ধর্ম হইতেছে, তাহার Swelling property। যে সকল কয়লা উত্তপ্ত করিলে আয়তনে বাড়ে না, সেই সব কয়লা মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী। উত্তাপের সহিত আয়তন বাড়িতে থাকিলে অর্থাৎ কয়লা আয়তনে স্ফীত হইতে থাকিলে, অন্তর্ধূম পাতনের সময় চুল্লীগুলির সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য কয়লার আয়তন-স্ফীতির মান (Swelling index) পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এক গ্র্যাম কয়লাকে 72 মেস-এ চূর্ণ করিয়া একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ক্রুসিবলের মধ্যে এমনভাবে উত্তপ্ত করিতে হয়, যাহাতে 2½ মিনিটে তাপমাত্রা 800° ডিগ্রীতে উঠে। তারপর তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া তাহার আয়তন কতকগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলি নম্বর করা থাকে। যে নম্বরের সহিত এই কয়লার আয়তনের মিল হয়, সেই নম্বরই তাহার Swelling index। সাধারণতঃ আয়তনের বিশেষ পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত আয়তন না মিলিলে তাহা অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশে দুইটি অঞ্চল—রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া হইতে কয়লা আমদানী হয়। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা উচ্চ শ্রেণীর বটে, কিন্তু ধাতু-নিষ্কাশনী কয়লার পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে ছাইয়ের পরিমাণ কম (13-16 শতাংশ)। ইহার ক্যালোরিফিক ভ্যালিউ বা তাপপরিবর্ধক ক্ষমতা বেশী এবং দাহ্য পদার্থ বা উদ্বায়ী পদার্থ বেশী। কিন্তু ইহা কোকিং কোল নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকিং কোল না হইলে মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লার কেকিং ইনডেক্স (Caking index) এবং সোয়েলিং ইনডেক্স—কোনটিই মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে উপযোগী নয়।

ঝরিয়া অঞ্চল হইতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা কোকিং কোল, ইহার কেকিং ইনডেক্স এবং সোয়েলিং ইনডেক্স দুই-ই মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। তবে এই অঞ্চলের কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ অত্যধিক—18-20 শতাংশ, ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও বেশী হইয়া থাকে। এত অধিক ছাইযুক্ত কয়লা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জের কয়লা নির্ধারিত অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া এমন একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়, যাহা হইতে ধাতুনিষ্কাশনী কোক উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহার সহিত বরাকর অঞ্চলের কয়লাও সময় সময় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লার সহিত রাণীগঞ্জের

কয়লা মিশ্রিত করা হয় বটে, তবে সরাসরি নয়। ঝরিয়ার কয়লাকেও বাছাই করা হয়। হাতে বাছাই করা হয় না, ভাসমান পদ্ধতি বা গ্র্যাভিটি সেপারেশনের দ্বারা বাছাই করা হয়। কয়লার ভিতর ছাইয়ের পরিমাণ অনুযায়ী কয়লা হাল্কা বা ভারী হইয়া থাকে। এমন একটি মাধ্যম প্রস্তুত করা হয়, যাহাতে ভারী কয়লাগুলি ডুবিয়া যায় এবং হাল্কা কয়লাগুলি ভাসিয়া উঠে। ওয়াসারিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজকাল কয়লাখনি অঞ্চলে অনেকগুলি ওয়াসারি স্থাপন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন ষ্টীল প্ল্যান্টেরও নিজস্ব ওয়াসারি আছে। এই সকল স্থানেই হাল্কা কয়লা ভারী কয়লা হইতে পৃথক করা হয়।

মাধ্যম প্রস্তুত করা হয় জলের সহিত 200-300 মেস-এর ম্যাগ্‌নেটাইট (Fe_3O_4) পাউডার মিশ্রিত করিয়া। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·00, ম্যাগ্‌নেটাইটের প্রায় 5·00। দুইটিকে এমনভাবে মিশ্রিত করা হয়, যাহাতে মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় 1·40-1·60-এর মধ্যে। ম্যাগ্‌নেটাইটের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমাইতে বা বাড়াইতে পারা যায়। ম্যাগ্‌নেটাইট চৌম্বকধর্মী হওয়ায় ম্যাগ্‌নেটাইট পাউডার ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পাউডারকে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুনরুদ্ধার করা যায় এবং সেই চূর্ণকে আবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যাগ্‌নেটাইট পাউডার ভারী। সেই জন্ত তলায় থিতাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই কারণে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে মিশ্রণটিকে এমনভাবে আলোড়িত করা হয়, যাহাতে ম্যাগ্‌নেটাইটের মিহি গুঁড়া তলায় থিতাইয়া পড়িতে না পারে।

গ্র্যাভিটি সেপারেসন বা ভাসমান পদ্ধতিতে হাল্কা ও ভারী কয়লার পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয় অতিকায় চোঙাকৃতির ড্রামের মধ্যে। এই ড্রামের মধ্যে জল ও ম্যাগ্‌নেটাইটের মিশ্রণটি রাখা হয় এবং টন টন কয়লা ইহার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·40, 1·45, 1·50—এই ভাবে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা হয় এবং ভাসমান কয়লাগুলিকে ছাঁকিয়া তোলা হয়। এই ভাবে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ প্রায় 70-75%। এই সকল কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম থাকে। যে কয়লাগুলি তলায় পড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ বেশী। সেগুলির দ্বারা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত হয় না। তবে সব কয়লাটাই পরিত্যক্ত হয় না। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·60, 1·65 পর্যন্ত বাড়াইয়া আরও কিছুটা কয়লা ছাঁকিয়া তোলা হয়। এই কয়লাগুলিকে মিড্‌লিং বলা হয়। অবশিষ্ট কয়লা পরিত্যক্ত হয়। মিডলিং-এ ছাইয়ের পরিমাণ প্রায় 30-35 শতাংশ। ইহাকে বিভিন্ন কাজে, যেমন—বৈদ্যুতিক থার্ম্যাল প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয়। পরিত্যক্ত কয়লা, যাহার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ চল্লিশের উর্ধ্বে তাহার ব্যবহারিক চল নাই। তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে পরিত্যক্ত বলিয়া কিছু নাই। তাহারা হয়তো এই কয়লাকেই অন্তান্ত কয়লার সহিত মিশাইয়া আমাদের দৈনন্দিন কাজে যোগান দেয়। ফলে এক দিকে আমরা যেমন আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, অন্ত দিকে তেমনি আমাদের দৈনন্দিন কয়লার খরচও বাড়িতেছে আর উনুনে ছাইয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে।

এই ভাবে পৃথক-করা ঝরিয়ার হাল্কা কয়লার সহিত রাণীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লার সংমিশ্রণ বা ব্লেণ্ডিং করা হয়। রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম, সুতরাং তাহার গ্র্যাভিটি সেপারেসনের প্রয়োজন হয় না। কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করিতে হইলে তাহাকে চূর্ণ করিতে হয়। সেই জন্ত গ্রাইণ্ডিং মিলে সংমিশ্রণটিকে হাই ম্যাকানিক্স হাতুড়ির সাহায্যে গুঁড়া করা হয়। চূর্ণীকৃত কয়লার আকার ⅛"-এর কম

হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বড় সাইজের কয়লার দ্বারা বেশ জমাট-বাঁধা কঠিন কোক প্রস্তুত হয় না। এই চূর্ণীকৃত কয়লার দ্বারা কোকচুল্লী বা ওভেনগুলিকে পূর্ণ করা বা চার্জ করা হয়। এক-একটা চুল্লীতে কয়লা ধরে প্রায় 20টন। এই রকম কম-বেশী 80টি চুল্লী পাশাপাশি অবস্থান করে। পাশাপাশি অবস্থিত 80টি চুল্লীকে বলে একটা ব্যাটারী। কোন কোন স্টীল প্ল্যান্টে 4টি, 5টি—এমন কি, আরও বেশী ব্যাটারী থাকে কোক উৎপাদনের জন্য। চুল্লীকে গুঁড়া কয়লার দ্বারা বোঝাই বা চার্জ করা হইতে কোক উৎপাদন পর্যন্ত সময় লাগে প্রায় 16 ঘণ্টা। চুল্লীগুলিকে গরম গ্যাসের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। দুই পাশ হইতে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হয়, যাহাতে তাপ কয়লার স্তূপ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। অন্তর্ধূম পাতনের সময় চুল্লীর দরজাগুলিকে এমন নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ রাখা হয়, যাহাতে বাতাসের অনুপ্রবেশ ঘটিতে না পারে। চুল্লীগুলির বাহিরের তাপ বেশী, কিন্তু ভিতরের তাপ 1100°-1200° ডিগ্রী রাখা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা নমনীয় বা প্লাস্টিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহা বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। সেই সঙ্গে কোল গ্যাস নির্গত হয়। এই কোল গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে আলকাত্‌রা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ন্যাপ্‌থ্যালিন, ক্রিয়োজোট অয়েল, টলুইন, জাইলিন, বেঞ্জল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ। কোল গ্যাসকে ঠাণ্ডা করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই সব মূল্যবান পদার্থগুলিকে পৃথক করা হয়। কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করা হয় দুই রকম উদ্দেশ্যে। একটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কোক কয়লা উৎপাদন করা। সে ক্ষেত্রে কোল গ্যাসটি গৌণ। ইহা তখন উপজাত পদার্থ বা বাই-প্রোডাক্ট।

ইস্পাত কারখানায় এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করা হয়। দ্বিতীয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কোল গ্যাসের উৎপাদন। সেই ক্ষেত্রে কোক হইল গৌণ। যেমন দুর্গাপুরে বাংলা গভর্ণমেন্টের কোকওভেন প্রজেক্ট। এখানে কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের দ্বারা কোল গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। কোক কয়লা হয় উপজাত পদার্থ। স্টীল প্ল্যান্টে কোক এবং কোল গ্যাস উভয়েরই প্রয়োজন। কোকের প্রয়োজন ব্লাষ্ট ফার্নেসে পিগ-লৌহ উৎপাদনে এবং ফাউণ্ড্রিতে আর কোল গ্যাসের প্রয়োজন হয় ওপেন হার্থ ফার্নেসে ইস্পাত গলাইবার কাজে। ইহা ছাড়াও এই গ্যাসের প্রয়োজন হয় শহরে আলো জ্বালাইবার কাজে, পারিবারিক রন্ধনের কাজে, লেবরেটরীতে বার্নার জ্বালাইবার কাজে। যে প্ল্যান্টে কোক উপজাত পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হয়, সেখানে কোককে বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া অন্য পথ নাই।

অন্তর্ধূম পাতনের সময় যখন চুল্লী হইতে আর কোন গ্যাস নির্গত হয় না, তখনই বুঝিতে পারা যায়, কয়লা কোকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর চুল্লীর দরজা খুলিয়া কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। কোক বাহির করিবার প্রণালীটাও একটু বিচিত্র ধরণের। চুল্লীর সম্মুখে একখানা উন্মুক্ত ওয়াগন আনিয়া রাখা হয়। ইহার নাম Quenching car। পিছন দিক হইতে বৈদ্যুতিক হাতের সাহায্যে সেই বিশাল জ্বলন্ত অঙ্গারের স্তূপটিকে ধাক্কা দিয়া Quenching car-এর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তার পর সেই জ্বলন্ত অঙ্গারকে বর্ষাধারার তলায় আনিয়া অগ্নি নির্বাপিত করা হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার না করা হয়। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্প 2-3 শতাংশের অতিরিক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই ক্ষেত্রে ব্লাষ্ট ফার্নেসে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

ব্লাষ্ট ফার্নেসে যে কোক ব্যবহার করা হয়, তাহার নির্দিষ্ট আকৃতি বা সাইজ আছে। 1½" হইতে 2" সাইজের কোক ব্যবহৃত হয়। বেশী

বড় বা বেশী ছোট আকারের কোক অসুবিধা-জনক। বড় বড় চাঁইকে ভাঙিয়া সঠিক আকারে পরিণত করিতে গেলে কত কোক যে গুঁড়া হইয়া যায় এবং ফার্ণেসে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়, তাহা বলা যায় না। সেগুলি সস্তা দরে খোলা বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। এক শত টন কয়লা হইতে কোক উৎপন্ন হয় 70-72 টন। খুব বেশী যদি হয় 74-75 টন; কারণ কয়লার মধ্যে বায়বীয় পদার্থই (আলকাতরা সমেত) থাকে 24-25শতাংশ।

কাজেই কোকের দাম স্বভাবতঃই বেশী। অতএব ইহার যতখানি সদ্ব্যবহার হয়, ততই ভাল। আজকাল সিন্টারিং প্ল্যান্টে কিছু কিছু কোককে কাজে লাগান হইতেছে। এক্ষেত্রে গুঁড়া কোকই উপযুক্ত।

ব্লাষ্ট ফার্ণেসের জন্য নিয়োজিত কোকের আকার বা সাইজ ($1\frac{1}{2}''$-$2''$) ছাড়া আরও কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন। ব্লাষ্ট ফার্ণেসে কোক, কঠিন লাল মাটি বা আয়রন ওর এবং চুনা পাথর বা লাইম ষ্টোনের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করিয়া সুউচ্চ চুল্লীর মাথার উপর হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকে। সুতরাং তাহাকে বিলক্ষণ উপরের চাপ এবং গড়াইয়া পড়িবার জন্য ঘর্ষণ-চাপ সহিতে হয়। সে ক্ষেত্রে কোক নরম প্রকৃতির হইলে অচল হইবে। উভয় প্রকার চাপের মধ্যে পড়িয়া কোক ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে ফার্ণেসের প্রক্রিয়াও শুরু হইয়া আসিবে। তাই কোক উৎপন্ন হইবার পর তাহার উপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাইয়া তাহার উপযোগিতা হাতে-কলমে যাচাই করিয়া দেখা হয়। এই সব পরীক্ষার মধ্যে একটি হইল ড্রাম টেস্ট বা মাইকাম টেস্ট (Micam test)। ইহাকে এক প্রকার অ্যাব্রেসন টেষ্টও বলা চলে।

মাইকাম টেষ্ট করা হয় একটি বিদ্যুৎ-চালিত ড্রামের মধ্যে। ড্রামটি নির্দিষ্ট আকারের হওয়া চাই। তাহার আবর্তমান গতিবেগও নির্দিষ্ট হওয়া চাই (যেমন মিনিটে 100 বার)। ড্রামের মধ্যে 100 কিলোগ্র্যাম কোক বোঝাই করিয়া মুখ বন্ধ করিবার পর তাহাকে একটা নির্দিষ্ট সময় (পাঁচ মিনিট) পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে একাদিক্রমে আবর্তিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ড্রামের আবর্তন থামাইয়া সব কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর $1\frac{1}{2}''$ ছাঁকনীর সাহায্যে ছাঁকা হয়। যদি 75 বা তদূর্ধ্বভাগ কোকের আকারে $1\frac{1}{2}''$ উপর থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কোক ফার্ণেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। 75 ভাগের কম হইলে কোক নরম বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ফার্ণেসের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়। 75 শতাংশ হইল সর্বনিম্ন মান। ইহাকে নরম কোক বলা হয়। যে কোকের 80 শতাংশ $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বে থাকে, তাহাকে মাঝারী প্রকৃতির কোক বলা হয়। আর যে কোকের 85 শতাংশ $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বে থাকে তাহাকে কঠিন বা শক্ত কোক বলা হয়। ফার্ণেসের পক্ষে মাঝারী প্রকৃতির কোকই সবিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয় পরীক্ষার নাম হইতেছে শ্যাটার টেষ্ট (Shatter test)। এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট ওজনের কোককে 24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে নীচে ফেলা হয়। অবশ্য 24 ফুট উচ্চ স্থান লেবরেটরীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া 6 ফুট উচ্চ স্থান হইতে চার বার নীচে ফেলিবার পর কোকগুলিকে $1\frac{1}{2}''$ ছাঁকনীর সাহায্যে চালা হয়। এই ক্ষেত্রে যদি 90 শতাংশের উপর কোক $1\frac{1}{2}''$ অথবা তদূর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে কোক ফার্ণেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। উভয় পরীক্ষাতে শুধু $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বের কোক ছাড়াই গুঁড়া কোক কতখানি উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণও ছাঁকনীর সাহায্যে মাপিয়া দেখা হয়।

24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে ফেলিবার কারণ হইতেছে এই যে, ব্লাষ্ট ফার্ণেসের মাথার উপর হইতে চার্জ যখন ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন সে মাল প্রায় 24 ফুট নীচে আসিয়া পড়ে। ফলে

কোকের গুঁড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। সেই জন্ত শাটার টেষ্টটি 24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকের মধ্যে সালফার এবং ফস্‌ফরাসের আধিক্য অবাঞ্ছনীয়। কয়লা হইতেই এই দুইটি পদার্থ কোকে অনুপ্রবেশ করে। কোকের মধ্যে সালফার এবং ফস্‌ফরাস বেশী থাকিলে ব্লাষ্ট ফার্নেসে পিগ প্রস্তুত করিবার সময় পিগ লৌহ কোক হইতে ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থ গ্রহণ করে। ফলে পিগের মধ্যে ঐ দুইটি পদার্থের পরিমাণ বেশী হইলে পিগের দ্বারা অ্যাসিড ইস্পাত প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অ্যাসিড ইস্পাতে (যে ইস্পাত অ্যাসিড ফার্নেস হইতে প্রস্তুত হয় তাহাকে অ্যাসিড ইস্পাত বলে) ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্পের আধিক্যও অবাঞ্ছনীয়। এই পদার্থটির পরিমাণ তিন শতাংশের বেশী না হওয়াই উচিত। চুল্লী হইতে নির্গত জলন্ত কোকের আগুন যখন ঝর্ণার জলধারার সাহায্যে নির্বাপিত করা হয়, তখনই জলীয় বাষ্প উহার মধ্যে আটকা পড়ে। ব্লাষ্ট ফার্নেসে কোক হইতে এই জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া ফার্নেসের তাপ শোষণ করিবার ফলে ফার্নেসের তাপ কমিয়া যায়। সুতরাং কোকের পরিমাণ বাড়াইয়া এই তাপের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই জন্ত উৎপাদন খরচাও বাড়িয়া যায়। সেই জন্ত কোয়েঞ্চিং কারে যখন জলন্ত কোক ঠাণ্ডা করা হয়, তখন যাহাতে অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোকের ছাই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোকের ছাই যত কম হয়, ততই ভাল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ কম। কিন্তু আমাদের দেশে এই পরিমাণ খুব বেশী—16-18 শতাংশেরও বেশী। এই সকল কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত হইলে প্রায় 24-25 শতাংশ বায়বীয় পদার্থ নিষ্কাশনের পর ছাইয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 20-21 শতাংশে। কয়লার শ্রেণী অনুসারে সব সময় এই মান রাখাও দায়। সেই ক্ষেত্রে লৌহ প্রস্তুতে কোকের পরিমাণ লাগে বেশী। এক টন লৌহ উৎপাদনে লাল মাটির প্রয়োজন প্রায় 1·5 টন, কোকের প্রয়োজন প্রায় 0·8 টন। কিন্তু সময় সময় এই পরিমাণ গিয়া দাঁড়ায় এক টনে। সেই ক্ষেত্রে লৌহ উৎপাদনের খরচা অনেক বাড়িয়া যায়।

ছাইয়ের আর একটা প্রয়োজনীয় গুণ হইল তাহার গলনাঙ্ক (Ash fusion temperature)। এই গলনাঙ্ক যত উচ্চ তাপের হয়, ততই ভাল। ছাইয়ের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে সিলিকা এবং অ্যালুমিনা (Al_2O_3), একটা অপরটার প্রায় দ্বিগুণ। ইহা ছাড়া থাকে কিছু ম্যাগ্‌নেসিয়া, কিছু লৌহ অক্সাইড। লৌহের অক্সাইড বেশী থাকিলে ছাইয়ের রং হয় লাল্‌চে এবং ইহার গলনাঙ্কও কম হয়। সেই ক্ষেত্রে ফার্নেসের তাপে ছাই যদি গলিয়া যায়, তাহা হইলে কোক ঝামার আকার ধারণ করে এবং লৌহ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং ছাইয়ের গলনাঙ্ক বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্ততঃ 1600° ডিগ্রীর কাছাকাছি হওয়াই ভাল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বৃহস্পতি গ্রহের সন্ধানে

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা বৃহস্পতি গ্রহটির বিষয় অনুসন্ধানের জন্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার রেডণ্ডো বীচের টি. আর. ডব্লিউ. ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে সম্প্রতি এই সম্পর্কে এক চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুসারে এই সংস্থাটি 1972-'73 সালে বৃহস্পতি গ্রহের অভিমুখে উৎক্ষেপণের জন্যে দুটি উন্নত ধরণের মহাকাশযান নির্মাণ করবে। এই মহাকাশযানে কোন আরোহী থাকবে না। এই মহাকাশযান দুটির নাম দেওয়া হয়েছে—পায়োনীয়ার-এফ ও পায়োনীয়ার-জি। এরাই বৃহস্পতির প্রথম ক্লোজআপ ছবি তুলবে। বৃহস্পতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে, সেগুলির পর্যবেক্ষণ এবং বৃহস্পতির পরিবেশ ও আবহমণ্ডলের সন্ধানও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হলো শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রহগুলিতে পৌঁছাবার জন্যে কৌশল উদ্ভাবন।

আখের ছোব্‌ড়া থেকে গৃহনির্মাণের উপাদান

বৃটেনে আখের ছোব্‌ড়াকে কাজে লাগাবার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গৃহ-নির্মাণের উপাদান সস্তায় পাওয়া যাবে।

লণ্ডনের ফার্ম চার্লস রাইট ডেভেলপমেন্টস্ লিমিটেডের মিঃ সি. রাইট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আখের ছোব্‌ড়ার (Bagasse) সঙ্গে অল্প পরিমাণ Propionic acid মিশ্রিত করলে জৈব কণিকাগুলি (যা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাগাসোসিস রোগ সৃষ্টি করে ও সংরক্ষিত ব্যাগাসির ক্ষতিসাধন করে) একই রকম থেকে যায়।

মিঃ রাইট ব্যাগাসোসিস রোগ বরণ করে নিয়ে এই রোগের কারণ জৈব কণিকাগুলিকে আলাদা করতে সাহায্য করেন। ত্রিনিদাদে পরিচালিত পরবর্তী পরীক্ষায় ব্যাগাসির উপর প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডের কাজ ধরা পড়ে। এই পরীক্ষা চালান মিঃ রাইট ও বি. পি. কেমিক্যালস্।

এই নতুন উপাদান সম্পর্কে বি. পি. কেমিক্যালস্ বলেন—পৃথিবীর অল্প-অগ্রসর দেশগুলিতে এই প্রথম একটি স্বল্প ব্যয়ের সর্বার্থসাধক গৃহ-নির্মাণের উপাদান পাওয়া যাবে।

তাঁরা আরও বলেন যে, এপর্যন্ত শিল্পে অতি অল্প পরিমাণে আখের ছোব্‌ড়া কাজে লাগানো হয়েছে (যেমন—ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, তাইওয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফাইবার বোর্ড তৈরির কাঁচামাল হিসাবে)। কিন্তু এটি চিপ বোর্ড, হার্ড বোর্ড, গ্যালভানাইজ্‌ড বুক, সফট উড, কার্ডবোর্ড এবং থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক প্রভৃতি তৈরির এক আশ্চর্য স্বল্পমূল্যের বিকল্প উপাদান হিসাবে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে।

ইঁদুরের বংশনাশের অভিনব পন্থা

বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার অভিনব পদ্ধতি আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলভুক কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রদ হয়েছে। ইঁদুর প্রভৃতি নির্মূল করবার জন্যেও বিভিন্ন দেশে এই অভিনব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের আপজন কোম্পানীর ডাঃ আর. জে. ডিকিনসন এবং রোয়েল ডিফোনর এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা পুরুষ ইঁদুরকে ক্লোরো হাইড্রিনস নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য খাইয়ে দেখেছেন যে, এতে পুরুষ ইঁদুরগুলি চিরকালের জন্যে বন্ধ্যা হয়ে গেলেও তারা যৌন আবেগ হারায় না। তাদের সঙ্গে স্ত্রী-ইঁদুরের মিলনে মিথ্যা গর্ভসঞ্চারও হয়ে থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রী-ইঁদুরেরা অন্য পুরুষ ইঁদুরদের কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। এর ফলে নতুন ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসবে এবং এভাবেই এদের নির্মূল করা সম্ভব হবে।

এই রাসায়নিক উপাদানটি এখনও বাজারে ছাড়া হয় নি। কারণ এখনও এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকী রয়েছে।

অতি শক্তিশালী ভিটামিন-ডি

যুক্তরাষ্ট্রের উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সুপার ভিটামিন-ডি নামে এক ধরণের অতি শক্তিশালী ভিটামিন আবিষ্কার করেছেন। এই সকল বিজ্ঞানীদের অন্যতম হেক্টর এফ. ডি. লিউকা বলেছেন, শিশুদের রিকেট রোগ এবং ঐ ধরণের অস্থি-সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাধারণ ভিটামিন-ডি-এর তুলনায় সুপার ভিটামিন-ডি 40 গুণ বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক, যারা অস্থিসংক্রান্ত রোগে ভুগছে, তারা খুবই উপকৃত হবে।

কারবাইন

প্রাকৃতিক সৃষ্টি নয় এবং এই গ্রহে পাওয়া যায় না, এমন এক জাতের উচ্চ আণবিক যৌগিক-পদার্থ (High Molecular Compound) সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর লেবরেটরীতে নির্মিত হয়েছে।

অঙ্গারের প্রাকৃতিক রূপ তিনটি—কয়লা, হীরক ও গ্র্যাফাইট। সাধারণ পেন্সিলের শীস আর হীরকের মত উজ্জ্বল পদার্থ একই অণু দিয়ে তৈরি। তবে তাদের গুণের পার্থক্য নির্ভর করে অণুর গঠনের উপর। এই গঠনের পরিবর্তন হলেই গ্র্যাফাইট হীরক হয়ে যায়। অত্যধিক উত্তাপ ও প্রচণ্ড চাপে এই গঠন বদলানো যায়।

তবে কয়লা, হীরা ও গ্র্যাফাইটের বাইরে অঙ্গারের রূপ আছে কি? এ. স্লাডকভের 1964 সালের এই প্রকল্পটি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন এবং বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন কারবাইন। বিজ্ঞানী ভি. কোরশাক, এ স্লাডকভ এবং ওয়াই. কুদ্রিয়াভসেভ এই পদার্থটি তৈরির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

কারবাইন কালো গুঁড়ার মত পদার্থ। পৃথিবীতে এই পদার্থটি নেই, তবে অন্য কোন গ্রহে থাকা সম্ভব। গ্র্যাফাইট ও কারবাইন মিশিয়ে খুব শক্তিশালী ইস্পাত তৈরি সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও এই অঙ্গারটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা উন্মুক্ত হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা : রমাতোষ সরকার

প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, 6 কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-12, দাম 4 টাকা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে গণিতচর্চা প্রচলিত। প্রাক্‌বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সুপ্রাচীন ভারতীয়েরা কেমন জীবনের সহজ ও সাধারণ প্রয়োজনের দাবিতে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেছিলেন, বৈদিক যুগে তেমনি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন গ্রহণ করেছিল, আর বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্র সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে এই তিনটি যুগ-পর্যায়ে প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা সম্পর্কে লেখক নিপুণভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে তিনি সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় 'সবই ব্যাদে আছে'—জাতীয় মনোভাব যেমন দেখা যায় নি, অপর দিকে তেমনি উগ্র ভারতবিদ্বেষী মনোভাবও নেই। একারণে সত্যসন্ধানী সাধকের কাছে তাঁর আলোচনার আকর্ষণ বিশেষভাবে অনুভূত হবে। লেখক গ্রন্থটি প্রতিটি যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার সঙ্গে গণিতচর্চার কাহিনী এবং প্রধান প্রধান গণিতজ্ঞ ও গণিতগ্রন্থের পরিচয় মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করেছেন। দশমিক স্থানীয় মান, অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও শূন্য আবিষ্কারের কাহিনী, সূর্যসিদ্ধান্ত, লীলাবতী গ্রন্থের বিবরণ এবং আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের পরিচয় পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে।

লেখকের রচনাশৈলী মনোজ্ঞ, ভাষা সহজ ও সাবলীল। তিনি যে বহু পরিশ্রম ও গভীরভাবে চিন্তা করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বাংশে পরিস্ফুট। কয়েকটি চিত্র থাকায় গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাপা ও মুদ্রণ পরিস্ফুট প্রশংসনীয়। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলেই আমরা মনে করি।

সমাজ ও কারিগর : শ্রীঅমূল্যধন দেব

প্রকাশক মনীষা গ্রন্থালয়, 4/3 বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-12। দাম 3 টাকা।

লেখক পেশায় একজন ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় একজন লেখক। কর্মজীবনে বহু বছর কারিগরদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তারই প্রতিফলন এই গ্রন্থে আছে। আমাদের কারিগরেরা তাঁদের স্বাধিকার অর্জন করবার জন্যে উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হোন, যাতে তাঁরা পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারেন—এই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু যুবক—যাঁরা কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এই বইটি পড়ে বিশেষ লাভবান হবেন। লেখকের ভাষা সাবলীল, বইটির ছাপা ভাল।

র. ব.

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা
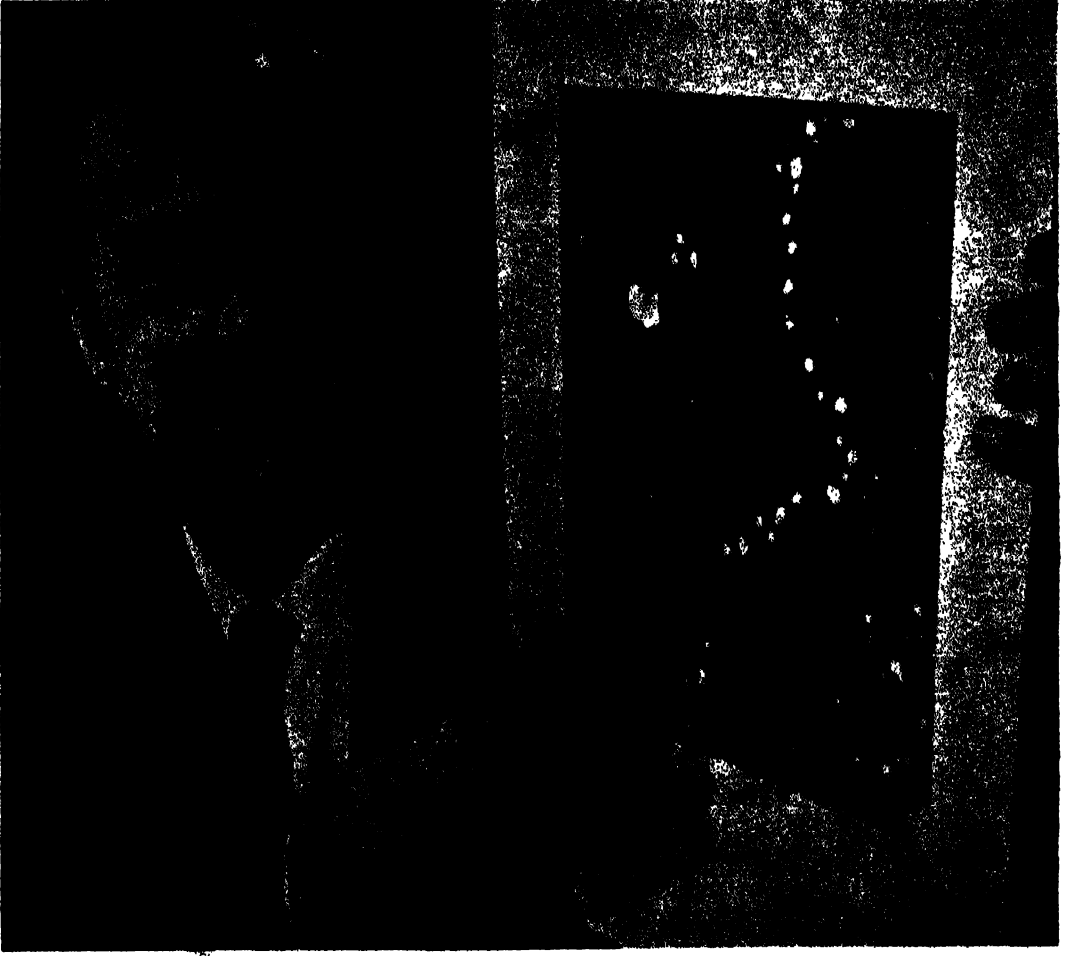
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের **Dr. Albert Crewe** তাঁর উদ্ভাবিত অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে থোরিয়াম অণুর মধ্যে একক পরমাণুর আলোকচিত্র গ্রহণে সর্বপ্রথম সক্ষম হয়েছেন। চিত্রে ছোট সাদা ফুটকিগুলি হচ্ছে একক থোরিয়াম পরমাণু।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটারের মত। এই ধরণের ব্যবধান আমরা কল্পনায় ঠিকমত আনতে পারি না। কারণ এই দূরত্বটা এমনই প্রকাণ্ড যে, আমাদের সাধারণ চিন্তাধারায় ওটা অসীম বলেই মনে হয়। তবে কয়েকটা সাধারণ কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে এই দূরত্বটা উপলব্ধি করা যেতে পারে; যেমন—বর্তমানে একটি এরোপ্লেনের গতিবেগে ঘণ্টায় 500 মাইল বা 800 কি. মি.। এই গতিবেগে যদি কেউ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দিকে ছুটে যায়, তবে তার সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছুতে সময় লাগবে একুশ বছর। অথবা ঘণ্টায় 5000 মাইল বেগে ছুটে-চলা কোন রকেটে চড়ে যদি ঐ পথ অতিক্রম করা হতো, তবে পৃথিবী থেকে সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছুতে সময় লাগতো দু-বছর দু-মাস—যেখানে ঐ রকেটে চড়ে চাঁদে যেতে সময় লাগবে মাত্র দু-দিন। কামানের মুখ থেকে একটা গোলা বেরোবার সময় যে গতি লাভ করে, সেই গতিতে ক্রমাগত ছুটে গেলে সূর্যে পৌঁছুতে তার সময় লাগবে নয় বছর। শব্দের গতিতে ছুটে গেলে পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছুতে সময় লাগবে চৌদ্দ বছর। তবে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 300000 কি. মি. হওয়ায় আলো বা বেতার-তরঙ্গের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় লাগবে মাত্র আট মিনিট। আমেরিকান জ্যোতির্বিদ চার্লস ইয়াং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা একটা চমৎকার ঘটনার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। Helmholtz প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, দেহের কোন স্থানের অনুভূতির স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে চলবার বেগ হলো সেকেণ্ডে 100 ফুট বা দিনে 1637 মাইল। সুতরাং যদি কোন মানুষের এমন একটি বিরাট হাত থাকে, যেটি সূর্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তবে সেই হাত সূর্যে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখন ওর দেহের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ঐ পুড়ে-যাওয়া হাতের জ্বালা-যন্ত্রণা আসতে সময় লাগবে দেড়-শ' বছর। কাজেই তার আগেই লোকটির মৃত্যু ঘটলে ঐ যন্ত্রণা সে আর উপলব্ধিই করবে না।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব একটা মডেল থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই মডেলে যদি পৃথিবীটাকে ধরা যায় এক মিলিমিটার ব্যাসের একটি সর্ষের দানা, তবে সূর্যের ব্যাস হবে দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা গোলাকার বল। এই মডেলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হবে দশ মিটারের মত; অর্থাৎ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের এক কোণে থাকবে সূর্যস্বরূপ বলটি এবং ঘরের বিপরীত কোণে থাকবে পৃথিবীস্বরূপ সর্ষের দানাটি। মনে রাখতে হবে, এই মডেলে 1/4 মি. মি. ব্যাসের চাঁদ বসবে পৃথিবী অর্থাৎ সর্ষের দানা থেকে মাত্র তিন সেন্টিমিটার দূরে। আর একটা ঘটনা দিয়েও সূর্য থেকে

পৃথিবীর দূরত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন কলিকাতা থেকে মোগলসরাই—এই চার-শ' মাইল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি মাকড়শার জালের সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন যদি 10 গ্র্যাম ধরা হয়, তবে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত ঐ সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন হবে ছয় কিলোগ্র্যামের মত। আর পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ তন্তুর ওজন হবে 2·3 টন। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যের খুব কাছে নেই। এখন উপরের এই উদাহরণগুলি থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কথা হলো, এই প্রকাণ্ড দূরত্বটা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন কেমন করে? কিভাবে তাঁরা জানলেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটার?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের যে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রথমটি হলো জরিপ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দুটি বিন্দু A
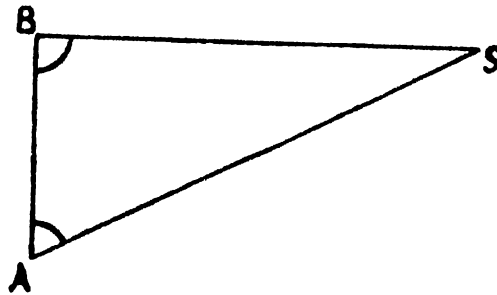
1নং চিত্র

এবং B স্থির করে AB ভূমিরেখা মনোনীত করা হয় (1নং চিত্র)। S বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান হলে A কোণ এবং B কোণ পরিমাপ করে S কোণ নির্ণয় করা হয়। এখন যেহেতু AB ভূমিরেখার দূরত্ব জানা আছে, সেহেতু ত্রিকোণমিতির সাহায্যে SB এবং SA-এর দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির নির্ভুলতা নির্ভর করে AB ভূমিরেখার দৈর্ঘ্যের উপর। AB রেখার দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, সূর্যের দূরত্ব তত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে। এখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে যদি পৃথিবীর ব্যাস (12755·9 কি. মি.) ভূমিরেখা হিসাবে ধরা হয়, তবে S কোণের মান হবে মাত্র 17·6 সেকেণ্ড অর্থাৎ এক ডিগ্রীর প্রায় 1/210 ভাগ। এর অর্ধকোণকে সৌর-লম্বন (Solar parallax) বলে। একটি দ্বিগুণ সৌর-লম্বন সৃষ্টি হয় এক মিটার দূরে রাখা একটি চুলের দ্বারা। এত ছোট কোণ নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যদি পরিমাপে 0·1 সেকেণ্ড কোণের তারতম্য ঘটে, তবে সৌর দূরত্বের ক্ষেত্রে বহু লক্ষ মাইলের পার্থক্য ঘটবে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা কখনও সম্ভব নয়।

এই কারণে জ্যোতির্বিদেরা বিকল্প উপায়ে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপ করে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে শুক্র গ্রহের সূর্যথালাটি অতিক্রম করবার সময় নির্ণয় করা হয়।

এটা সৌর-লম্বন নির্ধারণের সহায়তা করে। কিন্তু শুক্র গ্রহের সূর্যথালা অতিক্রম করা অর্থাৎ সূর্য, শুক্র ও পৃথিবীর এক সরলরেখায় আসা একটি দুর্লভ ঘটনা। শুক্র গ্রহের সূর্যথালা অতিক্রম করবার শেষ যুগ্ম বছর হলো 1874 এবং 1882 খৃষ্টাব্দ। এরপর এই ঘটনা ঘটবে 2004 খৃষ্টাব্দের 8ই জুন এবং 2012 খৃষ্টাব্দের 6ই জুন। এই সময়ের ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব খুব ঘন ঘন যাচাই করে দেখবার উপায় নেই।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের আধুনিকতম সহজ উপায় হলো স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতি (Spectroscopic method)। 2নং চিত্রে S হলো সূর্য এবং পৃথিবীর কক্ষপথে
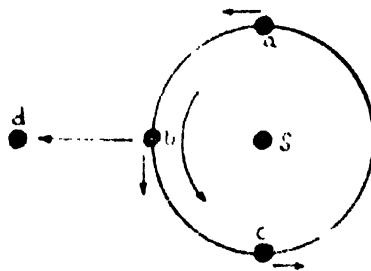
2নং চিত্র

a, b এবং c হলো পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অবস্থান। d হলো দূরবর্তী একটি নক্ষত্রের অবস্থান। এখন স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দৃষ্টিপথের রেখা বরাবর বেগের উপাংশ পরিমাপ করা যায়। পৃথিবী যখন b স্থানে থাকে, তখন নক্ষত্রের বেগ পরিমাপ করা হয়। লম্বভাবে ক্রিয়াশীল পৃথিবীর বেগ এই অবস্থায় নক্ষত্রের বেগের কোন তারতম্য ঘটায় না। কিন্তু পৃথিবী যখন a স্থানে অবস্থান করে, তখন নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের অন্তর ফল এবং পৃথিবীর c অবস্থানে নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের যোগফল পরিমাপ করা হয়। b অবস্থানে প্রাপ্ত নক্ষত্রের বেগ a অথবা c অবস্থানে প্রাপ্ত বেগের পার্থক্য থেকে পৃথিবীর বেগ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটে চলবার বেগ 29·7 কি. মি./সে.। এক বছরে যত সেকেণ্ড হয়, সেই সংখ্যা দিয়ে এই বেগ গুণ করে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিসীমা নির্ণয় করা হয়। ঐ পরিসীমাকে ($2\times\frac{22}{7}$)-এর দ্বারা ভাগ করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের মান হলো $(1495\pm2)\times 10^5$ কিলোমিটার।

গিরিজাচরণ ঘোষ*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

করাতের গুঁড়া থেকে কোক

অনেক জিনিষই আমরা কাজে লাগাই না বলে ফেলে দিই বা কাজ শেষে সেগুলির কোন দাম আছে বলে মনে করি না।

এভাবে অবহেলা করে ফেলে দেওয়া অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিষ থেকে কিভাবে সহজে ও অল্প খরচে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরাই চেষ্টা করে চলেছেন। বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষও আমরা পেয়েছি এসব গবেষণার ফলে।

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমনি এক তুচ্ছ জিনিষ—করাতের গুঁড়া (Saw dust) থেকে কোক তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। গোর্কীর সেণ্ট্রাল রিসার্চ টিম্বার অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউটে এই করাতের গুঁড়া থেকে কোক তৈরি করবার পরীক্ষাটি সফল হয়েছে।

সাধারণতঃ কোক তৈরি করা হয়, বায়ুবদ্ধ পাত্রে কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) দ্বারা। এই প্রক্রিয়ায় হাল্কা ও কালো রঙের যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকেই কোক বলে। কোক প্রধানতঃ ধাতুনিষ্কাশন ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

করাতের গুঁড়া কয়েকটি জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটিকে সেপারেসন, ড্রাইং ও মিক্সিং প্রভৃতি কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 500-750 কে. জি প্রতি বর্গসেন্টিমিটার চাপে রেখে দিলে তাথেকে ছোট ছোট কোকের ব্লক তৈরি হয়। এই ব্লকগুলিকে বলে ব্রিকোয়েট (Briquette)। কাঠের বাতিলকরা তরল অংশ, রাসায়নিক কারখানার বাতিল তরল পদার্থ বা তৈল, শোধনাগারের শুক্‌নো বাতিলকরা জিনিষ জৈব পদার্থ হিসেবে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন।

এভাবে তৈরি করা কোকে কাঠকয়লা থেকে ঘনত্ব, রোধ ও প্রতি একক আয়তনে কার্বনের পরিমাণ বেশী আছে। কাঠের গুঁড়া ও কাঠের কারখানার ফেলে দেওয়া জিনিষ ও কলকারখানার বাতিল জিনিষ মিশিয়ে যে কোক তৈরি করা হয়, তার খরচ পড়ে খুবই কম, অথচ কাজের দিক থেকে তা খুবই উন্নত ধরণের।

এই প্রক্রিয়া চলবার সময় উপজাত পদার্থ হিসেবে রেজিন পাওয়া যায়। কাঠের কাজ ও অন্যান্য কাজেও এই রেজিন নামমাত্র খরচায় সাকল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা

গেছে! রেজিন হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—কয়লার গুঁড়াও নগণ্য নয়, তা থেকে পাওয়া যায় কোক।

তোমাদেরও কোন জিনিষই অবহেলার চোখে দেখা উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞানীরা এভাবেই ফেলে দেওয়া জিনিষ থেকে কাজের জিনিষ তৈরি করে চলেছেন।

শ্রীঅজয় গুপ্ত

শব্দের ব্যবহার

তোমরা হয়তো শব্দ সম্পর্কে অনেক কিছু পূর্বেই জেনেছ। শব্দের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার কেমন করে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে, এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। প্রথমেই শব্দের প্রতিফলনকে কি কাজে লাগাতে পারা যায়—সে সম্বন্ধে বলছি। তোমরা চোঙাকৃতি মেগাফোনের নাম শুনেছ এবং কেউ কেউ দেখেও থাকবে। এই মেগাফোনের সাহায্যে শব্দ খুব জোরে শোনা যায়। কিন্তু কেমন করে? বক্তা যখন যন্ত্রের ক্ষুদ্র মুখ দিয়ে কথা বলে, তখন শব্দ ঐ মেগাফোনের ভিতরকার গায়ে বারবার প্রতিফলিত হয়। ফলে তরঙ্গগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে না পড়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। তাই নির্গত শব্দের মাত্রাও খুব জোরালো হয় এবং অনেক দূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। প্রতিফলনের আরও অনেক ব্যবহার আছে। যেমন—শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যে হাইড্রোফোন নামে শব্দগ্রাহী যন্ত্রকে জলের ভিতরে রাখা হয়। বিস্ফোরণের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে সেই শব্দকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসতে দেওয়া হয়। হাইড্রোফোন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে। তারপর সমুদ্র-জলে শব্দের বেগ এবং সময়ের ব্যবধান হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ থেকে চোরা পাহাড় বা হিমশৈলের দূরত্ব নির্ণয় করবার জন্যেও প্রতিধ্বনির সাহায্য নেওয়া হয়। এই প্রতিধ্বনি যদি শব্দ সৃষ্টি করবার 10 সেকেণ্ড পরে শোনা যায়, তবে বুঝতে হবে চোরা পাহাড় বা হিমশৈল জাহাজ থেকে এক মাইল দূর আছে; কেন না, শব্দ-তরঙ্গ 5 সেকেণ্ডে এক মাইল বিস্তার লাভ করে। এভাবে কামান-গর্জনের প্রতিধ্বনির অনুসরণ করে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনী ফ্রান্সের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

মানুষ তার কণ্ঠনালীর সাহায্যে কেমন করে শব্দ সৃষ্টি করে এবং কান কেমন

করে শব্দ গ্রহণ করে, এস্থলে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের কণ্ঠস্বর তার শ্বাসনালীর উপরের দিকে ল্যারিংস নামে একটি বিশেষ অংশ থেকে উৎপত্তি হয়। এই ল্যারিংস একটি হাড়ের খাঁচাবিশেষ। এর মধ্যে রয়েছে দুটি শক্ত ঝিল্লী, যাদের বলা হয় ভোক্যাল কর্ড। এই ভোক্যাল কর্ডের কম্পন থেকেই শব্দের উৎপত্তি হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন কর্ড দুটির মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকে। ফলে শ্বাসনলীর মধ্যে বায়ু চলাচলের সময় কোন শব্দ হয় না, তবে কথা বলবার সময় কর্ড দুটি খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং বায়ুর ধাক্কায় কাঁপতে থাকে। কথা বলবার সময় এই কম্পন থেকেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ আমাদের কানে এসে প্রবেশ করছে আর আমরা শব্দময় জগতের বিচিত্র অনুভূতি উপলব্ধি করছি। কানের গঠন তিনটি ভাগে বিভক্ত:—(1) বহির্ভাগ—এই ভাগে আছে কানের বাইরের অংশ, যা আমরা সরাসরি দেখিতে পাই। (2) মধ্যভাগ—এই ভাগে আছে তিনটি ছোট ছোট হাড়, যথা—হ্যামার, এনভিল ও ষ্টিরাপ। (3) অন্তর্ভাগ—এই অংশে আছে কানের পর্দা, ককলিয়া এবং শ্রবণস্নায়ু।

এখন দেখা যাক, কেমন করে আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়। প্রথমে শব্দ-তরঙ্গ উৎস থেকে এসে কানের নালীপথে প্রবেশ করে। তারপর নালীপথ দিয়ে পর্দায় এসে আঘাত করে। এই সময়ে মধ্যভাগের তিনটি হাড় কাজ করতে থাকে। তারা শব্দ-তরঙ্গকে ককলিয়াতে পৌঁছে দেয়। ককলিয়ার তরল পদার্থ তরঙ্গকে শ্রবণস্নায়ুতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কান খারাপ হলে তার কম্পন-সংখ্যা অনুভূতির বিস্তার 20 থেকে 20,000 বারের অনেক কম হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, শব্দের শক্তি যথেষ্ট না হলে তা শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং শ্রবণশক্তির একটা সীমা আছে। এই কম্পাঙ্কের নীচে বা উপরের শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছুলেও আমরা শুনতে পাই না। তোমরা নিশ্চয়ই জান—সেকেণ্ডে 20 কম্পাঙ্কের নীচের শব্দকে বলে Infrasonic শব্দ আর সেকেণ্ডে 20,000 কম্পাঙ্কের উপরের শব্দকে বলে Supersonic বা Ultrasonic শব্দ।

শব্দের আধুনিক ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ফনোগ্রাফের কথা। ফনোগ্রাফের আবিষ্কর্তা হলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন। এডিসনের ফনোগ্রাফ ছিল একটি হাতলের দ্বারা চালিত পিনসমেত একটি সিলিণ্ডার। এরপর অবশ্য এডিসন আর এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নি। আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র তৈরি করেন আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল। তাঁর যন্ত্রের নাম হলো গ্র্যামোফোন। এই যন্ত্রে তিনি হাতলের বদলে ঘড়ির কল ব্যবহার করেন। বেল ও তাঁর সহকর্মীরা পাতলা কাগজের সিলিণ্ডারের উপর মোমের পাতলা মিশ্রণ ব্যবহার করেছিলেন। এর পর এই যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধন করেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী

এমিল বারলিনার। তিনি তামার পাতে কণ্ঠস্বরের রেকর্ড গ্রহণ করা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আজ আমরা যে ধরণের রেকর্ড বাজাই—তিনি অবশেষে সেই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন 1887 সালে এবং তার নামও রাখা হয় গ্রামোফোন। এরপর অবশ্য এই যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ বিদ্যুৎ-শক্তিতে চালিত গ্রামোফোন যন্ত্র, যাকে বলা হয় রেকর্ড প্লেয়ার, তার সাহায্যে আরও সুন্দর এবং বর্ধিত মাত্রায় রেকর্ডের কথা ও গান আমরা শুনি।

শব্দ ধরে রাখবার জন্যে নানারকম পদ্ধতি আছে। এটা নির্ভর করে, সেই শব্দকে কি কাজে লাগানো হচ্ছে, তার উপর। যদি গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারে এই শব্দ শুনতে ইচ্ছা করি, তবে ডিস্ক রেকর্ডে সেই শব্দকে ধরে রাখতে হবে। এই ধরণের রেকর্ডিং-এ আছে মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিফায়ার ও কাটার। কাটারে আছে কাটিং নিড্‌ল্ বা ষ্টাইলাস। শব্দ-তরঙ্গের সমান তালে এই ষ্টাইলাসটি কাঁপতে থাকে। ফলে একটি নরম মোমের চাক্তির উপর ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়ে। এটি হলো মূল রেকর্ড। এথেকে যে ছাঁচ তৈরি হয়, সেই ছাঁচকে কাজে লাগিয়ে thermoplastic চাক্তির উপর আধুনিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

এই ডিস্ক রেকর্ড ছাড়াও বর্তমানে টেপ্ রেকর্ডার নামে একটি যন্ত্রের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই যন্ত্রটিতে আছে একটি ফিতা, যার উপর প্রকৃত রেকর্ডিং হয় আর বাকী অংশটুকু ডিস্ক রেকর্ডিংয়ের অনুরূপ। এই ফিতাটি চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত হয় এরূপ বস্তুর দ্বারা তৈরী। এর একটি দিক ফেরিক অক্সাইডের স্ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই স্ফটিকগুলির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে। এই স্ফটিকগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের চুম্বকত্বকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধরে রাখতে পারে। যখন রেকর্ড করা হয় তখন মাইক্রোফোন শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করে এবং একটি ইতস্ততঃ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। অ্যাম্প্লিফায়ার সেই তরঙ্গকে শক্তিশালী করে এবং তারপর রেকর্ডিং হেডে তা প্রবাহিত হয়। এই রেকর্ডিং হেডের অনুরূপ আর একটি play-back head আছে, যার মধ্য দিয়ে টেপটি চালালে আমরা আবার সেই শব্দ লাউড স্পীকারে শুনতে পাই। উপরিউক্ত হেড দুটির মত আর একটি অংশ আছে, তাকে বলে ইরেজিং হেড। প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডিংয়ের সময় ইরেজিং এবং রেকর্ডিং হেড একই সঙ্গে কাজ করে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইরেজিং হেডের বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে 50,000 বার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্যে একটি বিশেষ অসিলেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়। ডেনমার্কের ভানডেমার পলসন 1900 খৃষ্টাব্দে এটা আবিষ্কার করেন।

সবাক চলচ্চিত্রে যে শব্দ শুনতে পাই, তা অনেকটা ফনোগ্রাফ ও বেতারের যোগফল অ্যাম্প্লিফায়ারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের স্পন্দন একটি আলোকশিখাকে এপাশে ওপাশে নড়াতে

সাহায্য করে। শব্দ জোর হলে আলোর এই টিউবটি উজ্জ্বল হয়ে জলবে এবং কম হলে এর উজ্জ্বলতা কমবে। এভাবে শব্দ প্রথমে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে এবং পরে আলোক-স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়। ফলে ফিল্মের উপর একটি রেখার সৃষ্টি হয়। এই রেখাটি সর্বত্র সমান ঘন হয় না। এটা নির্ভর করে শব্দ জোর বা আস্তে হবার উপর।

শব্দের ক্ষেত্রে আর একটি আধুনিক বাস্তব ব্যবহারকে বলে ষ্টিরিয়োফোনিক ব্যবস্থা। এর উদ্ভাবন হয় 1958 সালে। এর ফলে সমবেত মিউজিকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুর ঘরের বিভিন্ন অংশ থেকে আসছে বলে মনে হয়। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মনে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—যেন সে ছবির ঘটনাস্থলেই রয়েছে। এই রেকর্ডে একই খাঁজের দুটি খাতে আলাদা দুটি রেকর্ডিং করা হয়—একটি তলায় আর একটি পাশে। ষ্টিরিয়ো-ফোনিক নিডল্ দুটি রেকর্ডিংকেই গ্রহণ করে স্পীকারে তা পুনরুৎপাদন করে।

আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে এমনভাবে শব্দ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত থাকে যেন বক্তা বা গায়কের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে শ্রোতার কানে না পৌঁছায়। শব্দ-বিজ্ঞানের এই শাখার পথিকৃৎ হলেন ইউ. এস. এ-র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাব্লিউ. সি. স্যাবাইন। বিশাল প্রেক্ষাগৃহে শব্দ নিয়ন্ত্রণের যদি কোন সুবন্দোবস্ত না থাকে, তবে প্রতিধ্বনির ফলে শ্রোতা কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারে না, সবই গোলমালে পরিণত হয়। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাগৃহের দেয়াল এবং ছাদ বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় ও জানলা, দেয়ালগুলি তাদিয়ে এমনভাবে আচ্ছাদিত থাকে যে, শব্দকে সহজে শুষে নিতে পারে। তাছাড়া চেয়ারের গদি ও শ্রোতাদের গায়ের পোষাকও শব্দ-তরঙ্গের শোষক হিসাবে অনেকটা কাজ দেয়। তবে প্রতিটি শ্রোতা যাতে নিজের আসনে বসে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পায়, সে জন্যে আবার শব্দের যথাযথ প্রতিফলন হওয়াও প্রয়োজন। এজন্যে প্রেক্ষাগৃহের ছাদ একটু বাঁকানো ও উঁচু করা হয় এবং শব্দের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্যে নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখা হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে নানা ধরণের প্রতিফলক লাগিয়েও শব্দের প্রতিফলনের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে।

শব্দের ব্যবহারকে আরও উন্নত ও আধুনিক করবার জন্যে দেশ-বিদেশে এখন গবেষণা চলছে। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য পরে জানা যাবে আশা করা যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল*

---

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, চন্দননগর।

উদ্ভিদের দান

তোমরা জান যে, ভূগর্ভ থেকেই মানুষ নানারকম খনিজ পদার্থ আহরণ করে আনে। কোনও জায়গায় মাটির তলায় খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে কিনা, তা নানারকম ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এজন্যে নানারকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকাল এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের সাহায্যেও এরকম জরীপের কাজ করা হচ্ছে।

এত সব পরীক্ষার পরেও কিন্তু মানুষ কাজ আরম্ভ করে অনেক সময় হয়তো কিছুই পায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলা চলতে পারে। অনেকের বাড়ীতে নল-কূপ বসাবার কাজ সুরু করে হয়তো কয়েক শ' ফুট পাইপ বসিয়েও ভাল জল পাওয়া গেল না।

তেমনি মাটির নীচে শিলাস্তরের কোনও ভাঁজে খনিজ তেল আছে মনে করে ডেরিক বা কাঠামো বসিয়ে ড্রিলিং পদ্ধতিতে নলকূপ বসিয়েও অনেক সময় হয়তো কিছুই পাওয়া যায় না।

অবশ্য এই পদ্ধতি বাড়ীর জলের নলকূপ বসাবার তুলনায় অনেক খাটুনীর এবং এতে অনেক টাকাও লাগে। অনেক সময় তেল তোলবার জন্যে এই কাজেই 25-30 হাজার ফুট গভীর নলকূপ বসাবার দরকার হয়ে পড়ে আর তাতে 30-35 লক্ষ টাকা খরচও হয়ে যায়।

সে জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন এমন কোনও উপায় বের করতে—যাতে খুব সহজেই তেল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রকওয়েল কর্পোরেশনের রকেটডাইন ডিভিশনের (ক্যানোগা পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া) বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানকার বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ-জীবন এবং খনিজ পদার্থের আকরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেছিলেন।

তাঁদের গবেষণার ফল থেকে তাঁরা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর ফলে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

এখানকার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা ডক্টর আর. জে. টমসন একবার এসম্বন্ধে বলেছিলেন যে, খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে; যেমন—পাতার রং হলুদ হয়ে যায়, বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোনও কোন উদ্ভিদের মূল ভূপৃষ্ঠের 70 ফুট নীচু পর্যন্ত খনিজ পদার্থের অবস্থানের সন্ধান দিতে পারে।

তাছাড়াও দেখা গেছে যে, কয়েক রকম বিশেষ ধরণের উদ্ভিদের অবস্থানকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম, দস্তা এবং সোনার আকরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

ডক্টর টমসন এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছিলেন যে, অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং পত্রপুষ্পে বেশ কিছু পরিমাণে ইউরেনিয়াম, দস্তা ও তামা প্রভৃতি ভারী ধাতু থাকে। এই সব উদ্ভিদের কাণ্ড বা পত্রপুষ্প সেখানকার মাটিতে খনিজ পদার্থের অবস্থান সহজেই বের করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি যে ড্রিলিং করে খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় করার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর, একথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তান থেকে।

সেখানকার বিজ্ঞানীরা মধ্য-এশিয়ার একটি স্বর্ণখনি অঞ্চলে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ঐ পরীক্ষা থেকে তাঁরা দেখেছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের গড়ে প্রতি টন সবুজ অংশে দুই গ্রাম পরিমাণ সোনা থাকে। আবার কোনও কোন উদ্ভিদের প্রতি টন সবুজ অংশে এগারো গ্রাম সোনাও পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ সোনাই তাঁরা পেয়েছিলেন উদ্ভিদের পাতা থেকে।

উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে যদি সোনা পাওয়া যায়, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে, সেখানে মাটির নীচে সোনার খনি আছে, কেন না, উদ্ভিদ মাটির তলা থেকে যে খনিজ পদার্থ আহরণ করে এনেছিল, তা তার দেহেই সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে।

শ্রীচুণীলাল রায়

দূরবীনের জন্মকথা

কাচ জিনিষটি যে মানুষ কবে কোথায় প্রথম তৈরি করেছিল, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজ আর মানুষের দপ্তরে নেই। ওটি একটি বহু প্রাচীন আবিষ্কার, যা প্রায় মানুষের সঙ্গলাভ করে এসেছে তার সভ্যতার সুরু থেকে। ইতিহাসে এমন সংবাদ আছে যে, রোমের সম্রাট নিরো তাঁর অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে এক খণ্ড সুবৃহৎ গোল কাচের ভিতর দিয়ে গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলা দেখতেন, কারণ তিনি চোখে একটু কম দেখতেন। এটি ছিল নিশ্চয়ই ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বা আতস কাচ। নিরো ছিলেন যীশু খৃষ্টের সমসাময়িক।

চশমার উদ্ভাবন করেন ভিনিশীয়রা। ভিনিশ ইটালীর একটি শহর, যা ছিল এক সময় কাচের কাজের জন্যে প্রসিদ্ধ, তা প্রায় খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর কথা।

এই চশমার নাম ছিল তখন ভিনিশীয় কল বা Venician device, সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে।

সেটা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—হল্যাণ্ডের মিডলবার্গ সহরে লিপারহেইম নামে এক চশমার কাচ প্রস্তুতকারী ছিলেন। একদিন তাঁর ছেলেরা খেলছিল বাবার তৈরী ফেলে-দেওয়া কিছু চশমার লেন্স নিয়ে। এমন সময়ে একটি ছেলে দুটি লেন্স একটু আগে-পিছে করে চোখের সামনে ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে—তাদের কারখানা থেকে বেশ কিছুটা দূরের গির্জার চূড়ায় ওয়েদার-কক্‌টি যে কেবল উল্টোই দেখা যাচ্ছে তা নয়, সেটিকে বেশ বড়, পরিষ্কার এবং অনেক কাছেও দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছেলেরা তাদের বাবাকে এই ব্যাপারটা ডেকে দেখায়। দেখে তিনি আর একটু এগুলেন, অর্থাৎ একটি লেন্সকে একটি বোর্ডের গায়ে এঁটে আর একটি লেন্সকে আগু-পিছু করে এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবটাই খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় লেন্স দুটিকে তিনি ঠিক ফোকাস করতে সক্ষম হলেন। দূরবীন যন্ত্র উদ্ভাবনের মূলে এই হলো এক কাহিনী।

আর এক কাহিনী—জেম্‌স্‌ মিটিয়াস নামে এক ব্যক্তি, সেও ডাচ দেশীয়—এক দিন লেন্স নাড়াচাড়া করতে করতে একটি অবতল (Concave) ও একটি উত্তল (Convex) লেন্স একটু আগু-পিছু ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন—দূরের বস্তুকে বেশ কাছে এবং পরিষ্কার ও বড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এবার আর উল্টো নয়, সোজাই দেখা যাচ্ছে তাকে। এটি দ্বিতীয় কাহিনী।

আবার এও বলা হয় যে, জেনসন নামে এক ডাচ দেশীয় চশমার কাচ নির্মাণ-কারী দুটি লেন্সকে একটি চোঙের এমুখে আর ওমুখে লাগিয়ে দেখতে গিয়ে অমনি দূরের বস্তুকে কাছে, বড় এবং পরিষ্কার দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর এই যন্ত্র নিয়ে দেখান অরেঞ্জের রাজা মরিসকে। মরিস তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ফ্রান্সের সঙ্গে। তিনি নিজে ছিলেন একজন দক্ষ যোদ্ধা। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যুদ্ধে এই যন্ত্রের উপযোগিতা। তাই তিনি জেনসনকে ফরমাস করেন তাঁকে একটি বড় আর ভাল করে এই যন্ত্র তৈরি করে দিতে আর কথাটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে।

কিন্তু এমন একটি ব্যাপার কি কখনো গোপন থাকে! কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক লোকই এই যন্ত্র তৈরি করে লোকের কাছে বেচতে লাগলো। তার ভিতরে পূর্বো-ল্লিখিত লিপারহেইমও একজন।

এই আবিষ্কারের সংবাদ লোকমুখে ফিরতে ফিরতে হাজির হলো ভিনিস নগরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিওর কাছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"মাস দশেক আগে আমার কাছে এমন এক সংবাদ পৌঁছায় যে, কে এক ডাচ ভদ্রলোক দূরের জিনিষ কাছে দেখবার একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। কেউ কেউ কথাটা

বিশ্বাস করেন, কেউ কেউ করেন না। কাজেই আমিও তখন খুব একটা দাম দিই নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে ফ্রান্স থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠিতে এই ব্যাপার সত্য বলে জানতে পারলাম। তখন আমি এই যন্ত্রটি কিভাবে তৈরি করতে হয়, তার খবর সংগ্রহ করতে থাকি নিজে একটি তৈরি করবো বলে। কিছুদিন বাদে আমি একটি সীসোর নলের ছদিকে ছটি লেন্স (অবতল ও উত্তল) সংযোগ করে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হই। এই যন্ত্র চোখে লাগিয়ে আমি সত্যই দূরের বস্তু কাছে এবং বড় আর পরিষ্কার দেখতে পাই। আমার প্রথম যন্ত্রে বস্তুকে তিন গুণ কাছে এবং নয় গুণ বড় দেখতে পেয়েছিলাম। তার পরেই আমি তেমনি আর একটা যন্ত্র তৈরি করি, যাতে দৃশ্য বস্তু ষাট গুণ বড় দেখায়। তারপর আরও একটি যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হই, যাতে বস্তুটিকে হাজার গুণ বড় দেখায় আর দেখা যায় প্রায় ত্রিশ গুণ কাছে।

আমার এই যন্ত্র তৈরির সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়লো, দেশের রাজা সিগ্নর আমাকে এই যন্ত্রটি দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। আমি তা রাজাকে দেখাই। বহু লোক, বহু বৃদ্ধ ব্যক্তিও এই জিনিষে চোখ লাগিয়ে দেখবার জন্যে চার্চের ছাদে ওঠেন। তাঁদের আমি সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখাই, যেটা খালি চোখে দেখতে আরও দু-ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। আমার যন্ত্রের ক্ষমতা ছিল কোন বস্তুকে ত্রিশ গুণ কাছে দেখাবার।”

গ্যালিলিও ভিনিসের সেনেটকে এই একটি যন্ত্র উপহার দেন এবং তা তৈরি করবার পদ্ধতিও লিখে দেন সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারের পর গ্যালিলিওর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তিন গুণ।

তারপর লোক এই মজা দেখবার জন্যে—(মানুষের কাছে তা একটা মজা বলেই মনে হয়েছিল তখন) প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসতে লাগলো গ্যালিলিওর কাছে। এখন এই যন্ত্রকে তিনি লাগালেন আকাশ দেখবার কাজে, যেখানে ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ আর যা ছিল তাঁর প্রথম কাজ। প্রথমেই তাকালেন চাঁদের দিকে। এই প্রথম মানুষ টের পেল চাঁদে আছে পাহাড়-পর্বত-প্রান্তর। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আকাশে অনেক নতুন তারা দেখতে সক্ষম হন। বৃহস্পতির চাঁদগুলিকেও চারদিকে তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চাঁদগুলিকে বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরতে দেখেই তিনি স্থির করেন যে, পৃথিবীর চাঁদও পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তারপর তিনি গ্রহগুলির ঘোরা-ফেরা দেখে স্থির করেন যে, পৃথিবীও একটি গ্রহ এবং এই সবগুলি গ্রহই ঘোরে সূর্যের চারদিকে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল ঐ ডাচ দেশীয় লোকদের দ্বারাই। গ্যালিলিও তাকে প্রথম উন্নততর করে লাগান আকাশ দেখবার কাজে। তাই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া হয়। তিনি এই যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং তার প্রধান কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু এর আবিষ্কারকের মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য নয়, ডাচ দেশের চশমার কাচ প্রস্তুতকারীদের সেই মর্যাদা প্রাপ্য।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

পাই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে পাই (π) বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। অঙ্ক কষতে গেলে অনেক জায়গায়ই π-এর প্রয়োজন হয়। আগে π-এর সংজ্ঞাটা বলে দিই। π আর কিছুই নয়—কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে পাই-এর দ্বারা সূচিত করা হয়। অঙ্কের বিভিন্ন বিষয়কে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পাই-এর গুরুত্ব কতখানি।

পাই এমনই একটা সংখ্যা, যার মান 3·1415926……। আশ্চর্যের বিষয়, দশমিকের পর ছয়টা সংখ্যা বসিয়েও π-এর মান সম্পূর্ণ হয় না, কারণ পাই একটা অমেয় (Incommensurable) রাশি। বহু দিন ধরে পাই-এর সঠিক মান সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছিল গণিতজ্ঞ মহলে। 1761 সালে Lambert-ই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন π-এর উপরিউক্ত মান। এর কিছুদিন পরে 1803 সালে Legendre দেখালেন—পাই-এর বর্গ অর্থাৎ π^2-ও একটা অমেয় রাশি। চেষ্টার অন্ত নেই বিজ্ঞানী মহলেও। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এর পর 1882 সালে Lindemann প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই কখনও মূলদ সংখ্যার (Rational number) বীজ (Root) হতে পারে না।

এই পাই-এর আবিষ্কারক হলেন উইলিয়াম জোন্স। তিনিই প্রথম এই গ্রীক বর্ণ (Letter) পাই-এর প্রয়োগ করেন অঙ্কশাস্ত্রে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বও চলেছিল কম নয়। Bernoulli আবার π এর পরিবর্তে c ব্যবহার করেন। এরপর Euler কিন্তু p এবং c এই দুটিরই প্রয়োগ করলেন। Goldback আবার উইলিয়াম জোন্সের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের π ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে π-এরই জয় হলো। Euler-এর 'Book On Analysis' বইতে π-এর ব্যবহার হয়। তারপর থেকে আমরা π ব্যবহার করে আসছি।

π-এর উৎপত্তি কি করে হয় আর কি করেই বা π-এর মান ঠিক করা হয়েছিল, এই বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। যে ... শতাব্দী পর্যন্ত যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে জ্যামিতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ... একটা বৃত্তের ভিতরে এবং বাইরে একটা সুষম বহুভুজ (Regular polygon) এঁকে তার সীমা বের করা হয়। এই সীমা বের করবার সময় ধরে নেওয়া হয় যে, বৃত্তের পরিধি বৃত্তের ভিতরের ও বাইরের বহুভুজের সীমার মধ্যবর্তী। তবে এই পদ্ধতি একেবারে যথার্থ নয়। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস এক বিরাট মহাকাব্যের মতই। বিভিন্ন সময়ে পাই-এর বিভিন্ন মান ব্যবহৃত হয়েছে। মিশরের লোকেরা পাই-এর মান বের করেছিল

$\frac{256}{81}$ = 3·1605। ব্যাবিলনীয়েরা আবার পাই-এর মান 3 ধরে হিসাব করতো। বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ইউক্লিডের নাম সবার কাছেই পরিচিত। ইউক্লিড প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই-এর মান $\frac{22}{7}$-এর কম, কিন্তু $\frac{223}{71}$-এর বেশী অর্থাৎ 3·1408 এবং 3·1428-এর মধ্যেই পাই-এর মান বর্তমান। তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। 96 বাহুবিশিষ্ট একটা বহুভুজের (Polygon) সাহায্যে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করেন। ত্রিকোণমিতিতে আমরা দেখেছি $\tan\theta > \theta > \sin\theta$ যেখানে $\theta = \frac{\pi}{96}$। ইউক্লিডের পরে এলেন আর্কিমিডিস। পাই-এর মান বের করতে গিয়ে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেন তিনি। কারণ আর্কিমিডিস যে সময়ের লোক, আজকালকার মত তখন স্লাইড রুল বা লগ্ টেবিলের আবিষ্কার হয় নি। তখন বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কষে কষে বের করতে হতো। আর্কিমিডিসের চেষ্টা চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। এরপর এলেন টলেমি। তাঁর মতে, পাই-এর মান $3^{\circ}8'30''$ (অর্থাৎ $3 + \frac{8}{60} + \frac{30}{3600}$ = 3·1416)। তখনকার ইঞ্জিনিয়ারেরা নিজেদের কাজের সুবিধার জন্যে পাই-এর মান 3·78 ধরে নিয়ে হিসাব করতেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষেও অঙ্কশাস্ত্রের উপর নানারকম গবেষণা চলছিল। বৌধায়ন, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্দের নাম তখন বিভিন্ন দেশের লোকমুখে উচ্চারিত হতো। শুনে অবাক হতে হয়, তখনকার দিনে রোম, গ্রীস, ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গণিতবিদ্দের পাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল। বৌধায়ন বললেন, পাই-এর মান $\frac{49}{16}$ আর আর্যভট্টের মতে 3·1416। আর্যভট্ট 384 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ নিয়ে তাঁর মতের সত্যাসত্য প্রমাণ করেন। তিনি একটা ফরমুলা বের করলেন। সেটি হলো $b^2 = 2 - (4 - a^2)^{\frac{1}{2}}$, যেখানে a = বৃত্তস্থ সুষম বহুভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, n = বহুভুজের বাহুসংখ্যা, b = 2n বাহুবিশিষ্ট ঐ একই বৃত্তস্থ বহুভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য। আর্যভট্ট তাঁর গণিতপাদ বইতে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে পাই-এর মান বিবৃত করেছেন। আবার Alkarishma তাঁর বীজগণিতের বইতে আর্যভট্ট প্রদত্ত পাই-এর মান অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে $\frac{62832}{20000}$ অনুপাতের সাহায্যেও পাই-এর মান বের করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত আবার বললেন $\pi = \sqrt{10}$। তিনি পাই-এর মান অবশ্য জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বের করেছেন। তাঁর মতে, কখনও কখনও $\frac{62832}{20000}$-এর অনুপাত থেকে পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। আরব দেশের গণিতজ্ঞেরা $\frac{22}{7}$, $\sqrt{10}$, $\frac{62832}{20000}$ থেকে পাই-এর মান নির্ণয় করেন। শুধু আরব কেন, পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে চীনাদের অবদানও অসামান্য। পঞ্চম শতাব্দীতে Tsu. Chungh Chih প্রমাণ করেন যে, পাই-এর মান 3·1415926 এবং 3·1415927-এর মধ্যে থাকবে। তখনকার দিনে তাঁর সময়ে ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত এটাই ছিল বিশুদ্ধ মান। তিনি $\frac{355}{113}$ অনুপাত থেকে পাই-এর ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত

মান বের করেছেন। এটা নেহাৎই একটা হঠাৎ আবিষ্কার। পরে অবশ্য এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাই-এর মান [illegible] এবং [illegible]-এর মধ্যে। এর পর ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাই-এর মান বের করবার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর এই চীনা গণিতজ্ঞের মত আর কেউ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক মান বের করতে পারেন নি। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ভিয়েটা 1579 সালে নয় দশমিক স্থান পর্যন্ত পাই-এর মান বের করেন। তিনি 6×2^{16} বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ এঁকে পাই-এর মান বের করেছিলেন। তখন থেকে গণিতজ্ঞ মহলে সাড়া পড়ে যায় পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত মান বের করবার জন্যে। Romanus আবার 2^{30} বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ এঁকে পনেরো দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করেন। এর পর L. Van Ceulen বের করেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত। পাই-এর মান বের করবার পর তিনি এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নিজের কটোর চারদিকে একটা বৃত্ত এঁকে পাই-এর মান লিখে রেখেছিলেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভেও পাই-এর মানটা খোদাই করে লিখে দিয়েছিল দেশবাসী। L Van Ceulen-এর পর Greinberger বের করলেন 39 দশমিক পর্যন্ত মান। তিনিই শেষ গণিতবিদ্, যিনি পাই-এর মান বের করবার জন্যে জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। 1656 সালের পর থেকে পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে বিশেষ সহায়ক হয় Convergent Series। ত্রিকোণমিতিতে আমরা দেখেছি,

$\theta = \tan\theta - \frac{\tan^3\theta}{3} + \frac{\tan^5\theta}{5} \cdots\cdots$ যেখানে θ-র মান $-\frac{\pi}{4}$ এবং $+\frac{\pi}{4}$-এর মধ্যে। এই Series এর সাহায্যে একাত্তর দশমিক পর্যন্ত পাই-এর যথার্থ মান বের করা যেতে পারে। কিছুদিন যেতে না যেতেই Machin আবার এক নতুন Series-এর সাহায্যে পাই-এর একশততম পর্যন্ত মান বের করেন। Machin-এর পর De Lagny বের করেন 127-তম পর্যন্ত মান। এরপর গণিতজ্ঞদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায় 127-এরও বেশী দশমিক স্থান পর্যন্ত মান বের করবার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয়, 527 দশমিক পর্যন্ত 1853-টি মান নির্ণীত হয়েছে তখনকার দিনে। আজকাল অবশ্য কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর 527 কেন, আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। চেষ্টার বিরাম নেই, আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণিতজ্ঞেরা পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত সঠিক মান বের করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হলে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশে বেশ কিছু সুবিধা হবে বলে আশা করা যায়।

হিল্লোল রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কি কি পদার্থ থাকে ?

গোপা বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি
সুমিত্রা চক্রবর্তী
কলিকাতা—57

প্রশ্ন :—2. ছোটদের দাঁতকে 'দুধেদাঁত' বলা হয় কেন ?

দেবাশীষ পাত্র
ও
সঞ্জয় মহলানবীশ
শিকারপুর

উত্তর :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কয়েকটি কুমারিনজাতীয় যৌগিক পদার্থ থাকে। এদের মধ্যে মারমেলোসিন, অ্যালেলিফেরন, মারমিন, অ্যালোইমেপরোটিন ইত্যাদিরই প্রাধান্য। দেখা যায় যে, কিছু যৌগিক পদার্থ কাঁচা অবস্থায় থাকে, পাকা অবস্থায় সেগুলি অন্য যৌগে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উত্তর :—2. জন্মাবার কিছুকাল পর থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্রমান্বয়ে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে। এই সময় প্রত্যেক পাটিতে অল্পসংখ্যক দাঁত বের হয়, এদেরই বলা হয় দুধেদাঁত। কালক্রমে এই দাঁতগুলি ভেঙে যায় এবং এদের জায়গায় স্থায়ী দাঁত ওঠে। মানুষের বেলায় প্রায় ছয় মাস বয়সের পর থেকেই এই দুধেদাঁত গজায় আর সাত-আট বছর বয়স থেকে সেগুলি পড়তে আরম্ভ করে। দুধেদাঁত বলবার পিছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। বয়সের প্রথম দিকের দাঁতগুলি অস্থায়ী হয় বলেই এদের দুধে দাঁত বলা হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 19শে জুন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের কৃষি-সমস্যা'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নতুন কৃতিত্ব

গত 2রা জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীদের একটি সেমিনারে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা (জন্মসূত্রে ভারতীয়, নাগরিকত্বে মার্কিন) কৃত্রিম উপায়ে জিন সংশ্লেষণের কথা ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণরূপে জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে তাঁরা এই জিন সৃষ্টি করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এই জিন হচ্ছে ঈস্ট-কোষের অন্তর্গত জিনের প্রতিরূপ। ডক্টর খোরানার গবেষক দলের মধ্যে আছেন শ্রীঅশোককুমার ও শ্রীনব গুপ্ত নামে দু-জন তরুণ ভারতীয় গবেষক।

যে চারটি নিউক্লিয়োটাইড হচ্ছে জিনের মূলভিত্তি, সেই চারটি নিউক্লিয়োটাইড নিয়েই ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহযোগীরা সংশ্লেষণ সুরু করেন। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে এই নিউক্লিয়োটাইড সংশ্লেষণ করা যায়। তাঁরা প্রথমে এক প্যাঁচের একাধিক অংশে নিউক্লিয়োটাইডগুলিকে যথাযথ পরম্পরায় জুড়ে দেন এবং তারপর এই অংশগুলিকে জুড়ে 77টি নিউক্লিয়োটাইডসমন্বিত একটি সম্পূর্ণ ডবল প্যাঁচের জিন সংশ্লেষণ করেন।

জিন হচ্ছে বংশগতির মূলাধার এবং তারাই জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা

কাজেই কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জিন সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই গবেষণা বংশগত ব্যাধি নিরাময়ে, উন্নত ধরণের মানুষ ও প্রাণী সৃষ্টিতে এবং শেষ

পর্যন্ত হয়তো কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

এই গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর খোরানা বলেছেন—বহুমূত্র ও কয়েকটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির টিস্যুতে স্বাভাবিক জিন সরবরাহ করে একদিন হয়তো এই সব ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভবপর হতে পারে। একই উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত করা যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ (যেমন খেলোয়াড় বা মনীষী) সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

উইস্কনসিন গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এই জিন সৃষ্টি ভাইরাসজনিত ব্যাধি ও ক্যান্সার প্রতিরোধের নতুন পথ খুলে দিতে পারে, বার্ধক্য প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার জীবকোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের রহস্য উন্মোচিত করতে পারে। জিনের স্তরে বংশগত বৈকল্য সংশোধন করে জিনজনিত ব্যাধি নিরাময়ের কোন উপায় বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জানা নেই। এই নতুন গবেষণার দ্বারা শেষ পর্যন্ত গবেষণাগারে ইচ্ছা-নুযায়ী জিন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু গবেষণাগারে ইচ্ছানুযায়ী জিন সৃষ্টি এবং রোগ নিরাময়ে তার ব্যবহার অচিরে সম্ভব হবে না, দূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে।

তবে কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথে এখনও বহু স্তর অতিক্রম করতে হবে। জিন সম্বন্ধে বর্তমানে যতটা জানা গেছে, তার চেয়ে জানবার বাকী অনেক বেশী। ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহকর্মীরা 77টি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে ঈষ্ট-কোষের একটি অ্যালানাইন ট্র্যান্সফার আর. এন. এ. জিন সংশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মানুষের একটি মাত্র কোষের নিউক্লিয়াস এই ধরণের 6 শত কোটি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে গঠিত হয়। এথেকেই উপলব্ধি করা যায়, গবেষণাগারে মানুষের জিন সৃষ্টির আগে কত বিরাট জটিল পথ অতিক্রম করতে হবে।

জীবনের প্রথম সরল রূপ, যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে, তা হবে সম্ভবতঃ ভাইরাস। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট এই নতুন ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বর্তমান ভেষজগুলি কার্যকর হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির 12-6-70 তারিখের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবা-নুসারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' বর্তমান মাস হইতে বাংলা সংখ্যার পরিবর্তে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে। লেখক-লেখিকাগণকে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। —স

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — অগাষ্ট, 1970 — অষ্টম সংখ্যা

খাদ্যসমস্যার ভয়াবহ রূপ

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়*

আমরা অনেক দিন থেকেই জানি—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও এই দেশের শতকরা 70 ভাগ লোক চাষের কাজ করেন এবং দেশের উৎপাদন থেকে যে আয় হয়, তার প্রায় শতকরা 70 ভাগই চাষের জমি থেকে আসে। এর কিছু অংশ আসে পাট, চা, তুলা ও লাক্ষা থেকে। এই বিষয়ে ভুল নেই যে, কৃষিপণ্যই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ অথচ সেই প্রধান সম্পদেরই আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। দেশে আজ চালের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। আমেরিকার গম না পেলে দেশে দুর্ভিক্ষ রোধ করবার কোন উপায়ই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেন এই সঙ্কট?

বর্তমানের এই খাদ্যসমস্যা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। খাদ্যসমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। 1600 খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল 50 কোটি—বর্তমানে প্রায় 350 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। যে হারে লোকসংখ্যা এখনও বাড়ছে, তাথেকে অনুমান হয় 2000 খৃষ্টাব্দে বিশ্বের লোকসংখ্যা 600 কোটিতে দাঁড়াবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এভাবে চলতে থাকলে এর পরে যা ঘটতে পারে, তা চিন্তা করাও ভয়াবহ। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, যে পরিমাণ

---

*ফুড টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে. সেই পরিমিত লোকসংখ্যাই পৃথিবীতে থাকতে পারবে। যদি খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট না বাড়ে, তবে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই সীমিত হবে। কিন্তু কেমন করে তা ঘটবে, আমরা এখনও জানি না। হয়তো বা তা ঘটবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধ বা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীর উন্নত দেশ-গুলিতে খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 1নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর কিছু অংশে মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম অংশে অবস্থার কোন পরি-বর্তন ঘটে নি।

1নং তালিকা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, অনুন্নত দেশগুলিতে গত কয়েক বছরে মোট খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদনের কোন তারতম্য হয় নি। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেখানে অনেক বেশী। এই কারণে এই সকল দেশগুলির খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 2নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে—বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলি কেবলমাত্র শস্যজাতীয় খাদ্যের উপর কতটা নির্ভর করে আছে।

এদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে সবসমেত 3·29 কোটি একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র শতকরা 11 ভাগ চাষের উপযোগী, 19 ভাগ তৃণভূমি এবং শতকরা 70 ভাগ জমি চাষের অনুপযোগী এবং লোকসংখ্যা যত বাড়ছে, বসতির জন্যে ততই জমির প্রয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া বিমান বন্দর, রাস্তা, কলকারখানা প্রভৃতি চাষের জমি দখল করছে। 3নং তালিকায় রয়েছে 1934 সাল থেকে 1961 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু চাষের জমি কিভাবে কমেছে, তার হিসাব।

ভারতবর্ষে শতকরা 49 ভাগ জমিই চাষের উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে এখানে চাষের উপযোগী আরও জমি পাবার সম্ভাবনা কম। হয়তো বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় একদিন মরুঅঞ্চলে চাষ করা সম্ভব হবে, হয়তো সাইবেরিয়ার শীতল অঞ্চলেও চাষের সম্ভাবনা দেখা দেবে। বিজ্ঞান যদি অল্প খরচে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করতে পারে, সমুদ্রের জল যদি অল্প খরচে লবণমুক্ত করা সম্ভব হয়, তখন পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যাবে।

আমরা আরও জানি—সমুদ্রের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে। পৃথিবীর উপরি-ভাগের শতকরা 70 অংশ জল, মাত্র 30 অংশ স্থল। এই বিশাল জলভাগ অনুর্বর নয়। এখানে অসংখ্য গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে। ছোট ছোট উদ্ভিদ, ফাইটোপ্লাঙ্কটনে (Phytoplankton) ভরা এই সমুদ্র। জমির সমস্ত গাছপালা আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রণালীর সাহায্যে বাতাসের প্রায় 30 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে অক্সিজেন (O_2) তৈরি করে। বাতাসের বাকী 70 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্রহণ করে আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে এসব ফাইটোপ্লাঙ্ক-টন। এই জাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। যদি ধরা যায়—আমাদের দৈনিক মাথাপিছু 30 গ্রাম প্রাণীজ প্রোটিন প্রয়োজন, তবে সমুদ্রে যে পরিমাণ মাছ আছে, তাথেকে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার দশগুণ বেশী লোকের প্রোটিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অথচ বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার যা ক্যালোরি প্রয়োজন, তার মাত্র শতকরা এক ভাগ আসে সমুদ্র থেকে। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়—ভবিষ্যৎ মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্তে

1নং তালিকা

বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ (কমিউনিষ্ট দেশগুলি ছাড়া)* । (1957-59 সালের খাদ্য উৎপাদনের মান 100 ধরা হয়েছে)

	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদন	96	96	102	103	106	108	111	114	118	118	124	128
উন্নত দেশগুলির উৎপাদন	95	96	102	102	106	107	110	112	116	117	126	128
উন্নতিকামী দেশগুলির উৎপাদন	96	96	101	103	108	110	112	118	121	120	120	130
বিশ্বের মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন	100	98	102	101	102	102	103	103	105	103	106	107
উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু উৎপাদন	98	97	102	101	103	103	105	105	103	107	114	115
উন্নতিকামী দেশগুলির মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন	101	98	101	101	103	102	101	104	104	101	98	104
(1) ভারতবর্ষ	101	96	102	103	106	108	100	104	105	92	88	103
(2) পাকিস্থান	104	99	95	106	108	106	101	111	108	108	100	108
(3) এশিয়ার অন্যান্য দেশ	99	97	102	100	99	101	102	104	104	102	105	105
(4) আফ্রিকা	101	100	100	100	102	97	103	103	102	99	96	98
(5) দক্ষিণ আমেরিকা	101	100	101	99	99	100	101	103	103	107	102	105

(উন্নত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে—আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড)

(*Economic Research Service, World Food Situation—Prospects of World Grain Production, Consumption and Trade, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1967.)

2নং তালিকা

1959-61 সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু ক্যালোরির পরিমাণ ও সেই ক্যালোরি কত শতাংশ বিভিন্ন খাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে—তার হিসাব *

ক্যালোরি শতাংশ

	মোট ক্যালোরি	গম	চাল	ভুট্টা	অন্যান্য শস্য	মূলজাতীয় খাদ্য	ডাল ও বাদাম জাতীয় দ্রব্য	চিনি	ফল ও শজী	তেল ও ঘি	মাংস, মাছ ও ডিম	দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য
আমেরিকা	3190	17·4	0·9	2·0	0·5	3·1	3·3	15·7	6·2	20·5	16·9	13·5
ক্যানাডা	3100	18·8	0·6	1·0	0·9	4·5	1·9	16·3	4·8	15·1	22·0	14·1
অষ্ট্রেলিয়া	3260	25·2	0·6	0·3	1·0	2·7	1·3	13·4	4·7	14·3	24·8	11·7
উত্তর ইউরোপ	3060	23·4	0·6	0.4	3·6	6·9	1·7	13·4	4·5	17·8	16·4	11·3
মধ্য ইউরোপ	3200	33·2	1·7	1·2	1·1	6·0	1·0	12·4	3·3	12·5	21·0	6·6
দক্ষিণ ইউরোপ	2720	40·1	2·4	2·5	1·3	6·0	4·4	7·6	7·4	15·6	6·9	5·8
পূর্ব ইউরোপ	3000	32·1	1·0	5·7	10·4	7·8	1·3	8·5	2·9	11·4	11·9	6·6
মধ্য আমেরিকা	2240	8·8	9·4	19.2	3·8	12·6	5·9	15·0	4·2	8·6	7·4	5·0
মেক্সিকো	2580	11·1	1·6	42·0	0·2	1·8	8·0	13·0	2·8	8·1	6·1	5·3
দক্ষিণ আমেরিকা	2260	16·9	5·9	13·8	2.2	15·5	3·9	15·9	3·9	7·5	9·0	5·5
ব্রাজিল	2710	8·6	14·5	11·0	0·2	20·9	8·9	15·4	2·3	5·9	8·4	3·9
দক্ষিণ আফ্রিকা	2670	14·0	1·1	39·1	2·5	1·1	1·7	14·0	2·4	5·3	12·4	6·4
পশ্চিম এশিয়া	2350	48·0	4·2	4·2	4·6	1·6	4·1	9·4	7·6	8·1	4·0	4·2
রাশিয়া	3040	35·7	0·8	0·4	16·5	9·9	1·4	9·8	1·9	8·9	8·1	6·6
উত্তর আফ্রিকা	2210	26·4	3·1	7·6	28·6	1·3	5·7	6·1	6·1	6·0	4·3	4·8
ভারতবর্ষ	2050	11·3	33·1	4·0	15·0	2·6	13·2	8·2	2·0	4·2	0·9	5·5
জাপান	2360	11·7	46·9	—	4·6	7·7	5·9	6·7	4·2	5·0	5·0	1·4
পূর্ব এশিয়া	2150	1·8	50·1	7·1	0·6	12·7	6·6	5·2	5·4	5·7	4·1	0·7
দক্ষিণ এশিয়া	2120	19·4	47·1	1·9	3·0	1·0	5·9	6·7	3·6	4·0	3·0	4·4
পশ্চিম ও মধ্যে আফ্রিকা	2460	1·2	5·7	10·0	17·2	45·3	6·5	1·5	1·0	9·0	2·0	0·6
পূর্ব আফ্রিকা	2390	2·3	8·4	34·1	21·8	12·4	6·5	4·3	0·8	3·4	3·6	2·4
কমিউনিষ্ট এশিয়া	1790	12·2	44·3	—	18·1	11·1	5·9	1·2	1·7	3·1	2·3	0·1

*(Economic Research Service, The World Food Budget 1970, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., October 1964)

3নং তালিকা

মাথাপিছু চাষের জমি (একর হিসাবে), 1934 থেকে 1961 সাল পর্যন্ত*

	1934-38	1948-52	1957/58	1960-61	1934 থেকে কত কম
উত্তর আমেরিকা	1·73	1·53	1·24	1·19	31 শতাংশ
দক্ষিণ আমেরিকা	0·55	0·42	0·45	0·43	22 „
পশ্চিম ইউরোপ	0·39	0·35	0·34	0·33	15 „
পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া	1·24	1·10	1·14	1·08	13 „
আফ্রিকা	0·59	0·56	0·52	0·53	10 „
এশিয়া	0·45	0·45	0·41	0·42	7 „
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	1·45	1·15	1·13	1·31	10 „
বিশ্বের মোট হিসাব	0·66	0·60	0·56	0·55	15 „

(*Brown, L. R., Man, Land and Food : Foreign Agricultural Report No. 11., U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1963.)

এসেছে। চন্দ্র-অভিযানও সফল হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অল্প খরচে সিন্থেটিক খাদ্য তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এখনও আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্যে মূলতঃ চাষের জমির উপর নির্ভর করে আছি।

মাথাপিছু জমি যতই কমছে, নিবিড় চাষের দ্বারা বিঘাপ্রতি ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজন ততই বাড়ছে। অধিক ফলনশীল বীজ কৃষিপণ্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে হয়তো আরও বাড়বে। কিন্তু কতদিনে সেই সুফল পাওয়া যাবে, তা জানা নেই। একই জমিতে একাধিক ফলন, সার, সেচের জল, পোকা-মাকড় মারবার ঔষধ, ট্র্যাক্টর ও চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ফলন বাড়ানো সম্ভব। তাই-ওয়ানের প্রায় সমস্ত জমিতেই বছরে দু-বার ফসল হয়। জাপানে শতকরা প্রায় 60 ভাগ জমিতে দু-বার ফসল ফলানো হয়। ভারতে মাত্র শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ জমিতে বছরে দু-বার চাষ হয়। তাই ভারতে বাকী জমিতে দু-বার চাষ করে খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। রাসায়নিক সার প্রচলনের পর থেকে তার ব্যবহারও বেড়ে গেছে। ফলনও বাড়ছে ঠিকই।

কিন্তু যেখানে জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ রয়েছে—সেখানে ফলন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচও বেড়ে যায়। সার, জল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্যে মূলধনের প্রয়োজন। সেই মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে—তাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের খরচ বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে চাল উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ে, জাপানে তার তিন গুণ খরচ পড়ে। 4নং তালিকায় দেখা যাবে 1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাল ও গমের উৎপাদন মূল্যের হিসাব।

4নং তালিকা

1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে চাল ও গমের উৎপাদন মূল্য ও মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ*

	কিলোগ্র্যাম প্রতি গমের মূল্য		মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ	
অষ্ট্রেলিয়া	6·2	আমেরিকান সেণ্ট	6·6	একর
ক্যানাডা	5·4	,,	5·8	,,
পশ্চিম জার্মেনী	10·1	,,	0·4	,,
ভারতবর্ষ	9·0	,,	0·9	,,
জাপান	10·2	,,	0·2	,,
পাকিস্তান	7·2	,,	0·7	,,
মিশর	7·7	,,	0·3	,,
ইংল্যাণ্ড	7·5	,,	0·3	,,
আমেরিকা	6·4	,,	2·6	,,
	ধানের মূল্য			
থাইল্যাণ্ড	4·5	,,	1·1	,,
ভারতবর্ষ	5·2	,,	0·9	,,
জাপান	17·7	,,	0·2	,,
সিংহল	12·1	,,	0·4	,,

* (Brown, L. R. etc.)

জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত কম যে, বিঘাপ্রতি ফসল বাড়ানো ভিন্ন খাদ্যসমস্যা সমাধানের অন্য সহজ পথ নেই।

1964 সালে শিকাগো শহরে আমেরিকান রাসায়নিক সংস্থার সভায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Dr. Raymond Ewell বলেছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ 1970 সাল থেকে 1980 সালের মধ্যে সারা এশিয়ার উপর ছড়িয়ে পড়বে এবং 1980 সালের পর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই বিপদ দেখা দেবে। তিনি বলেছিলেন—পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজ উপায় নেই। কিন্তু যতদিন না পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত লোক উপলব্ধি করবেন ও তার সুফল পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে—রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বর্তমানে বছরে যত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে, তার দশ গুণ সারের প্রয়োজন হবে 1980 সালে। এর ফলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। 1964 সালে মাথাপিছু শস্য-উৎপাদন যা হচ্ছিলো, 1980 সালেও তাই হবে। তার কারণ, ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। 1980 সালের অবস্থায় পৌঁছুতে হলে ভারতবর্ষে প্রতি বছর একটি করে সিন্ধ্রীর মত সারের কারখানা তৈরি করা প্রয়োজন।

আরও তলিয়ে দেখলে আমাদের খাদ্যসমস্যার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে। জমি থেকে আমাদের খাদ্য দু-ভাবে আসে। প্রথমতঃ, জমিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে যা উৎপন্ন হয়; যেমন—নানাবিধ শস্য, ফলমূল, শাকসব্জি, তৈলবীজ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, জমির ফসল রূপান্তরিত হয়ে পরোক্ষভাবে কিছু খাদ্যের উৎপাদন হয়। শস্য বা অন্যান্য ফসল প্রাণীদের খাইয়ে আমরা অনেক পুষ্টিকর রূপান্তরিত খাদ্য পাই; যেমন—মাংস, ডিম ও দুধ। কিন্তু মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে কিছু অসুবিধা আছে। শস্যজাতীয় খাদ্য রূপান্তরিত করে মাংস, ডিম বা দুধ উৎপাদন করলে তার পরিমাণ অনেক কমে যায়। প্রায় 800 ক্যালোরির সমান শস্যজাতীয় খাদ্য প্রাণীকে খাওয়ালে মাত্র 100 ক্যালোরির সমান খাদ্য মাংস, ডিম বা দুধ হিসাবে পাওয়া যায়। তাই ডিম, দুধ ও মাংস শস্যজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক বেশী দামী।

অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ কি দশ ভাগ খাদ্যের ঘাটতি আছে এবং সেটুকু চাল ও গম উৎপাদন করতে পারলেই এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হবে। এই ধারণায় অনেক ভুল রয়েছে। ভারতবর্ষে চাষের জমি থেকে যে খাদ্য সরাসরি উৎপন্ন হয়, তাথেকে ভারতবাসী মাথাপিছু প্রায় 2500 ক্যালোরি পেতে পারেন। আর আমেরিকায় চাষের জমিতে প্রত্যক্ষভাবে যে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তাথেকে একজন আমেরিকান প্রতিদিন প্রায় 10000 ক্যালোরি পেতে পারেন। অথচ একটি সুস্থ, সবল, বয়স্ক লোকের দৈনিক মাত্র 2500 থেকে 3000 ক্যালোরির প্রয়োজন। আমেরিকার এই বাড়্তি ফসল পশুপালনে সাহায্য করছে। তার ফলে রূপান্তরিত খাদ্য ডিম, দুধ, মাংস যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে উৎপন্ন ভুট্টা ও সয়াবীনের প্রায় শতকরা 80 ভাগই গরু, শূকর ও মুরগীদের খাওয়ানো হয়। যথেষ্ট পরিমাণে জমির ফসল বাড়্তি না হলে দুধ, ডিম বা মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। গত মহাযুদ্ধে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর অসুবিধার জন্যে ইংল্যাণ্ড তাদের দেশে পশুপালনের হার কমিয়ে দিয়েছিল। ফলে যে বাড়্তি জমির ফসল পাওয়া গেল, তা সেই দেশকে সাময়িক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তাই দেখা যাচ্ছে—খাদ্য উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হতে হলে ভারতবর্ষকে খাদ্যের উৎপাদন চতুর্গুণ বাড়াতে হবে।

এথেকে অনুমান করা যায়—ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা সামান্য নয়।

এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—জমিতে যত প্রকারের ফসল হতে পারে, সব কিছুরই উৎপাদন বাড়াবার উপর গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু জমিতে সরাসরি অনেক রকমের উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উৎপাদন হয়, যেমন—শস্য, ফলমূল, শাকসব্জি, আখ, তৈলবীজ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন্ খাদ্য উৎপাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়েও চিন্তা করা দরকার।

প্রথমে দেখা যাক—ভারতবর্ষে এখন কি উৎপন্ন হয়। এখানে বছরে প্রায় 9 কোটি টন শস্য-জাতীয় খাদ্য, 2 কোটি টন তৈলবীজ, 2 কোটি টন শাকসব্জি, পৌনে এক কোটি টন ফল ও 8 কোটি টন আখ উৎপন্ন হয়। শাকসব্জি ও ফলমূলে শস্য ও তৈলবীজের তুলনায় প্রচুর জল থাকে। সেই হিসাবে শুষ্ক অবস্থায় এই সব্জির ওজন হবে আধ কোটিরও কম, আর এই ফলের মোট ওজন হবে মাত্র দশ লক্ষ টন। তাই শস্যজাতীয় খাদ্যের তুলনায় সব্জী ও ফলের উৎপাদন এদেশে অনেক কম।

অথচ যাঁরা ফল বা সব্জি চাষ করেন, তাঁরা জানেন অধিকাংশ ফল বা সব্জির বিঘাপ্রতি ফলন শস্যজাতীয় খাদ্যের ফলনের চেয়ে বেশী। নিম্নের তালিকায় কয়েকটি খাদ্যের তুলনামূলক উৎপাদনের হিসাব দেওয়া রয়েছে।

গম, কলা, পেঁপে ও মিষ্টি আলুর তুলনামূলক উৎপাদন*

	একর প্রতি উৎপাদন	একর প্রতি উৎপাদিত ক্যালোরির পরিমাণ
গম	0·34 টন	1,034,880
কলা	10·00 ,,	15,052,8000
পেঁপে	48·00 ,,	18,923,520
মিষ্টি আলু	3·00 ,,	5,500,000

* (J. Science Club, Dec.-Feb., 1966-67)

শাকসব্জি, ফলমূল ফলাতে পারলে একই জমি থেকে অধিক খাদ্য পাওয়া সম্ভব। তবু বর্তমানে এই দেশে সব্জি ও ফলের উৎপাদন খুবই কম। এখানে শাকসব্জির দামও শস্যজাতীয় খাদ্যের তুলনায় অধিকাংশ সময়েই বেশী থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন কম হবার প্রধান কারণ—এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায়; শস্যজাতীয় খাদ্যের মত সাধারণভাবে ঘরে অনেক দিন রাখা যায় না।

খাদ্য সম্পর্কে অর্থনীতির নিয়ম এই যে—মানুষের পেট যখন ভরে যায়, তখন বাড়্তি খাবার বাজারে সস্তায় পাওয়া গেলেও তার কোন চাহিদা হবে না (Law of inflexible demand)। তাই বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বাড়্তি সব্জি ও ফল শুধু যে নষ্ট হয় তাই নয়—সব্জি ও ফলের ফলন বাড়াতে চাষীরা উৎসাহ পান না। অথচ এই সাময়িক বাড়্তি ফল ও সব্জি সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে বছরের অন্যান্য সময়ে তার সদ্ব্যবহার হতে পারে। সব্জি ও ফল সংরক্ষণের সহজ উপায় যখন অল্প খরচে করা সম্ভব হবে, তখন এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর পরেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়তো হবে না। কারণ লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সে হারে খাদ্য উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়বে। একথা প্রায় 180 বছর আগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেছিলেন।

তাই বিজ্ঞানীরা এমন খাদ্যের কথা ভাবছেন, যা অল্প দিনে খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষুদ্র জীবাণু ও শৈবালজাতীয় গাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই দিক থেকে কিছু সুরাহা হতে পারে। তার কারণ, এরা গাছপালার তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। 457 পৃষ্ঠার তালিকায় গাছপালা ও জীবজন্তুর তুলনামূলক বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

জীব	দ্বিগুণিত হতে কোন্ জীবের কত সময় লাগে (Mass doubling time)
জীবাণু (Bacteria)	20-120 মিনিট
ছত্রাক ও শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ (Mold and Algae)	2-6 ঘণ্টা
ঘাস	1-2 সপ্তাহ
মুরগী	4-6 সপ্তাহ
শূকর	1-2 মাস
মানুষ	6 মাস

দেখা যাচ্ছে—ছত্রাক ও ক্ষুদ্র জীবাণু গাছপালা ও প্রাণীদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। সেই জন্যে Bacteria, Yeast, ছত্রাক বা শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারলে খাদ্য-উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

খাদ্যগুণের কথা চিন্তা করলে এই সব জীবাণু খাদ্য হিসাবে খারাপ নয়। বিশেষতঃ এতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী আছে। স্বাদের দিক থেকেও এদের খাদ্যোপযোগী করে তোলা হয়তো সম্ভব হবে। তাছাড়া এই সব জীবাণুর মধ্যে শর্করা, নানাপ্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও আছে।

এই সব জীবাণু নানা প্রকার বস্তু থেকে আমাদের উপযোগী খাদ্য—শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি সংশ্লেষণ করতে পারে। পেট্রোলিয়ামের অপ্রয়োজনীয় অংশকে (কতকগুলি বিশেষ Hydrocarbons) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে কোন কোন জীবাণু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি সহজ নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে। ঠিক এমনিভাবেই গাছও আমাদের জন্যে খাদ্য তৈরি করে দেয়—বাতাসের কার্বন ডায়োক্সাইড, জল ও বাতাসের নাইট্রোজেন কিংবা জমির নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থকে সংশ্লেষণ করে। তবে জীবাণুর ক্ষেত্রে সুবিধা এই যে, এদের বাড়বার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া এদের শরীরে প্রোটিনের পরিমাণও অনেক বেশী। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রোটিনের অভাব যত বেশী, শর্করাজাতীয় খাদ্যের অভাব তত নয়।

তাই ক্ষুদ্রতম জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবার পরিকল্পনা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যতে মানুষের কাছে আসবে। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। মনে হয় আরও নতুন পথের সন্ধান আমরা পাব।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?...তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

—বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৮৯)

লিউকেমিয়া

সমর চক্রবর্তী*

যে কোন সুস্থ, তথা স্বাভাবিক মানুষের দেহে রক্তকণিকা থাকে তিন ধরণের; যথা—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও প্লেট্‌লেটস্। এই তিন ধরণের কোষ বা কণিকা রক্তরস অর্থাৎ প্লাজ্‌মার মধ্যে উপস্থিত থেকে রক্তের স্বাভাবিক কর্ম পরিচালনায় সাহায্য করে। উৎপত্তি এবং আকৃতি অনুযায়ী শ্বেত কণিকাকে ভাগ করা হয় প্রধানতঃ তিন ভাগে; যথা—লিম্ফোসাইট, মনোসাইট ও গ্র্যানুলোসাইট। এদের প্রথম দুটি অর্থাৎ লিম্ফোসাইট ও মনোসাইটের উৎপত্তি দেহাভ্যন্তরস্থ লসিকা গ্রন্থি বা Lymph node থেকে; অন্যদিকে গ্র্যানুলোসাইট উৎপন্ন হয় দেহের বিভিন্ন অস্থি-র আভ্যন্তরীণ কোষসমূহ অর্থাৎ মেরুমজ্জা থেকে (চিত্র-1)। সাধারণভাবে লোহিত কণিকার কাজ হলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে দেহের বিভিন্ন কোষে বিতরণ করা এবং কোষের বর্জ্য পদার্থ কার্বন ডায়োক্সাইড বহন করে ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দেওয়া। এক কথায় দেহের সমস্ত কোষতন্ত্রকে সক্ষম ও সতেজ রাখবার জন্যে লোহিত কণিকা অপরিহার্য। অন্য দিকে শ্বেত কণিকার প্রধান কাজ হলো, বিভিন্ন বহিঃশত্রুর (ভাইরাস, ব্যাক্‌টিরিয়া ইত্যাদি) আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করা। অন্যান্য কাজের সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং রক্তবাহী নালীগুলিকে সুসংবদ্ধ, তথা সুদৃঢ় করে রাখাই হলো প্লেট্‌লেটের কাজ (চিত্র-1)।

স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে শ্বেত কণিকাসহ বিভিন্ন রক্ত-কোষ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বিভাজিত হয় এবং রক্ত-সংবহনতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় বর্তমান থাকে; যেমন—একটি পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে শ্বেত কণিকার আনুপাতিক সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থায় 5000 থেকে 6000-এর মধ্যে। অন্য দিকে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিভাজনের ফলে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ অথবা আরও বেশী। বলা বাহুল্য, রক্তের মধ্যে এই অতিরিক্ত শ্বেত কণিকা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। এই অসুস্থ শ্বেত কণিকা তার স্বাভাবিক কার্য পরিচালনায় অক্ষম এবং অনেকের মতে এরা বিভিন্ন রক্তকণিকা উৎপাদনকারী কোষগুলিকে (মেরুমজ্জা এবং লসিকা গ্রন্থি) আক্রমণ করে এবং লোহিত কণিকাসহ সমস্ত সুস্থ রক্তকণিকার উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত করে। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী; পুনরুৎপাদন না হবার ফলে রক্ত-সংবহনতন্ত্রে লোহিত কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার ফলে রোগীর দেহে রক্তাল্পতা দেখা দেয়; প্লেট্‌লেটের সংখ্যাল্পতার জন্যে মাড়ী, নাক, ঠোঁট প্রভৃতি অংশ থেকে শুরু হয় অনিয়মিত রক্তক্ষরণ। তাছাড়া উপস্থিত শ্বেত কণিকা তাদের স্বাভাবিক কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ায় দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে যায়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর আশী থেকে নব্বই ভাগ লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর কারণই হলো অনিয়মিত রক্তক্ষরণ ও রোগ প্রতিরোধে অক্ষমতা।
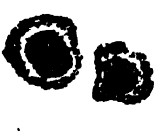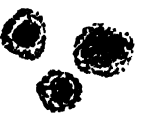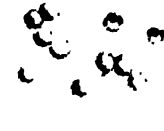
কোন্ ধরণের কোষ বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ কোন্ কোষগুলি বৃদ্ধি এবং বিভাজনে স্বাভাবিকতার মাত্রা লঙ্ঘন করেছে,

---

*কোষ-বিজ্ঞান গবেষণাগার, প্রাণিবিদ্যাবিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, লিউকেমিয়া সাধারণতঃ দুই ধরণের—লিম্ফোসাইটিক ও গ্র্যানুলোসাইটিক (চিত্র-2,3)। এর প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়াতে লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন লিম্ফোসাইট কোষসমূহের বৃদ্ধি এবং বিভাজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে অস্বাভাবিকতা। রোগের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত দুই ধরণের লিউকেমিয়াকে আবার ভাগ করা হয় প্রধানতঃ দুই ভাগে ; যথা—সঙ্কটাপন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী।

আশ্চর্যের বিষয়, এই লিউকেমিয়া—এত যার তীব্রতা, এত যার ব্যাপকতা—তার উৎপত্তির কারণ

উৎপত্তিস্থল	মাতৃকোষ	রক্তকণিকা	মুখ্যকার্য
লসিকা গ্রন্থি	অপরিণত-লিম্ফোসাইট	পরিণত-লিম্ফোসাইট	অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সাহায্য করা। • সংক্রামণতায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করা
	অপরিণত-লোহিতকণিকা	পরিণত-লোহিতকণিকা	বিভিন্ন কোষগুলিতে O_2 বিতরণ এবং কোষের বর্জ্য পদার্থ CO_2 অপসারণ। • সংক্রামণতায় রক্তশূন্যতা।
	মেগাক্যারিওসাইট	প্লেটলেটস	রক্তবাহী নালী সমূহকে সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় রাখা। • সংক্রামণতায় অনিয়মিত রক্তক্ষরণ।
অস্থিমজ্জা	অপরিণত শ্বেতকণিকা	পরিণত শ্বেতকণিকা	বিভিন্ন বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করা • সংক্রামণতায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়

1নং চিত্র

যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্র্যানুলোসাইটিক লিউকেমিয়াতে মেরুমজ্জা থেকে উৎপন্ন কোষসমূহে দেখা দেয় বৃদ্ধি ও বিভাজনজনিত আকস্মিক কিন্তু আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনেও কোন বিজ্ঞানীই এর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে স্থির

নিশ্চিত নন। এঁদের অনেকের মতে, Ionising radiation বা রঞ্জন্‌গেন-রশ্মির প্রভাবই লিউকেমিয়া উৎপত্তির অন্যতম কারণ। তাঁরা বলেন যে, কোন ব্যক্তি এই রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হবেন তা নয়, রঞ্জন্‌গেন-রশ্মির প্রভাবজনিত এই পরিণাম পনেরো বছর পরেও অনুভূত হতে পারে। প্রতিপালিত অনেক প্রাণীর (যেমন—সাদা ইঁদুর ও কোন কোন পাখী) লিউকেমিয়ার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ভাইরাসই দায়ী।

লিউকেমিয়ার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, এই বিষয়ে আজ কোন সন্দেহই নেই যে,লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষের প্রজননতন্ত্রে (Genetic machinery) এমন একটা পরিবর্তন আসে, যা শুধু

2নং চিত্র

3নং চিত্র

কোষের স্বাভাবিক কাজকর্মেই ব্যাঘাত ঘটায়—তা নয়, পারিপার্শ্বিক সমগোত্রীয় কোষসমূহের কর্মক্ষমতাও ভীষণভাবে ব্যাহত করে। যে কোন সুস্থ কোষের যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে কোষমধ্যস্থিত D N A বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। এই ডি-এন-এ-ই হলো জেনেটিক কোড-এর মূল কথা। বলা বাহুল্য, ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনে যে কোন পরিবর্তনই প্রতিবিম্বিত হবে কোষের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায়। ঠিক একই কারণে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরস্থ ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনের সামান্যতম পরিবর্তনই রোগীর বাস্তব জীবনে এনে দেয় বিরাট বিপর্যয়।

অন্য দিকে এই মতের বিরোধীরা বলেন, রঞ্জন্‌গেন-রশ্মির প্রভাব লিউকেমিয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণই নয়; কারণ এমন অনেক লিউকেমিয়ার রোগী দেখা গেছে, যাঁরা পূর্বে কখনও রঞ্জন্‌গেন-রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই বিষয়ে অন্য ধারণার প্রবক্তাদের মতে, ভাইরাসই লিউকেমিয়া উৎপত্তির অন্যতম কারণ। এই মতবাদ নস্যাৎকারীদের একটা মন্তব্যই ভাইরাস-প্রকল্প মিথ্যা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা বলেন, ভাইরাসজনিত যে কোন রোগই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সংক্রামক। বলা বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যা থেকে আমরা লিউকেমিয়া সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য করতে পারি। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের ক্ষেত্রে না হলেও গবেষণাগারে

লিউকেমিয়ার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আজ

বিজ্ঞানীরা একমত যে, রোগের প্রকৃতির সঙ্গে রোগীর বয়সের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়ায় প্রায় সব বয়সের লোক আক্রান্ত হলেও এর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বেশী দেখা যায় তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে, অথচ এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় সাধারণতঃ পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধদের মধ্যে। অন্ত দিকে গ্র্যানুলোসাইটিক লিউকেমিয়ার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অল্প বয়স্ক যুবকদের মধ্যে বেশী দেখা গেলেও এর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা সাধারণতঃ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে জীবজগতের ক্রমবিবর্তন থেকে সুরু করে মানব দেহের হৃদয় পরিবর্তন পর্যন্ত সব কিছুর চাবিকাঠিই যখন বিজ্ঞানীদের হাতের মধ্যে, তখনও কিন্তু লিউকেমিয়ার উপযুক্ত প্রতিষেধক অনাবিষ্কৃত। অবশ্য এই বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নেই, বিজ্ঞানীদের গবেষণারও অন্ত নেই। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ আজ কিছু কিছু প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হলেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-মুক্তি আজও একান্তই নাটকীয় ঘটনা। তবে আংশিক আরোগ্য এবং রোগের বাহ্যিক লক্ষণসমূহ দূরীকরণের কাজে আধুনিক অনেক প্রতিষেধক বেশ ফলপ্রদ। যে সব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিষেধকরূপে প্রচলিত, তার মধ্যে মেথোট্রিক্সেট, লিউকেরন, মারক্যাপটোপিউরিণ ভিন্‌ক্রিস্টিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—মেথোট্রিক্সেট সহ উপরিউক্ত প্রায় সমস্ত প্রতিষেধকই আক্রান্ত কোষের ডি-এন-এ সংশ্লেষণ বন্ধ করে কোষবিভাজন ব্যাহত করে।

মাত্র কিছুদিন আগে, 1969 সালের মাঝামাঝি লিউকেমিয়ার দুটি প্রতিষেধক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছেন এদের একটি হলো সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও অপরটি এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজ। এদের প্রথমটির আবিষ্কর্তা ডাঃ গর্ডন জিউব্রডের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী, বিশেষতঃ গ্র্যানুলোসাইটিক ও লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। ঐ একই বছরে হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ল্যাজার্স ও তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষাগারে দেখান যে, এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজ নামে ব্যাক্টিরিয়া ই. কোলাই-এর দেহনিঃসৃত একটি জারক রস বা এন্‌জাইম লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত মানব-কোষের অব্যর্থ প্রতিষেধক। আবিষ্কর্তাদের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজের অপর একটি বিশেষত্ব হলো, এরা নির্দিষ্টভাবে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষসমূহের বিভাজনই ব্যাহত করে, পারিপার্শ্বিক সুস্থ কোষের উপর এদের প্রভাব উপেক্ষণীয় (সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের দু-জন বিজ্ঞানীও তাঁদের নব আবিষ্কৃত প্রতিষেধক সম্বন্ধে অনুরূপ দাবী করেছেন)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—এত প্রতিষেধক থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-মুক্তি আজও সম্ভব নয় কেন? একথা আমরা জানি, মাত্র একটি লিউকেমিয়া আক্রান্ত কোষের উপস্থিতি একটি সুস্থ মানুষকে লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত করে তুলতে পারে। তাই লিউকেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তুলতে হলে যাবতীয় অসুস্থ শ্বেত কণিকা নির্মূল করা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত যে সব প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনটাই সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া কোষ-পরিবারকে নির্মূল করতে সক্ষম নয়। কারণ মানবদেহে এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলি সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত প্রতিষেধকের কাছেই অভেদ্য; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের আবরণী, সুষুম্না কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ তরল

পদার্থ প্রভৃতি। দেখা গেছে, বেশ কিছু সংখ্যক লিউকেমিয়া কোষ দেহের এই সব নিরাপদ অংশে আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক কোষতন্ত্রের উপর এদের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষেধকের পরিমাণ সীমিত রাখতে হয়।

অনেক অসুবিধা, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাথেকে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মনে, শত-সহস্র আশাবাদী মানুষের মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে, সেই অনাগত মুহূর্ত হয়তো খুব দূরে নয়, যখন আমরা লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে তাদের রোগমুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারবো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—অতীত ও বর্তমান

শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে হাতে-কলমে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হয়। তখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ দুই-ই সম্ভব হয়েছিল। এর জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তাঁর 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' স্কুলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া 'সম্বাদ কৌমুদী'তে স্বরচিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের কিছু বইও রচনা করেছিলেন।

রামমোহন ছাড়া বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা করতে দেখা যায় ইউরোপীয় মিশনারিদের। উইলিয়াম ইয়েটস্ 1825 খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় 'পদার্থবিদ্যা সার' এবং 1830 খৃষ্টাব্দে 'জ্যোতির্বিদ্যা' নামে বই প্রকাশ করেন। জন ম্যাক 1834 খৃষ্টাব্দে 'কিমিয়াবিদ্যা সার' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়নের বই প্রকাশ করেন। এভাবে দেখা যায়, বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হয়েছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা সুরু হবার অনেক আগে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, যে চর্চা সুষ্ঠুভাবেই সুরু হয়েছিল তা ব্যাহত হলো কি কারণে? সঙ্গতভাবেই বলা যায়, এর প্রধান কারণ বিদেশী শাসন। যদিও সরকারীভাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে হবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করবার জন্যে; তথাপি ইংরেজী শিক্ষা চালু করবার ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধ দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা শাসনকার্যে সহায়তা লাভের জন্যেই ইংরেজী শিক্ষা চালু করেছিলেন। তাই ইংরেজী শিক্ষা যখন চালু হলো, তখন সামান্য ইংরেজী শিখলেই সাধারণ একটা কেরাণীর চাকরি জুটে যেত। ফলে অধিকাংশ বাঙালীই চাকরির আশায় ইংরেজী পড়তে সুরু করেন। উপরন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিষয় পড়তে বাধ্য হতো। তাছাড়া তখনকার দিনের খ্যাতনামা বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দিলেও স্বচেষ্টায় কেউই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে অগ্রণী হন নি। ভারতের বিভিন্ন জনহিতকর আন্দোলনে

এবং ভারতের সম্মান বিদেশে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যে রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে সেই রকম কিছু করলে আজ হয়তো আমাদের এত ভাবতে হতো না। সুতরাং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যাহত হবার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায়, এই ব্যাপারে বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সক্রিয় চেষ্টার অভাব।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের আধুনিক যুগের উৎসাহীদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপকারিতা বুঝতে পেরে সারা জীবন ধরে এর জন্যে চেষ্টা করতে কসুর করেন নি। দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁর প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ দেখতে পান নি। এখানেও বলা যায়, সরকার ও বিজ্ঞান-শিক্ষক উভয়েই দায়ী। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের মতে, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ও বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব এর জন্যে দায়ী। আজও মাঝে মাঝে এই কথা শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দিয়েছেন 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধে। তবে বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা কখনো বন্ধ হয় নি। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক উভয়েরই দান অপরিসীম।

আজ ভারত স্বাধীন। সরকারও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। অনেক শব্দের পরিভাষাও হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের নানা বই ও বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলা পরিভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি বৈজ্ঞানিক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রধান কারণ বিভিন্ন লেখকের নিজের কাজের সুবিধার জন্যে ইচ্ছানুযায়ী বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ সৃষ্টির প্রয়াস। এঁরা কখনো খোঁজ করে দেখেন না যে, আগে কোন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। ফলে বাংলা ভাষার শব্দকোষের আকার বৃদ্ধি হলেও পরিভাষা হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত। তাই এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বলা যায়, প্রথমেই দরকার সরকারী সাহায্যপুষ্ট একটি চিরস্থায়ী 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সমিতি'র। সেই সমিতির মতানুযায়ী চলবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—কারণ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সকলে নাও মানতে পারেন। ঐ সমিতি নিম্নলিখিতভাবে কাজ করলে বোধ হয় অনেক ভাল হবে।

(1) একই শব্দের যেন একাধিক পরিভাষা না হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। বিভিন্ন বিজ্ঞানী যদি একটি শব্দের বদলে একাধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিজ্ঞানীমহলেই বিষয়বস্তু বোঝবার ব্যাপারে গোলযোগ দেখা দেবে—বিজ্ঞানীকে তখন গবেষণা ছেড়ে বিজ্ঞানের শব্দকোষ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং একটি শব্দের একটি প্রতিশব্দ প্রচলিত থাকলে কি সুবিধা হবে, তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এই কাজের জন্যে সমিতির উচিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের যত রকম পরিভাষা পাওয়া যায়, তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের মধ্যে যদি কোনটি গ্রহণযোগ্য হয় তাকে গ্রহণ করা, নয় তো নতুন শব্দের সৃষ্টি করা। এর জন্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে কিভাবে পরিভাষা করা হয়, তা দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু এই করলেই চলবে না, ভবিষ্যতে যাতে কোন রকম গোলযোগ না দেখা দেয়, তার জন্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নতুন শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন। যতদিন পরিভাষা সৃষ্টি ও তা প্রকাশিত না হয়, ততদিন প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দের কি রকম পরি-

ভাষা করবেন সমিতিকৃত আইনে তারও নির্দেশ থাকা চাই।

(2) বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার লোকের বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে তফাৎ দেখা যায়। ফলে বহু শব্দের বিভিন্ন বানানও লক্ষ্য করা যায়। এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না করলেও যে নতুন বিজ্ঞান শিখতে আরম্ভ করবে, তার পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে। সুতরাং পরিভাষার আইনের সঙ্গে বানানের আইনেরও দরকার আছে।

(3) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাছাড়াও প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যাসমন্বিত অভিধানের প্রয়োজন আছে। কারণ শব্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে যে কোন পাঠক বিজ্ঞানের যে কোন শাখার বই অথবা প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করেও কোন কিছু রচনা করা যাবে। এতে হয়তো রচনার আকার কিছু বড় হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে বিশেষ সুবিধা হবে। ফলে এক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না।

(4) কোন্ ভাষায় কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষের জন্যে বিজ্ঞানের বই লেখা হবে, তা নির্ধারণ করা দরকার। আমরা কথা বলি চলিত ভাষায়, লিখি সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই। কিশোর-কিশোরী ও সাধারণ মানুষের কাছে চলিত ভাষা যত আপন, সাধু ভাষা ততটা নয়। সুতরাং আমার মনে হয় চলিত ভাষার মাধ্যমে সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে যা দেখতে পাওয়া যায়, তাথেকে উদাহরণ দিয়ে বই বা প্রবন্ধ লিখলে বিজ্ঞানে অজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি অতি সহজে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় বুঝতে পারবে এবং প্রাত্যহিক জীবনে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সব শেষে একটি কথাই বলা যায়—সব কিছুই পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেদিন, যেদিন বাঙালী বিজ্ঞান-শিক্ষকেরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন। যত দিন তাঁরা ত্যাগ স্বীকার না করবেন, তত দিন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাময়িকীতেই নিবদ্ধ থাকবে, উচ্চ শিক্ষার দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার

অরূপ রায়

ইনার্ট গ্যাস—বাংলায় বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। নামকরণ হইতেই বোঝা যায় যে, ইহারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্ষম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন ও র‍্যাডন—এই ছয়টি গ্যাসকেই নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। ইহাদের সংকেত—যথাক্রমে He, Ne, A, Kr, Xe ও Rn। একমাত্র র‍্যাডন ছাড়া আর বাকী সব গ্যাস-গুলিই বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়, তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। বায়ুমণ্ডলে ইহাদের আয়তন হিসাবে মোটামুটি আপেক্ষিক স্থিতি :

He – 0·00052, Ne – 0·0015, A = 0·9323, Kr – 0·0001 ও Xe = 0·000009.

পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে উপস্থিতির জন্যই বিজ্ঞানীদের কাছে ইহারা বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 1785 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস নিজের অজ্ঞাতসারেই একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটান। সকল স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ অভিন্ন কিনা দেখিবার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-কার্য চালান। একটি আবদ্ধ কাঁচপাত্রের মধ্যে গাঢ় KOH দ্রবণের উপর অতিরিক্ত অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু লইয়া তাহার মধ্যে তিনি বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ঘটান। ফলে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যে সকল নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহারা KOH-দ্রবণে শোষিত হইয়া যায় এবং অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি পটাসিয়াম সালফাইড (K_2S) দ্রবণে শোষিত করান, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছুটা গ্যাস অশোষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যাহার আয়তন ক্যাভেন্ডিসের ভাষায়, "......not more than $\frac{1}{120}$th part of the whole." তিনি এই অশোষিত গ্যাসের স্বরূপ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁহার পরীক্ষাটিও আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

ক্যাভেন্ডিসের পরীক্ষার এক শতাব্দীরও পরে 1892 সালে Lord Rayleigh দেখিতে পান যে, বায়ুমণ্ডল হইতে অন্যান্য গ্যাস অপসারণ করিয়া প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন ও নাইট্রোজেন যৌগ হইতে প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন যথাক্রমে 1·2576 gms. ও 1·2506 gms, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস, রাসায়নিক উপায়ে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস হইতে 0·5% ভারী। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যখন কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না, তখন এই পর্যবেক্ষণের কথা তিনি Sir Willium Ramsay-কে জানান। লর্ড র‍্যালের পর্যবেক্ষণের উপর র‍্যামজে সিদ্ধান্ত করেন যে, বাতাসে কিছু অনাবিষ্কৃত ভারী গ্যাসের উপস্থিতির ফলেই নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দুই রকম পাওয়া যাইতেছে।

র‍্যামজে ও র‍্যালে যখন এই বিষয়টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন, হঠাৎ তখন এক শতাব্দীরও বেশী পূর্বে সম্পাদিত ক্যাভেন্ডিসের পরীক্ষাটির উপর তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেক রকম উন্নতি সাধন করিয়া পৃথক পদ্ধতিতে তাঁহারা পরীক্ষাটি আবার করিয়া দেখেন।

র‍্যালে আয়তন হিসাবে 9 ভাগ বাতাস ও 11 ভাগ অক্সিজেনের মিশ্রণ লইয়া 50 লিটারের একটি কাচের গ্লোবের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণের সান্নিধ্যে

প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ঘটান। উৎপন্ন NO_2 সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবীভূত হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি অ্যালকালাইন পাইরোগ্যালেট দ্রবণে শোষিত করাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটিকে সংগ্রহ করেন।

র‍্যামজে উত্তপ্ত Cu-এর উপর দিয়া কিছু পরিমাণ বাতাস বার বার প্রবাহিত করাইয়া উহার অক্সিজেনকে সম্পূর্ণরূপে শোষিত করান ও নাইট্রোজেন গ্যাস অপসারণ করিবার জন্য উহাকে উত্তপ্ত Mg-এর উপর দিয়া পরিচালিত করেন। এই ভাবে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিবার পর শেষ পর্যন্ত তিনি যে অবশিষ্ট গ্যাস পান, তাহার ঘনত্ব দেখা যায় 19·94 (H = 1·0008) ও আয়তন পরীক্ষায় ব্যবহৃত বাতাসের আয়তনের $\frac{1}{80}$ ভাগ। তিনি এই গ্যাস ও ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্ত গ্যাসের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে, উহারা অভিন্ন ও যে কোন জানা মৌল বা যৌগের বর্ণালী হইতে ভিন্ন। 1894 সালে র‍্যালে ও র‍্যামজে গ্যাসটিকে মৌলিক বলিয়া প্রমাণ করেন। গ্যাসটি উত্তপ্ত ধাতু, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$), সোডিয়াম পারক্সাইড (Na_2O_2) প্রভৃতির সহিত তো নয়ই—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন—এমন কি, ফ্লোরিনের সঙ্গেও বৈদ্যুতিক স্ফুরণের সাহায্যে মিলিত হয় না। তাঁহারা নিষ্ক্রিয়তার জন্য গ্যাসটির নাম দেন আর্গন (নিষ্ক্রিয়)।

1868 সালে সূর্যগ্রহণ চলিবার সময় Janseen সৌরবর্ণালী বিশ্লেষণের সময় সোডিয়ামের D-লাইন হইতে ভিন্ন জায়গায় একটি নূতন হলুদ লাইন পান। এই পর্যবেক্ষণ হইতে Frankland ও Lockyer সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যে একটি নূতন মৌলিক পদার্থ বর্তমান। তাঁহারা মৌলিক পদার্থটির নাম দিলেন হিলিয়াম (গ্রীক Helios—সূর্য)। 1889 সালে Hillebrand ইউরেনিয়াম খনিজ ক্লেভাইট (Cleveite) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিয়া এক ধরণের গ্যাস পান, কিন্তু উহা যে কি গ্যাস, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 1894 সালে র‍্যামজে গ্যাসটিকে নাইট্রোজেন সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা-কার্য চালান। তিনি গ্যাসটির সহিত অক্সিজেন মিশাইয়া বৈদ্যুতিক স্ফুরণের সাহায্যে উহার সহিত মিশ্রিত নাইট্রোজেনকে উহার অক্সাইডে পরিণত করিয়া গাঢ় KOH দ্রবণে শোষিত করান। এইরূপে অন্যান্য গ্যাসসমূহ সরাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটির বর্ণালী লইয়া দেখিলেন যে, ইহা জানসিনের প্রাপ্ত বর্ণালী হইতে অভিন্ন। এইরূপে তিনিই প্রথম পার্থিব পদার্থ হইতে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ করেন। 1895 সালে Kayser বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণ করেন।

র‍্যামজে 1896 সালে নবাবিষ্কৃত গ্যাস হিলিয়াম ও আর্গনকে পর্যায় সারণীতে একটি নূতন গ্রুপে স্থান দেন। তিনি তাহার নাম দেন জিরো গ্রুপ (Group O)। এই সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, গ্রুপটিকে পূর্ণ করিতে কম করিয়া আরও একটি অনাবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছেই।

অবিশুদ্ধ তরল আর্গনকে আংশিক পাতন করিয়া র‍্যামজে ও Travers 1898 সালে আরও কয়েকটি মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পান। তাঁহারা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দূর করিয়া বাতাস হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট গ্যাসটিকে একটি বাল্বে অতিরিক্ত চাপে রাখিয়া তরল বায়ুর সাহায্যে—185° সে.-এ শীতল করেন। এই সময় বেশীর ভাগ গ্যাসই তরল হইয়া যায়। বাল্বটিকে তরল বায়ু হইতে সরাইয়া তরল অংশটিকে দ্রুত বাষ্পীভূত করিয়া গ্যাসীয় ও তরল দুইটি অংশে ভাগ করেন। প্রথমে এই গ্যাসীয় অংশটিকে তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে—240° ডিগ্রী সে.-এ শীতল করিলে ইহার কিছুটা অংশ কঠিন হইয়া

যায় ও বাকী অংশ গ্যাসীয় অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে। গ্যাসীয় অংশটি হিলিয়াম ও কঠিন অংশটি একটি নূতন নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ—নাম নিয়ন (গ্রীক—নূতন)। ইহার পর তরল অংশকে (যাহার বেশীর ভাগই আর্গন) তাঁহারা আংশিক পাতন করেন। আংশিক পাতনের (Fractional distillation) ফলে প্রথমে আর্গন ও পরে যথাক্রমে ক্রিপ্‌টন (অজ্ঞাত) ও জেনন (আগন্তুক) নামক আরও দুইটি মৌলিক গ্যাস পান। এই গ্যাস দুইটিও নিষ্ক্রিয়। 120 টন তরল বায়ু হইতেও আর কোনও নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তী কালে র‍্যাডন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (Radioactive decay) উৎপাদক হিসাবে পাওয়া যায়। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসটির দুইটি আইসোটোপ—Actinon ও Thoron।

1907 সালে Cady ও Mc Farland-এর অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ক্যান্‌সাসের বিশেষ কিছু অংশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে আয়তন হিসাবে 1·84% হিলিয়াম বর্তমান। এই হইল নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

সাধারণতঃ প্রকৃতিতে আমরা পদার্থের তিন প্রকার রূপ দেখতে পাই—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। জলের তিন রকম বিভিন্ন অবস্থার নাম বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প। কঠিন অবস্থায় পদার্থের ভিতরের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী। উত্তাপের সংস্পর্শে এলে কঠিন পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। অধিক তাপমাত্রায় অণুগুলি আরও দ্রুত পরিভ্রমণ করে এবং স্ফুটনাঙ্কে অণুগুলির নিজেদের ভিতর আকর্ষণ খুব বেশী কমে যাওয়ার ফলে তারা গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসকে 1000° থেকে 5000° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে তা পরমাণুতে পরিণত হয়। প্রায় 10,000° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক আধানসম্পন্ন নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনে ভেঙে পড়ে। এই সময় পরমাণুগুলির নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকির ফলে তাদের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলি সবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে এবং গ্যাস আয়নিত হয়। এই অবস্থাকে প্লাজ্‌মা অথবা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্লাজ্‌মা অতিমাত্রায় আয়নিত গ্যাস এবং এর নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতর সমসংখ্যক ধনাত্মক আয়ন এবং মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান থাকে। প্লাজ্‌মার মধ্যে নিরপেক্ষ গ্যাস-অণু এবং পরমাণু থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে গ্যাসের সঙ্গে এর সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, প্লাজ্‌মা খুব ভালভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন এবং ধারণ করতে পারে। উপরন্তু এটি চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। প্লাজ্‌মার গতি-

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বিধিত অন্যান্য চার্জড্ বা আহিত কণিকাগুলির থেকে স্বতন্ত্র।

প্লাজ্মার উৎপত্তিস্থান

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শতকরা 99.9 ভাগই রয়েছে প্লাজ্মা অবস্থায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ, আয়নোস্ফিয়ার, সূর্যের মধ্যভাগ (যেখানে উষ্ণতা প্রায় 10^{6} কেলভিন), নক্ষত্রমণ্ডলী, নীহারিকা, নীহারিকার মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদির পদার্থসমূহ প্লাজ্মা অবস্থায় রয়েছে। রসায়নাগারে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ডিস্চার্জ-টিউবে প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়।

প্লাজ্মার ইতিহাস এবং গুরুত্ব

প্লাজ্মা সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ভালভাবে গবেষণা চলে 1929 খৃষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাংমুর এবং টংক্ ডিস্চার্জ টিউবে আয়নিত গ্যাসের সঞ্চালন লক্ষ্য করবার সময় দেখেন, সেটা অনেকটা প্লাজ্মা জেলীর মত। প্লাজ্মা জেলী থেকেই প্লাজ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম ক্রুক্স্ও নিম্নচাপের ডিস্চার্জ-টিউবের বিভিন্ন ঘটনা দেখে মনে করেন, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্ভব। প্লাজ্মা অবস্থার গুরুত্ব দেখা দিল তখন, যখন প্লাজ্মা জেট, প্লাজ্মা টর্চ ইত্যাদির প্রচলন সুরু হলো। পরে উচ্চ গতিতে রকেট চালাবার জন্যে, মহাশূন্যে বেতার-বিদ্যুতের সাহায্যে কথাবার্তার জন্যে এবং উচ্চ তাপ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্লাজ্মা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে ফিউসন বিক্রিয়ার জন্যে প্লাজ্মার নির্মিত পাত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে পুরাদমে। উত্তপ্ত প্লাজ্মা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যায় কিনা, সে বিষয়েও বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন।

প্লাজ্মা উৎপাদন ও রক্ষণ

সাধারণতঃ দুটি উপায়ে প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। (এক)—পিন্চ ক্রিয়ার সহায্যে এবং (দুই)—উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ডয়টেরিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ওজন-2) অণুর স্রোতকে কার্বন আর্কের সাহায্যে ডয়টেরিয়াম পরমাণুতে পরিণত করে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে মিরর যন্ত্র, টরাস অথবা স্টিলারেটর যন্ত্রের দ্বারা ধরে রাখা প্লাজ্মার ভিতর দিয়ে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে সরাসরি ইলেকট্রনকে উত্তপ্ত করে এক কিলোইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

পিন্চ ক্রিয়া—সিলিণ্ডারের ভিতর পিষ্টনের সাহায্যে যেমন গ্যাসকে সঙ্কুচিত করা হয়, ঠিক সে রকম উপায়ে চুম্বক-প্রশমন প্রক্রিয়ার সাহায্যে Magnetic compression) প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়। খুব শক্তিশালী কয়েক কোটি অ্যাম-পিয়ার একাভিমুখী বিদ্যুৎ একটি সিলিণ্ডারের ভিতরের পরিবাহী গ্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠালে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের এক দিক কমিয়ে এবং অন্য দিক বাড়িয়ে দিলে প্লাজ্মা খুব দ্রুত চলাফেরা করতে থাকে এবং সিলিণ্ডারের ভিতরের দিকের গ্যাসকে প্রশমিত করে। এই ঘটনাকেই টংক্ 1939 খৃষ্টাব্দে পিন্চ ক্রিয়া নামে অভিহিত করেন।

ফিউসনের বিষয় গবেষণার জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—ডয়টেরিয়াম অথবা ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ওজন 3) মিশ্রণের সাহায্যে 100 কোটি ডিগ্রী পরম উষ্ণতাবিশিষ্ট অতি উত্তপ্ত বিশুদ্ধ প্লাজ্মা উৎপাদন করা। এই উত্তপ্ত প্লাজ্মাকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে ভবিষ্যতে বহু কল্যাণমূলক কাজ করবার প্রকল্প রয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

প্লাজ্মা-কণিকাগুলি উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন হবার ফলে (1.0^{8}°K) ও অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থার জন্যে খুব শক্তিশালী (10^{4} e. v) হয়ে থাকে এবং পাত্রের গায়ে এদের আঘাত করবার

সম্ভাবনা থাকে। পাত্রের গায়ে প্লাজ্‌মা কণিকা-গুলির আঘাতের ফলে তাথেকে উদ্ভূত শক্তির বেশ কিছুটা অংশ কমে যাবে। শুধু তাই নয়, উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার ভিতর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসগুলির ধাক্কাধাক্কির ফলে তাথেকে এক্স-রে বিচ্ছুরিত হয়। প্লাজ্‌মার উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলি থেকেও সিনক্রোট্রোন রশ্মি নির্গত হয় এবং তার ফলে এথেকে প্রাপ্ত শক্তির কিছুটা অংশ বিনষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। বর্তমানে ফিউসন বিক্রিয়ার জন্যে এমন একটি পাত্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে, যার মধ্যে খুব কমসংখ্যক প্লাজ্‌মা-কণিকা পাত্রের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে এবং যেখানে অনেকক্ষণ ধরে ফিউসন-বিক্রিয়া চালনা সম্ভব হবে। সে জন্যে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক পাত্রের ভিতর প্লাজ্‌মাকে রক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই পাত্রের মধ্যে থাকলে প্লাজ্‌মা কণিকাগুলির পাত্রের গায়ে খুব বেশী ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা থাকবে না। বাইরে থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ম্যাগ্‌নেটিক মিররের সাহায্যে প্লাজ্‌মার স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়। প্লাজ্‌মাকে উত্তপ্ত রাখা এবং রক্ষণের জন্যে আজকাল স্টিলারেটর পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হচ্ছে।

অতি উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার উষ্ণতা প্রায় 10⁶° পর্যন্ত হতে পারে এবং নিউট্রন থার্মোমিটারের সাহায্যে তা মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা প্লাজ্‌মা ব্যবহারের বিভিন্ন দিকের কথা এখন চিন্তা করছেন। আমরা সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করবো, যে দিন বিজ্ঞান প্লাজ্‌মাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

কৃষির কয়েকটি দিক

সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক উপযুক্ত খাদ্য পায় না। সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা 71 ভাগ লোক অনুন্নত অঞ্চলে বাস করে। তারা সমগ্র উৎপন্ন খাদ্যের মাত্র 42 ভাগ উৎপাদন করে এবং আয় করে আরও কম—মাত্র 21 ভাগ। লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো কি সম্ভব নয়? যদি 1952-56 সালের মাঝামাঝি গড় হিসাবে উৎপন্ন খাদ্যকে 100 ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে 1963 সালে ওটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 109-তে এবং 1965 সালে 110-এ। এটা হলো পৃথিবীর গড় হিসাব, কিন্তু দেশে দেশে ব্যতিক্রম রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় যেমন বেড়ে গিয়ে 1966 সালে দাঁড়িয়েছিল 141, তেমনি অধিকতর খাদ্য উৎপাদনকারী দেশগুলিতে (যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়) যথাক্রমে 120 ও 100-তেই দাঁড়িয়ে আছে। মেক্সিকো 1952 সালের 90 থেকে 1964 সালে তুলেছে 127, জাপান তুলেছে 99 থেকে 120-তে। ভারতবর্ষে 1960-61 সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল 108, কিন্তু 1965 সালে আবার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 97-তে।

খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে কি কি জিনিষের প্রয়োজন এবং কতটাই বা এর সীমা? আলো, বাতাস, জল, সার ছাড়াও দরকার উন্নত ধরণের বীজ, রোগমুক্তির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সব মিলিয়ে একটা সুষম প্রয়োগ-কৌশল। ফসলের জন্যে যে সূর্যের আলোর দরকার হয়, তার উপর

আমাদের হাত নেই; কাজেই সেটাই শেষ সীমা।

কৃষিযোগ্য ভূমিতে মোটামুটিভাবে প্রতি বর্গ-সেণ্টিমিটারে 70 থেকে 210 কিলোক্যালোরির মত সূর্যকিরণ পড়ে। এক টন শুষ্ক জৈব পদার্থ উৎপাদনে প্রায় 100 ক্যালোরির মত সূর্যকিরণ দরকার হয়। এই হিসাবে দেখা গেছে, খুব ভাল-ভাবে ফসল উৎপাদনে যদি একর প্রতি 4 টন শুষ্ক জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাহলেও যে পরিমাণ সূর্যের শক্তি আহরিত হয়, সেটা মাত্র ঐ স্থানে পতিত একদিনের সূর্যকিরণের সমান। যদিও সব দিক হিসাব করে দেখানো যায় যে, অন্ততঃ শত-করা 20 ভাগ সূর্যকিরণকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, কিন্তু নীচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে—কত সামান্য পরিমাণই মাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করতে পারছে। যে সংখ্যাগুলি নীচে দেওয়া গেল, সেগুলি উৎপন্ন ফসলে অঙ্গীভূত সূর্যকিরণ ও সেই স্থানে পতিত সমগ্র সূর্যকিরণের অনুপাতের দশ হাজার গুণ।

	ফ্রান্স	রাশিয়া	ইউ. এস. এ.	জাপান	ইউ. এ. আর.	ভারত	পাকিস্তান
শস্য	36	23	28	34	19	8	7
চাল	23	10	17	16	11	3	4

কাজেই দেখা যায় যে, প্রচুর পরিমাণ শক্তি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে এর সদ্ব্যবহার করা যায়, তা নির্ভর করছে ফসল উৎপাদনের অন্যান্য বিষয়গুলির উপর।

প্রথমেই আসে জলের কথা। উপযুক্ত পরি-মাণ জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, তেমনি একই জমিতে একাধিকবার ফসলও উৎপাদন করা চলতে পারে। আমাদের দেশে বছরের বেশ কিছু সময় যেমন বৃষ্টি হয় না, তেমনি উপকূল অঞ্চল, আসাম ও বাংলা দেশ ছাড়া অন্যত্র অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলতে পারে না। কাজেই কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা খুবই জরুরী। ভারতবর্ষের বার্ষিক গড় নদীর জল-প্রবাহের হিসাবে জলশক্তির পরিমাণ 1,356 মিলিয়ন একর ফুটের মত। এর মধ্যে প্রায় 450 মিঃ এঃ ফুঃ জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে প্রায় 76 মিঃ এঃ ফুঃ (17%)-এর মত জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রায় 45%-এর মত নদীপ্রবাহ কাজে লাগানো যাবে বলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী নদীর জল কাজে লাগাতে পারা যাবে না 20 বছরেরও বেশী চেষ্টায়। এ তো গেল নদীপ্রবাহের কথা, এছাড়াও মৃত্তিকার মধ্যস্থিত প্রায় 300 মিঃ এঃ ফুঃ জলের অন্ততঃ 75 মিঃ এঃ ফুঃ জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এর মধ্যে মাত্র 42 মিঃ এঃ ফুঃ জলের ব্যবস্থা করা গেছে। এসব হলো সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জলের পরি-মাণ। এর সবটাই কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। 1964-65 সাল পর্যন্ত কৃষিযোগ্য জমির শতকরা মাত্র 19 ভাগ সেচ-পরিকল্পনার আওতায় আনা গেছে, বাকী সবই রয়েছে প্রকৃতির দয়ার উপর। নতুন নতুন সেচ-প্রকল্প অপেক্ষা বর্তমান সেচ-ব্যবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারাটাই এখন মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সেচ-ব্যবস্থার অর্ধেকেরও বেশী জল কৃষিতে অব্যবহৃতই রয়ে গেছে।

জলের পরেই আসে সারের কথা। ভারত-বর্ষের অর্ধেকেরও বেশী জমিতেই (157 মিলিয়ন হেক্টার, সমগ্র দেশের প্রায় 52%) কৃষিকার্য হয়, যেখানে আমেরিকায় 20%, জাপানে 16%,

রাশিয়ায় 10% এবং ক্যানাডায় মাত্র হয় 4%, অথচ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কত কম! নাইট্রোজেন, জৈব সার, ফস্‌ফরাস প্রভৃতির ঘাটতি এর একটি প্রধান কারণ। হিসাব করে দেখা গেছে কর্ষণযোগ্য সমস্ত জমি থেকে বছরে প্রায় 2·5 মিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন ধুয়ে বেরিয়ে যায় অথচ 1966-67 সালে মাত্র 9 লক্ষ টন নাইট্রোজেনের ব্যবহার হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে 2 মিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করবার পরিকল্পনা রয়েছে। 1970-71 সালে প্রায় 125 মিলিয়ন টনের মত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে 2·4 মিঃ টন নাইট্রোজেন, 1 মিঃ টন ফস্‌ফরাস ও 7 লক্ষ টন পটাস সারের ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে রাখা হয়েছে। সব যদি ঠিকমত চলে, তাহলে এর বেশ কিছুটাই আমদানী করতে হবে। নাইট্রোজেন সারের জন্যে প্রধান কাঁচামাল ন্যাপ্‌থা উৎপাদনের মোটামুটি ব্যবস্থা হলেও ফস্‌ফেট ও কোন কোন ক্ষেত্র নাইট্রোজেন সারের জন্যেও প্রয়োজনীয় ফস্‌ফেট খনিজ ও গন্ধকের দিক থেকে আমরা অনেকটাই পরমুখাপেক্ষী। গন্ধকের পরিবর্তে পাইরাইটের ব্যবহার ও ফস্‌ফেট খনিজের নতুন নতুন খনির খোঁজ চলছে। ইতিমধ্যে রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে কিছু খনিজ ফস্‌ফেটের খোঁজ পাওয়া গেছে। পটাসের প্রায় সবটাই আমদানী করতে হয়।

ভারতের জমির প্রায় সর্বত্রই নাট্রোজেন সারের অত্যন্ত প্রয়োজন, শতকরা প্রায় 85 ভাগ আরও ফস্‌ফরাস ও প্রায় 63 ভাগের দরকার অতিরিক্ত পটাস। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে সারের ব্যবহার খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সব মিলিয়ে বর্তমানে মাত্র 3·46 কেজির মত সার প্রতি হেক্টারে, যেখানে নেদারল্যাণ্ডে প্রায় 557 কেজি এবং পৃথিবীর গড় 27·45 কেজি (1964-65)। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেও যদি সবটাই ব্যবহার করা যায়, তবু হেক্টার প্রতি নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র 14 কেজির মত, যেখানে তাইওয়ানে 150 কেজি ও জাপানে 120 কেজির মত ব্যবহৃত হয়। এখানেরই কোন কোন জমিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হেক্টার প্রতি 20 কেজি নাইট্রোজেন ব্যবহারে প্রায় 259 কেজি বেশী চাল ও 350 কেজি বেশী গম পাওয়া যায়। তার মানে টাকার হিসাবে প্রায় 1 টাকার নাইট্রোজেন সার চালের বেলায় 2·4 টাকা ও গমের বেলায় 2·6 টাকা বেশী লাভ দিয়েছে।

বেশী ফসলের জন্যে সারের সঙ্গে দরকার উন্নত জাতের বীজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত সঙ্কর জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এগুলির সার গ্রহণক্ষমতাও যেমন বেশী, তেমনি বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। তবে প্রধান অসুবিধা—উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বীজ তৈরি করতে হবে, অন্যথা নিয়ম অনুসারে ফসলের একটা অংশ বীজ হিসাবে রেখে দেওয়া চলবে না। উন্নত ধরণের বীজ নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদনের জন্যে 1960 সালে ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় ও আমেরিকার সাহায্যে অনেক নতুন জাতের সঙ্কর বীজ তৈরি করেছেন। গঙ্গা 101, 2 ও 3, রঞ্জিত, ডেকান, হিমালয় 123 প্রভৃতি ভূট্টার বীজ; সি. এস্‌ এইচ. 1 ও 2 জোয়ার; এইচ. বি. 1 বজরা; সোনারা 64, লারমা রোজো ও সরবতী সোনারা গম, এ. ডি. টি. 27, তাইচুং নেটিভ 1, তাইনান 3, আই. আর 7 ও 8 ধান; আসিরিয়া মিটুওে বাদাম; পুসা সাওয়ানি ঢেড়স এবং বোগেভিল ছোলা ইত্যাদি বহু রকমের সঙ্কর বীজ নিয়ে গবেষণা চলছে। এছাড়াও এই কর্পোরেশন পুসা রুবি টোম্যাটো, পুসা পার্পল বেগুন, পুসা কার্টিক ফুলকপি, পুসা লঙ্কা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ ফলনক্ষম সজির বীজও তৈরি করেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রি-

কালচারাল রিসার্চ-এর তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরণের আম, কলা, লেবু, আঙুর, পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের কাজও চলছে। বেশী ফলন ছাড়াও ফসলে অন্যান্য গুণ আনবারও চেষ্টা চলছে অবিরাম। রঞ্জন্‌গেন রশ্মির প্রয়োগে অধিকতর প্রোটিনযুক্ত গমের বীজ তৈরি করা গেছে যেমন, তেমনি পারমাণবিক রশ্মির প্রয়োগেও উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণের ধান, গম, বার্লি, সয়াবীন, পীচ প্রভৃতির নতুন ধরণের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উন্নত জাতের বীজের সুফল একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। উপযুক্ত সার প্রয়োগে তাইচুং নেটিভ 1 ধান হেক্টার প্রতি প্রায় 6,000 কেজি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচলিত জাতে পাওয়া যেত 700 থেকে 1000 কেজি মাত্র।

ভাল ফসলের জন্যে এর পরও রয়েছে গাছকে নীরোগ রাখবার ব্যবস্থা। নানারকম পোকামাকড়, ছত্রাক ও অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক গুল্ম ইত্যাদির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ফসলের ক্ষতিকারক এই গুলিকে একত্রে বলা হয় পেষ্ট। এর বিরুদ্ধে তিন রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ নিজের হাতে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক গুল্মের অপসারণ, বীজ বপন ও ফসল রোপণের উপযুক্ত সময় নির্বাচন এবং একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো বায়োলজিক্যাল প্রতিকার। এক রকম শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য রকম জীবের ব্যবহার, নির্বীর্য পুরুষ প্রাণীর সৃষ্টি এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংসকারী ব্যাসিলাসের ব্যবহার। এসব ছাড়াও তৃতীয় পথ অর্থাৎ রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের ব্যবহারই হয় সবচেয়ে বেশী। ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন, ডি-ডি-টি, বি-এইচ-সি, নানারকম জৈব ফস্‌ফরাস, রাসায়নিক, ডাইকিনাইল, কার্বামেট ইত্যাদির বহুল প্রচলন হচ্ছে। ধানের পাতায় পোকার জন্যে এনড্রিন, শিকড়ের রোগে অ্যালড্রিন এবং ধান ক্ষেতের আগাছা ধ্বংসের জন্যে প্রোপানিলের ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিষের মত এই ব্যাপারেও আমরা বেশ পিছিয়ে রয়েছি। 1963 সালের হিসাবে যেখানে জাপানে হেক্টার প্রতি 10,790 গ্রাম কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের দেশে হয়েছে সেখানে মাত্র 149 গ্রাম। আমাদের দেশে কীটনাশক তৈরিও হয় না খুব বেশী। 1965-66 সালে কীটনাশক দ্রব্যাদির আমদানীতে খরচ হয়েছে প্রায় 2 কোটি 60 লক্ষ টাকা।

যে যুগে ছোট-বড় প্রায় সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েই চলেছে, সেই যুগে জীর্ণ বলদে টানা হাল সত্যই করুণ নয় কি? বড় বড় কো-অপারেটিভ ফার্মিং না থাকায় একদিকে যেমন ট্র্যাক্টরের বহুল প্রচলন হচ্ছে না, তেমনি কৃষিজীবী শ্রমিকের বেশ কিছুটা অংশকে শিল্পে টেনে আনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যাপক বেকারত্বের আশঙ্কায় এখনই পূর্ণ যন্ত্রীকরণের লক্ষ্য রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাটো যন্ত্রের, যেমন—পাম্পিং সেট, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার স্প্রেয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন হতে পারে। এর জন্যে দরকার কৃষিতে আরও অর্থের বিনিয়োগ, ধারে কৃষকদের যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা ও সরলীকৃত ছোট যন্ত্রের সস্তায় উৎপাদন।

1960 সাল থেকে 17টি রাজ্যের প্রত্যেকটির একটি করে জেলায় উপযুক্ত সার, বীজ ইত্যাদির প্রয়োগে নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রচলন হয়। 1966-67 সালে ফলস্বরূপ পূর্বের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশী ফসল পাওয়া গেছে। এখন আরও বেশী জেলা (130টি) নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এখানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সঙ্গে মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের শস্য উৎপাদনের একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল (1964 সাল)।

দেশের নাম	মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমি, (1/100 হেক্টার)	হেক্টার প্রতি সারের ব্যবহার কেজি	হেক্টার প্রতি কীটনাশক কেজি	হেক্টার প্রতি প্রধান শস্য উৎপাদন কেজি
জাপান	6	304·39	10·79	5,480
ইউরোপ	14 (ইউ. কে.)	119·94	1·47	3,430
ইউ. এস. এ.	96	43·68	1.49	2,600
আফ্রিকা	69 (দক্ষিণ-আফ্রিকা)	21·18	0·127	1,210
ভারত	35	4·43	0·149	820

(1 হেক্টার = 10,000 বর্গমিটার = 2·47 একর)

আধুনিক বিজ্ঞান মরুভূমিকেও শস্যশ্যামল করবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর সমস্ত জমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগই হয় শুষ্ক অথবা আধা শুষ্ক। বালুকাময় মরুভূমির মোট আয়তন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশী। ভারতের পশ্চিম ভাগেও বেশ কিছুটা অংশ মরুভূমিকবলিত। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সাহায্যে বালুকাময় মরুভূমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা চলছে। এই ধরণের জমিতে সমুদ্রজল ব্যবহারের সম্ভাব্যতার কারণ হলো—এই জলের ক্ষতিকারক লবণগুলি সাধারণ মাটির মত বালিকণায় জমতে পারে না, ফলে জলটা নেমে যেতে পারে এবং বালিকণাগুলির মধ্যস্থিত জায়গায় বায়ু চলাচলের অসুবিধাও হয় না। গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড সহজেই জলের সঙ্গে নেমে যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় কিছু কিছু লবণ বালিতে থেকে গিয়ে গাছের কিছু সুবিধাও করে দেয়। রস আহরণকারী শিকড়ের তুলনায় বালিকণার মধ্যস্থিত ফাঁকগুলির ব্যাস দশ গুণেরও বেশী, ফলে বায়ু চলাচলও ভালভাবেই হয়। উপরন্তু রাত্রিবেলায় উপরের তাপ কমে গেলে বালুকারাশির নীচের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে শিকড়ের উপর জমে গিয়ে গাছের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাল জলের অভাবও মেটায়। ইস্রায়েলের বিজ্ঞানীরা নেগেভ মরুভূমিতে এই ব্যাপারে কিছু সাফল্যলাভও করেছেন। আমাদের দেশে ভবনগরে অবস্থিত সেন্ট্রাল সল্ট অ্যাণ্ড মেরিন কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন অব ইণ্ডিয়াতেও এই বিষয়ে কিছু কাজ চলছে। সেখানে ভারত মহাসাগরের জল ব্যবহার করে কিছু তৈলবীজ এবং গমও ফলানো হয়েছে।

সব কিছু মিলিয়ে এটা দেখা যাচ্ছে—খাদ্যের ব্যবস্থা আমাদের হাতের মধ্যেই; শুধু প্রয়োগ-বিদ্যাই এনে দিতে পারে আমাদের সমৃদ্ধি।

সঞ্চয়ন

পরমাণু-শক্তির কল্যাণময় ভবিষ্যৎ

পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা বা নিউক্লিয়ার টেক্‌নোলোজীর ক্ষেত্রে গত 27 বছরের মধ্যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ঐ সময়ে পরমাণু নিয়ে বহু রকমের গবেষণা হয়েছে, নানা ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পরমাণু-শক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার ও কল্যাণ সাধনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বর্তমানে কোন সন্দেহই নেই।

1942 সালের ডিসেম্বর মাসে শিকাগো সহরে প্রথম যে দিন পরমাণু ভাঙা হয় এবং পরমাণুতে নিহিত অসীম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়—সে দিনই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আজ এই শক্তির সাহায্যে মানুষের যে কত রকমের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে, এই শক্তি জ্ঞানের সীমানাকে যে কতদূর প্রসারিত করছে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1951 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর গ্লেন টি. সীবর্গ সম্প্রতি বলেছেন যে, গত 27 বছরে পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাতে সমগ্র মানবজাতির জন্যে, মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে এক মহান ভবিষ্যতের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে। আজ অস্পষ্টভাবে হলেও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

পরমাণু-শক্তিকে শিল্প ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই অধিকতর পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যেই এই শক্তিকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লী বা রিয়্যাক্টরের সাহায্যেই পরমাণু-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধরণের রিয়্যাক্টর তৈরি করেছে, সেই ধরণের পারমাণবিক চুল্লী বর্তমানে জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মেনী, স্পেন, ইটালী ও সুইডেনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল রিয়্যাক্টর চালু করবার জন্যে যে পারমাণবিক ইন্ধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা ঐ সকল রাষ্ট্রকে আমেরিকাই জুগিয়ে থাকে।

এতকাল কয়লা, তেল ও গ্যাসকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব ইন্ধনের স্থলে পরমাণু-শক্তিকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করলে খরচ যে খুব বেশী পড়ে, তা নয়। যেখানে প্রচুর কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সে সকল অঞ্চল সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

পরমাণু-শক্তির সাহায্যে রিয়্যাক্টরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে। ঐ সকল কারখানা খুব পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাছাড়া সেখানে কোন রকম আওয়াজ হয় না। পারমাণবিক ইন্ধন আকারে খুবই ছোট এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এর অপচয়ও অতি সামান্যই হয়ে থাকে এবং যথাস্থানে এদের সরিয়ে নিয়ে আসাও তেমন কঠিন কাজ নয়। ফলে পারমাণবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ-শক্তির কারখানার পরিবেশকে ছিমছাম রাখা যায়।

কয়লা, তৈল প্রভৃতি জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার সময় প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, অপচয়ের পরিমাণও প্রচুর হয়ে থাকে। কয়লা জমা রাখবার জন্যে প্রচুর স্থান এবং

পরিবহনের জন্যে গাড়ীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। কয়লার ধোঁয়া আবহাওয়াকে খুবই অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই সকল সমস্যা পরমাণু-শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে দেখা দেয় না। বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অভিমত—ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের খরচ অনেক কমানো যাবে।

ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জেনারেটরে যে ইন্ধন ব্যবহার করা হবে, তা সংগৃহীত হবে সমুদ্র থেকে। রিয়্যাক্টরে ভারী হাইড্রোজেন ব্যবহার করে অসম্ভব রকমের সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হবে।

গবেষণাগারের পরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে—যে ইন্ধনটি রয়েছে সমুদ্রের জলে, তা ব্যবহার করে ফিউশন বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় বিপুল শক্তি উৎপাদন করা হবে। দুই পরমাণুর মিলনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনই এর মূল কথা। ফিশন-পদ্ধতিতে পরমাণু ভেঙে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

সংযোজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এখনও বহু রকমের কঠিন কারিগরী সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছেন।

এই ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হলে অফুরন্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। মানুষ তা কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে যেমন কৃষিকার্যে ব্যবহার করতে পারবে, তেমনই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ থেকেও নানা রকম সম্পদ আহরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে। সে দিন মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানের ফলে পৃথিবীতে স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তির পথও রচিত হবে।

মানুষের বিবর্তন-পথের নূতন নিশানা

বিবর্তনবাদ অনুসারে বানরসদৃশ কোন প্রাণী থেকেই মানুষের অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে এরা কখন যে বিবর্তনের পথে বংশানুক্রমের ধারায় মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই তা জানবার চেষ্টা করছেন। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেকার বিস্মৃত যুগের কঙ্কালের সন্ধানে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা দেশ-দেশান্তরে গিয়েছেন, কিন্তু এতকাল এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নি।

সম্প্রতি দু-জন বিজ্ঞানী অধুনালুপ্ত এক-প্রকার জীবের দুটি চোয়ালের জীবাশ্ম বা ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন। চোয়াল দুটি পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ার রুডল্ফ্ হ্রদের উত্তর দিকে এক স্রোতস্বিনীতে। 1969 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পি. ক্লার্ক হাওয়েলের নেতৃত্বাধীনে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে তথ্যানুসন্ধানী এক অভিযানের ফলেই এই নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর এলুইন এল. সাইমন্স্ এবং ডক্টর ডেভিড আর. পিলবিন এই দুটি জীবাশ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন যে, এই চোয়াল দুটি এক প্রকার স্তন্যপায়ী দ্বিপদ জীবের। এরা আশী লক্ষ থেকে দেড় কোটি বছর পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিচরণ করতো। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোন্‌টিতে যে এই সকল জীবকে ফেলা হবে, অর্থাৎ ঐ জীবটি দেখতে মানুষের মত না বানরের মত ছিল—এই সম্বন্ধে তাঁরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি।

তবে ডক্টর সাইমন্স্ এই সম্পর্কে বলেছেন যে, গঠন-প্রণালীর দিক থেকে এই জীবটিই প্রাচীনতম মানুষের পূর্বপুরুষ। এর নামকরণ করা হয়েছে রামাপিথেকাস। অস্ট্রোপিথেকাসজাতীয় জীব থেকেই মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এদের সঙ্গেই রয়েছে মানুষের নিকটতম সম্পর্ক। রামাপিথেকাস এদেরই পূর্বপুরুষ।

ডক্টর সাইমন্স্ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—যে দুটি নিদর্শন আমরা সনাক্ত করেছি, তাদের সঙ্গে অস্ট্রোপিথেকাসজাতীয় জীবের বহু ক্রিয়ামূলক সাদৃশ্য রয়েছে, যাতে মনে হয় রামাপিথেকাসজাতীয় জীবের সঙ্গে বানরগোষ্ঠীর নিকট সম্পর্ক না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী।

1920 সালের শেষের দিকে এবং 1930 সালের প্রথম দিকে ভারতের ভূগর্ভ থেকে চোয়ালের হাড়ের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছিল, সে সকল জীবাশ্ম নিয়ে ডক্টর সাইমন্স্ ও ডক্টর পিলবিন গবেষণা করেছিলেন। এই সকল নিদর্শন বৃটিশ মিউজিয়াম এবং কলিকাতার মিউজিয়ামে একজাতীয় অধুনালুপ্ত বানরের চোয়ালের জীবাশ্ম বলে প্রদর্শিত হয়েছে। এই শ্রেণী নির্ধারণ এবং এদের কোন অধুনালুপ্ত বানরের চোয়াল বলে অভিহিত করা ঠিক হয় নি বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা মানুষের পূর্বপুরুষ কোন জীবের চোয়াল দেখে সেই জীবটির খাদ্যের বিবরণ দিতে পারেন। তাদের তথ্যানুসন্ধানে দাঁত খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন বিজ্ঞানী ঐ জীবাশ্মের চোয়ালের দাঁতের পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে বলেছেন—এটি যে বানরজাতীয় কোন জীবের নয় তার প্রমাণ—এতে অংশতঃ আবৃত কোন বৃহৎ খদন্ত নেই। কিন্তু যে কোন বানরজাতীয় জীবের চোয়ালে এই জাতীয় দাঁত থাকবেই। এই দাঁত না থাকবার জন্যে রামাপিথেকাসজাতীয় জীবেরা কোন জিনিষ বেশ চিবিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু বানরজাতীয় জীবেরা খদন্তের জন্যে তা পারে না। তারা উপর ও নীচের দাঁতের মধ্যে কোন জিনিষ ফেলে চেপে নিয়ে গিলে ফেলে। তারা চোয়াল পাশেরদিকে ঘোরাতে পারে না।

ডক্টর সাইমন্স্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, নীচের এবং উপরের—উভয় অংশের চোয়ালের গঠনপ্রণালী দেখে মনে হয়, এই দুটি মানবজাতীয় জীবেরই চোয়াল। কারণ খাদ্যবস্তু চিবানোর ব্যাপারে এদের সঙ্গে মানুষের বহু রকমের সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

তাঁরা বলেছেন যে, বানরের মাড়ির দাঁতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি একই সঙ্গে ওঠে। কিন্তু মানুষের বেলায় ঐ সকল পেষক দন্ত একটির পর একটি বিভিন্ন সময়ে ওঠে। রামাপিথেকাসের চোয়ালের হাড় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ সকল পেষক দন্তের পিছনের দিকে ক্ষয় খুব কম হয়েছে—মানুষের বেলায়ও তাই হয়ে থাকে।

এতে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মনুষ্যজাতীয় পরবর্তী জীবের মত রামাপিথেকাসজাতীয় জীবের জীবনের বেশীর ভাগ সময় শৈশব ও কৈশোর অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব এবং তার সৃষ্টির পথের সন্ধান আজও সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নি। তবে প্রাক্‌মানব যুগ সম্পর্কে যে সন্দেহ ছিল, তা এই আবিষ্কারটি অনেকখানি নিরসন করছে।

ভূ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অতীতের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই কয়টি নিদর্শন কয়েকটি মুহূর্তের প্রতীক মাত্র। এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর পূর্বে। আর মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের প্রায় 300 কোটি বছর আগে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে।

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাত্র এক-শ' বছরের কিছুটা আগে 1850 ও 1860 সালে আবহাওয়াবিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ কতটুকুই বা জানতো! তখন অনেকে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনাও করতো। কিন্তু তারা এই বিষয়ে প্রায় কিছুই করে নি—এমন কি, বোঝবারও চেষ্টা করে নি। সে দিন প্রকৃতিতে ঝড়, জল যা কিছু ঘটেছে, তাকে সাধারণ ঘটনা বলেই তারা মেনে নিয়েছে। তবে আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ঐ সময়েই প্রথম স্থির করেন যে, তাপমাত্রা, আবহমণ্ডলের চাপ ও বাতাসের গতির ক্ষেত্রে যা ঘটছে, যে উঠানামা চলছে—তার একটা হিসাব রাখতে হবে—একটা মানচিত্র রচনা করতে হবে। কারণ এগুলির মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই তথ্যানুসন্ধানের ফলেই ভীষণ ঝড়ো আবহাওয়ার রূপ ও তার গতি-প্রকৃতিও সে দিন তাঁরা জানতে পেরেছিলেন।

দিনের পর দিন আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়ে থাকে, মানুষ তা লক্ষ্য করে এসেছে। এই পরিবর্তনের উৎস যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে, তাও এর ফলে সে জানতে পেরেছে। কিছুটা রয়েছে আকাশের উপরের দিকে, আর কিছুটা রয়েছে তার অনেক ঊর্ধ্বে।

পৃথিবীর উপরে রয়েছে অন্তহীন বাতাসের সমুদ্র। এই বাতাসের গতি-প্রকৃতির দ্বারাই যে আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে—এই কথা আজ আর কারো অজানা নেই। সারা পৃথিবীব্যাপী এই বাতাসের গতি-প্রকৃতি খুবই জটিল। নানা দেশের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে গত এক-শ' বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই কথা উপলব্ধি করেছেন, সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। বিগত এক-শ' বছরের বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার প্যাটার্ন বা প্রকৃতি ও রূপ বিশ্লেষণ করে কোন একটি স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস যে জ্ঞাপন করা যেতে পারে, তাও বিজ্ঞানীরা এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানতে পেরেছেন।

আবহবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীর একটা বিরাট এলাকা জুড়ে আবহমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন স্থানের তাপ, চাপ ও বাতাসের গতির মাত্রার হিসাব একই সময়ে নেওয়া যায় নি এবং সেই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কে ব্যাপক মানচিত্র রচনার জন্যে যথাশীঘ্র কোন দপ্তরে পাঠানোও সে দিন সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ। নানা প্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই সকল স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের চাপ, গতি ও তাপমাত্রার নিখুঁত হিসাব একই সময়ে পৃথিবীতে সরবরাহ করে যাচ্ছে, আর পাঠিয়ে যাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থানের মেঘের গঠন বা প্যাটার্নের চিত্রাবলী।

আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বার্তার দ্রুত আদান-প্রদানের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে টেলিগ্রাফই ছিল দ্রুত বার্তা প্রেরণের প্রধান বাহন। তার পরে উদ্ভাবিত হয়েছে বেতার বা রেডিও। এটি বার্তা আদান-প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা। যেখানে টেলিগ্রাফের তার বা সমুদ্রগর্ভ দিয়ে বিদ্যুদ্বাহী তার স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, সেখানে এবং দূর সমুদ্রে কোন জাহাজে বার্তার আদান-প্রদান রেডিওর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বেতারের মাধ্যমেই আজ আবহাওয়া সম্পর্কে যেমন তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে, তেমনি কৃত্রিম

উপগ্রহসমূহও টেলিভিশনের মাধ্যমে মেঘের চিত্রাবলী পৃথিবীতে পাঠিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের দিগন্ত আজ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে বসেই তথ্যানুসন্ধান করেন না, বর্তমানে তাঁরা পৃথিবীর কিছুটা উপরে বিমান ও বেলুন পাঠিয়ে এবং তারও উর্ধ্বে মহাকাশযানের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আবহবিজ্ঞানের আওতায় এখন বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি বিষয়গুলিও পড়ে। এছাড়া জীবতত্ত্ব এবং কৃষির পক্ষে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব যে কতখানি, এই বিষয়ে গবেষণার ফলে তা বিশেষভাবে জানা গেছে। শীত, গ্রীষ্ম অর্থাৎ ঠাণ্ডা, গরম এবং আর্দ্রতার সূর্যের নানা রকমের তাপে মানুষ এবং পশুর স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়ে থাকে। তারপর ঘূর্ণিবাত্যা, শিলাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝায় মানুষের ধনসম্পত্তি ও ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়ে থাকে—এমন কি, জীবনহানিও ঘটে। এই অশান্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেলে মানুষ এই সকল দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আজ মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

অনেক দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়মিতভাবে প্রথমেই চাষীদের দেওয়া হয়। ফসল কখন রোপণ করতে হবে, কখন রোপণ করলে বেশ ভাল বর্ষা এবং ফসল তোলবার সময়ে বেশ ভাল রোদ পাওয়া যাবে, তা প্রায় সকল দেশের চাষীরাই নিজ নিজ দেশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে অনেক কাল থেকেই মোটামুটিভাবে জেনে আসছেন। তবে আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস পেলে ফসল রোপণ ও ফসল তোলবার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালের শিল্পযুগের মানুষেরা আবহাওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আবহবিজ্ঞানীরাও এই সকল বিষয় সম্পর্কে সচেতন। তবে এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রতি তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে; যেমন—শিল্প প্রসারণের ফলে কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং বড় বড় সহরে এই ধোঁয়া ও কুয়াসা মিলে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াসার। মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানের কিছুটা নীচে বিশেষ অঞ্চলে এই ধোঁয়াসা সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধোঁয়াসার পূর্বাভাস দেওয়া আবহবিজ্ঞানীদের একটা মস্ত বড় কাজ। এছাড়া বাতাস বা আবহাওয়া দূষিত হবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আবহবিজ্ঞানীদের অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

তারপর আবহাওয়ায় কার্বন ডায়োক্সাইড কি এই পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে, তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে? অথবা যে সকল বস্তুকণা আবহাওয়াকে দূষিত করে ও আবহাওয়ায় ভেসে থাকে, সেগুলির উপর সূর্যকিরণ পড়ে প্রতিফলিত হয়—এই প্রতিফলনের ফলে পৃথিবী কি শীতল হবে? বাতাসের ক্ষুদ্র বস্তুকণা মেঘের গঠনে কি সাহায্য করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবহবিজ্ঞানীদের দিতে হবে।

আবহবিজ্ঞানীদের সীমানা আজ মাত্র আবহাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আবহাওয়ার সঙ্গে সমুদ্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, মেরুঅঞ্চলের চিরতুষারাবৃত স্থানের সঙ্গে এবং মহাদেশসমূহের পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও প্রান্তরের সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজ আবহবিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বেই প্রসারিত।

আবহাওয়া দূষিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিই মাত্র মানুষের দৃষ্টি আজ আবদ্ধ নয়, আব-

হাওয়ার পরিবর্তন কিভাবে করা যেতে পারে, তারও চেষ্টা আজ হচ্ছে। বর্তমানে বিশেষ অবস্থায় তুষার ও বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। কালক্রমে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ঝড়কেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে অথবা তার গতি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

সিমেণ্ট-বালির নৌকা

এই সম্বন্ধে জ্যাক ক্লিমেন্টস লিখেছেন—একেবারে গোড়ার দিকে বৃটেনের নৌশক্তির খ্যাতির মূলে ছিল তার ওক-নির্মীত কাঠের জাহাজগুলি। তারপর বৃটেনই প্রথম লৌহ-নির্মিত জাহাজের সূচনা করলো—যার ফলে আজকের বিরাট ইস্পাতের তৈরি জলযানগুলি দেখা যাচ্ছে। এবার নরফোকের (দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড) ওরক্যাসহ্যামের একটি বৃটিশ ফার্মে নৌকা নির্মাণের আর একটি নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই নতুন উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে সীক্রিট (Seacrete)। এর মধ্যে থাকে প্রধানতঃ বালি ও উচ্চ মানের সিমেণ্ট। প্রায় 10 বছর আগে এটি উদ্ভাবিত হয় এবং বর্তমানে এই উপাদানে তৈরি 200-এরও বেশী জলযান 19টি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। সীক্রিটের সাহায্যে জাহাজের খোল তৈরি হচ্ছে 10টি দেশে এবং আরও অনেক অনুমতি-পত্রের আবেদন নিয়ে আলোচনা চলছে।

চিরাচরিত উপাদানে তৈরি জাহাজের খোল-গুলির চেয়ে সীক্রিটের খোলগুলির সুবিধা অনেক-বেশী। বড় রকমের সংঘর্ষেও এর সামান্যই ক্ষতি হয়। এর আগুন বা চাপ সহ্য করবার শক্তি অসাধারণ। একে রক্ষণাবেক্ষণ করাও সহজ। মেরামতির কাজ সঙ্গে সঙ্গে করা চলে এবং কাঠের তৈরি জাহাজের খোলের মেরামতের এক-দশমাংশ সময় লাগে।

অন্যান্য উপাদানে তৈরি একই মাপের জাহাজের তুলনায় সীক্রিটে তৈরি জাহাজে জায়গা বেশী পাওয়া যায়। সীক্রিটের নৌকা বা জাহাজ তৈরি করতে হলে বিশেষ কাঠামোর (প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা) প্রয়োজন হয় না বলে তুলনামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে ব্যয় অনেক কম।

সীক্রিট জলীয় বাষ্প টানে না, সে জন্যে দুর্গন্ধ হবার আশঙ্কা নেই। এই উপাদান বিদ্যুৎ-প্রতিরোধীও বটে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা (যার মধ্যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা এফ-এ-ও রয়েছে) সীক্রিটের দ্বারা মাছ-ধরা নৌকা তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন।

শুধু মাছ-ধরবার কাজে নয়, সীক্রিটে তৈরি জলযান নাইজেরিয়ার পুলিশ প্রহরী নৌকা, ফেরি নৌকা, গায়নার টাগবোট, সৌদি আরবে জলবাহী নৌকা এবং পৃথিবীর বহু দেশে বন্দর লঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বার্জ, বয়া ও অন্যান্য বন্দর-সরঞ্জাম তৈরির কাজেও সীক্রিটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সীক্রিট জাহাজ-নির্মাতা ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডোনাল্ড হ্যাগেনব্যাক গত বছর অক্টোবরে ভারত সফর করেন এবং সম্ভাব্য সীক্রিট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—এটাই স্বাভাবিক যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিষ সৃষ্টি করে নেবে। সীক্রিট তৈরি করবার মত কাঁচামাল সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং শ্রমিকদের শিখিয়ে দেওয়াও কঠিন কাজ নয়। ভারতে এই ধরণের নৌকা তৈরির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

ভারতীয় প্রাইমেট

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

প্রাইমেট হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি শ্রেণী, মানুষও যার অন্তর্গত। সুতরাং এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব জন্তু অন্তর্ভুক্ত, তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও মানুষের খুবই কাছকাছি। কাজেই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে এদের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যে সব প্রাইমেট বর্তমানে জীবিত আছে, তাদের মধ্যে গরিলা এবং শিম্পাঞ্জি মানুষের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। এরা আফ্রিকার অধিবাসী। তার পরেই আসে ওরাং ওটাং; এরা সুমাত্রা ও বোর্নিওর অধিবাসী।

ভারতবর্ষে যে সব প্রাইমেট বাস করে, তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লেজহীন মর্কট (Ape),

(খ) লেজবিশিষ্ট বানর (Monkey),

(গ) নিশাচর বৃহচ্চক্ষু বানর (Loris)

লেজহীন মর্কট

এদের সাধারণ নাম গিবন। এরা Hylobates গণভুক্ত। এদের ছয়টি বিভিন্ন প্রজাতি (Species) আছে—যারা সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা। হাইলোবেটস-এর কেবল দুটি Species ভারতবর্ষে দেখা যায়। তার মধ্যে Hylobates hoolock অতি পরিচিত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে, যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এরা বাস করে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে লতাপাতায় আচ্ছাদিত ঝোপের ভিতর থাকতে এরা ভালবাসে। তবে খাবার সময় বহু উঁচু গাছের ডালের উপর উঠে যায় আবার মাটিতে নেমে ঝর্ণার জল পান করে। এরা দিবাচর

1নং চিত্র
গিবন

প্রাণী। এদের খাবার হলো বনজ ফল, পাতা ও ফুল। মাঝে মাঝে পাখীর ডিম এবং বাচ্চা

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

পাখীও খেয়ে থাকে। এরা আদিম যুগের মানুষের মতই কখনও স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে না।

লেজহীন এই মর্কটগুলি দেখতে প্রায় মানুষের মতই লম্বা, এদের সারা শরীর ঘন কোঁকড়া লোমে আবৃত। জন্মের সময় দেহের রং হয় ধূসর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের রং হয়ে যায় কালো। যৌবনে স্ত্রী হাইলোবেটসের রং থাকে পিঙ্গল বর্ণের, কিন্তু পুরুষের রং কালোই থেকে যায়, কেবল চোখের পাতাগুলি সাদা ঘন লোমে ঢাকা থাকে। মানুষের মতই এদের মোট 32টি দাঁত। বাহু দুটি পায়ের তুলনায় অনেক লম্বা। কখনও কখনও হাতে-পায়ে আবার কখনও মানুষের মত দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে চলাফেরা করে। রাতের বেলায় গাছের ডালে ঘন পত্রগুচ্ছের মধ্যে ঘুমায়।

বনের মধ্যে এরা ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটি দল হলো এক-একটি পরিবার, যার মধ্যে থাকে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী এবং তাদের তিন-চারটি বাচ্চা। বাচ্চারা পরিণত বয়স হলে নিজেদের সঙ্গী খুঁজে নিয়ে বাপ-মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক একটি পরিবার জঙ্গলের মধ্যে 250 থেকে 300 একর জায়গা জুড়ে বিচরণ করে এবং তারই মধ্যে উৎপন্ন ফল, ফুল ইত্যাদি খাবার খায়। এই সীমানার মধ্যে অন্য কোন পরিবার ঢুকে পড়লে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়।

সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে না। ঋতুকালে (Menstrual cycle) এবং গর্ভবতী অবস্থায়ও স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হয়। স্ত্রী-গিবনের নিয়মিত ঋতুকালের ব্যবধান 20 থেকে 33 দিন এবং 2 থেকে 4 দিন তা স্থায়ী হয়। স্ত্রী-গিবন 220 দিন গর্ভধারণের পর মানুষের মতই একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চারা জন্মের পর মায়ের কোলে-পিঠেই পালিত হয়। বাচ্চা প্রায় 2 বছর স্তন্যপান করে এবং 7-8 বছর বয়সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। এদের আয়ুষ্কাল 30 থেকে 32 বছর।

লেজবিশিষ্ট বানর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বানর দেখা যায়। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্রই বানর সুপরিচিত। গাছের ফল, পাতা, আলু, ধান, গম এবং ছোট ছোট পোকামাকড়ও খাদ্য হিসাবে এরা গ্রহণ করে থাকে। এরা দিবাচর প্রাণী (2নং চিত্র)।

দেহের উচ্চতা বিভিন্ন জাতের বানরের বিভিন্ন রকমের। এদের হাত-পা দেহের তুলনায় বেশী লম্বা, দেহ নানা রঙের লোমে আবৃত। এদেরও দাঁত মোট 32টি। সাধারণভাবে লম্বা লেজটি গুটিয়ে অথবা উপরের দিকে তুলে হাত ও পায়ে ভর দিয়ে এরা চলাফেরা করে—কখনও আবার দু-পায়ে ভর দিয়েও দাঁড়ায়। এরা এক-এক দলে সংখ্যায় অনেকগুলি করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাবালক পুরুষ বানর থাকে মাত্র একটি। পুরুষ বানর দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দলের নেতৃত্ব করে। স্ত্রী-বানরের কাজ বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালন করা।

ভারতবর্ষে যে বানর হনুমান নামে পরিচিত, তারা এক সঙ্গে তিন থেকে এক-শ' কুড়িটি পর্যন্ত দল বেঁধে বাস করে। একটি দলে সাধারণতঃ যে পুরুষ থাকে, তাকে বলা হয় বীর হনুমান বা দলপতি। বাকী সবাই স্ত্রী-বানর অথবা বাচ্চা। অন্য কোন পুরুষ সেই দলে প্রবেশ করলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং যে জয়লাভ করে,

সেই দলপতি হয়। আবার কোন কোন সময় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটি দলে একাধিক পুরুষও কর্তৃত্ব করে থাকে। স্ত্রী-বানরের মধ্যে যে দলপতিকে বেশী সঙ্গ দান করে, কারণ, স্ত্রী-বানরেরা স্বভাবতঃই বাচ্চা ভালবাসে। তারপর তারা মায়ের কাছে বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেয় এবং মা তার বুকের দুধ দিয়ে বাচ্চাকে পালন করে। কিন্তু সাধারণতঃ দু-বছরের মধ্যে

2নং চিত্র
বানর

সে কিছুটা রাণীর মত কর্তৃত্বে আসীন হয়। কিন্তু সন্তান প্রসব করলেই দলপতির বিরাগ-ভাজন হয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে অবহেলিত অবস্থায় দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

স্ত্রী-হনুমানের ঋতুকাল ত্রিশ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয়। এরা গর্ভবতী হবার 168 দিন পরে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতি যখন বেদনা অনুভব করে তখন তিন থেকে আটটি বানর তাকে ধাত্রীর কাজের জন্যে ঘিরে ধরে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাটিকে সরিয়ে নেয় এবং দু-এক দিন ধাত্রী-বানরেরা এই বাচ্চাকে যত্ন করে— মায়ের কোলে যদি অন্য সন্তান আসে, তখন মা বাচ্চাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেয়। মা যদি পুরুষ বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার ভয়ের সীমা থাকে না। দলপতি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে পুরুষ শিশুটিকে সুবিধা পেলেই হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে না। কোনক্রমে রক্ষা পেলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে সে দলপতির মন জয় করে এবং দলের মধ্যে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

ভারতবর্ষে যে সব বানর দেখা যায়, এখানে তাদের নাম, প্রাপ্তিস্থান এবং অন্যান্য পরিচিতি দেওয়া হলো।

নাম	প্রাপ্তিস্থান	দেহের রং	মুখ	লেজ
1. Macaca radiata ম্যাকাকা রেডিয়েটা (Bonnet monkey)	গোদাবরী নদী ও সাতারা পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল।	ধূসর পিঙ্গলাভ, পেটের তলা ফিকে।	হাল্কা গোলাপী অথবা লাল্চে কপালে ছোট ছোট লোম।	দেহের দৈর্ঘ্য থেকে বড়, নরম লোমে আবৃত।
2. Macaca silenus ম্যাকাকা সাইলিনাস। (Lion tailed monkey)	পশ্চিমঘাট পর্বত-মালা হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত	কালো	কালো	দেহের দৈর্ঘ্যে অর্ধেক অথবা ⅔ ভাগ। শেষ ভাগে গুচ্ছ লোম থাকে।
3. Macaca mullata ম্যাকাকা মুলেটা। (Rhesus monkey)	সমগ্র উত্তরভারত	পিঙ্গলবর্ণের, পেটের তলা ফিকে।	লাল্চে	দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক, প্রচুর লোম থাকে।
4. Macaca assam-ensis. ম্যাকাকা অ্যাসামেনসিস (Assamese monkey)	আসাম,সুন্দরবন, মিশমি ও নাগা পার্বত্যাঞ্চল	হলুদ বর্ণ থেকে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের	মুখের পাশ লাল্চে, চোখের তলা কালো।	দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অর্ধেক থেকে ⅔ ভাগ।
5. Macaca speciosa ম্যাকাকা স্পিসিওসা (Stump tailed monkey)	আসাম	কাল্চে	লাল্চে কপাল কোঁচকানো	লেজ দীর্ঘ, লেজে অল্প লোম।
6. Presbytis entellus (Semno-pithecus entellus) প্রেসবিটিস এন্টেলিস (Hanuman monkey)	ভারতের সর্বত্র	ধূসর, কাল্চে অথবা পিঙ্গল	মুখ খুবই কালো	লেজ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়

এই প্রজাতিগুলি ছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রতিটি জাতির অনেক উপ-প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়।

নিশাচর বৃহচ্চক্ষু লোরিস

ভারতে দু-জাতের লোরিস দেখা যায় অর্থাৎ স্লেণ্ডার লরিস (Loris tardigradus) এবং স্লো লোরিস (Nycticebus coucang)। প্রথমোক্ত জন্তুটি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয়টি আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখা যায়।

এরা সাধারণতঃ গাছের ফল, কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট গিরগিটি ও পাখী খেয়ে জীবন-

ধারণ করে। রাত্রিবেলা ছাড়া এরা বের হয় না, জঙ্গলের মধ্যে অনেক উঁচু গাছের ডালে, ঝোপের মধ্যে অথবা কোটরের মধ্যে থাকে।

3নং চিত্র
লোরিস

দেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে আবৃত, হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান, কান বড় এবং গোলাকার। চোখের আকৃতি দেখে মনে হয় যেন চশমা পরে আছে। স্লেণ্ডার লোরিসের লেজ নেই, স্লো লোরিসের লেজ খুব ছোট এবং লোমে ঢাকা।

এরা সাধারণতঃ একাকী ঘুরে বেড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় এদের দেখা যায় না। এদের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, চলবার সময় এরা ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করে। বোধ হয় ঐ প্রস্রাবের গন্ধ ইচ্ছামত তাদের যে কোন অঞ্চলে বিচরণের সময় নির্ধারিত স্থান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এরা সাধারণতঃ 160 দিন গর্ভধারণের পর একটি অথবা কখনও কখনও ছুটি বাচ্চা প্রসব করে। ছু-সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এরা মায়ের স্তন্যপান করে। প্রকৃতপক্ষে এরা অন্য সব প্রাইমেট অপেক্ষা একটু নিম্নস্তরের।

ধূমকেতুর কথা

রতনমোহন খাঁ*

অসীম নীল আকাশের বুকে ছোট-বড় অগণিত জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায়, ছু-একটি আগুনের গোলা একদিক থেকে অন্য দিকে গিয়ে অসীম আকাশে হারিয়ে যায় চিরদিনের মত। এগুলিকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড। আবার কখনও কখনও বিশাল পুচ্ছসমন্বিত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে আকাশের বুকে। এদেরই নাম ধূমকেতু। আদি ও মধ্যযুগে ধূমকেতুর উদয়ে মানুষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তো। তাদের ধারণা ছিল—ছর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অশুভের সূচক এই ধূমকেতু। বর্তমান প্রবন্ধে এই ধূমকেতু সম্বন্ধেই মোটামুটি আলোচনা করবো।

ধূমকেতু অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ধূমকেতু সাধারণতঃ তিনটি অংশে গঠিত—(1) উজ্জ্বল অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াস (Nucleus), (2) উজ্জ্বল অগ্রভাগের চারপাশে ধূম্রাবৃত আবরণ বা কমা (Comma), (3) শুভ্র উজ্জ্বল দীর্ঘ পুচ্ছ।

কতকগুলি বিশাল ধূমকেতু মহাবিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভার। হাজার হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট উজ্জ্বল গোলকের অগ্রভাগ থেকে ছড়িয়ে পড়ে যেন অসংখ্য আগুনের ফোয়ারা আর পিছনে থাকে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছ। এই

* সিটি কলেজ, কলিকাতা—9

বিশাল বস্তু সূর্যের দিকে যতই অগ্রসর হতে থাকে, পুচ্ছের সৌন্দর্য যেন ততই নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতু খুবই হাল্কা, এদের ঘনাঙ্ক পৃথিবীর ঘনাঙ্কের প্রায় $\frac{1}{100000000}$ ভাগ। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বিশেষ করে বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলে ধূমকেতুর মধ্যে CO, CH_2, CH, CN, NH_2, OH, NH, C_2, N_2 প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হবার ফলে ধূমকেতু উজ্জ্বল রঙে সুশোভিত হয়ে ওঠে। ধূমকেতু মূলতঃ সূর্যকিরণে আলোকিত হলেও এর অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে। অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াসের ব্যাস 100 মাইল থেকে 50000 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। ধূমকেতুর অগ্রভাগ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখায়। অগ্রভাগের চারপাশে ধূমায়িত আবরণ বা কমা একটি বিরাট গোলকের মত। এই গোলকের ব্যাস 18000 মাইল থেকে 1150000 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশের বুকে ধূমকেতুর অগ্রভাগটি প্রথম দেখা দেয় একখণ্ড আব্ছা মেঘের মত। কোন ধূমকেতু সূর্য থেকে 250,000,000 মাইল দূরে থাকলে অনেক সময় দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে থাকে, ততই তার অগ্রভাগ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে আর স্ফীতকায় পুচ্ছের আবির্ভাব ঘটে। ধূমায়িত অংশ হচ্ছে অগ্রভাগের আবরণের মত। অগ্রভাগকে মাঝে মাঝে পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। Donati-র ধূমকেতুকে কয়েক দিনের মধ্যে সাতবার আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা গিয়েছিল। Tebbutl-এর ধূমকেতু ছ-সপ্তাহে একবার আবরণ পরিত্যাগ করে। Morehouse-এর ধূমকেতুর ধূমায়িত আবরণ ও পুচ্ছ পরিবর্তনের কথা সুবিদিত।

দীর্ঘ পুচ্ছই ধূমকেতুর বিশেষ আকর্ষণ। Maxwell, Lebedeff, Nichols, ও Hull প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, আলোক-তরঙ্গের চাপের ফলেই এই হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের সৃষ্টি হয়। পুচ্ছের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা পরিবর্তন সূর্য থেকে এর অবস্থানের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত ধূমকেতুর কোন পুচ্ছ দেখা যায় না। ধূমকেতু যতই সূর্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, উজ্জ্বল অগ্রভাগের আকৃতি ততই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় আর পুচ্ছটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। অনুসূর (Perihelion) বিন্দুটি (সূর্যের নিকটতম বিন্দু) অতিক্রম করবার পরেই অগ্রভাগের আকার আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পুচ্ছটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। ধূমকেতুর অগ্রভাগটি থাকে সূর্যের দিকে আর পুচ্ছটি থাকে সূর্যের বিপরীত দিকে। আমরা জানি, আলোক-তরঙ্গের চাপ বস্তুর বহির্ভাগের ক্ষেত্রফলের উপর আর মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ বস্তুর আয়তনের উপর নির্ভর করে। তাই স্বল্প ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গের চাপ মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ অপেক্ষা বেশী। এই সকল কারণ পর্যালোচনা করে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সূর্যরশ্মির চাপে সূক্ষ্মকণাগুলি অগ্রভাগ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুচ্ছের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে এই চাপ এত প্রবল হয় যে, পুচ্ছটি অগ্রভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যায়। সূর্যরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফলে ধূমকেতুর পুচ্ছ কখনও কখনও নানা রঙে রঞ্জিত অবস্থাতেও দেখা যায়। 1861 খৃষ্টাব্দে প্রায় 24,000,000 মাইল দীর্ঘ 1000 মাইল বিস্তৃত বিশাল পুচ্ছধারী ধূমকেতু জ্যোতিবিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে। একাধিক পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুও দেখা যায়। 1744 খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ছয় পুচ্ছবিশিষ্ট একটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। 1903 খৃষ্টাব্দে Borelly নয় পুচ্ছবিশিষ্ট একটি ধূমকেতুর সন্ধান পান। 1861

খৃষ্টাব্দে 23 রঙে রঞ্জিত চার পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু জ্যোতির্বিদ্গণের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। 1823 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর দুই পুচ্ছের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ছিল 160°।

ধূমকেতুর কক্ষপথ সাধারণতঃ তিন রকমের; যথা—অধিবৃত্ত (Parabola), উপবৃত্ত (Ellipse) ও পরাবৃত্ত (Hyperbola)। আমাদের পৃথিবীর মত কতকগুলি ধূমকেতু সূর্য পরিক্রমা করে। আজ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হলেও মহাবিশ্বের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

মানমন্দিরের বিবরণী ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে যতদূর জানা যায়, শতকরা 75টি ধূমকেতুরই পরিক্রমার পথ অধিবৃত্ত। অনেকের মতে, সব ধূমকেতুরই কক্ষপথ উপবৃত্ত, তবে এই পরিক্রমার পথ এত বড় (উৎকেন্দ্রিকতা বা Eccentricity প্রায় 1-এর নিকটবর্তী হবার জন্যে) যে, কয়েক হাজার বছর লাগে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে। তাই কোন ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যায় ক্ষীণজীবী মানুষের কাছ থেকে। সাধারণতঃ এক-শ' বছরে এক থেকে কুড়িটি ধূমকেতু দেখা যায়। একজন মানুষ তার জীবনে মোটামুটি এক ডজন ধূমকেতু দেখতে পারে।

দিনের বেলায় ধূমকেতু প্রথম দেখেন আফ্রিকার তিনজন রেলের কুলি। এই ঘটনাটি ঘটে 1910 খৃষ্টাব্দে। আজ পর্যন্ত প্রায় 50টি পর্যায়ক্রমিক (Periodic) ধূমকেতু দেখা গেছে, যাদের পর্যায়কাল 300 বছরের কম।

Halley-র ধূমকেতুর আবর্তনকাল 76 বছর। 1910 খৃষ্টাব্দে Halley-র ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল এবং আবার 1986 খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই ধূমকেতুকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে। 1811 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর আবর্তনকাল প্রায় 3000 বছর আর 1864 খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর আবর্তনকাল প্রায় 2,000,000 বছর। কতকগুলি ধূমকেতুর সূর্যের চারদিক পরিক্রমার পথ প্রায় একই ধরণের। এই ধূমকেতুগুলিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে ধরা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি ধূমকেতু থেকেই এদের উৎপত্তি হয়েছে।

সূর্যের চারদিক পরিক্রমা করলেও ধূমকেতুগুলিকে সৌরমণ্ডলের মধ্যে গণ্য করা হয় না। সৌরমণ্ডলের সবকিছু নিয়ম এরা মেনে চলে না। তাই এরা গ্রহ-সূর্যের মধ্যে অপাংক্তেয়। জ্যোতির্বিদ্দের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ধূমকেতুগুলি একই পথে ভ্রমণ করে না। গ্রহগুলির মধ্যে এরূপ পরিক্রমার পথ পরিবর্তন প্রায় দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ধূমকেতুকেই সৌরমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দিকে ঘুরতে দেখা যায়। Halley-র ও আরও কয়েকটি ধূমকেতুর গতি এর ব্যতিক্রম। ধূমকেতুর অগ্রভাগ ও পুচ্ছ প্রথমে সূর্যরশ্মি শোষণ করে পরে তা বিকিরণ করে। সূর্যরশ্মি এদের উপর প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয় এবং অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে; কিন্তু গ্রহগুলির নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা নেই। সূর্যের আলোকেই এরা আলোকিত এবং সূর্যরশ্মি এদের থেকে প্রতিফলিত হয়। তবে গ্রহগুলির মত ধূমকেতুরও গতিবেগ বৃদ্ধি পায়—যতই সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে; আর হ্রাস পায়—যতই সূর্য থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকে।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন। একদলের মতে, সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হবার সময় কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছে আর একদলের মতে, সূর্য বা গ্রহের বিস্ফোরণের ফলে এদের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন—সূর্যের আকর্ষণে সুদূর নীহারিকা থেকে কিছু অংশ ছিট্‌কে আসবার ফলে ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়েছে।

পুরাকালের অশুভ ইঙ্গিতবাহী ধূমকেতু

দুর্ভিক্ষ, মহামারী সৃষ্টি করতে না পারলেও পৃথিবীর উপর প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ইত্যাদি সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সময় সময় দু-একটি ধূমকেতু তাদের বিশাল কলেবর নিয়ে পৃথিবী বা সূর্যপৃষ্ঠের খুব নিকটে চলে আসে। 1680 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর সূর্যপৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব ছিল মাত্র 147,000 মাইল। 1882 খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এসে পড়ে। 1921 খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর কবল থেকে আমাদের এই পৃথিবী অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। 1910 খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আকাশের বুকে অপরূপ আলোকছটা দেখে জ্যোতির্বিদ্গণ বিস্মিত হয়ে যান। অনেকের ধারণা ধূমকেতুর পৃথিবীর অতি সান্নিধ্যের ফলেই বৃহৎ উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

ধূমকেতুর নাম তার আবিষ্কারকের নামানুসারেই রাখা হয়। কোন ধূমকেতু দেখা যায় তার গতিপথ, আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ Harvard College Observatory-তে জানিয়ে দিলে সেটি যদি কোন নূতন ধূমকেতু হয়, তাহলে সংবাদদাতার নামেই তা পরিচিত হবে।

চাঁদের পাথর

শ্রীঅলোককুমার সেন

1969 সালের 21শে জুলাই অ্যাপোলো-11 মহাকাশযানের দুই আরোহী আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন পদার্পণ করেন চাঁদের Sea of tranquility নামক অঞ্চলে। চাঁদের বুকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন পৃথিবীতে, সঙ্গে করে আনেন চাঁদের পাথর। আমেরিকাসহ পৃথিবীর আটটি দেশের এক-শ' পঞ্চাশ্ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চাঁদের পাথর নিয়ে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আমেরিকার গবেষকেরা গত 15ই সেপ্টেম্বর তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো চাঁদের পাথর বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। অবশ্য এই আলোচনার আগে বলা দরকার যে, কিভাবে তাঁরা পরীক্ষা চালিয়েছেন।

অ্যাপোলো-11-এর মহাকাশচারীরা যে সকল শিলাখণ্ড নিয়ে আসেন, সেগুলিকে রাখা হয় টেক্সাসের হিউস্টনের নিকটবর্তী মহাকাশ অভিযান কেন্দ্রে। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা চার বছরের চেষ্টায় ও 80 লক্ষ ডলার বা 6 কোটি টাকা খরচ করে বিশেষ একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। এখানেই চান্দ্রশিলার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়—জানা যায় তার ইতিহাস। শিলাগুলি যাতে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে না আসতে পারে, তার জন্যে বিজ্ঞানীদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ পৃথিবীর আবহাওয়া বা পার্থিব পদার্থের সংস্পর্শে এলে প্রস্তরখণ্ডের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে; তাছাড়া চান্দ্রশিলা থেকে সংক্রামক বীজাণু পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের পর ক্যাপ্সুল ও অভিযাত্রীদের সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ডসহ আধারগুলিকে উদ্ধারকারী জাহাজের সাহায্যে সরাসরি হিউস্টনে নিয়ে আসবার পর তাদের বহিরাবরণ অতিবেগুনী রশ্মি ও

বিভিন্ন অ্যাসিডের সাহায্যে বীজাণুমুক্ত করা হয়। তারপর সেগুলিকে ধোয়া হয় বীজাণু-মুক্ত জলে এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে শুকিয়ে নেবার পর আধার-গুলিকে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট জানালার মধ্য দিয়ে নিরাপত্তামূলক দস্তানা পরিহিত হাত ঢুকিয়ে শিলাখণ্ডগুলিকে বের করে আনেন।

প্রথমে প্রস্তরখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ, নির্গত তেজ-রশ্মি ও গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সেগুলির ওজন নেবার পর বিশেষভাবে স্থাপিত দুটি ক্যামেরায় তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরু হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। এই গবেষণার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা কোন কোন শিলাখণ্ডকে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে গলিয়ে ফেলেন বা উত্তপ্ত করে প্রথমে তরল ও পরে গ্যাসে পরিণত করেন আবার ঠাণ্ডায় আরো জমিয়ে ফেলেন।

তৃতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আরো কঠিন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা তেজ-নির্গমন পদ্ধতির সাহায্যে চান্দ্রশিলার বয়স নির্ণয় করেন এবং সেগুলির উপাদান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান।

এই সকল গবেষণার ফলে জানা গেল চান্দ্র-শিলার ইতিহাস। চান্দ্রশিলার বিশ্লেষণে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো—পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন সব পদার্থে চাঁদের দেহ গঠিত। অবশ্য এই বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, চাঁদের গঠন ও উপাদানের সঙ্গে পৃথিবীর গঠনে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরও জানা গেছে যে, চাঁদের ধূলাবালির অর্ধেকটাই কাচ দিয়ে তৈরী। এই কাচ অবশ্য পৃথিবীতে প্রাপ্ত কাচের মত নয়। এগুলি হলো খুব ছোট ছোট চক্‌চকে গোলাকার কণিকার সমষ্টি। আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন যে সব আলোকচিত্র তুলে এনেছেন, তা দেখে মনে হয় যে, তাঁরা বেগুনী রঙের কাচের আবরণের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। নব আবিষ্কৃত তথ্যাদি যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলা যায় যে, চাঁদের জন্মের প্রথম দেড়-শ' কোটি বছর চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর উল্কার আঘাত ও আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু গত তিন-শ' কোটি বছরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত কম বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের অবস্থা তা নয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—কয়েক কোটি বছর আগে ভূপৃষ্ঠ যে রকম সক্রিয় ছিল, আজও সেই রকম সক্রিয় আছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়-পর্বত এবং মহাদেশগুলি ক্রমেই দূরে সরে গেছে আর আগ্নেয়গিরিগুলি অগ্ন্যুদ্গীরণ করে চলছে। পক্ষান্তরে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চাঁদের মৃত্তিকায় কাচের অস্বাভাবিক উপস্থিতি, শিলায় তেজস্ক্রিয়তা এবং চাঁদের অবশিষ্টাংশের তুলনায় চান্দ্রশিলার ঘনত্ব বেশী—এই তিনটি তথ্য পর্যবেক্ষণ করে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পল গাষ্ট বলেছেন—চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এবার চান্দ্রশিলার উপাদান সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখা গেছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি পাথর একই জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য পদার্থসমূহ চাঁদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেমন—ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম ও জিরকোনি-য়াম। চাঁদের আগ্নেয়শিলায় শতকরা বারো ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, কিন্তু পৃথিবীর আগ্নেয়শিলায় এই যৌগিক পদার্থের উপস্থিতি এক-শ' ভাগে পাঁচ ভাগ মাত্র। চাঁদের

পাথরে প্রাপ্ত ক্রোমিয়ামের পরিমাণ পৃথিবীতে প্রাপ্ত ক্রোমিয়ামের দশ গুণ বেশী।

আবার এখানে যে সকল যৌগিক পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়, চাঁদে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। সীসা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও বিস্মাথের মত স্বল্প গলনাঙ্কের পদার্থ চাঁদে প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিস্ময়কর তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা এখনো জানা যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, চাঁদের শিলার গঠন পৃথিবীর শিলার গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় অথবা যে পদ্ধতিতে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তা অনুরূপ পার্থিব প্রক্রিয়া থেকে পৃথক হওয়ায় এই উপাদানগত বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

গত 5ই জানুয়ারী দু-জন বিশিষ্ট জাপানী বিজ্ঞানী হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্রে তাঁদের গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এঁদের একজন হলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ইকুয়ো কুশিরো আর অপর জন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর টাকেশী নাগাতা। এঁরা চান্দ্রশিলায় অ্যাপাটাইট ও ট্রলাইট নামক দু-রকমের দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। ডক্টর কুশিরো বলেন যে, মার্কিন মহাকাশ সংস্থা চান্দ্রশিলায় বিশ্লেষণে বারোটি খনিজ পদার্থের অবস্থিতি প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু এঁরা অ্যাপাটাইট বা ট্রলাইটের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। ট্রলাইট শুধুমাত্র উল্কাপিণ্ডেই পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব নেই।

ডক্টর নাগাতা চৌম্বক শক্তি বিষয়ক গবেষক দলের প্রধান। তাঁর মতে চান্দ্রশিলার মধ্যে চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই বিজ্ঞানীদ্বয়ের ধারণা—চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে চার-শ' পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। তাঁরা আরো বলেন যে, চাঁদের উৎস হলো গলিত লাভা, পরে তা শক্ত হয়ে জমাট বাঁধে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাপোলো-11-এর মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে অনেক আগ্নেয়শিলা দেখতে পান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এক সময় পাথরগুলি ছিল কতকটা তরল অবস্থায়, সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপে তা গলিত অবস্থায় পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, এগুলি অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এবার চাঁদের ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই ভূমিকম্পের বিষয় যথাযথভাবে নিরূপণ করবার জন্যে মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে সিস্‌মোগ্রাফ রেখে আসেন।

এই যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত চন্দ্রকম্পনের বিশ্লেষণের ভার পড়েছিল নিউইয়র্ক সহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামন্ট ভূবিদ্যা মানমন্দিরের ডক্টর গ্যারি লাথাম ও ডক্টর মরিস ইউইং-এর উপর। এঁরা প্রাথমিক বিশ্লেষণের পর বলেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের কম্পন পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের অনুরূপ। কিন্তু পরে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের পার্থক্য বিদ্যমান। ডক্টর ইউই বলেন—সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক শব্দের ফলেই প্রথম সঙ্কেতগুলি ভূকম্পনের অনুরূপ মনে হয়েছিল। ডক্টর লাথাম বলেন—পরবর্তী সঙ্কেতগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূত্বকের নিম্নভাগের অবস্থা চাঁদের অভ্যন্তর ভাগের মত নয়। চন্দ্রের অভ্যন্তর ভাগের কম্পন অনেক বিক্ষিপ্ত ও ক্ষীণ। তিনি আরও বলেন যে, হয়তো চন্দ্রদেহে কম্পনের কোন বড় উৎস নেই অথবা চন্দ্রদেহ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থে তৈরি, তাই কম্পনের কিয়দংশ শোষণ করে নেয়। এই কারণে এখনো পর্যন্ত সিস্‌মোগ্রাফ কোন ভয়ঙ্কর কম্পনের সঙ্কেত পাঠায় নি। তিনি অনুমান করেন যে, আদিম যুগে চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কার আঘাতেই বড় বড় ফাটলের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অবস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, চাঁদের অভ্যন্তর ভাগ কখনও সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল না। অবশ্য স্তরবিহীন শীতল চাঁদের তত্ত্বটি অনুমান মাত্র। আরও গবেষণা

ও পরীক্ষার সাহায্যে যদি প্রমাণ করা যায় যে, চাঁদের দেহে প্রকৃত কাটল রয়েছে, তাহলে গ্রহ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা হবে এক নতুন আবিষ্কার।

চান্দ্রশিলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চাঁদে জীবনের কোন সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার ফলে চাঁদ থেকে সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ডগুলিতে বিষাক্ত দ্রব্য, সংক্রামক জীবাণু বা জীবনের কোন মূল উপাদান পাওয়া যায় নি। তবে হিউস্টনের চান্দ্র-গবেষণাগারের কৃষিক্ষেত্রে ও চিড়িয়াখানায় এখনো পরীক্ষা চলেছে। পার্থিব বস্তুর উপর চান্দ্রশিলার কোন সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া হয় কি না, সে সম্পর্কে গবেষণা শেষ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। সম্প্রতি একটি সংবাদে বলা হয় যে, গবেষণাগারে চান্দ্রমৃত্তিকা মেশানো মাটিতে উদ্ভিদ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। এসম্পর্কে নাসার জনৈক মুখপাত্র বলেন—গবেষণাগারের গাছপালার দৈনন্দিন বৃদ্ধির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চান্দ্রমৃত্তিকা মেশানো মাটিতে চারাগাছগুলি অন্যদের তুলনায় বেশী বড় ও সবুজ হয়েছে। চান্দ্রমৃত্তিকায় পালিত চারাগাছসহ প্রায় চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় সমানভাবে বাড়ছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন চারাই পৃথিবীর সাধারণ মাটি বা শুধু চান্দ্রমৃত্তিকায় রোপণ করা হয় নি। মুখপাত্রটি আরও বলেন যে, চান্দ্রমৃত্তিকার সংস্পর্শ পার্থিব বস্তু ও প্রাণীর উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। চন্দ্রের উপকরণের সাহায্যে যে সকল প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে দু-শ'টি ইঁদুর, ত্রিশটি জাপানী কাঠবিড়াল, মাছি, আরশোলা, মাছ, ঝিনুক ও চিংড়ি। এই গবেষণার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ শেষ হলে আরও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে জীবনের অবস্থিতির বিষয় অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানীরা চান্দ্রশিলার বয়স নিরূপণে সচেষ্ট হন। অ্যাপোলো 11-এর যাত্রীরা যে সব প্রস্তর এনেছেন, সেগুলির বয়স তিন-শ' কোটি বছর থেকে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর। সবচেয়ে প্রাচীন উপলখণ্ডের বয়স চার-শ' কোটি বছর। তেজনির্গমন পদ্ধতির সাহায্যে এদের বয়স নিরূপণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সর্বপ্রাচীন পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বয়স তিন-শ' ত্রিশ কোটি বছর। এজাতীয় শিলা ভূপৃষ্ঠের বেশ নিচে অবস্থিত।

চাঁদের পাথর চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের আবরণ উন্মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পৃথিবীর শৈশব কালে তার দেহের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়—এই মতবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এখন নানাবিধ প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ বলছেন যে, চাঁদ ও পৃথিবী একই সময় একই রকম পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন যে, চাঁদ মহাকাশের কোন স্থানে জন্ম লাভ করে ও পরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার উপগ্রহে পরিণত হয়। চাঁদ ও পৃথিবীতে প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেই বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

চাঁদের গঠন সম্বন্ধে যা জানা গেছে, এখন সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায় যে, তার উপরের ত্বকের নীচের অংশ একটা বিরাট তন্দুর বলের মত। এই গোলাকৃতি অংশটি খণ্ড খণ্ড শিলার সমষ্টি। চাঁদের মারিয়া বা শুষ্ক সাগর অঞ্চলে খণ্ডিত পাথরগুলির সংহত রূপ দেখা যায়। এই কারণে চন্দ্র পরিক্রমায় মহাকাশযানের উপর চাঁদের অভিকর্ষ সব জায়গায় সমান নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে

উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে, তাই তার দেহের অধিকাংশই হলো আগ্নেয়শিলা। এই শিলার উপরিভাগ অমসৃণ কাচের মত, মনে হয় ছোট ছোট কণিকার সঙ্গে অবিরাম ঘর্ষণের ফলে এই আকার ধারণ করেছে।

চান্দ্রশিলা আমাদের যে সব নতুন তথ্য জানিয়েছে, তাদের কি আমরা কোন কাজে লাগাতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন টেনেসির ওকরীজের জাতীয় বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাক ডাফি। তিনি বলেন—চাঁদে পদার্পণের আগে তার সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হতো আল্‌ফা কণিকার বিকিরণ-পদ্ধতির দ্বারা, কিন্তু এখন অনেক সহজভাবে সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে। চাঁদের শিলার রং বেগুনী কেন? ম্যাক্ ডাফির মতে, কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের বুকে অবাধে তেজ-বিকিরণ হওয়ায় বেগুনী পাথরের সৃষ্টি হয়েছে। কেন না, এই প্রক্রিয়ায় রঙের ভিত্তিমূল তৈরি হয়। শিলার দ্বারা শোষিত তেজ-রশ্মির উচ্চশক্তি যখন ইলেকট্রনকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে, তখন এই সব রঙীণ ভিত্তি গড়ে উঠে।

চাঁদের পাথর জৈব অণুর দ্বারা দূষিত নয়। তাই এগুলি থেকে অতীত জৈব জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চাঁদের বায়ু-শূন্যতার সাহায্যে কোন গ্যাসের দূষিত অংশ দূর করা সম্ভব। তাছাড়া চাঁদের বুকে সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তাই আশা করা যায় যে, আগামী দশকের মধ্যে চাঁদ হবে একটি সুন্দর গবেষণাগার, যেখান থেকে বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে—জানা যাবে জীবনের উৎস আর সন্ধান করা হবে নানা তথ্যের।

পরিশেষে চান্দ্রশিলা সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানী-দের গবেষণার ফলাফলের কথা বলছি। আমে-রিকার এক-শ' জন বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্যান্য দেশের যে ছত্রিশ জন বিজ্ঞানী চান্দ্রশিলা বিশ্লেষণের জন্যে মনোনীত হন, তাঁদের মধ্যে চারজন ভারতীয়। এঁরা হলেন যথাক্রমে ডক্টর কে. গোপালন, যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ভি. রামমূর্তি, স্যানডিয়েগোর ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জেমস্ আর-নল্ডের সহকারী ডক্টর দেবেন্দ্রলাল ও ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর ডি. পি. ধারকার।

ডক্টর কে. গোপালন একজন ভূ-পদার্থ-বিদ্যাবিদ্। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-পদার্থবিদ্যা ও গ্রহ-পদার্থবিদ্যা সংস্থায় 1966 সাল থেকে গবেষণা করছেন। এবছর খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধি-বেশনে তিনি জানান যে, চাঁদ থেকে প্রাপ্ত উপলখণ্ড-গুলির গঠন পৃথিবীতে প্রাপ্ত উপলখণ্ডগুলির গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো—চাঁদে পাওয়া পাথর পৃথিবীতে পাওয়া পাথরের চেয়ে পুরনো হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের উপর নতুন আলোকপাত করতে সাহায্য করবে। অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো, শিলাখণ্ডের প্রাকৃতিক ধর্মের বিশ্লেষণ। তাঁদের গবেষণার ফলাফল টেক্সাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাঁদের অনুসন্ধান সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নি।

অ্যাপোলো-11-র সার্থক চন্দ্র অবতরণের পর গত বছর নভেম্বর মাসে অ্যাপোলো-12-র দুই অভিযাত্রী কনরাড ও বীন আবার চাঁদের বুকে নামেন। তাঁরাও সঙ্গে এনেছেন চাঁদের পাথর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শিলাগুলির বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাঁদ, পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্পর্কে নতুন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে। শীঘ্রই বিশ্বের নানা দেশে চান্দ্রশিলা নিয়ে গবেষণা শুরু হবে। সুতরাং চাঁদ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্যে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

নিদ্রার স্নায়ু-রাসায়নিক তত্ত্ব

সুভাষচন্দ্র বসাক ও জগৎজীবন ঘোষ*

নিদ্রা কেন ও কিভাবে আসে—এই সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল আজকের নয়, গত দশ বছরে অনেক বিজ্ঞানীই নিদ্রার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসাবে জীবনের এই রহস্যাবৃত অংশ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আমাদের জ্ঞানগম্য হয়েছে। নিদ্রার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। সুতরাং নিদ্রার স্বরূপ কি এবং কেনই বা তার আবির্ভাব ঘটে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

নিদ্রার সংজ্ঞা ও লক্ষণ

এক কথায় নিদ্রার সঠিক কোন সংজ্ঞা জানা নেই। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে নিদ্রা প্রাণীদের জীবনের এমন একটি অবস্থা, যখন প্রাণীদের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সক্রিয় যোগাযোগ হ্রাস পায় এবং এই অবস্থা থেকে প্রাণীকে স্বল্পায়াসেই জাগ্রতাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। নিদ্রার সময় শরীরের অনেক পেশীর কার্যকারিতা হ্রাস পায় বা লুপ্ত হয়ে যায়—প্রাণীদের চলাফেরার কোন প্রবণতা থাকে না। শুধুমাত্র স্বপ্নের সময় অনিয়মিতভাবে স্বরযন্ত্র ও মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহের প্রতিটি পেশীর কর্মক্ষমতা হ্রাসই নিদ্রার বৈশিষ্ট্য—এই ধারণা কিন্তু ভুল বরং কোন কোন পেশী নিদ্রার সময় অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রাণীর দেহ নিদ্রার সময় বিশেষভাবে বাঁকা অবস্থায় থাকে; যেমন—পাখীরা দাঁড়ের উপর বিশেষ ভঙ্গীতে বসে ঘুমায়, বাদুড় ঘুমের সময় পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে। ঘুমের সময় প্রাণীদের চোখের পাতা বিশেষভাবে বন্ধ থাকে এবং বাইরে থেকে বল প্রয়োগে খোলবার চেষ্টা করলে আরও বেশী সংকোচন লক্ষ্য করা যায়। জাগ্রতাবস্থায় যে সব দুর্বল উত্তেজনায় প্রাণীরা সাড়া দিতে পারে, নিদ্রার সময় সেগুলির কার্যকারিতা হ্রাস পায় অথবা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উপযুক্ত উত্তেজনার দ্বারা অতি সহজেই ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগ্রতাবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। এটা নিদ্রার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অসাড়তা (Anaesthesia) বা কোমা (Coma) বাহ্যতঃ নিদ্রার অনুরূপ অবস্থা হলেও এসব অবস্থা থেকে প্রাণীকে জাগ্রত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উত্তেজনার মান অনেক বেশী। তাছাড়া অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগাবার পর প্রাণীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং নিদ্রা থেকে জাগাবার পরের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে তফাৎ অনেক। নিদ্রা থেকে জাগাবার পর মানুষ সাধারণতঃ জাগ্রতাবস্থায়ই থাকে। অপর পক্ষে, বাইরে থেকে প্রযুক্ত উত্তেজনার কার্যকাল শেষ হলেই অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগ্রত প্রাণীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নিদ্রা কতটা গাঢ়—সেটা জানবারও কোন স্পষ্ট উপায় নেই। নিদ্রার যে অবস্থা থেকে জাগাতে যত শক্তিশালী উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, সেই অবস্থাকে তত গাঢ় বলা হয়। কিন্তু উত্তেজকের কার্যকারিতা, তার গুণ এবং পরিমাণ উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। পরিচিত বেশী শক্তিশালী উত্তেজকের চেয়ে অপরিচিত দুর্বল উত্তেজনায় প্রাণী অনেক প্রবলভাবে সাড়া দেয়। কোন কোন

* জৈব রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষেত্রে আবার বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় প্রাণীরা সর্বাধিক সাড়া দেয়। সামান্য শব্দেই কুকুরের গাঢ় নিদ্রা ভেঙে যায়। মায়েদের ঘুম ভাঙাবার জন্যে অন্য শক্তিশালী শব্দের চেয়ে শিশুর সামান্য কান্নাই যথেষ্ট। ঘুমন্ত বিড়ালের নাকের কাছে এক টুকরা মাংস ধরলেই তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে ওঠে।

মানুষের নিদ্রিতাবস্থায় যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি মনুষ্যেতর প্রাণীদের বিশ্রামের অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, সেই সব অবস্থাকে আমরা নিদ্রা আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু অন্যান্য অনেক জৈব প্রক্রিয়ার মত নিদ্রার কারণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাছাড়া উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে জাগ্রতাবস্থা, জাগ্রত বিশ্রামাবস্থা, তন্দ্রা, হাল্কা ঘুম এবং গাঢ় ঘুম ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব নয়। Electro-encephalogram বা E. E. G-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত অবস্থাগুলিকে অংশতঃ পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই সব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ই. ই. জি. তরঙ্গ পাওয়া যায়। জাগ্রতাবস্থায় সর্বদাই আল্‌ফা-তরঙ্গ পাওয়া যায়, তন্দ্রার সময় ই. ই. জি-তে মাঝে মাঝে আল্‌ফা-তরঙ্গের বিলুপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গাঢ় নিদ্রার সময় ডেল্টা-তরঙ্গের ই. ই. জি পাওয়া যায়। বর্তমানে নিদ্রার লক্ষণ হিসাবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং ই. ই. জি.—এই দুই পদ্ধতিকেই সমানভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

নিদ্রা নিষ্ক্রিয়, না সক্রিয় অবস্থা ?

আগে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, নিদ্রা একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা। বিজ্ঞানী ব্রেমারের মতে, জেগে থাকতে না পারলেই নিদ্রা আসে। জাগ্রত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে স্নায়বিক ক্লান্তি আসে, তার ফলে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীদের যোগাযোগ হ্রাস পায়। এই হ্রাসই যদি নিদ্রার একমাত্র কারণ হয়, তবে নিদ্রা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কিন্তু গত দশকে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কে এমন একাধিক অংশ খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলি সক্রিয়ভাবে জাগ্রত অবস্থা থেকে প্রাণীকে নিদ্রাগ্রস্ত করে দিতে পারে। তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক অংশকে উত্তেজিত করলে নিদ্রা আসে। এছাড়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে কেটে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও নিদ্রার পরিমাণ কমে যায়। এই সব পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিক নিদ্রার জন্যে মস্তিষ্কের একাধিক অংশের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ প্রয়োজন। কাজেই বর্তমানে অনেক জীব-বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, নিদ্রা একটি সক্রিয় অবস্থা।

নিদ্রা এক, না একাধিক অবস্থা ?

ঘুমন্ত প্রাণীর অবিরাম ই. ই. জি. নিতে গিয়ে জানা গেছে যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিদ্রা অন্ততঃ একটিমাত্র অবস্থা নয়। এই সব প্রাণীদের ঘুমন্ত মস্তিষ্ক পর পর দুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়।

প্রথম অবস্থাকে বলা হয় ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা। এই অবস্থায় ই. ই. জি-তে যে তরঙ্গ পাওয়া যায়, তা জাগ্রতাবস্থার তরঙ্গ থেকে আলাদা এবং ধীর। এই অবস্থায় প্রাণীর হাবভাব নিদ্রার অনুরূপ থাকে এবং চোখ বন্ধ থাকে। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলবার পর সম্পূর্ণ অন্য এক অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এই অবস্থাকে বলা হয় স্বপ্নকালীন নিদ্রা বা প্যারা-ডক্সিক্যাল নিদ্রা। এই অবস্থায়ই আমরা স্বপ্ন দেখি। জাগ্রতাবস্থার অনুরূপ ই. ই. জি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনিয়মিত সঞ্চালন এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের নিদ্রায় আবার দুটি অবস্থা—1. টোনিক (Tonic) ও 2. ফেজিক (Phasic)। প্রথম অবস্থায় মস্তিষ্কের ই. ই. জি-তে দ্রুত তরঙ্গ দেখা যায় এবং ঘাড়ের পেশীর কোন কার্যকারিতা থাকে না। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলবার পর ই. ই. জি-তে বিশেষ ধরণের এক প্রকার ধীর তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে এবং জাগ্রতাবস্থা থেকে ভিন্ন এক বিশেষ

ধরণে চোখ দ্রুত নড়তে থাকে। এই সংখ্যা হলো মিনিটে 50 থেকে 60 বার। নিদ্রার এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবার পর সকলেই বলে—সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু আমরা অনেকেই বলি—আমরা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। আসলে আমরা রোজই রাতে কয়েক বার করে স্বপ্ন দেখি এবং পরবর্তী ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার সময় তা ভুলে যাই। মাঝে মাঝে দু-একটা স্বপ্নের কথাই মাত্র মনে থাকে। চোখ নড়বার গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে স্বপ্নের কি সম্বন্ধ, তা জানা নেই। তবে অনেকেই মনে করেন, স্বপ্নের সময় পরিদৃশ্যমান বস্তুর সংখ্যা যত বেশী হয় বা স্বপ্নের দৃশ্য যত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, চোখ নড়বার গতিও তত বেশী হয়। সুস্থ ও সবল প্রাণীর ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা চলবার পর স্বপ্নের নিদ্রার আবির্ভাব ঘটে। নিদ্রার প্রথমেই কখনও প্যারাডক্সিক্যাল নিদ্রা হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও স্বপ্নের নিদ্রার প্রকৃতি মানুষের নিদ্রার অনুরূপই হয়ে থাকে। মাছ ও সরীসৃপের ক্ষেত্রে শুধু ধীর-তরঙ্গের নিদ্রাই হয়ে থাকে। পাখীদেরও স্বপ্নের নিদ্রা আছে, যদিও তার স্থায়িত্ব অতি সামান্য। অপর পক্ষে অপোসাম থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত যাবতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীতেই স্বপ্নকালীন নিদ্রার অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আরও লক্ষণীয় এই যে, যে সকল প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন জন্মের সময় অসম্পূর্ণ থাকে (যেমন—ইঁদুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদি), তাদের ক্ষেত্রে নবজাতকের ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা হয় না, জাগ্রতাবস্থার পরেই স্বপ্নকালীন নিদ্রা আসে। কিন্তু যেসব প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন জন্মের আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দুই প্রকার নিদ্রা দেখতে পাওয়া যায়।

নিদ্রা আবির্ভাবের কারণ

অনেকেই মনে করেন যে, ক্লান্তিই নিদ্রার একমাত্র কারণ। শারীরিক দিক থেকে ক্লান্তি এমন একটা অবস্থা, যখন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও কমে যায়। আর মানসিক দিক থেকে ক্লান্তি হলো এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা, যখন তা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের মধ্যে সাময়িক ছেদ এনে দেয়। ক্লান্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এক-মত নন। তবে অনেকেই মনে করেন যে, জাগ্রতাবস্থায় নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ অধিক মাত্রায় কোষে জমে যায় এবং তার ফলেই প্রাণীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

Legendre পরীক্ষামূলকভাবে ক্লান্ত কুকুরের মস্তিষ্ক থেকে 5 সি. সি. তরল পদার্থ বের করে সুস্থ ও সবল অন্য একটি কুকুরের মস্তকে ইন্‌জেকশন করে দেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সতেজ কুকুরটি ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি আরও দেখালেন যে, ক্লান্ত হবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোষের যে প্রকার আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, এই তরল ইন্‌জেকশন দেবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোষেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব পরীক্ষা থেকে Legendre এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জেগে থাকবার সময় মস্তিষ্কে এমন কোন পদার্থ তৈরি হয়, যার জন্যে ক্লান্তি ও নিদ্রা আসে। তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন হিপনোজেন (Hypnogen)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উপরিউক্ত ইন্‌জেকশন দেবার ফলে মস্তিষ্কে তরলের চাপ বেড়ে যায় এবং শুধুমাত্র এই কারণেই ক্লান্তি আসা সম্ভব।

Kroll বিড়াল ও খরগোসের মস্তিষ্কে এমন একটি দ্রবণীয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যা সকল প্রাণীদের মধ্যে নিদ্রা এনে দিতে সক্ষম। অপর পক্ষে, বিজ্ঞানী Monier ক্লান্ত প্রাণীর রক্ত থেকে এমন একপ্রকার রস পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সুস্থ ও জাগ্রত প্রাণীকে ঘুমোতে বাধ্য করে।

উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি থেকে বলা যেতে পারে যে, ক্লান্ত প্রাণীর মস্তিষ্কে ও রক্তে এক বা একাধিক পদার্থ জমে যায়, যা নিদ্রার জন্যে দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি মনে আসে, সেটি হলো, Kroll-এর পাওয়া হিপনোজেন ও Monier-এর পাওয়া হিপনোজেন—এই দুটি কি একই পদার্থ? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর জানা নেই।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থার স্থিতি ও প্রকৃতি প্রাণীর আভ্যন্তরীণ ছন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। লক্ষ্য করা গেছে, দিন-রাত্রির 24 ঘণ্টায় এক বিশেষ ঘুম আসে এবং এই সময়েরই এক বিশেষ অংশে নিদ্রা সর্বাধিক গাঢ় হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, বাইরের আলোর তীব্রতা, কলরব, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্যে এটা হতে পারে। এই কারণগুলি নিঃসন্দেহেই নিদ্রাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কিন্তু কোন উপায়ে এগুলিকে সরিয়ে দিলেও দেখা যায় যে, প্রাণীদের নিদ্রা-জাগরণ চক্র একটি ছন্দের তালে তালে চলে। বিজ্ঞানী Mills একটি সুন্দর পরীক্ষা করেছেন। তিনি একটি লোককে 105 দিন নির্জন কক্ষে রেখে দেন। প্রথম প্রথম দেখা গেল, লোকটি পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী আগের মত সময়েই ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সময়ের পরিবর্তন হতে থাকে। Mills লক্ষ্য করেন যে, নিদ্রার মোট সময়ের পরিবর্তন করতে গেলে সব সময়েই কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয় এবং তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের চেষ্টা করলে এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে লোকটি বেশ অসুবিধা বোধ করে।

এই আভ্যন্তরীণ ছন্দ কিভাবে পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ছন্দের ক্রিয়ার ফলে এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন পর্যায়ক্রমে কমে বা বাড়ে। এই কারণেই হাইপোথ্যালামাসের নিদ্রা-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের উপর হিপনোজেনের প্রভাব পর্যায়ক্রমে কমে ও বাড়ে। এটা নিছক বিজ্ঞানীদের ধারণামাত্র, কোন পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়। তবে উপরিউক্ত মতের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—কেন অনেক দিন অনিদ্রার পরেও যে সময়ে ঘুমানো অভ্যাস নয়, সে সময়ে সচরাচর ঘুম আসে না। আবার সুস্থ মানুষকেও ঘুমাবার সময়ে জেগে থাকতে হলে প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

পরিবেশবাদী বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভের মতে, নিদ্রা হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতার ফল (Conditioned reflex)। তিনি প্রধানতঃ কুকুর নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, একটি কুকুরকে খাবার দেবার সময় যদি বেশ কিছুদিন এক সঙ্গে ঘণ্টা বাজানো চালিয়ে যাওয়া যায়, তবে কুকুরটি খাবার দেওয়া ও ঘণ্টা বাজাবার ঘটনা দুটির সঙ্গে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, পরে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের জিভ্‌ দিয়ে লালা নির্গত হতে থাকে। এটাই হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কোন প্রাণীকে এভাবে অভ্যস্ত করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। প্যাভ্‌লভের মতে, নিদ্রার পূর্বে আমরা যে শয়নকক্ষে যাই, নিদ্রার কথা চিন্তা করি—এই সব ঘটনার সঙ্গে নিদ্রার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নবজাতকের নিদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং প্যাভ্‌লভের মতবাদ নিদ্রাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

শীত-ঘুমের নিদ্রা ও স্বল্পকালীন নিদ্রার কারণ কি এক?

নিদ্রা দুই প্রকার ও নিদ্রার কারণ হিপনোজেন—এই তথ্য জানবার পরেই যে প্রশ্নটা

স্বভাবতঃই মনে আসে, সেটা হলো দুই প্রকার নিদ্রার জন্যে কি একই হিপনোজেন দায়ী? সুতরাং হিপনোজেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন পরীক্ষায় এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের অ্যামিনজাতীয় পদার্থের (Biogenic amines) সঙ্গে হিপনোজেনের নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই ধরণের প্রধান তিনটি অ্যামিন হলো—Serotonin, Noradrenalin এবং Dopamine। বিড়ালের মস্তিষ্কে সরাসরি সেরো-টোনিন ইন্‌জেকশন দিলে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা বেড়ে যায়। বিড়ালকে Reserpine ইনজেকশন দিলে 12 ঘণ্টার জন্যে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা এবং 24 ঘণ্টার জন্যে স্বপ্নের নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রাণীকে Serotonin ইন্‌-জেকশন দিলে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; কারণ এই পদার্থটি রক্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী বাধা অতিক্রমে অক্ষম। কিন্তু 5-hyd-roxy tryptophan ইন্‌জেকশন দিলে পদার্থটি সহজেই মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয় এবং ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অপর পক্ষে, ডোপা ইন্‌জেকশন দিলে স্বপ্নের নিদ্রার আবির্ভাব হয়। ডোপা মস্তিষ্কে গিয়ে ডোপামিনে রূপান্তরিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে, ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার কারণ সেরোটোনিন এবং স্বপ্নের নিদ্রার কারণ হলো ডোপামিন।

Nialamide, Iproniazid ইত্যাদি ওষুধ-গুলি মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, যেগুলি অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলিকে ভেঙে ফেলে। ফলে উপরিউক্ত ওষুধগুলি ইন্‌জেকশন দিলে মস্তিষ্কে অ্যামিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু স্বপ্নের নিদ্রা ব্যাহত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙে যাবার সময় এমন সব পদার্থ তৈরি করে, যাদের সঙ্গে স্বপ্নের নিদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণীকে প্যারাক্লোরোফিনাইল-অ্যালানিন (p-chlorophenylalanine) ইন্‌জেকশন দিলে নিদ্রা একেবারে লুপ্ত হয়। দেখা গেছে যে, এই ওষুধের কাজ হলো মস্তিষ্কের সেরোটোনিন তৈরি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। এই অবস্থায় 5-hydroxy tryptophan ইনজেকশন দিলে উভয় প্রকার নিদ্রাই ফিরে আসে। শেষোক্ত ওষুধটি মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ধীর-তরঙ্গের-নিদ্রার একমাত্র কারণ সেরোটোনিন হলেও স্বপ্নকালীন নিদ্রার কারণ একাধিক। ডোপামিনজাতীয় পদার্থ ছাড়াও সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থ এই বিশেষ ধরণের নিদ্রার জন্যে দায়ী। তবে সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত পদার্থগুলির স্বরূপ এখনও অনাবিষ্কৃত।

নিদ্রার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

নিদ্রার প্রকৃতি এবং শরীরের উপর প্রভাব সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য আছে। জাগ্রতাবস্থার মত নিদ্রা প্রাণীদের অন্য এক অবস্থা, যখন দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া বিভিন্নভাবে চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিদ্রার বেলায় সমস্ত প্রাণীটিই ঘুমায়। নিদ্রার ক্লান্তি দূর করবার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই, কিন্তু জীব-কোষ কিভাবে একাজ সমাধা করে, তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

বর্তমানে অনেকেই মনে করেন যে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর গ্লায়া কোষের (Glial cell) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান।

Hyden ও Lange দেখিয়েছেন যে, নিদ্রার সময় স্নায়ুকোষের সাক্সিনোক্সিডেজ (Succinoxidase) নামক এনজাইমটির কার্যক্ষমতা জাগ্রতবস্থার তুলনায় তিন গুণ বেশী। অপর পক্ষে গ্লায়া কোষের বেলায় ঠিক বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য স্নায়ুকোষ ও গ্লায়া কোষের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে নিদ্রা ও জাগরণের সঠিক কি সম্পর্ক, তা জানা নেই।

প্রাণীকে দীর্ঘ সময় ঘুমাতে না দিলে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়। শুধু মাত্র স্বপ্নের নিদ্রা বন্ধ করে দিলেও মানসিক অবস্থা, তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিদ্রা—এমন কি, স্বপ্নও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্যে অপরিহার্য।

অনেকে মনে করেন যে, নিদ্রা যত গাঢ় হয়, তার ক্লান্তি দূর করবার ক্ষমতাও তত বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু এমন লোকও আছে, যারা অনেকক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পরেও স্বস্তি বোধ করে না। আবার ইতিহাসখ্যাত নেপোলিয়ান নাকি 5 মিনিট ঘুমিয়েই স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যেতে পারতেন। এসব থেকে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, নিদ্রার প্রকৃত রহস্য থেকে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী এখনও অনেক দূরে।

নিদ্রা ও আগামী দিনের মানুষ

নিদ্রার রহস্যভেদ শুধু তত্ত্বগত দিক থেকেই এক বিরাট আবিষ্কার নয়, এর ব্যবহারিক দিকটাও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিতে নিদ্রার প্রকৃতি ও পরিমাণের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। বহু মানসিক ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নিদ্রার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং নিদ্রার প্রকৃত স্বরূপ জানা গেলে এই সব মানসিক ব্যাধিকে আমরা আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবো বলে আশা করা যায়। আমরা জীবনের এক অতি মূল্যবান অংশ নিদ্রায় কাটাই। শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না করে নিদ্রার সময়কে কমিয়ে আনা নিশ্চয়ই আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের অন্যতম কাজ হবে।

নিদ্রা ও নিদ্রা-নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্কের রহস্যভেদ আধুনিক বিজ্ঞানীর সামনে এক মোহময় লক্ষ্য। এর জন্যে প্রয়োজন, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী Walter Rosenblith-এর ভাষায় বলতে গেলে —মানুষের মস্তিষ্ক আজ পর্যন্ত যতগুলি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, আজ তারা সকলে সেই মস্তিষ্কের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এগিয়ে আসুক।

"……বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।……যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পুস্তক পরিচয়

প্রাথমিক ভৌত রসায়ন—শ্রীপ্রিয়নাথ কুণ্ডু, এম. এস্-সি প্রণীত। পৃঃ 741 ; চিত্র সংখ্যা-128 ; সারণী সংখ্যা—89 ; প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ; 10 বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-12। মূল্য-15 টাকা।

বইখানি স্নাতক শ্রেণীর পাস ও অনার্সের পাঠ্য হিসাবে লিখিত। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিন্যাস, উপস্থাপন এবং আলোচনা গ্রন্থকারের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়ায় ঐ অধ্যায়ে ব্যবহৃত যাবতীয় বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলী ও তাদের আন্তর্জাতিক ইংরেজী সংজ্ঞার সন্নিবেশ এই গ্রন্থের একটি বিশেষ সহায়ক অঙ্গ। এসব বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলীর সংগ্রহ, নির্বাচন ও উদ্ভাবনে গ্রন্থকার তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ও বিচার-বুদ্ধির নিদর্শন দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, বহু উদ্ভাবিত পারিভাষিক বাংলা শব্দের যথাযথ অর্থবোধের তাগিদে ও ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সংশোধন ও সংস্কৃতির আবশ্যক হতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহারের প্রথম চেষ্টায় এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কালক্রমে এসব পরিভাষা বহু সুলেখকের সহযোগিতায় পরিশুদ্ধ হয়ে সর্বসম্মতি অনুসারে গৃহীত হবে। এটাই সকল দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

অবশেষে, আন্তর্জাতিক ইংরেজী পরিভাষা গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হয়, এই সম্পর্কে বিজ্ঞানের সকল অধ্যাপক ও পুস্তক-প্রণেতার সজাগ থাকা উচিত। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে এই বিষয়ে সম্যক সতর্কতা অপরিহার্য। বর্তমান গ্রন্থখানিতে এর কোন ত্রুটি ঘটে নি। এটি এর একটি সন্তোষজনক বিভব বলতে হবে।

কলেজ-পাঠ্য হিসাবে পুস্তকখানির সমুচিত সমাদর বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আগষ্ট — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — অষ্টম সংখ্যা
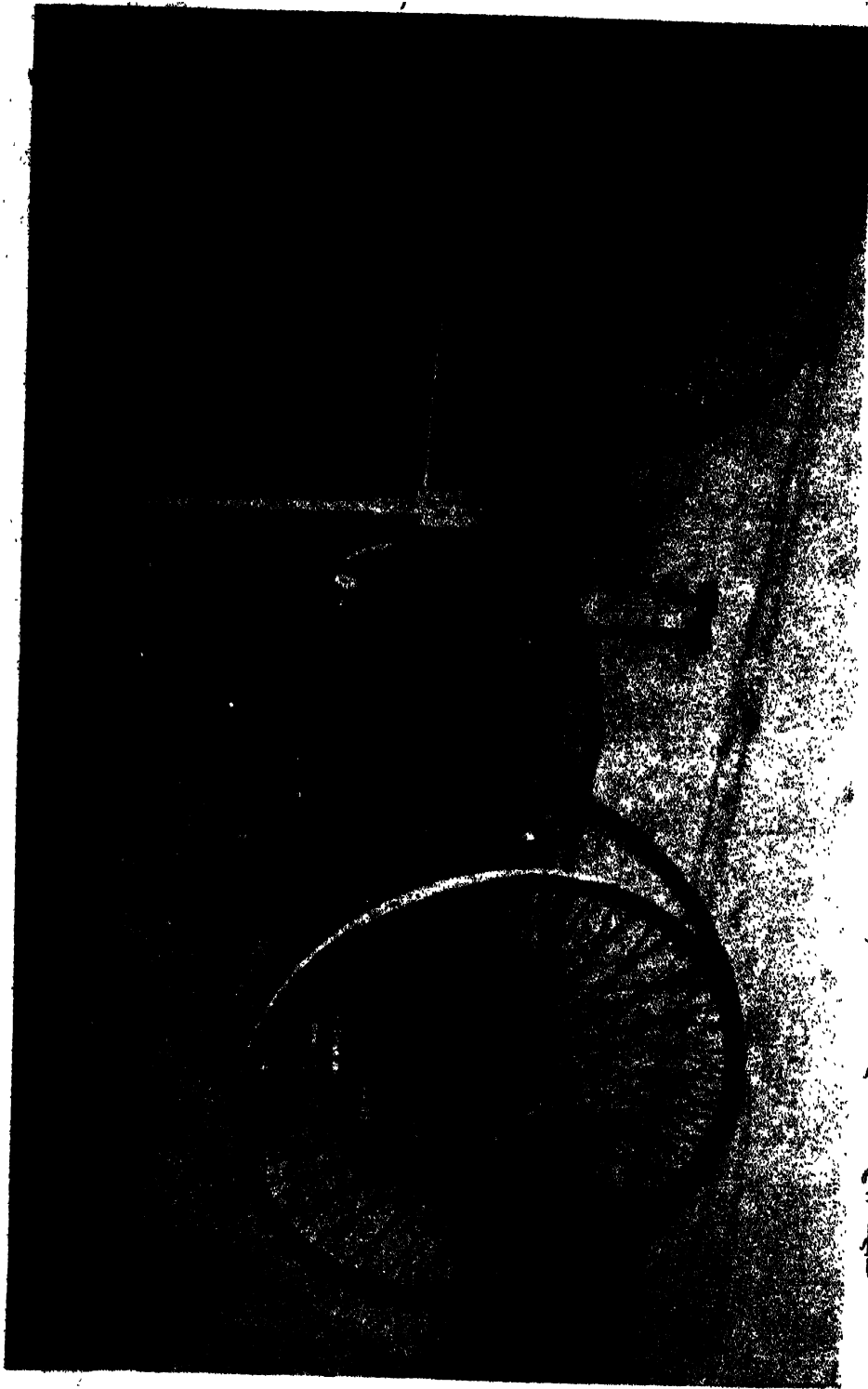
মোটর গাড়ীর প্রথম উদ্ভাবক কার্ল বেন্সোজের স্মরণে কার্লসরুহেব (প. জার্মেনী) ট্রাফিক মিউজিয়ামে 1886 সালে বেন্সোজের কারখানায় তৈরী প্রথম মোটর গাড়ীর মডেল। গাড়ীটির সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় 15 কিলোমিটার। বেন্সোজের সমসাময়িক মোটর গাড়ী নির্মাতা হচ্ছেন ডেমলার। পরে এঁরা দু-জন একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন — যার গাড়ী, ট্রাক ও বাস আজ পৃথিবীর সর্বত্র চলছে।

সুপার ট্যাঙ্কার

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছিল, কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিকে মূলধন করে সব কাজ আর করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনই উদ্ভাবনের উৎস। এথেকে সুরু হয় যন্ত্রের আবিষ্কার। যন্ত্র চালাবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রথম যুগে তার চাহিদা মিটতো কেবলমাত্র কয়লা থেকে। কয়লার পর এলো জ্বালানী তেল। সভ্যতার আধুনিকতম শক্তির উৎস পারমাণবিক শক্তি; যদিও এখন পর্যন্ত এই শক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। হিসেব করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানী তেল একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। জ্বালানী তেল সব দেশেরই প্রয়োজন। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে মাত্র কয়েকটি দেশের—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের। চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক দেশে থেকে অন্য দেশে তেল নিয়ে যাবার ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। কলকাতার কাছেই বজবজ এবং হলদিয়াতে তেলের জাহাজ ভিড়াবার জন্যে অয়েল জেটি রয়েছে।

অনেক কম খরচ হয় বলে সমুদ্রপথকেই এই ব্যাপারে বেছে নেওয়া হয়েছে। এক বারে বেশী তেল নিয়ে যেতে পারলে খরচ অনেক কম হয়। সেই কারণে তেলবাহী জাহাজগুলির আয়তন বাড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সব বিরাট বিরাট তেলের জাহাজগুলিকে বলে সুপার ট্যাঙ্কার। দু-লক্ষ টনেরও বেশী বহনক্ষমতাযুক্ত জাহাজও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাহাজে তেল পরিবহনের সময় অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সবগুলির কথা এক সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে প্রধানতঃ যেটি সারা বিশ্বের তেল ব্যবসায়ীদের ভাবিয়ে তুলছে, তা হচ্ছে জাহাজ ডুবি অথবা অন্য কারণে জাহাজ থেকে উপ্‌চে পড়া তেলে সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার দরুণ যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার মোকাবিলা করবার উপায় উদ্ভাবন। তেল জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রের উপকূলের শহরগুলিতে পৌঁছুলে সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, সমুদ্রের বিরাট এলাকা জুড়ে উপ্‌চে পড়া তেলে আগুন লেগে গেছে।

অনেক সময় তেলের জাহাজ ডুবির সন্তোষজনক কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। দু-লক্ষ সাত হাজার টনের তেলবাহী জাহাজ মারপেসার (Marpessa) প্রথম যাত্রাতেই তেল নামিয়ে ফেরবার সময় পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে আশী মাইল দূরে 1969 সালের 15ই ডিসেম্বর ডুবে যায়। জাহাজে তেল ভর্তি থাকলে এই জাহাজ ডুবির ফলাফল আরও ভয়াবহ হতে পারতো। তাই ক্ষতির পরিমাণ কেবল জাহাজের কয়েক কোটি টাকা দামের উপর দিয়েই গেল। ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার উপকূলে পর পর যে তিনটি

সুপার ট্যাঙ্কার ডুবে যায়, এটিই তার প্রথম। এর কয়েক দিনের মধ্যেই, 29শে ডিসেম্বর দু-লক্ষ পাঁচ হাজার টনের জাহাজ ম্যাকট্রা (Mactra) মোজাম্বিক চ্যানেলে ডুবে যায়। পরদিনই লাইবেরিয়ার উপকূলের কাছে এক লক্ষ দশ হাজার টনের নরওয়ের জাহাজ কং-হাকনের (Kong-haakon) বিস্ফোরণ রহস্যজনক।

ডুবে যাবার আগে সুপার ট্যাঙ্কার মারপেসা রটারডামে তেল খালাস করে ফিরে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা তেল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এখন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন, কেমন করে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়, যাতে তেলের অপচয় রোধ করা যাবে আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়ে যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাও বন্ধ হবে।

1967 সালের টরি ক্যানিয়নের ঘটনার পর থেকে সবাই নড়েচড়ে বসেছেন। এই জাহাজ ডুবিতে তিন কোটি গ্যালন তেল সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ফ্রান্স ও বৃটেনের এক-শ' মাইল তটরেখাকে বিষাক্ত করে তোলে। জাহাজের মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ এই দুটি দেশকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। এর উপর তেল ও জাহাজের দাম সমেত আরও বেশ কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি তো আছেই।

এই ঘটনার পর, কয়েক দিন আগে আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—টরি ক্যানিয়নের দুর্ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেল, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশই এই ধরণের ঘটনা এড়াবার কোন উপায় বাৎলাতে পারলেন না।

হিসেব করে দেখা গেছে, বছরে প্রায় 1000 কোটি টন তেল জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেয়। এর মধ্যে শতকরা দশ ভাগ—প্রায় দশ কোটি টন তেল জাহাজ-ডুবি বা অন্যান্য কারণে সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। জাহাজ যত বড় হবে, প্রতিটি দুর্ঘটনায় তেলের ক্ষতিও সেই পরিমাণ বাড়বে।

আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং-এর প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে এক লক্ষ টনের উপর বহনক্ষমতাযুক্ত তেলের জাহাজের সংখ্যা 180টি। 1968 সালে এই সংখ্যা ছিল মোটে 55টি। বর্তমানে তৈরি হচ্ছে, এমন সুপার ট্যাঙ্কারের সংখ্যা 310। এর মধ্যে বেশ কিছু জাহাজ আছে, যাদের বহনক্ষমতা দু-লক্ষ—এমন কি, তিন লক্ষ টনেরও উপরে।

বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করছেন—তেলের জাহাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেল থেকে সমুদ্রের জল এবং সমুদ্রের উপকূলের আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিদেশে এই বিষয়ে নানা রকমের গবেষণা চলছে। মানুষের অন্যান্য সমস্যার মত এরও একদিন নিশ্চয়ই সমাধান হবে।

দীপ্তিময় দে

উল্কা-গহ্বর

রাত্রির অন্ধকারে খসে-পড়া যে সব তারা মুহূর্তের জন্যে আকাশের গায়ে আলোর রেখা এঁকে দিয়ে যায়, আজ সবাই তাদের পরিচয় জানে; অর্থাৎ ওগুলি তারা নয়—উল্কা। উল্কাপাতে অমঙ্গলের আশঙ্কায় অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য সময়ে সময়ে উল্কাপাত ভয়াবহ ধ্বংসের কারণও হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই উল্কাই পৃথিবীর বাইরের মহাশূন্যের একমাত্র আগন্তুক, জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীরা যাদের পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারেন। ।

প্রচণ্ডবেগে ধাবমান উল্কাপিণ্ডের গতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতি সামান্যই প্রতিরোধ করতে পারে। বিরাট দেহ নিয়ে যখন উল্কাপিণ্ড বিপুল বেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, তখন পৃথিবী নিজেই একটা সুদৃঢ় ব্রেকের মত কাজ করে। মুহূর্তের মধ্যেই উল্কাপিণ্ডের এই বিপুল গতিশক্তি পৃথিবীর বুকে ক্ষত সৃষ্টি করে সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রচণ্ড তাপশক্তি অংশতঃ বা সমগ্র উল্কা-পিণ্ডের দেহ এবং তার চতুর্দিকের সবকিছুকে বাষ্পীভূত করে ফেলে। এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা এমন এক কম্পন-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

যেখানে উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়, সেখানে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে—মূল গহ্বরের চেয়ে বহুগুণ বেশী গভীরতা পর্যন্ত শিলাস্তর বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং উল্কার সংঘর্ষ-বিন্দুর বহু নীচের শিলাস্তরে ভগ্ন-শঙ্কু এবং কোয়েসাইট প্রভৃতি দেখা গেছে।

1947 সালের 12ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর বুকে মোট প্রায় 150 টন ওজনের উল্কা-বর্ষণ হয়েছিল, যার বড় বড় খণ্ডগুলি Sikhote-Alin পর্বতমালার শিলাপৃষ্ঠে প্রায় 110টি উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

বৃহৎ আকৃতির উল্কার ধ্বংস-শক্তি এতই প্রচণ্ড যে, হয়তো তা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের সাহায্যে করা যেতে পারে। উল্কার সংঘর্ষই উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে। কাজেই যখন এর আঘাতের প্রচণ্ডতা কম, তখন ভূপৃষ্ঠে ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়। গহ্বরের আকার নির্ভর করে উল্কার আসন্ন গতিপথের কৌণিক অবস্থান, উল্কা-বর্ষণের প্রকৃতি আর পিণ্ডটির মূল আকৃতি ও আয়তনের উপর। এমনও হতে পারে যে, মূল উল্কাটি খণ্ডাংশের বহুগুণ বড় বা এর আবিষ্কারের বিলম্ব সত্ত্বেও পূর্বে একই আকারের ছিল। আবার প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন উল্কাপিণ্ড বিপুল বিস্ফোরণের স্বাক্ষর রেখে যায় উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি

করে। চেহারায় গহ্বরগুলি খনি বা বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্ট গহ্বরগুলির চেয়ে পৃথক। সাধারণতঃ বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত গহ্বরের চেয়ে উল্কা-গহ্বর অনেক বড়। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাপে উল্কা-গহ্বর সৃষ্টির শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

অ্যারিজোনার নিকটবর্তী কোয়েনিক্সের উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট আকৃতির একটি উল্কাপাতের ফলে, যার নাম Conon Diablo। তাছাড়া একে ব্যারিংয়ের গহ্বর বা অ্যারিজোনার বৃহৎ উল্কা-গহ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কনন ডায়াব্লোর বয়স প্রায় 5000 বছর। এর আসল গভীরতা প্রায় সাত-শ' ফুট ছিল এবং বিস্তৃতি ছিল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাইল। মুহূর্তের মধ্যে এরূপ একটি বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করবার জন্যে প্রয়োজন কয়েক হাজার মেগাটন বিস্ফোরকের; অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এমন কোন বোমার কথা জানা নেই, যা এই উল্কা-গহ্বরের মত বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করতে সক্ষম!

উত্তর আমেরিকার এই রকমের অনেক গহ্বর উল্কাপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন গহ্বর এমনভাবে প্রচ্ছন্ন আছে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বিমান থেকে গৃহীত আলোকচিত্রে এগুলি ধরা পড়ে। এথেকে মনে হয়, এখনও অনেক 'ফসিল গহ্বর' আবিষ্কৃত ও চিহ্নিত হবার অপেক্ষা রাখে।

আজ পর্যন্ত যত বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার মধ্যে বৃহত্তম চিহ্ন আর আবিষ্কৃত ফসিল-গহ্বরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ উল্কা-গহ্বরটি রয়েছে জোহানেসবার্গের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রেদেফোর্ট শহরে। প্রায় এক-শ' চল্লিশ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পাথরের স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিরাট ওলট-পালট হয়েছে স্তরগুলিতে। প্রায় তিরিশ মাইল চওড়া আগ্নেয়শিলাস্তরের গ্র্যানিট পাথরের অংশ নিক্ষিপ্ত হয়েছে উপরের দিকে—এই উল্কা-গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে। আমাদের জানা শিলাস্তরের ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, মূল গহ্বরটি নিশ্চয়ই ছিল প্রায় দশ মাইল গভীর। বর্তমানে এটি যে স্তরীভূত শিলাস্তরে অংশতঃ ঢাকা পড়েছে, তা বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়। কম পক্ষে এই উল্কা-গহ্বরের বয়স পঞ্চাশ কোটি বছর। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির তুলনা দিয়েও এর শক্তির পরিমাপ করা যায় না। কারণ, এরূপ বিরাট ধ্বংস ঘটাতে পারে 15 লক্ষ মেগাটন বিস্ফোরকের শক্তি—একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক বড় বড় উল্কাপিণ্ড আঘাত করে, তা নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ উল্কাই ভূপৃষ্ঠের বৃহত্তর অংশ—সাগর বা মহাসাগরে এসে পড়ে বলে চিহ্ন রাখতে পারে না। তাছাড়া যে স্থানে এখনও মানুষের পদক্ষেপ হয়

নি, সে সব জায়গাতেও নিশ্চয়ই অনেক উল্কাপাত হয়েছে। উল্কাপাতের এই আকস্মিক প্রকৃতির জন্যেই কেউ কেউ মনে করেন কোন বড় শহর বৃহৎ উল্কাপাতের লক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু সঠিক মূল্যায়ন একথাইবলে যে, এই ধরণের বিধ্বংসী উল্কাপাতের সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অনেক দূরবর্তী—হয়তো প্রতি আড়াই লক্ষ বছরে একবার ঘটতে পারে। সাধারণতঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 14 মাইল বেগে উল্কাপিণ্ড আঘাত করে এবং মাত্র শতকরা 10 ভাগ উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

কিন্তু আমরা আজও উল্কাপিণ্ডের প্রকৃতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি নি। উল্কা-বিশেষজ্ঞেরা বলেন—পৃথিবীর বর্তমান আকার ধারণে এবং প্রাগৈতিহাসিক জীব নিশ্চিহ্ন হবার পিছনে উল্কাপাতের হয়তো বিশেষ কোন ভূমিকা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ ত্রে:দকোর্টের উল্কা-গহ্বরের কথাই ধরা যেতে পারে। এটা যদি স্থলভাগে গহ্বরের সৃষ্টি না করে কোনও মহাসাগরে পতিত হতো, তবে এর ধ্বংসকারী শক্তির পরিমাণ আরও অধিক হতে পারতো। এই উল্কাপাত যদি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে ঘটতো, তবে সৃষ্টি হতো কুড়ি হাজার ফুট উঁচু বৃত্তাকার এক জোয়ারের তরঙ্গ, যা প্রচণ্ড শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিরাট অংশে আনতো এক ভয়াবহ বিধ্বংসী প্লাবন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

এ. এম. ও পি. এম.

এ. এম. ও পি. এম. কথা দুটি তোমরা প্রায়ই শুনে থাক এবং নিজেরাও বলে থাক—Eight A.M. বা Nine-thirty P.M. অর্থাৎ দিন বারোটার আগের বেলা আটটা বা দিন বারোটার পরের রাত্রি সাড়ে-নয়টা। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছ কি—ঐ কথা-দুটির অর্থ কি? প্রথমেই দেখা যাক—কথা দুটিই বা কি? A.M. আর P.M. তো ওর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কথা দুটি হলো Anti-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের আগে আর Post-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের পরে বা মেরিডিয়ান-অতিক্রান্ত।

আমাদের দিন হচ্ছে 24 ঘণ্টায়, অর্থাৎ দিন ও রাত্রি মিলে একটি সম্পূর্ণ দিন। এই কাল বিভাগটি করেছিলেন আমাদের সুদূরতম পূর্বপুরুষেরা আর তখনই তা বৃহত্তর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কে বা কোন্ জাতি বা কোন্ দেশ, কবে, কোথায় প্রথম এই কাল-বিভাগটির প্রচলন করেছিল, আজ আর তার কোন হদিশ মেলে না; কিন্তু একথা জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরীয়েরাও এই কাল-বিভাগই পালন করতো।

এখন দিনের এই চব্বিশ ঘণ্টার আরম্ভটা হবে কোথা থেকে? বর্তমানে আমরা এটা জানি রাত্রি 12টা থেকে, কারণ সেখান থেকেই আমাদের তারিখ পাল্টায়। এই হিসাবটা আমাদের দিয়েছে ইউরোপের মানুষ অর্থাৎ ইংরেজরা। আমাদের দেশের মানুষ এবং গণৎকারেরা দিনের হিসাব করতেন উষাকাল থেকে দিনের আরম্ভ ধরে নিয়ে।

রাত্রি 12টা যেই শেষ হয়ে গেল, তারিখটি পাল্টে গেল—আরম্ভ হলো আর একটা দিন; অর্থাৎ শেষ হলো রাত্রি 12টা থেকে রাত্রি 12 টার একটা দিন, একটা সম্পূর্ণ দিন আর দুটি রাত্রির অর্ধেক করে। বর্তমানে আমাদের না হয় ঘড়ি আছে, রাত্রি 12টা আমরা টের পাই—কিন্তু সেই সুদূর প্রাচীন কালেও ওই হিসাবটি তখনকার মানুষেরা করেছিলেন। তাঁরা করেছিলেন কেমন করে? ঘড়ি তো মাত্র পাঁচ-শ' বছরের ব্যাপার। তাঁরা রাত্রি দেখেও করেন নি, ঘড়ি দেখেও করেন নি—তাঁরা করেছিলেন সূর্যের গতিবিধি দেখে। কিন্তু রাত্রিতে সূর্য কোথায়?

রাত্রি দেখে তাঁরা করেন নি, তাঁরা করেছিলেন দিন দেখেই। সকালবেলায় সূর্য ওঠে, ক্রমে সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। এক সময় সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে আসে, তারপরে চলে যায় পশ্চিম দিকে। এই যে পূব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া—এটাই হলো আসল কথা। পৃথিবীর যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো না কেন, সূর্য মাথার উপরে উঠে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাবেই। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর উঠে এলো, তখন হলো বেলা 12টা। এই বেলা 12টা হলো দিনের অর্ধেক। তারপর সেখান থেকে হিসাব করলেই রাত 12টা পাওয়া যায়, যা হলো কিনা দিনের শেষ। বর্তমান কালের কলের ঘড়ি তখনকার দিনের মানুষদের ছিল না—এটা ঠিক, কিন্তু তাঁদেরও ছিল ঘণ্টা মাপবার নানা রকম কায়দা। প্রয়োজনের তাগিদেই ঘড়ির উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত অংশকেই জ্ঞানী মানুষরা ভাগ করেছেন কতকগুলি রেখা দিয়ে। বিষুব রেখার সঙ্গে সমান্তরাল রেখাগুলিকে বলা হয় Latitude, আর রেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, সেগুলি হলো Longitude। এই Longitude-গুলিকে সূর্য কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে। Longitude-এর সমান্তরাল এই কাল্পনিক যে কোন রেখাকেই বলা হয় মেরিডিয়ান। তাই সূর্য যখন এই রেখার পূবদিকে থাকে, তখন তাকে বলা হয় Anti-Maridian বা এ. এম, আর পশ্চিম দিকে গেলেই বলা হয় Post-Maridian বা পি. এম.।

তাহলে বেলা 12টাকে কি বলা হবে—A. M.? 12 A. M.? না, ঠিক বেলা 12টা পূবেও নয় পশ্চিমেও নয়, ওটা ঠিক মাথার উপর। ওকে বলা হয় noon বা দুপুর 12টা। তেমনি রাত 12টাকে বলা হয় midnight বা রাত 12টা। না বললেও চলতো, 12 night-ই যথেষ্ট হতো, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীটি চলে এসেছে এবং

চালু হয়ে গেছে। দিন বারোটার পর এক সেকেণ্ড হয়ে গেলেই সেটা পি. এম. আবার তেমনি রাত বারোটার পর এক সেকেণ্ড হয়ে গেলেই সেটা এ. এম. এবং নতুন আর একটা দিন।

সূর্য মাথার উপরে থাকে একটা রেখাতেই। ধরা যাক, কলকাতা শহর। কলকাতার উপরে ঐ রেখা ধরে উত্তর ও দক্ষিণে আগাগোড়া সবই ওই বেলা 12টা থাকবে। কিন্তু বোম্বাইতে তখন হবে সাড়ে এগারোটা, যেহেতু বোম্বাই কলকাতা থেকে হাজার মাইল পশ্চিমে—সেখানে noon আসতে আধ ঘণ্টা দেরী হবে। কলকাতার সময় আর বোম্বাইয়ের সময়ে হবে তফাৎ। এমনি তফাৎ সর্বদাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর সময়ে।

এর পরও আবার আছে Local time বা স্থানীয় সময় ও Standard time বা সাধারণ সময়। সেটা এই রকম—কলকাতার আছে একটা স্থানীয় সময়, আর বোম্বাইয়ের আছে একটা স্থানীয় সময়। এই দুটিতে আছে আধ ঘণ্টার মত তফাৎ। এখন কোন লোক যদি কলকাতা থেকে রেলগাড়ীতে বোম্বাইয়ের পথে রওনা দেয় আর সে গাড়ী যদি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল করে চলে, তাহলে সে গাড়ী প্রতি এক-শ' মাইলে আড়াই মিনিট করে এগিয়ে যাবে। অথচ গাড়ীর চলবার কোন একটা ষ্টেশনে নামবার আবার সেখান থেকে ছাড়বার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যেটা দেওয়া থাকে Time-table বা সময় নির্দেশিকা বইয়ে। সেই বই দেখে আর কলকাতার সময়-ওয়ালা ঘড়ি দেখে কেউ যদি স্থান এবং সময় বিচার করতে যায়, তাহলে তার সবই গোলমাল হয়ে যাবে। সেই জন্যে রেলওয়ে, জাহাজ, প্লেন—এসবের কাজে ব্যবহার করা হয় একটা সাধারণ সময়। এটা নেওয়া হয় এক একটা দেশ ধরে, তার মাঝখানের কোন একটা জায়গার সময় নিয়ে। ভারতবর্ষের সেই standard বা সাধারণ সময় হচ্ছে এলাহাবাদের সময়ের সঙ্গে মেলানো।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

শব্দ-সঞ্চয়

গ্রামোফোনের সাহায্যে বহুদিন আগেকার শিল্পী ও বক্তাদের কণ্ঠে গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতা শোনা আজও অনেক লোকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সামান্ত একটা কাঠের বাক্স থেকে একটা সরু সূচের সাহায্যে কি করে যে গান বা সুরের সৃষ্টি হয়—অনেকের কাছেই সেটা কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু এই কৌতূহল মেটাতে গেলে শব্দ-তরঙ্গ জিনিষটা যে কি, সেটা আগে বোঝা দরকার। আমি কথা বললাম, আর আমার সামনে আর একজন সে কথা শুনলো—এর অর্থ এই নয় যে, আমার কথাগুলি ছাপার অক্ষরের মত দল বেঁধে শ্রোতার কানে গিয়ে প্রবেশ করলো। আসলে যে কোন শব্দ সৃষ্টির সময় চারপাশের বায়ুস্তর বিশেষভাবে কম্পিত হয়ে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। আর সেই শব্দ-তরঙ্গ যখন শ্রোতার কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে, তখনই শ্রোতা সেই শব্দ শুনতে পায়।

এই ব্যাপার থেকে স্থির করা হলো যে, আমরা যদি মুখের বদলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক এইভাবে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে সেটা ঠিক মানুষের কণ্ঠস্বরের মতই শোনা যাবে। গ্রামোফোন ঠিক এই ধরণেরই এক প্রকার যন্ত্র, যে কোন নির্দিষ্ট শব্দ, রেকর্ড নামে এক বিশেষ ধরণের জিনিষের উপর সঞ্চয় করে রেখে তাথেকেই পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই শব্দের পুনরুৎপাদন করা হয়। কিভাবে সেই সঞ্চিত শব্দকে পুনরায় উৎপাদন করা হয়, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

এই গ্রামোফোন বা ফনোগ্রাফ যন্ত্রটির আবিষ্কারক হলেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। 1877 সালে এই বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন দেখে ভাবলেন—মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে যদি একটি সরু সূচকে কাঁপিয়ে সেই শব্দের অনুলিপি কোন ধাতুখণ্ডে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই অনুলিপি থেকে আবার কম্পন জাগিয়ে আগেকার নেওয়া সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা কি সম্ভব নয়? এডিসনের এই কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপায়িত হলো।

এডিসন তাঁর মিস্ত্রি ক্রুয়েসীকে ডেকে একটা নক্সা দিলেন, তাতে ছিল একটা সিলিণ্ডারের উপর পাত্‌লা টিনের একটা চাদর বসানো। মিস্ত্রীকে তিনি বললেন—এই চাদরের সংস্পর্শে রাখা একটা সরু সূচকে স্প্রিং দিয়ে সামনে রাখা পাত্‌লা ডায়াফ্রামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। তাঁর মত বিচক্ষণ মিস্ত্রীর পক্ষে এটা তৈরি করতে মোটেই বেশী সময় লাগলো না। ক্রুয়েসীর কৌতূহলের জবাবে এডিসন বললেন—এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি মানুষের কথা ধরে রাখবো এবং তার পুনরাবৃত্তি করবো। টিনের চাদর যথাস্থানে রেখে, ডায়াফ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে এডিসন খুব জোরে চীৎকার করে তাঁর

প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করলেন—Mary had a little lamb…ইত্যাদি। তারপর সেই যন্ত্রের সাহায্যেই কবিতাটির পুনরাবৃত্তি করে সেই ঘরের সকলকে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শোনালেন। সকলে বিস্ময়ে হতবাক—এমন কি, এডিসন নিজেও। মানুষের কণ্ঠস্বরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে তার পুনরাবৃত্তি করবার এই প্রথম প্রচেষ্টার সাফল্যে সকলের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এডিসনের কাছে প্রশংসাপত্র আসতে লাগলো। বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কারকে সারা পৃথিবীর লোক সাদরে গ্রহণ করলো। এই হলো প্রথম শব্দ-সঞ্চয়ের ছোট্ট কাহিনী।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—শব্দকে এভাবে সঞ্চয় করা হলো কিভাবে? এডিসনের আবিষ্কৃত পদ্ধতির অবশ্য এখন অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে। তবে শব্দ-সঞ্চয়ের মূল যান্ত্রিক পদ্ধতি অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এক। এডিসন যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে প্রথম ধরে রাখেন, তার মূল তত্ত্ব হলো—সেই যন্ত্রের পাত্‌লা টিনের চাদরের গায়ে একটা সরু সূচের প্রান্তভাগ ঠেকিয়ে রাখা ছিল। এই সূচটির অপর প্রান্ত আবার একটা স্প্রিং-এর সাহায্যে একটা ডায়াফ্রামের সঙ্গে লাগানো। এই ডায়াফ্রামের সামনে কোন কিছু আবৃত্তি করলে স্বভাবতঃই বায়ুস্তর কম্পিত হয়। বায়ুর এই কম্পনের ফলে ঠিক অনুরূপভাবেই ডায়াফ্রামটিও কম্পিত হয়। ডায়াফ্রামের এই কম্পন, তার সঙ্গে সংলগ্ন সরু সূচটিকেও কাঁপিয়ে তুলে। সেই সময়ে টিনের চাদরে মোড়া সিলিণ্ডারটিকে আস্তে আস্তে ঘোরানো হতে থাকে। সূচের অগ্রভাগের এই কম্পন ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর খুব সরু সরু রেখার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই রেখাগুলির গভীরতা খুবই কম—এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের মত। যাহোক ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর এই রেখার আকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে সূচটির কম্পনের উপর, যেটা আবার নির্ভর করে ডায়াফ্রামের কম্পনের উপর। সুতরাং স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, ডায়াফ্রামের সামনে কি ধরণের শব্দের উৎপত্তি হলো, তার উপর নির্ভর করছে টিনের চাদরের উপর রেখার আকৃতি। এখন টিনের চাদরের এই রেখাগুলির উপর দিয়ে ঐ সূচটিকে আবার যদি ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ডায়াফ্রামটি আগের মতই কাঁপতে থাকবে। ফলে তার সামনেকার বাতাসও কাঁপবে এবং শব্দের পুনরুৎপত্তি হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু সূচটি টিনের উপর তার নিজেরই করা রেখার উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু শব্দ সঞ্চয়ের সময় ডায়াফ্রামটি যেমনভাবে কেঁপেছিল, পুনরাবৃত্তির সময়ে সেটা ঠিক একইভাবে কাঁপবে অর্থাৎ এবারও ঠিক একই ধরণের শব্দের উৎপত্তি হবে। এডিসনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সেই টিনের চাদরের উপর ধরে রাখা শব্দকে আমরা রেকর্ড বলতে পারি। এই ব্যবস্থায় নানা অসুবিধার জন্যে এর পরে টিনের চাদরের পরিবর্তে মোমের সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এই হলো শব্দ-সঞ্চয়ের মোটামুটি পদ্ধতি। আজকাল আমরা যে সব

গ্রামোফোনের রেকর্ড দেখতে পাই, সেগুলি অবশ্য এই পদ্ধতিরই আরো উন্নত ব্যবস্থা। আজকাল মোমের উপর প্রথমে রেকর্ড তোলা হয় এবং মোমের রেকর্ড থেকে পিতল বা ব্রঞ্জের ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। আমরা যে সব রেকর্ড ব্যবহার করি, সেগুলি এই ছাঁচ থেকে একরকম শক্ত গন্ধক মিশ্রিত রাবার ও অন্যান্য পদার্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

এইভাবে শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার পদ্ধতি ছাড়াও আধুনিক যুগে আরো এক রকম উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। টেপ রেকর্ডারের নাম আজকাল সবাই জানে। এই যন্ত্রটিকেও শব্দ সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে এবং তাথেকে সেই শব্দের পুনরাবৃত্তির জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসলে এই যন্ত্রটি শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার এক প্রকার বৈদ্যুতিক-চৌম্বক পদ্ধতি মাত্র। চুম্বক এবং বিদ্যুতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে সঞ্চয় করে রেখে তাথেকে যতবার ইচ্ছা শব্দের পুনরাবৃত্তি করা চলে। এই পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল অবশ্য কিছুটা জটিল, তবে এই পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হলো—শব্দ সঞ্চয় করবার পরমুহূর্তেই সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা এর দ্বারা সম্ভব। আধুনিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বেতার কেন্দ্রেই এই যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

সমীরকুমার ঘোষ *

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. অ্যান্টিবায়োটিক্স কি ?

বারীন দাস,
নিমতা

উঃ—1. অ্যান্টিবায়োটিক্স বলতে সাধারণতঃ জীবাণুনাশক পদার্থকেই বোঝায়। বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রতিষেধক হিসাবেই এদের ব্যবহার। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ থেকে নিঃসৃত বিশাক্তীয় পদার্থ অনেক সময় অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সক্রিয়তাকে বাধা দেয়। এই জাতীয় পদার্থকে অ্যান্টিবায়োটিক্স বলা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রধানতঃ ব্যাক্‌টিরিয়া, অ্যাক্‌টিনোমাইসেটিস ছত্রাক ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। অ্যান্টিবায়োটিক্সের বেশীর ভাগই জৈব সংশ্লেষণে প্রস্তুত করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগ-প্রতিষেধকরূপে যে সব অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, ওরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতির নাম খুবই পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুর উপর এদের ক্রিয়াও বিভিন্ন। ছোটখাটো রোগ

থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসাতেই আজ অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কলেরা, টি. বি. প্রভৃতি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিক্সের সাহায্যে চিকিৎসকেরা আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন। রোগের বিভিন্ন অবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবায়োটিক্সের ক্রিয়া হ্রাস পায় না। সাধারণ ওষুধের তুলনায় এটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্রধান ধর্ম।

অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রয়োগের ফলে রোগীর দেহে অনেক সময় কম-বেশী বিষক্রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এদের উপকারিতা এতই বেশী যে, বিষক্রিয়ার প্রভাব সেখানে খুবই কম। এই বিষক্রিয়া দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই সচেষ্ট। পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক্সের বেলায় বিভিন্ন রকমের বিষক্রিয়া নিবারক ওষুধও বেরিয়েছে, যেমন—পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এন্‌জাইম পেনিসিলিনেজ ব্যবহার করা হয়।

রোগের প্রতিষেধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স নির্বাচন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ভুল প্রয়োগে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যান্টিবায়োটিক্সের ব্যবহার অপরিহার্য। এগুলি খুব দ্রুতভাবে রোগ-প্রতিষেধকের কাজ করে। অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়ে এখন বহু গবেষণা চলছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যাবতীয় রোগের প্রতিরোধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

বিবিধ

পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি

নয়াদিল্লী থেকে 20শে জুলাই পি. টি. আই. এবং ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—বৃহদাকারের পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লী নির্মাণ এবং পরমাণু-জ্বালানীর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার এক বৃহৎ কর্মসূচী নিয়ে ভারতবর্ষ '70 দশকের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাদ্রাজের কাছে কালাপাক্কামে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় প্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ কারখানা গড়ে উঠছে এবং হায়দরাবাদে পরমাণু-চুল্লীর জ্বালানী তৈরির আয়োজন সুরু হয়েছে।

ভারতীয় পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সারাভাই সাংবাদিকদের বলেছেন—আমরা 'ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম বৃত্ত' সম্পূর্ণ করতে চাই, অর্থাৎ অন্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করে দেশে যে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তার উপরেই আমাদের পরমাণু-কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে।

ডক্টর সরাভাই পরিষ্কারভাবে বলেন, পরমাণু-প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত কারও পিছনে পড়ে থাকবে না। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা বলেন, পরমাণু-বিজ্ঞান ও পরমাণু-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গত 25 বছরে ভারতের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ভারত পরমাণু-প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্রে এমন এক কঠিন পরীক্ষায় নেমেছে, যা এযাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াও পারে নি। পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশ এই নতুন প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল, কিন্তু তারা তাদের এই পদ্ধতিটিকে গোপন রেখেছে। পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহারের জন্যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-235 আলাদা করবার জন্যে ভারতে একটি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ প্ল্যান্ট তৈরি করবার প্রস্তুতি চলছে।

পরমাণু-বোমা বা পরমাণু-বিদ্যুৎ, যা-ই উৎপাদন করা হোক না কেন, ইউরেনিয়াম-235-এর উপযোগিতাই বেশী।

পৃথিবীর প্রথম সেনট্রিফিউজ কারখানাটি বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী ও হল্যাণ্ড যুক্তভাবে গোপনে তৈরি করেছে। ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই বলেছেন—ভারতের বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত রয়েছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ও সর্বাপেক্ষা জটিল পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতবর্ষ যদি কোন সময়ে পরমাণু-বোমা তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তবে এই পরিকল্পিত কারখানা হাতের কাছেই থাকবে। নিখাদ ইউরেনিয়াম-235-এর জন্যে তাকে অপরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। স্বল্প ব্যয়ে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও তখন সম্ভব হবে।

ব্যয় হ্রাসের কথা চিন্তা করেই ভারতবর্ষ সেন্ট্রিফিউজ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। এখান থেকে যে নিখাদ ইউরেনিয়াম তৈরি হবে, তা পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লীর ব্যয়ও অনেকটা কমিয়ে দেবে।

তারাপুরের প্রথম পরমাণু-চুল্লীর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিখাদ ইউরেনিয়াম আমদানী করতে হয়েছিল, কিন্তু রাজস্থানে রাণা প্রতাপ সাগর বা তামিলনাড়ুর কালাপাক্কামে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারতের কেরল উপকূলে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তা পরমাণু-চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্যে ফাস্ট ব্রীডার প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে।

পরমাণু-চুল্লীতে নিউট্রন কণিকার সাহায্যে ইউরেনিয়াম-235 কণিকার প্রোটন-ইলেকট্রনের বন্ধন ছিন্ন হবার ফলে বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড তাপ। পরমাণু-চুল্লীতে ইউরেনিয়াম-238 থেকে প্লুটোনিয়াম-239 পাওয়া যাবে। প্লুটোনিয়াম-239 বিভাজনযোগ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

1974 সালে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই সাংবাদিকদের বলেছেন যে, 1974 সালের মাঝামাঝি ভারতের নিজস্ব চেষ্টায় তৈরি ত্রিশ কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা আছে।

চার শত কিলোমিটার উঁচুতে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সেটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা শুরু করবে। হায়দরাবাদের শ্রীহরিকোটা রকেট ঘাঁটি থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

1980 সাল নাগাদ ভারতের এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে

উৎক্ষিপ্ত হবে—মহাকাশে 40 হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে এই উপগ্রহটি বিষুবরেখার উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে ভারতের মহাকাশ পরিক্রমার সূচনা হচ্ছে। ত্রিবান্দ্রমের কাছে মহাকাশ-গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা-কেন্দ্রের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহের নক্শা তৈরি করেছেন।

দেশব্যাপী টেলিভিশন প্রচারের জন্যে ভারত যখন তার নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবে, তখন সে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে হয়।

1974 সালে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হবে, সেটিকে বয়ে নিয়ে যাবে চার পর্যায়ের 20 টন ওজনের একটি রকেট। এতে কঠিন জ্বালানী ব্যবহৃত হবে। এই ধরণের রকেট উৎক্ষেপণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার পর শ্রীহরিকোটা থেকে শক্তিশালী দূরপাল্লার রকেট আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে ভারত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার দুই হাজার কিলোমিটার দূরে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করা হবে।

এসব রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে শক্তিশালী রেডার স্থাপন করা হবে। থুম্বা থেকে আবহাওয়া রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা রকেট প্রযুক্তি-বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেট ব্যবহারের উপযোগী কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি বিরাট কারখানা শ্রীহরিকোটার কাছেই গড়ে তোলা হচ্ছে। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর নজর রাখবার উপযোগী অতি শক্তিশালী রেডার নির্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

পিব্কো এবং স্ল্যাগ উল

কিছুকাল আগে দুর্গাপুরের কাছে পিব্কো নামে একটি অভিনব শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। এই কারখানায় ভারতের মধ্যে প্রথম স্ল্যাগ উল প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা জানি, লোহা বা তামা নিষ্কাশন করবার সময় প্রচুর পরিমাণ স্ল্যাগ বা ধাতুমল নির্গত হয়। এই ধাতুমল থেকে যে পশমতুল্য বস্তু প্রস্তুত হয়, তাই হচ্ছে স্ল্যাগ উল।

এই পিব্কো কারখানার প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই তৈরি করেছেন এদেশের যন্ত্রকুশলীরা। যন্ত্রপাতি তৈরির কাঁচামালও সংগৃহীত হয়েছে এদেশে। স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এখানকার সমস্ত কাজ চলে। প্রয়োজনীয় স্ল্যাগ পাওয়া যায় দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প থেকে। স্ল্যাগ উল তৈরির জন্যে এর সঙ্গে মেশানো হয় ফ্লুরোস্পার, চুন, কোক এবং অন্যান্য কয়েকটি সামগ্রী। চুল্লীর মধ্যে এই সমস্ত সামগ্রী প্রায় 600° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তারপর সূক্ষ্ম সূতার মত সামগ্রী একটি কনভেয়ারের সাহায্যে আর একটি চুল্লীতে প্রবিষ্ট করানো হয়। এখানে সেই সূতার সঙ্গে মেশানো হয় রেজিন। চুল্লীর অপর প্রান্ত থেকে মাপমত কেটে স্ল্যাগ উলের গালিচা বেরিয়ে আসে। এই গালিচা দেখতে অনেকটা ডান্‌লোপিলো রবারের প্যাডের মত, বেশ নরম ও হাল্কা।

আগে লোহা ও তামার কারখানার ধাতুমল রাস্তা তৈরির কাজে ও সিমেন্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিব্কো কারখানায় তার একটা নতুন উপযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দরোধক ঘরবাড়ী ও বরফ তৈরির কারখানায় আজ স্ল্যাগ উলের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া চুল্লী বা বিভিন্ন ধরণের বার্নারের প্রলেপ তৈরির কাজে হাত দিয়েছে পিব্কো। এই প্রলেপ উচ্চ তাপ প্রতি-

যোগে সাহায্য করবে। 1969 সালের সেপ্টেম্বরে এই কারখানাটি চালু হয়েছে। প্রাথমিক খরচের জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার মধ্যে 40 লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে মার্কিন পি-এল 480-র অন্তর্ভুক্ত একটি তহবিল থেকে।

ঝরিয়া রজ্জু-পথের 25 বছর

কয়লা খনির আগুন নেবানোর কাজে বালির একান্ত প্রয়োজন। ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে এই বালি সরবরাহ করা হয়ে থাকে রজ্জু-পথের মাধ্যমে। ঝরিয়া থেকে প্রায় 13 মাইল দূরে সাঁওতালডিহি অঞ্চলে দামোদর নদ থেকে ড্রেজারের সাহায্যে এই বালি সংগৃহীত হয়। প্রথমে নদীর গহ্বর থেকে সংগৃহীত বালি শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে বিশেষ এক ধরণের বাক্সের মত লোহার আধারে শুক্‌নো বালি রজ্জুপথ দিয়ে ঝরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। মোট আধার সমানে এই বালি বহনের কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের প্রত্যেকটির গতিবেগ মিনিটে 600 ফুট। এক একটি বাক্সের বহনক্ষমতা তিন টনের মত। ভারতের কোল বোর্ড এবং মার্কিন সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 25 বছর আগে 1945 সালে এই পথটি স্থাপিত হয়। এই প্রকল্পে মার্কিন সরকার ঋণস্বরূপ দিয়েছেন 5 কোটি 78 লক্ষ টাকা। এই রজ্জু-পথ স্থাপিত হবার ফলে ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার উৎপাদন বছরে প্রায় দেড় কোটি টনের মত বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর '70 মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে সেপ্টেম্বর মাসের (1970) চতুর্থ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। সুতরাং শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' অক্টোবর মাসের (1970) প্রথম সপ্তাহে সভ্য ও গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হবে।

—স—

—————। বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1970 | নবম-দশম সংখ্যা

নিবেদন

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন রকমের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইবার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারীত্ব এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব আজ দেশের জনগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সুষ্ঠু সমাধান তো দূরের কথা, সঙ্কটের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবার শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ব্যাহত হইতেছে। জনসাধারণকে বিজ্ঞান-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিও আজ গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বিগত শারদীয় সংখ্যাগুলি জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবার ফলে অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও এবারও আমরা গুরুতর আর্থিক দায়িত্বের ঝুঁকি লইয়া সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের ভরসা করিয়াই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা দুইটিকে একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই সংখ্যাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সরল ভাষায় লিখিত কতকগুলি রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা এইগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল মিটাইতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই আশা করি। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ধাঁধা প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অন্যান্য বারের মত এই বারের শারদীয় সংখ্যাটিও সকলের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক পরিস্থিতি

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

সূচনা

বিনামেঘে বজ্র বা বিদ্যুৎপাত হয় না। কিন্তু আকাশে যখন মেঘের কোনও ঘনঘটা থাকে না, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপর আবহাওয়া যখন বেশ শান্ত ও স্থির থাকে, তখনও যে ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বহু বছর আগেই বিজ্ঞানীরা তা জানতেন। ইং 1752 সনে ফরাসী বিজ্ঞানী Lemonnier সর্বপ্রথম উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের সন্ধান পেয়েছিলেন। নানাবিধ পরীক্ষার ফলে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর এক ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কাজ করে থাকে। একেই পজিটিভ বা ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বলা হয়। উত্তম আবহাওয়ায় এই ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বর্তমান থাকার অর্থ এই যে, এই অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে কিছু পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে এবং একই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎ ভূপৃষ্ঠে আবিষ্ট থাকে। এই ধনবাচক ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ধন-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা উপর থেকে নীচে নেমে আসে, আবার বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ঋণ-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা নীচ থেকে উপরে উঠে যায়।

ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ

ভাল আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাপ নানাভাবে করা যায়। এই সব বিভিন্ন পরীক্ষাবিধির বিবরণ ও আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—শুধু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ যা নির্ণীত হয়েছে, তারই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যাবে। ইংল্যাণ্ডের কিউ মানমন্দিরে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 317 ভোল্ট। সুইট্জারল্যাণ্ডের ডাভোস-এর উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 64 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ গড়ে 126 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর যে কোনও ভৌগোলিক অবস্থানে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রায় সমানই দেখা যায়। উত্তম আবহাওয়ায় সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রতি মিটারে প্রায় 120 ভোল্ট।

ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক, বার্ষিক ও অন্যান্য পরিবর্তন

ভাল আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল দিন-রাত্রি মিলে 24 ঘণ্টায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তা 1 নং চিত্রে প্রদর্শিত হলো। কিউ মানমন্দিরে দুটি পর্বের (1898-1915 এবং 1916-1928) গ্রীষ্মকালে নির্ণীত এই বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে বেশী, আর বেলা দুটা-তিনটায় ও ভোর রাত্রে ঐ একই সময়ে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে কম। 1921-1928 এই ক'বছরের গ্রীষ্মকালে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে কয়লার গুঁড়া, ধোঁয়া, ধুলা-বালি প্রভৃতির জন্যে বায়ুমণ্ডলে

---

*বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

অবিশুদ্ধতার গড়পড়তা পরিমাণ দিনে-রাতে কিভাবে বাড়ে ও কমে, ইংরেজ বিজ্ঞানী Whipple তা নির্ধারণ করেছিলেন। অবিশুদ্ধতার এই দৈনিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সকাল আটটা-ন'টায় প্রাতরাশের সময় যখন রান্নাঘরে উনুন ধরানো হয়, তখন ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ার জন্যে বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ বেশী হবারই কথা। পূর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 2নং চিত্রে সাযোয়া নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের যে দৈনিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে, তা কিউ মানমন্দিরে নির্ণীত ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের অনুরূপ। সাযোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতরাশের

1নং চিত্র
কিউ (Kew) মানমন্দিরে নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন।
......1898—1915 ......1916—1928

আবার রাত্রি আটটা-ন'টায় রাত্রির আহারের সময় এই একই কারণে বাতাসে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ অধিক হবারই সম্ভাবনা। 1 নং চিত্রে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। অনেকেই জানেন গ্রেট বৃটেনে গ্রীষ্মকালে সব ঘড়ির কাঁটা দিনের আলো বেশী পাবার জন্যে এক ঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হয়। 1916 সন থেকে এভাবে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 1 নং চিত্রে দেখা যাবে, ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সর্বাধিক পরিমাণ 1916-'28 পর্বে (1898-1915 পর্বের তুলনায়) সকালে ও রাত্রে এক ঘন্টা সময় বিশেষ ঘটা করে আগুন জ্বালাবার প্রথা আছে। এই কারণেই ক-চিহ্নিত গ্রাফে 40টি রবিবারে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ সকাল আটটা-ন'টায় রাত্রের তুলনায় তিন গুণেরও বেশী দেখা যায়। খ-চিহ্নিত গ্রাফে রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত 264 দিনের ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের গড়পড়তা পরিমাণ সকাল আটটা-ন'টায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

বায়ুর অবিশুদ্ধতার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সম্পর্ক কি, তা পরে আলোচিত হবে। উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ

বলের দৈনিক পরিবর্তনের তাৎপর্য কি, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও পরে দেওয়া হবে।

স্থানীয় সময়ের পরিবর্তে যদি Greenwich Mean Time (G.M.T.) অর্থাৎ গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তবে যে কোনও দেশে স্থলভূমি বা সমুদ্রের উপর কিভাবে বাড়ে ও কমে, 1929 সনে Whipple তা দেখিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে যেভাবে পরিবর্তিত হয়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের মিল দেখা যায়। 3নং চিত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল 04

2নং চিত্র

সামোৰা নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন। ক…40টি রবিবারের গড়পড়তা মূল্যায়ন, খ—রবিবার থেকে পরের শনিবার 264 দিনের গড়পড়তা মূল্যায়ন।
এখানে বলা প্রয়োজন যে, সামোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতরাশের সময় বিশেষ ঘটা করে আগুন জ্বালবার প্রথা আছে।

উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল মোটামুটি একই ভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। 3নং চিত্রে গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন প্রদর্শিত হলো। গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা GMT-ঘণ্টায় সবচেয়ে কম এবং প্রায় 20 GMT-ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশী থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে আত্যধিক বাজ ও বিদ্যুতের তিনটি অঞ্চল দেখা যায়; যথা—(1) ওলন্দাজ অধিকৃত ইস্ট ইন্ডিজ (Dutch East Indies), (2) দক্ষিণ আফ্রিকা ও (3) দক্ষিণ আমেরিকা। সাধারণতঃ পৃথিবীর সর্বত্রই বিকাল

চারটায় (স্থানীয় সময়) বিজলি-ঝড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। স্থানীয় সময় চার ঘটিকা এই তিন অঞ্চলে 04 থেকে প্রায় 20 GMT-ঘণ্টার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং 04 GMT-ঘণ্টা থেকে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বল বাড়তে থাকবে এবং প্রায় 20 GMT-ঘণ্টায় তা সবচেয়ে বেশী হবে।

3নং চিত্র
GMT—ঘণ্টার সঙ্গে সমুদ্রের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধেই শীতকালে সবচেয়ে বেশী ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে কম দেখা যায়। দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ঐ অঞ্চলে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল শীতকালে সবচেয়ে কম ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশী।

বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা

বাতাসের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা 1887 সনে বিজ্ঞানী Linns সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। 1899 সনে Elster ও Geitel এবং তার এক বছর পরেই বিখ্যাত পদার্থবিদ্ C. T. R. Wilson স্বাধীনভাবে দেখিয়েছিলেন যে, যাকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বলা হয়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎসম্পন্ন কণাই বিদ্যুতের বাহকরূপে বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার সৃষ্টি করে। কি শক্তির প্রয়োগে ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়নিত হয়—এই বিষয়ের আলোচনায় ভূগর্ভস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা কিছু বলতে হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে ধনাত্মক আল্‌ফা-কণা নির্গত হয়—তা হিলিয়াম পরমাণুর কোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর শিলাস্তর ভেদ করে ভূগর্ভের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে আল্‌ফা কণাগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর আসতে না আসতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। দেখা গেছে, আল্‌ফা-কণা ভূতলের কাছাকাছি কয়েক সেন্টিমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে আয়নিত করতে পারে মাত্র। ভূগর্ভের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে বিটা-কণা (বা দ্রুতগামী ইলেকট্রন) এবং গামা-রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলিকে ভূতল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত আয়নিত করে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে যে সব

আয়ন দেখা যায়—তাদের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে এদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। এদের 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়ন বলা হয়। এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় দেড় সেন্টিমিটার। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে কখনও কখনও আগুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া, ধুলা-বালি ও জলকণা ভাসমান থাকে। বায়ুমণ্ডল যখন আয়নিত হয়, তখন বিদ্যুৎসম্পন্ন 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নগুলি বিদ্যুৎবিহীন এই সব অপেক্ষাকৃত বড় বড় বস্তু-কণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের সৃষ্টি হয়। প্রতি সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ 0·003-0·005 সেন্টিমিটার। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়ন, 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। এর কারণ এই যে, ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর আগুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া, ধুলা-বালি ইত্যাদি স্বভাবতঃই সমুদ্রের উপরের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' এবং 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়ন ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে মধ্যম শ্রেণীর আয়নের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এদের গতিবেগ এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট প্রয়োগে 0·1—0·01 সেন্টিমিটার। বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন আয়নের শ্রেণীবিভাগও আজ সম্ভব হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন—যেখানেই 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নের আধিক্য দেখা যায়, সেখানেই আয়নের দ্রুত গতিবেগের জন্যে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী, আর যেখানেই 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের প্রাচুর্য, সেখানেই আয়নের মন্থর গতির জন্যে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যদি বেশী হয়, তবে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কমে যায়; আবার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা খুব কম হলে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল বৃদ্ধি পায়। পরে এই বিষয়টি আলোচিত হবে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা একই সঙ্গে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের যত উর্ধ্বে ওঠা যায়, ততই বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যায় বেড়ে এবং সেই অনুপাতে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলও যায় কমে। নীচের তালিকায় ভূপৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন উচ্চতায় উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার পরিমাণ জার্মান বিজ্ঞানী Wigand-এর 1925 সনের পরীক্ষার ফল থেকে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

উচ্চতা (metre)	উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল (volts/cm)	বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (e. s. u.)
0	136	$1·1 \times 10^{-4}$
2500	72	$4·3 \times 10^{-4}$
4400	18	$8·2 \times 10^{-4}$
6500	8·8	$12·6 \times 10^{-4}$

তালিকা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলও সেই সঙ্গে অনেক কম হয়। বলা বাহুল্য, যদি ভূগর্ভস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত কণা ও বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের আয়নিত অবস্থার একমাত্র কারণ হতো, তবে উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ক্রমশঃ হ্রাস পেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির কারণ মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)। একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাইরে নানা দিক থেকে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এই ভেদনশীল রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডল আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী Chalmers-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে আনুমানিক 50 কিলোমিটার ঊর্ধ্বে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা এত অধিক যে, সেখানকার বায়ুস্তরকে সম-বিভবসম্পন্ন (Equipotential) বলা যেতে পারে। এই সম-বিভবসম্পন্ন স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে—তড়িৎমণ্ডল (Electrosphere)। এই স্তরটির বৈদ্যুতিক বিভব প্রায় 3×10^5 ভোল্ট। যাকে আমরা আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলি—তা তড়িৎমণ্ডল থেকে আরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। 80 থেকে 350 কিলোমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই মণ্ডলটি বিস্তৃত। এখানে বলা দরকার যে, ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল আয়নমণ্ডলের উপর নির্ভর করে না। আয়নমণ্ডলের অনেক নীচে যে তড়িৎমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হলো—তার বৈদ্যুতিক বিভব এবং ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাই ভূপৃষ্ঠের উপর অপেক্ষাকৃত নিম্ন বায়ুস্তরে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক বিভব শূন্য ধরা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎমণ্ডলের বৈদ্যুতিক বিভব যদি V ভোল্ট হয় এবং ভূতলের এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের উপর তড়িৎমণ্ডল পর্যন্ত ঊর্ধ্বাধঃ বায়ুস্তম্ভের রোধ যদি হয় R ওম্ (Ohm), তবে তড়িৎমণ্ডল ও ভূতলের মধ্যে প্রতি বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে—

$$i = \frac{V}{R} \text{ ampere} \cdots\cdots (1)$$

এবার ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের কথা ধরা যাক। ভূতল থেকে এক মিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তম্ভের রোধ যদি হয় r ওম্, তাহলে ভূতল থেকে এক মিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুস্তরে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল হবে—

$$E = i\,r \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots (2)$$

সুতরাং 1নং সূত্র থেকে আমরা পাই—

$$E = \frac{Vr}{R} \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots (3)$$

এক মিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তম্ভের রোধ (r) এবং এই নিম্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (λ)—এই দু'য়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিম্নলিখিত সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায়, যথা—

$$\lambda = \frac{1}{r} \cdots\cdots\cdots\cdots (4)$$

3 ও 4 নং সূত্রের সাহায্যে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে—

$$E = \frac{V}{R\lambda} \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots\cdots (5)$$

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তম আবহাওয়ায় V ও R-এর প্রত্যেকটির পরিমাণ মোটামুটিভাবে সমান ধরা যেতে পারে। সুতরাং যখনই ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (λ) বাড়ে বা কমে, 5নং সূত্র অনুসারে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কমে বা বাড়ে।

1নং চিত্রে কিউ মানমন্দিরে নির্ণীত উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় এই বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বেলা দুটো-তিনটায় ও ভোর রাত্রে ঐ একই সময়ে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা কম হয়। কেন এমন হয়, তার ব্যাখ্যা 5নং সূত্র থেকে সহজেই পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় রান্নাঘরের ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি বেশী থাকে বলে এই সময়ে নিম্ন বায়ুস্তরে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত

অধিক। আবার অপরাহ্ণে ও শেষ রাত্রে বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ কম থাকায় সেই সময়ে 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়ন-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেখানেই 'দ্রুত' আয়নের আধিক্য, সেখানেই আয়নের দ্রুতগতির জন্যে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। আবার যখনই 'মন্থর' আয়নের প্রাচুর্য, তখনই আয়নের মন্থর গতির জন্যে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। কাজে কাজেই প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়, যখন বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি বেশী এবং 'মন্থর' আয়নের সংখ্যাই অধিক হবার সম্ভাবনা, তখন বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হ্রাস পায়। ফলে 5নং সূত্র অনুসারে প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়ে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। আবার অপরাহ্ণে ও শেষ রাত্রে বায়ুমণ্ডলে 'দ্রুত' আয়নের আধিক্য থাকায়, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। সুতরাং 5নং সূত্র অনুযায়ী অপরাহ্ণে ও শেষরাত্রে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের হ্রাস দেখা যায়।

উত্তম আবহাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এবং উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রণষ্টির সম্ভাবনা

উত্তম আবহাওয়ায় উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ধনাত্মক আয়নগুলি উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে নেমে আসে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলি ভূতল থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই আয়ন-চলাচলের ফলে বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, এই বিদ্যুতের পরিমাণ এক সেণ্টিমিটার চৌকোর প্রায় 3×10^{-16} অ্যাম্পিয়ার। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় 6×10^{3} কি. মি.; সুতরাং সমপ্রভাবে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 1500 অ্যাম্পিয়ার। এখানে বলা দরকার যে, জলবিন্দু, শিলা প্রভৃতির অধঃক্ষেপের ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 300 অ্যাম্পিয়ার। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি যোগ করা যায়, তবে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মোট পরিমাণ 1800 অ্যাম্পিয়ার। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছুবার অনতিকাল পরেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে সঞ্চিত ধন-বিদ্যুৎ ও সমগ্র ভূতলে একই পরিমাণের ঋণ-বিদ্যুৎ বিনষ্ট হয়ে যাবার কথা; অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বিলুপ্তি হবার সম্ভাবনা। মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের যে অবসান হবে, তা সহজেই হিসাব করা যায়। কিন্তু আমরা জানি, উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বিলোপ লক্ষিত হয় না। এর কারণ কি—এবার তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রবন্ধটি শেষ করবো।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সংরক্ষণ

1925 সনে Brookes-এর গণনা অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড়ের সংখ্যা চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় 44,000। যদি ধরা যায়, একরকম প্রতিটি বৈদ্যুতিক ঝড় গড়পড়তা এক ঘণ্টা ধরে চলে, তবে যে কোনও মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বত্র বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা হবে মোটামুটি আঠারো শত। এখন যদি মনে করা যায় যে, এক-একটি বিদ্যুৎ ঝলকে 20 কুলম্ব্ (Coulomb) ঋণ-বিদ্যুতের ক্ষরণ হয় এবং যদি ধরা যায় যে, এক মিনিটে তিনটি ঝলক দেখা যায়, তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ হবে $\frac{1800\times20\times3}{60}$ অর্থাৎ 1800 অ্যাম্পিয়ার। সুতরাং বলা যেতে

পারে যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিদ্যুৎপাতের ফলে প্রায় 1800 অ্যাম্পিয়ারের ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ সমপ্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে এই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎপাতের জন্যেই, পৃথিবীর যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া দেখা যায়, সেই সকল স্থানে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল মোটামুটিভাবে সংরক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎপাতের ফলে যদি সমপ্রভাবে ভূতলে ঋণ-বিদ্যুতের সমাবেশ না হতো, তবে যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া, সেই সকল স্থানে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর থেকে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যেত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। এই কথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শুনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে, সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম, তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

প্লাজ্‌মা ও বিপরীত জগৎ

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

সাধারণ ও বিপরীত পদার্থ

পৃথিবীর পদার্থসমূহের মোটামুটি গঠন-বিন্যাস আমাদের অজানা নয়। অণু, পরমাণু, নিউক্লিয়াস কিভাবে গড়ে উঠেছে, আবার কোটি কোটি আলোক-বছর পরিধিবিশিষ্ট বিশ্ব-ছায়াপথ (Meta-galaxy), যা বহু ছায়াপথের সমবায়ে গঠিত এবং আমাদের ছায়াপথ, ছোট-বড় নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সবই পৃথিবীর পদার্থ দিয়ে গড়া—এই হলো বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই ধারণা নিয়েই সৃষ্টিতত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে—বিশ্ব-রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা চলেছে। সোজাসুজি এই সব চিন্তা-ভাবনায় বিপরীত পদার্থকণা (Anti-matter) পজিট্রন, বিপরীত প্রোটন (Anti-proton), বিপরীত নিউট্রন (Anti-neutron) উড়ে এসে জুড়ে বসলো—ফলে সবই তো নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য এগুলির আবিষ্কার হবার পর পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রতিসাম্যের প্রত্যাশিত নিয়মটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলো। ধন ও ঋণ আধানের মধ্যে যখন প্রতিসাম্য রয়েছে, তখন ঋণ আধানের শুধু হাল্কা ইলেকট্রন অথবা ধন আধানের শুধু ভারী প্রোটন হবে কেন? পজিট্রন ও বিপরীত প্রোটন পদার্থ-জগতের এই অসাম্য দূর করলো। প্রতিসাম্যের খাতিরে তাহলে বিপরীত পদার্থও তো থাকা উচিত। Goldhaber-এর বিপরীত ডয়টেরন আবিষ্কারের পর এই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত নিউট্রনের সমবায়ে তৈরি হয়েছে বিপরীত ডয়টেরন। এগুলি সবই আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে, যেখানে সব কিছুই সাধারণ পদার্থ (Koinomatter) দিয়ে গড়া। আমাদের পদার্থ-জগতে স্বভাবতঃই এই সব বিপরীত পদার্থ অস্থায়ী আগন্তুক। সাধারণ পদার্থের বিন্দুমাত্র সংঘাতে এই সব বিপরীত পদার্থকণা মিলিয়ে গিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নানা কলাকৌশলের মাধ্যমে এদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে। আর একটু এগিয়ে আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি—বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রনের সমবায়ে বিপরীত হাইড্রোজেন পরমাণু—এমন কি, বিপরীত নিউট্রন সহযোগে আরো ভারী ভারী সব বিপরীত মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে পারে। এখনই তৈরি করা সম্ভব না হলেও প্রতিসাম্যের খাতিরে এই রকম বিপরীত পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব। এরকম বিপরীত পদার্থের বিপরীত জগৎ (Anti-world) বিশ্বের কোথাও থাকতে পারে। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের কলাকৌশলে তা ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা আছে কি? ধরা যাক, নক্ষত্র-জগতের অর্ধেক বাসিন্দাই বিপরীত পদার্থে তৈরী। অনেক নক্ষত্রই চুম্বকধর্মী—ফলে সেই সব নক্ষত্রের বর্ণালীরেখা জিম্যান-ক্রিয়ার (Zeeman effect) ফলে বিভক্ত হয়। এখন কোন নক্ষত্রের জিম্যান বর্ণালীর দিক নির্ণয় করে নক্ষত্রটি বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া হলে তার দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর দিকে থাকবে, বলা যেতে পারে। কারণ এই বর্ণালী ইলেকট্রন ও পজিট্রনের বেলায় হবে পরস্পর বিপরীতমুখী। কিন্তু কোন্ নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে তার উত্তর মেরু অথবা দক্ষিণ মেরু প্রসারিত করে রেখেছে, তা মাপবার কোন উপায় নেই। যদি নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী মহাকাশ শূন্য হয়, তবু সাধারণ ও বিপরীত নক্ষত্রের

---

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,
কলিকাতা—9

আলোতে কোন পার্থক্যই আমরা দেখতে পাব না।

ফলে বিপুল বিশ্বজগতের কিছুটা যে বিপরীত জগৎ হবে না, একথা আমরা হলফ করে বলতে পারি না। অবশ্য আমাদের পৃথিবী যে সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কেবল অল্পমাত্রায় আমরা কিছু এই সব অপার্থিব বিপরীত পদার্থ তৈরি করেছি মাত্র। তাছাড়া আরও কিছু কিছু বিপরীত মৌলিক কণার সন্ধানও আমরা পেয়েছি। না—চাঁদেও বিপরীত পদার্থ নেই, তার প্রমাণ তো চন্দ্র-অভিযাত্রীরা হাতে হাতে দিয়েছেন। সূর্যও সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া। তা না হলে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত প্লাজ্‌মা থেকে আমরা যে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে পাই, তার জ্যোতি আরও হাজার গুণ বেড়ে যেত—বিপরীত প্লাজ্‌মা ও পার্থিব বস্তুর সংঘাতে। এই সৌর প্লাজ্‌মা বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও পৌঁছায়। সেখানে কোন অঘটন ঘটে না—তা থেকে সূর্য যে বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া নয়, তা প্রমাণিত হয়। আর যে সূর্য থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে—সেই গ্রহগুলিও যে বিপরীত জগৎ নয়, তা সহজেই ধরা যায়।

এখন পর্যন্ত যে সব উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে, তার কোনটাই বিপরীত জগতের টুকরা নয়। ফলে বিপরীত জগতের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ মনে হবে রূপকথার মত। তবে Libby অনুমান করেছিলেন, 1908 সালে সাইবেরিয়ায় যে উল্কাটি পড়েছিল, সেটি বোধ হয় বিপরীত পদার্থের টুকরা। এই অনুমান যেমন খণ্ডিত করা হয় নি, তেমনি প্রমাণিতও হয় নি। ফলে বিপরীত জগৎ যবনিকার অন্তরালেই রয়ে গেছে। তবু বিজ্ঞানীরা প্রতিসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত জগতের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগৎ মুখোমুখি থাকতে হলে তার সীমারেখা অথবা প্রান্তিক জগৎ কি রকম হবে, তা ভেবে দেখছেন।

ধরা যাক—নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী স্থান শূন্য নয়, সেখানে ছড়িয়ে আছে প্লাজ্‌মা অর্থাৎ প্রোটন ও ইলেকট্রনের মুক্ত অঞ্চল। প্লাজ্‌মা হলো পদার্থের বায়ব, তরল ও কঠিন—এই তিন অবস্থার বাইরে তার চতুর্থ অবস্থা। সাধারণ জগতের প্রান্তে যেমন সাধারণ প্লাজ্‌মা (Koino-plasma) থাকবে, তেমনি বিপরীত জগতের কাছাকাছি জায়গায়ও থাকবে বিপরীত প্লাজ্‌মা (Anti-plasma)। এতে মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রনের মেলা। তাহলে সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী স্থানে সাধারণ প্লাজ্‌মা ও বিপরীত প্লাজ্‌মার সংঘাতে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন Alfven ও Klein প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশ ও প্লাজ্‌মা

সম্পূর্ণ আয়নিত পদার্থ, যাতে ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি ছাড়া নিরপেক্ষ পদার্থ থাকে না—কিছুটা ঐ রকম পদার্থ থাকলে তাকে আংশিক প্লাজ্‌মা বলে। কোন বায়বীয় পদার্থ উত্তপ্ত হলে আয়নিত হয় উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—কোন কোন অবস্থায় 5000°—10,000° ডিঃ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আবার কখনো আরো বেশী তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ আয়নিত বায়বীয় প্লাজ্‌মার রূপ নেয়। আয়ননের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আয়ন ও ইলেকট্রনের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকে। প্লাজ্‌মার সাম্যাবস্থা হলো তখন, যখন আয়নন ও পুনর্মিলনের মাত্রা সমান সমান দাঁড়ায়।

বিশ্বজগতে নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা যথেষ্ট, তাই সম্পূর্ণ না হলেও নক্ষত্রপৃষ্ঠ আংশিক প্লাজ্‌মা সন্দেহ নেই। তাদের অভ্যন্তর ভাগ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ প্লাজ্‌মা, কারণ সেখানে তাপমাত্রা আরো বেশী। ছায়াপথে মধ্যবর্তী শূন্য স্থানগুলিও

কিন্তু আংশিক প্লাজ্‌মার ভক্তি, অবশ্য ঘনত্ব নক্ষত্রদেহ থেকে অনেক কম—এক ঘনমিটারে প্রায় একটি পরমাণু। এই হাল্কা ঘনত্বের প্লাজ্‌মা, যা মহাকাশকে আবৃত করে রেখেছে, বিপরীত জগতের চাবিকাঠি কিন্তু তাতেই রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। মহাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে অতি ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র। তার পরিমাণ 10^{-5} বা 10^{-6} গউসের মত অর্থাৎ পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্রই মহাকাশের হাল্কা প্লাজ্‌মার ধর্ম অর্থাৎ তার গতিবিধি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজ্‌মা হলো আহিত কণিকার সমষ্টি চুম্বকীয় শক্তিতে এই কণিকাগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে। এই কুণ্ডলীর পরিধি যেমন ইলেকট্রন আর প্রোটনের বেলায় তফাৎ—আবার কণার শক্তির উপরও নির্ভরশীল—চুম্বকীয় শক্তির উপরও বটে। আবার প্রোটন ও ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই গতিবিধির দিকও বিপরীতমুখী। মহাকাশে সর্বত্রই যে সমান চৌম্বক ক্ষেত্র থাকতে পারে, তাও সম্ভব নয়। ফলে এই কুণ্ডলীর পরিধি কখনো বিস্তৃততর আবার কখনো সঙ্কীর্ণ হওয়াই সম্ভব। আবার বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রগুলির দিকও বিরাট মহাকাশে একমুখী না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। ফলে কোন প্লাজ্‌মা-কণাই মহাকাশে চৌম্বক বলরেখার সমান্তরাল নয়—তাই তাদের কুণ্ডলী পাকিয়েই চলতে হবে। সোজাসুজি না গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলবার ফলে একটি নক্ষত্রদেহ থেকে আর একটি নক্ষত্রদেহে কোন কণিকার স্থানান্তর সম্ভব নয়। অবশ্য কণিকার শক্তি যদি খুব বেশী হয়, যার ফলে মহাকাশে তার কুণ্ডলীর ব্যাস নক্ষত্র দুটির দূরত্ব থেকেও বেশী, তবেই এই স্থানান্তর সম্ভব। কিন্তু সেই শক্তির (প্রায় 10^{14} ইলেকট্রন ভোল্ট) কণিকা থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কোন বৃহদাকারের মহাকাশযান মহাকাশের এই ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র ও হাল্কা প্লাজ্‌মার কোন অনুভূতিই পেতে পারে না, অথচ এই দুইয়ে মিলে আন্তর্নাক্ষত্রিক কণা চলাচলের পক্ষে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথের বেলায়ও ঠিক একই নিয়ম খাটে।

বিপরীত প্লাজ্‌মা ও উভপ্লাজ্‌মা

এখন দেখা যাক, দুটি নক্ষত্রের বেলায় কি ঘটে? ধরা যাক, একটি নক্ষত্র সাধারণ ও আর একটি নক্ষত্র বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত। ফলে সাধারণ নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে সাধারণ প্লাজ্‌মা আর বিপরীত নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে বিপরীত প্লাজ্‌মা অর্থাৎ মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রন। ক্রমশঃ এই সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার ঘনত্ব ক্রমশঃ দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে। তার পর এক জায়গায় নিশ্চয়ই সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মা মিলে যাবে। কিন্তু মিলবে কি করে? প্রোটন ও বিপরীত প্রোটন মিললেই তো তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তার ফলে হবে কতকগুলি মেসনের সৃষ্টি, যাদের পরিণতি হলো গামা-রশ্মি, নিউট্রিনো আর ইলেকট্রন-পজিট্রনে। প্লাজ্‌মার নিজস্ব ইলেকট্রন, পজিট্রনও তো রয়েছে। যাহোক, সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মা অর্থাৎ যেখানে সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের মিলনস্থল—বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন উভপ্লাজ্‌মা (Ambiplasma)। এই উভপ্লাজ্‌মাই হলো সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের সেতুবন্ধ। সে প্রসঙ্গে আসবার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে Leidenfrost নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। আবিষ্কারের বিষয়টি জানবার আগে অবশ্য একটি সাধারণ পরীক্ষা রান্নাঘরেই করা যেতে পারে। একটি গরম ধাতুপাত্র নিয়ে তাতে এক ফোঁটা জল রাখুন। প্রায় 100° সেঃ তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে এই বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে হিস্‌হিস্ শব্দ করে উবে যাবে। আরো একটু তাপমাত্রা বাড়ালে দেখা যাবে,

জলবিন্দুটি উবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন যদি কয়েক শত ডিগ্রীতে তুলে ঐ লাল্‌চে পাত্রটির উপর জল-বিন্দু ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে উবে যাচ্ছে না। পাঁচ মিনিটের উপরও এই বিন্দুটিকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারবে—যদিও তা একটু এদিক-ওদিক আলোড়িত হবে মাত্র। ক্রমশঃ বিন্দুটির আয়তন কমতে কমতে এক সময় উবে যাবে। অবশ্য হঠাৎ যদি পাত্রটির তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলা যায়, তাহলে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুটির বিলুপ্তি ঘটবে। লীডেনক্রষ্টের আবিষ্কার হলো এই জলবিন্দুর উবে যাওয়া নিয়ে। তাঁর মতে, বিন্দুটি উবে যাবার আগে একটি বাষ্পের স্তর পাত্র ও বিন্দুটির মধ্যে একটি অপরিবাহী স্তরের সৃষ্টি করে। ফলে পাত্রের তাপ বিন্দুটির উপর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়। পাত্রের উচ্চ তাপমাত্রা অনুযায়ী আরো পুরু বাষ্পস্তরই শুধু জলবিন্দুর উবে যাওয়া বিলম্বিত করতে পারে। 100° সেঃ তাপমাত্রার সামান্ত ঊর্ধ্বে এই বাষ্পস্তর এতই পাত্‌লা যে, খুব তাড়াতাড়ি তাপ সঞ্চালিত হয়ে জলবিন্দুটি তাড়াতাড়ি উবে যায়।

ঠিক একই রকম ব্যাপার ঘটতে পারে সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার বেলায়। এদের মিলনস্থলে লিডেনক্রষ্ট-স্তরের অনুরূপ একটি স্তর সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের বিলুপ্তিকে বিলম্বিত করবে। প্রথম দিকে এই বিলোপজনিত শক্তিই সীমান্ত স্তরগুলিকে অতি উচ্চ মাত্রায় উত্তপ্ত করে তুলবে। তখন সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার বিলোপ সাধন আরো বিলম্বিত হবে। ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লিডেনক্রষ্ট-স্তর সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার প্রান্তরেখায় একটি বাধার প্রাচীর তৈরি করে এদের মিলন, তথা বিলুপ্তিকে আটকে রাখবে। হিসাবে দেখা যায় যে, এরকম স্তরের বিস্তৃতি হবে $\frac{1}{1000}$ আলোক-বছর।

লিডেনক্রষ্ট-স্তর ও বেতার-তরঙ্গ

এখন উত্তপ্লাজ্‌মার কথায় আসা যাক। উত্তপ্লাজ্‌মাতেই তো লিডেনক্রষ্ট-স্তরের অস্তিত্ব। আগেই বলা হয়েছে—বিপরীত প্রোটন ও প্রোটন থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রন-পজিট্রন তৈরি হয়। গামা বা নিউট্রিনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বাধা না মেনে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে ইলেকট্রন-পজিট্রন থেকে যায়, তাদের শক্তি প্রায় 10^{12} ডিঃ তাপমাত্রার সমকক্ষ। এত তাপমাত্রায় কোন বায়বীয় বা প্লাজ্‌মা উত্তেজিত হলে তার চাপ বেড়ে যায় ও প্রসারিত হয়ে পড়ে। এখন উত্তপ্লাজ্‌মায় সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার প্রাথমিক বিলোপজনিত শক্তিতে উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার প্রসারণের ফলে একে অপরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এরা আর পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে পারে না। উত্তপ্লাজ্‌মায় এই ভাবে তৈরি হয় একটি বাধার স্তর, যাকে আমরা লিডেনক্রষ্ট-আবিষ্কৃত অপরিবাহী বাষ্পস্তরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

উত্তপ্লাজ্‌মা যে শুধু গামা ও নিউট্রিনোর উৎস, তা নয়, কিছুটা শক্তি হয় বেতার-তরঙ্গের আকারেও সেখানে সৃষ্ট হবে। সাধারণ ও বিপরীত জগতের সীমারেখার অস্তিত্ব ধরতে হলে আমাদের এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্য নিতে হবে। তার কারণ, নিউট্রিনোর কোন যন্ত্রে ধরা পড়বার কথা নয়। আবার গামা-রশ্মি ধরবার চেয়ে এই সব বেতার-তরঙ্গ ধরবার সুবিধা বেশী। ফলে সাধারণ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী এই বিচিত্র স্তরটির বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়লে তবেই বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাব। অনেক বেতার-নক্ষত্র (Radio star) ধরা পড়েছে, যারা এই সব বেতার-তরঙ্গ অনবরত পাঠিয়ে চলেছে। দুই বিপরীত জগতের প্রান্তদেশ যে এরকম একটি বেতার-নক্ষত্র নয়, তাই-ই বা কে বলতে পারে? বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আজও আমাদের অজানা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্‌মাই বুঝি এই জগতের চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছে। কে জানে—হয়তো ভবিষ্যতে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলা দেশে মাছের চাষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস

সে আজ অনেক দিনের কথা—কয়েক জন বিত্তশালী ব্যক্তি বাংলা দেশে জমিদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে মনোমত ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাঁহাদের জমিতে স্থাপন করিলেন। এই সকল প্রজার সুখ-সুবিধার প্রতি জমিদারদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা প্রজাদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্ত মন্দির ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পথ চলিবার জন্ত প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ ও পানীয় জল সরবরাহের জন্ত স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া জনহিতকর কার্য করিতেন। ক্রমে বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত নীচু জমি ভরাট করিবার জন্ত ও পল্লীকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজনে বাঁধ নির্মাণ করিতে ছোট-বড় অনেক পুষ্করিণী, ডোবা ও জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি পাইলে ছোট নদী বা নালা দিয়া জল এই সকল পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছের চারাও আসিয়া বড় হইতে থাকিত। ইহার ফলে প্রজাদের পক্ষে অনেক লাভ হইত। সেই জন্ত অনেক স্থানে বর্ষার পূর্বে মাছের লোভে পুকুরের পাড় কাটিয়া জল আসিবার পথ তৈয়ার করা হইত। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) কোন কোন স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে।

১নং চিত্র

মার্শারী ট্যাঙ্কের দৃশ্য। সম্মুখে হাপার চারা মাছ।

মাছ খাওয়া বা মাছের চাষ করা পূর্বে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হইল যে,

আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান উপাদান প্রোটিন মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং যখন চিকিৎসকগণ রোগীদের পথ্য হিসাবে মাছ খাওয়া সুপারিশ করিলেন, তখন লোক দলে দলে মাছ খাইতে ও মাছের চাষ করিতে লাগিল। ক্রমে মাছের চাষ বিশেষ লাভজনক শিল্প বলিয়া প্রমাণিত হইলে অভিজাত সম্প্রদায়েরও অনেকে মৎস্য-চাষে প্রবৃত্ত হন। মৎস্য-চাষ ও মৎস্য-ব্যবসায় তখন আর অসম্মানজনক শিল্প বলিয়া বিবেচিত হইত না। পরে বিজ্ঞানের সহায়তায় শহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিলে এবং পানীয় জলের জন্য পল্লীগ্রামে টিউব ওয়েল স্থাপিত হইলে পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলি যত্ন ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এখনও অনেক পুষ্করিণী ও জলাশয় অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলি অনাবাদী থাকিবার প্রধান কারণ

2নং চিত্র

রেলগাড়ীতে খোলা হাঁড়ির মধ্যে করিয়া চারা মাছের চালান।

—(1) মৎস্য-চাষের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব, (2) সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং (3) যৌথ অধিকারীদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য। উপযুক্ত মৎস্য-বীজের অভাবও অনেক সময় লাভজনক মৎস্য-চাষের অন্তরায় হইয়া থাকে।

আমরা অনেক রকম মিঠাজলের মাছ খাইয়া থাকি, তাহাদের সবগুলিই লাভজনক মাছের চাষের উপযোগী নয়। যে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, দেখিতে সুশ্রী ও খাইতে সুস্বাদু, যে সকল মাছ মৎস্যভুক নয় এবং মৎস্য-শিকারীদের পক্ষে আনন্দদায়ক, সেই সকল মাছের চাষই লাভজনক। রুই, কাৎলা, মৃগেল ও কালবোস প্রভৃতি মাছ এই সকল গুণের অধিকারী। কিন্তু কুঁচি বাটা, খড়্‌কে বাটা, ভাঙন বাটা, সরল পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতি পুকুরের মাছ অনেকের কাছে লোভনীয় হইলেও সেগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে তেমন লাভজনক নয়। কই, মাগুর, শোল, শাল প্রভৃতি মাছ অনেকের

প্রিয় হইলেও ইহারা মৎস্যভুক মাছ বলিয়া ব্যবসায়ের উপযোগী নয়। এই সকল মাছের দুই রকমের শ্বাসযন্ত্র থাকিবার ফলে ইহারা জলের বাহিরে অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এইগুলি জিওল মাছ নামে পরিচিত। ইহারা বিস্তীর্ণ অগভীর জলাভূমি ও বিল এলাকায় বিচরণ করে। ইহাদের পুকুরে রাখিয়া পালন করিলে বর্ষার সময় মাটির উপর দিয়া এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে চলিয়া যাইতে পারে। ইলিশ মাছও

ইংরেজীতে বলা হয় Indian major carp, বাংলায় আমরা পোনামাছ বলিয়া থাকি। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল পোনামাছের মত দেখিতে Common carp নামে এক প্রকার বিদেশী মাছকে বাংলা দেশে আনা হইয়াছে। এই মাছগুলি বাংলার জলাশয়গুলিতে স্থিতিলাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার বাজারে আমেরিকান রুই নামে বিক্রীত হইতেছে। আসলে ইহারা যবদ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। এই মাছগুলির বিশেষত্ব

3নং চিত্র
প্লেনে চারা পোনার টিন বোঝাই।

অনেকের প্রিয় খাদ্য, কিন্তু আসলে ইহারা অগভীর সমুদ্রের মাছ। বর্ষাকালে ডিম ছাড়িবার সময় মিঠাজলের নদীতে প্রবেশ করিবার কালে এবং সমুদ্রে ফিরিয়া যাইবার পথেও কতকগুলি মাছ জালে ধরা পড়ে। ইলিশ মাছ খুবই স্পর্শকাতর, জল হইতে তুলিলেই ইহারা মরিয়া যায়। ইলিশের চারা সতর্কভাবে আনিয়া পুকরিণীতে রাখিলেও অধিকাংশই মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টগুলি বড় হইলেও খাইতে তেমন সুস্বাদু হয় না।

রুই, কাৎলা মৃগেল ও কালবোস মাছকে

হইল—ইহারা বদ্ধ পুকরিণীতেও বৎসরে দুই-তিন বার ডিম ছাড়ে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার পর পুকরিণীতে সামান্য জলজ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। আমরা এই মাছকে কার্পিও বলিব। কারণ ইহার আসল নাম Cyprinus carpio—আমেরিকান রুই নামটি গৌরবাত্মক। ঐরূপ Tilapia নামে আফ্রিকার একজাতীয় মাছকে কলিকাতার বাজারে আমেরিকান কই বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এমন একদিন ছিল, যখন যাহা কিছু ভাল তাহার নামকরণ গৌরবে 'বিলাতি' শব্দ যোগে করা

হইত, যথা—বিলাতি আমড়া, বিলাতি বেগুন ইত্যাদি—যদিও ঐ আমড়া ও বেগুন বিলাত হইতে আমদানী করা নয়।

ভারতীয় পোনামাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। স্ত্রী-মাছ পূর্ণ পরিপক্ক হইবার পর বর্ষাকালে উপযুক্ত নদীর অগভীর কিনারায় ডিম ছাড়ে এবং পূর্ণ পরিপক্ক পুরুষ সেখানে গিয়া ডিমগুলিকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিমের মধ্যে মৎস্য-ভ্রূণ বড় হইয়া কতকটা মাছের আকার ধারণ করে এবং ডিম হইতে বাহির হইয়া আসে। এইগুলিকে ডিমপোনা (Spawn) বলা হয়। ইহারা উদরের থলিতে সঞ্চিত খাদ্য (Yolk) গ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ডিমপোনা বন্যার স্রোতে নীচের দিকে আসিয়া ডিমধরা বেহুন্দী জালে (Spawn collecting or shooting net) ধরা পড়ে। ডিমপোনা দৈর্ঘ্যে প্রায় 4·6 মি মিঃ হইতে 6·2 মি মিঃ হইয়া থাকে এবং ডিমপোনার বাজারে আসে। ডিমপোনা জালে ধরা না পড়িলে বা নদীর মধ্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় না পাইলে ঘোলা মাটির জলের সংস্পর্শে আসিয়া মরিয়া যায়।

আর এক উপায়ে পোনামাছের ডিমপোনা পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বড় বড় ঘেরা পুষ্করিণী (যেগুলিকে বাঁধ বলা হয়) মৎস্য প্রজননের প্রসিদ্ধ স্থান। ঐ বাঁধগুলিকে অর্ধকৃত্রিম উপায়ে নদীর পরিবেশে পরিণত করা হয় এবং পরিপক্ক স্ত্রী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে উত্তেজিত করা হয়। পরে নিষিক্ত ডিমকে হাপাতে (Hatchery) রাখিয়া ডিমপোনা পাইতে হয়।

4নং চিত্র

টিনে অক্সিজেন দিয়া চারামাছ বোঝাই করা হইতেছে।

আর এক কৃত্রিম উপায়ে পোনামাছের ডিম পাওয়া যায়। ইহার নাম প্ররোচিত প্রজনন (Induced breeding)। ইহাতে পরিপক্ক পোনামাছকে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের রস ইঞ্জেকশন করিয়া স্ত্রী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে বাধ্য করা হয়। শেষোক্ত উপায়টি সম্পূর্ণ কার্যকরী করিতে পারিলে বাংলা দেশের মৎস্য-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মৎস্য-বীজের

কোন অভাব থাকিবে না। এই ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলিতেছে।

পোনামাছের ডিমপোনা লইয়া মাছের চাষ করিতে তিন রকম পুকুরের প্রয়োজন হয়; যথা— নার্সারি ট্যাঙ্ক (Nursery tank), রিয়ারিং ট্যাঙ্ক (Rearing tank) এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্ক (Stocking tank)। তৈয়ারী নার্সারিতে ডিমপোনা দিয়া চারাপোনা (Fry) উৎপাদন করিতে হয়। রিয়ারিং ট্যাঙ্কে চারাপোনা দিয়া চালাপোনা (Fingerling) এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্কে চালাপোনা দিয়া বিক্রয়োপযোগী বড় মাছ উৎপাদন করিতে হয়। এই সকল পুষ্করিণীকে সম্যকভাবে কার্যকরী করিবার জন্য পুষ্করিণীতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে প্রয়োজনীয় মৎস্য-খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্করিণী-

5নং চিত্র
কাত্‌লা মাছ (Catla catla)

গুলিকে, বিশেষতঃ নার্সারি ও রিয়ারিং ট্যাঙ্ক-গুলিকে কয়েক বৎসর অন্তর শুষ্ক করিয়া দিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মৎস্য-চাষের সাফল্য নির্ভর করে পুষ্করিণীর

6নং চিত্র
রুই মাছ (Labeo rohita)

যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তাহার জন্য উপযুক্ত মৎস্য-বীজ সংগ্রহ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

যে, গভীর পুষ্করিণী যাহার পাড়গুলি বেশ খাড়াই, কিনারায় কম গভীর বিচরণ ক্ষেত্রের অভাব, এরূপ পুষ্করিণী সাধারণতঃ রুই মাছের পক্ষেই উপযুক্ত, কিন্তু ইহাতে কাত্‌লার চারাপোনা দিলে খুব বেশী ভাল ফল পাওয়া যায় না। মৎস্য-বীজ পরিবহনের ব্যর্থতাও অনেক সময় মৎস্য-চাষের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। অনেক জায়গায় খোলা হাঁড়িতে করিয়া মাছের চারা সরবরাহ করা হয় এবং হাঁড়ির সঙ্গে লোক থাকিবার

7নং চিত্র
মৃগেল মাছ (Cirrhina mrigala)

প্রয়োজন হয়, কিন্তু দূরের পথে লইয়া যাইবার সময় অনেক মাছের চারা মরিয়া যায়। এখন মৎস্য-পরিবহনের এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে মৎস্য-বীজ বদ্ধ অবস্থায় কম পক্ষে 40 ঘন্টার পথও জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব। এই ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা এই যে, টিনের বাক্সের মধ্যে অ্যালকাথিন ব্যাগের ভিতর জল, মাছ ও অক্সিজেন দিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার পর পার্শেলের মত (কোন লোকের উপস্থিতি ছাড়াই) এক সঙ্গে অনেকগুলি টিন রেল বা প্লেনযোগে চালান দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য জীবন্ত মৎস্য-বীজ চালান দিবার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা আজ সারা দেশে অনুসৃত হইতেছে।

তিন প্রকারে মৎস্য-চাষ হইতে পারে; যথা—(1) ব্যক্তিগত মৎস্য-চাষ (Private Fish-farming), (2) সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষ (Co-operative Fish-farming) ও (3) রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষ (State Fish-farming)। নিজস্ব পদ্ধতিতে কোন কোন মৎস্য-চাষী সীমাবদ্ধ সম্পত্তি ও চিরাচরিত জ্ঞানের সাহায্যে মাছের চাষ করিয়া থাকে। চাষীরা সহজে কোন নূতন জিনিষ গ্রহণ করিতে চায় না, তবে সর্বদা একাগ্রতার সহিত কিস্যারির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাভবান হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ করিতে চায়। তাহারা অবশেষে ফিসারির উন্নতি সাধন করিয়া লাভবান হয়।

সমবায় পদ্ধতিতে একদল মৎস্য-চাষী সরকারের সমবায় বিভাগের পরিচালনায় মৎস্য-চাষ করিয়া থাকে। এই সমবায় সমিতি সরকারের অর্থসাহায্য ও উপদেশ পাইয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সমিতির দক্ষ সভ্যেরা সমবায় পদ্ধতির স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা ভুলিয়া সরকারী অফিসারের স্থান দখল করিয়া বসে এবং ফিসারির কাজে উদ্যোক্তার

উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটাইতে থাকে। সমবায় সমিতির সভ্যদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে মৎস্য-চাষের উন্নতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জ্ঞান এবং সরকারী বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থার অভাব নাই; তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না এবং অন্যান্য প্রচেষ্টার তুলনায় অত্যন্ত কম লাভজনক হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তবে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, স্বল্পকালীন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অনেক সময় লাভজনক ও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক হইয়াছে। সেগুলি মৎস্য-চাষীদের আদর্শ হিসাবে মৎস্য-চাষে অনুপ্রেরণা দেয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া মনে হয়—হাজার হাজার পুষ্করিণী ও জলাশয়ের মধ্যে যেগুলি আজও অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষোপযোগী করিয়া উপযুক্ত সমবায় সমিতি বা নিজস্ব মালিকানার দ্বারা কার্যকরী করিবার জন্য উৎসাহ দিলে পশ্চিম বঙ্গের মৎস্য-শিল্পের উন্নতি হইবে ও মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিম বঙ্গে মোট 15 লক্ষ একর বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে প্রায় 10 লক্ষ একরে মাছের চাষ করা হয়। তাহার মধ্যে আছে হাজার হাজার নার্সারি ট্যাঙ্ক, যেগুলি মাছের চাষে চারাপোনা তৈয়ারি করিয়া সাহায্য করিলেও খাদ্যোপযোগী মাছের কোন সংস্থান করে না, আর সেই রকম হাজার হাজার বাঁধও আছে, যাহা হইতে বর্ষার সময় কোটি কোটি ডিমপোনা সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বৎসরে এক কেজি মাছও খাইবার জন্য পাওয়া যায় না। 1963 সালের গুপ্ত কমিশনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে বৎসরে মোট 51 লক্ষ মণ খাদ্যোপযোগী মাছ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে আছে অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা প্রায় 18 লক্ষ মণ আর বাংলা দেশে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপন্ন প্রায় 24·5 লক্ষ মণ মাছ। এই মাছ বাংলার চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। গত লোকগণনার হিসাবে বাংলার লোক-
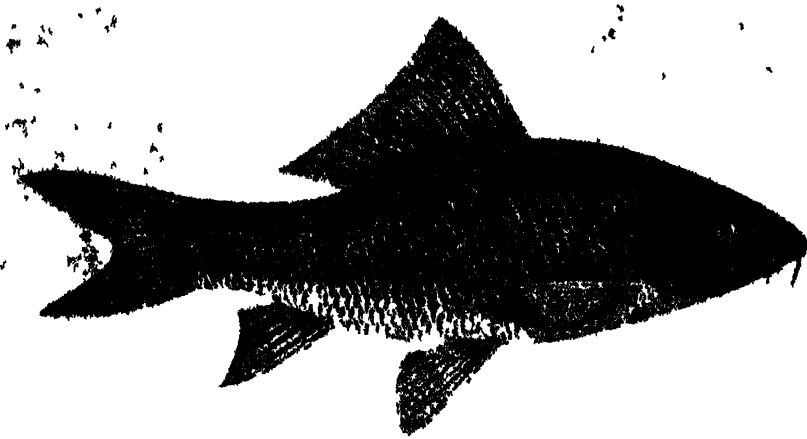
৪নং চিত্র
কালবোস মাছ (Labeo calbasu)

সংখ্যা প্রায় 370 লক্ষ, তাহার মধ্যে মৎস্যভোজীর সংখ্যা 303 লক্ষ ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষকে দৈনিক দুই আউন্স করিয়া খাইবার জন্য মৎস্য সরবরাহ করিতে বৎসরে প্রায় 166 লক্ষ মণ মাছের প্রয়োজন। এই হিসাবে বাংলা দেশে মাছের অভাব দেখা যায় প্রায় 115 লক্ষ মণের। এই বিরাট অঙ্কের অভাব আংশিক দূর করিতে আমরা ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে এবং সমুদ্রের উন্মুক্ত পরিবেশ হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে যে পাঁচ লক্ষ একর বদ্ধ জলাশয় পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে, সেগুলিকে সংস্কার করিয়া মৎস্য-চাষের জন্য উৎসাহ দান করিলে বাংলা দেশে মৎস্যের অভাব দূর হইতে পারে।
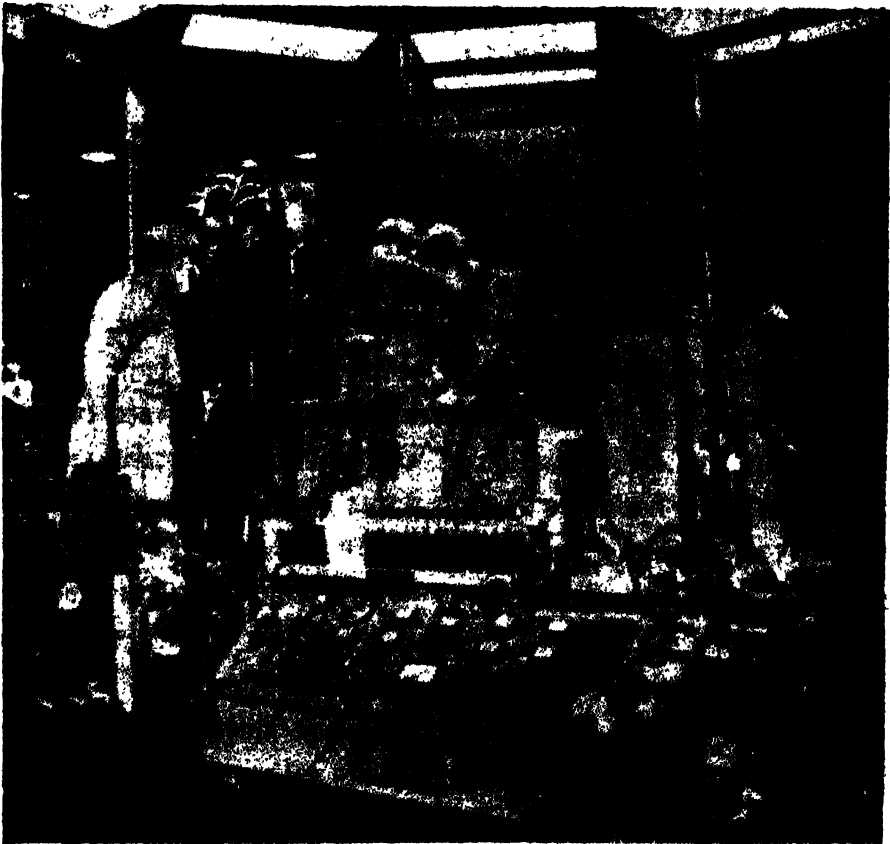
হার্ট-লাং মেসিন

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করবার সময় রক্ত-সঞ্চালন ও রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই হার্ট-লাং মেসিনটি (সম্মুখে দেখা যাচ্ছে) ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যে কাজ করে—এই যন্ত্রটিও অস্ত্রোপচারের সময় ঠিক একই কাজ করে। এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে হৃৎপিণ্ডে যে ধরণের অস্ত্রোপচার করা পূর্বে অসম্ভব ছিল, এখন তা অনায়াসেই করা যাচ্ছে। এর ফলে অনেক রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

ভূমিকম্প কেন?

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

30শে মে, 1970। পেরুর রাজধানী লিমার প্রধান টেলিগ্রাফ কেন্দ্রে খবর বেজে চলছে—টরে টক্কা··· টরে টক্কা···। আমার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে··· আমার হাত থরথর করে কাঁপছে ··· সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল··· বাঁচাও ·· বাঁচাও···। এর পরেই নাটকীয়ভাবে টেলিগ্রাফের লাইন মৃত মানুষের মত নীরব-নিথর হয়ে গেল। লিমার অপারেটর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইয়ুঙ্গে শহরের লাইনকে আর সজীব করে তুলতে পারলো না। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে অপারেটর বললো—দি লাইন ইজ ডেড। শুধুমাত্র টেলিগ্রাফের লাইন নয়, সমস্ত পশ্চিম পেরু জুড়ে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা। সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বুকে গড়ে ওঠা দুটি জনমলে শহর—হুয়ারাজ ও কারাজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া চিমবোটে ও ট্রুজিলো শহর দুটিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অন্যান্য শহর ও গ্রামের ক্ষতিও নগণ্য নয়। বেসরকারীভাবে রয়টারের মারফৎ যেসব খবর পৌঁচেছে, তাতে জানা যায়, পেরুর এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির এই নির্মম, নিষ্ঠুর খেলা আজ নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে এসেছে সর্বনাশের করাল ছায়া, বিলুপ্তি ঘটেছে শান্ত, স্নিগ্ধ জনপদের। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ ধনপ্রাণ হারিয়েছে নির্বিচারে, তবু প্রকৃতির লোলুপ রসনার তৃপ্তি ঘটে নি। বেশী দিনের কথা নয়, 1967 সালের 11ই ডিসেম্বর। শীতের সকালে তখনো সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ খেয়ালী প্রকৃতির প্রচণ্ড তাণ্ডবে থরথর করে কাঁপতে লাগলো পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অঞ্চল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো কয়নানগর (চিত্র নং 1)। শুধু তাই নয়, আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চল—সাতারা, সাংলি, কোলাপুর ও রত্নগিরি জেলার কম করেও হাজারটি গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়লো। আড়াই লক্ষের বেশী নরনারী গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। মৃতের সংখ্যা প্রায় দু-শ'-এর কাছাকাছি এবং আহতের সংখ্যাও কম নয়—প্রায় আড়াই হাজারের মত। অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম উল্লেখযোগ্য নয়। হেলতাঘাকের কাছে কয়নার উপর কারাড-চিপলান রাস্তার ব্রীজের তিনটি খিলান ভেঙে চুরমার। অবশ্য কয়না-বাঁধ ও স্পিলওয়ে গেট অদ্ভুতভাবে এই তীব্র কম্পন সহ্য করেছিল। কিন্তু বাঁধের উপরের হয়েষ্ট টাওয়ার, স্পিলওয়ে ব্রীজ এবং কণ্ট্রোল রুমটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। ভূমিকম্পের এই তাণ্ডব শুধু পশ্চিম মহারাষ্ট্রের উপরেই আঘাত হানে নি, ফাটল ধরিয়েছে ভূতাত্ত্বিকদের চিরকালের বিশ্বাসের ভিতে। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে যতখানি অনড় বলে মনে করা হতো, ততখানি অনড় সে নয়।

পূর্ব ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ভারতের বুকে কয়না ভূমিকম্পই প্রথম নয়। এর আগেও ভারতের মাটিতে ভূমিকম্পের পদধ্বনি শোনা গেছে। 1897 সালের 12ই জুন প্রচণ্ড ভূকম্পনের সৃষ্টি হলো উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিলং শহরের চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল

---

*ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

এলাকা জুড়ে এই প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণ-হানি ও অপূরণীয় ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। এর পর আসাম নয়, ভূমিকম্পের ঝোঁক পড়ে বিহারের উপর। 1934 সালের 15ই জানুয়ারী, বেলা প্রায় তিনটা। এমনি সময়ে হঠাৎ বিহারের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠলো। এই ভূমিকম্পে মতিহারী, কাঠমাণ্ডু ও মুঙ্গের জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাট বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় বেলুচিস্থানের কোয়েটা ও কালাট শহর ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তাণ্ডবে কেঁপে উঠলো। মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্ত চিৎকারে অন্ধকার রাত্রির আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠলো। মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেল। এর পর বছর পনেরো নির্বিঘ্নেই কাটলো—অন্ততঃ ভারতবর্ষে, কিন্তু ধরিত্রী আবার খেয়ালী হয়ে উঠলো। 1950 সালের 15ই আগষ্ট আসাম-চীন সীমান্তে আর এক প্রবল ভূকম্পনে রিমা নগরীর আশেপাশে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিরাট

1নং চিত্র

এবং সেই সব ফাটল থেকে উপচে-পড়া জল বন্যার জলের মত সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে ফেলে। কম করেও সেবার প্রায় বারো হাজার মানুষ ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে প্রাণ হারায়। বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা, পলিমাটির নীচে শক্ত পাথরের বিচ্যুতি ঘটবার ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল। বিহারের এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বছর দেড়েকও কাটলো না। 1935 সালের 31শে মে। নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ধন-প্রাণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইদানীং কালের 1964 সালের 15ই এপ্রিল, কলকাতায় মৃদু ভূকম্পনের কথা অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই মৃদু ভূকম্পনই যদি আরও মিনিট কয়েক স্থায়ী হতো, তবে হয়তো সমগ্র কলকাতা নগরী একটি বিরাট শবাগারে পরিণত হতো।

মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর

ব্যাপারকে দেবতার অভিশাপ বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে দেবতার রোষের কোন সম্পর্ক নেই—আসলে এর মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির কার্য-কারণের সম্পর্ক।

মনীষী অ্যারিষ্টটল (384-322 খৃ: পূ:) বিশ্বাস করতেন, ভূপৃষ্ঠের তলদেশে সঞ্চিত গ্যাস মুক্তির প্রয়াসে শিলাস্তরের নীচে ক্রমাগত আঘাত করে ভূকম্পনের সৃষ্টি করে। আরেক গ্রীক মনীষী লুক্রেটিয়াস বললেন, ভূগর্ভস্থ গুহাকন্দর যখন কোন কারণে ভেঙে পড়ে, তখনই ভূস্তরের বুকে জেগে ওঠে কম্পন, সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় মানুষ জানতে পেরেছে প্রকৃতির এই দুজ্ঞের্য় রহস্যের প্রকৃত কারণ, বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর বুক ক্ষণে ক্ষণে কেন যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। যে সকল বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় ভূমিকম্পের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ ওয়াকেবহাল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ম্যালে, মিল্‌নে, রীড, ইমানুরা এবং ওমরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়; যথা—(1) ভূপৃষ্ঠ-জনিত, (2) আগ্নেয়গিরিজনিত এবং (3) শিলা-চ্যুতিজনিত।

(1) ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ: পাহাড়ী অঞ্চলে ধস্ নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, 1911 সালে তুর্কীস্থানের ভূমিকম্পে পামীর উপত্যকা অঞ্চলে 50,000 কোটি টন ওজনের বিশাল ধস্ (Land slide) পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট ধস্ নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প হয়েছিল। যদিও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী গুটেনবার্গ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূকম্পনের ফলেই পাহাড়ী জায়গায় সর্বনাশা দৈত্যের মত বিরাটকায় ধস্ নামতে শুরু করে। কিন্তু ধস্ আগে, না ভূমিকম্প আগে? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। এছাড়াও নানা কারণে মহাদেশের উপকূল ভাগে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে যে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, তা ক্ষীণবল হলেও কলকাতার আলিপুরের আবহ অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

(2) আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ—বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, অনেক সময় বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা যখন বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে ঊর্ধ্বে আঘাত করতে থাকে, সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 1888 সালের সুমাত্রার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ও গলিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। একই বছরে জাপানের বন্দরসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোত নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল।

(3) শিলাচ্যুতিজনিত কারণ—আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের মতানুসারে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিকেই ভূমিকম্পের মূল কারণ বলে মনে করা হয়। 1906 সালের সানফ্রানসিস্কো ভূমিকম্প ও সান অ্যাণ্ড্রিয়াস শিলাচ্যুতির (Fault) কার্যকারণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে অধ্যাপক এইচ. এফ. রীড ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বের (Elastic Rebound Theory) সাহায্যেই তিনি ভূমিকম্প ও শিলাচ্যুতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেন। সম্ভাবিত শিলাচ্যুত তলের দু-পাশে

নানা কারণে ক্রমশঃ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত ও স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে (চিত্র নং 2—ক, খ)। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তর দুটিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে এশিয়া মাইনর হয়ে আরল পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পৌঁচেছে। পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভূমিকম্পই এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অথচ এই বিচারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উল্লিখিত ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চলের বাইরে। এতকাল ধরে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অনড়। তবে কেন কয়নানগরের এই ভূমিকম্প ? এই প্রশ্নের ভিতর ঢুকতে গেলে

2নং চিত্র (ক)

2নং চিত্র (খ)
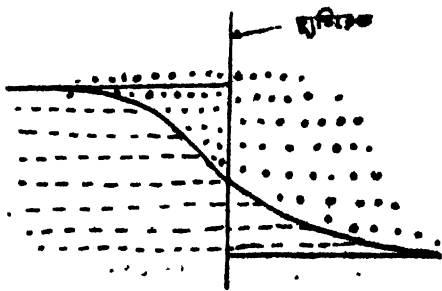
সমগ্র শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের। শিলার চ্যুতি-বিচ্যুতি ভঙ্গ পর্বতমালার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির ভূমিকম্পের আধিক্য এসব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। 1897 সালের আসামের ভূমিকম্পে চিদ্রং শিলাচ্যুতির ফলে একটি ভূস্তর প্রায় 35 ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। পেরুর সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটেছিল।

গত দেড়-শ'-দু-শ' বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিশেষ কয়েকটি পর্বতমালার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে প্রধানতম প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিমণ্ডল, যা প্রশান্ত মহাসাগরকে চারদিক থেকে মেখলার মত বেষ্টন করে আছে। অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল, যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে হিমালয় ও
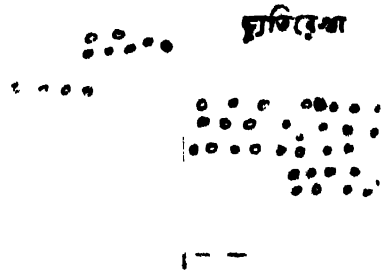
কয়নানগর অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন।

1962 সালে মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধের জলাধার ভর্তি হবার সুরু থেকেই কখনো কখনো মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু পরের বছর বর্ষাকালে বাঁধের জল আরো বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ও সংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ কয়নানগর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কারণ এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই মহারাষ্ট্রের শতকরা 40 ভাগ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। এর পর ভূকম্পনের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ গবেষণা দপ্তরের উপর। এই দপ্তরের অভিমত, আমেরিকার বোল্ডার ড্যামের মত কয়নানগর জলাধারের চাপে কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তেমন ভয়ের কিছু নেই, বছর কয়েকের মধ্যে

ভূত্বকে ভারসাম্য ফিরে এলেই এই কম্পন থেমে যাবে।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণাকে নস্যাৎ করে 1967 সালের 13ই সেপ্টেম্বর কয়নানগর কেঁপে উঠলো। বেশ খানিকটা দূরের শহর পুণাতেও ভূমিকম্পের কাঁপুনি বোঝা গেল। কম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণীত হলো 6 থেকে 10 কিলোমিটারের মত। এই ভূমিকম্পের ফলে কয়নানগরের কিছু বাড়ী বিধ্বস্ত হলো, বেশ কিছু অধিবাসী আহত হলো। অপ্রত্যাশিত এই ভূকম্পনে বিশেষজ্ঞেরা কিছুটা বিস্মিত হলেও এবার কিন্তু বললেন— এই শেষ, এর পর ভবিষ্যতে জোরালো কোন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই। অথচ তারপর তিন মাসও কাটলো না—11ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানীদের সব ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে কয়নানগর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো—একথা আগেই বলা হয়েছে। কয়নার এই ভূমিকম্পে কিন্তু বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। তীব্র ভূকম্পনের পরে সাধারণতঃ ভূমিস্খলন, ভূমির অধোগমন, ফাটলের সৃষ্টি, জলপীঠের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়নায় বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। যদিও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাসাল্ট পাথর গ্রন্থি ধরে ভেঙ্গে পড়েছে এবং কেবলমাত্র কয়না বাঁধের কাছে মানেল থেকে দক্ষিণের ডার্গা উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত মাটির উপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা কয়েকটি ফাটল দেখা গেছে এবং কয়ণ এলাকার প্রস্রবণগুলির তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়না ভূমিকম্পের তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধ থেকে 5 কিলোমিটার দক্ষিণে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধের কিছু উত্তরে।

কয়না ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাণ ও কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তীব্রতার পরিমাণ রিকটার স্কেলে 6·5 থেকে 7·5 এবং কম্পনকেন্দ্রের গভীরতা 16 কিঃ মিঃ থেকে 30 কিঃ মিঃ পর্যন্ত ধরে ধরা পড়েছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র কুমার রায় বলেছেন, এই ভূকম্পনের পরিমাণ 7·5 এবং বহুদূর পর্যন্ত কম্পনের বিস্তৃতি ভূকম্পনকেন্দ্রের গভীরতারই ইঙ্গিত প্রদান করে।

কিন্তু ভূমিকম্পের কেন্দ্র গভীরে হলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হয় না—এই কারণে অনেক ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীরে। কিন্তু অগভীর কেন্দ্র সত্ত্বেও এই ভূমিকম্প যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ, Lg তরঙ্গ ভূত্বকের উপরের স্তর (Sial) দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব কম সময়ের ব্যবধানে পরস্পর দুটি কম্পন—প্রথমটির কেন্দ্র অগভীরে থাকায় বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষয়-ক্ষতি প্রচণ্ড হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির কেন্দ্র গভীরে হওয়ায় বহু দূর পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, যে চ্যুতির জন্যে এই ভূমিকম্পের সৃষ্টি, তা 15-20 কিঃ মিঃ থেকে 25-30 কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ভূকম্পবিদ্‌দের মতপার্থক্য থেকে বলা চলে— কম্পনের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্যে অনেক তথ্যই এখনো অজানার অন্ধকারে। অথচ কয়না বাঁধ অঞ্চলকে সম্ভাব্য ভূমিকম্প থেকে বাঁচাতে হলে ভূমিকম্পের সঠিক কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতবাদগুলি সংক্ষেপে এই রকম—

(1) বাঁধের জলাধারে সংরক্ষিত জলের প্রচণ্ড চাপে ভিত্তিপ্রস্তরের কম্পন।

(2) জলাধার থেকে চোঁয়ানো জলে ট্র্যাপের মধ্যবর্তী চুনাপাথরের দ্রবীভবন। উপরে বর্ণিত কারণ দুটি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই গভীরভাবে সন্দিহান।

(3) শিলাচ্যুতির ফলে ভূকম্পন।

কয়নানগরের ভূমিকম্পে প্রচুর পরিমাণে শক্তির মুক্তি এবং কেন্দ্রের গভীরতা থেকে অনেকের অনুমান, কোন বড় রকমের চ্যুতির জন্যেই কয়নার মাটি এত জোরে কেঁপে উঠেছিল। খুব সম্ভব এই ভূমিকম্পে কোন পুরনো চ্যুতিরেখা অথবা নতুন কোন ফাটল বরাবর আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এই রকম তিনটি চ্যুতিরেখার অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন, যদিও এদের উপস্থিতি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় পুরাপুরি প্রমাণিত হয় নি।

(4) ভূপৃষ্ঠের গভীরে গলিত শিলার (ম্যাগ্‌মা) অবস্থা পরিবর্তনে উৎপন্ন শক্তির ফলে কম্পন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে টার্শিয়ারী যুগের লাভা-প্রবাহের (Deccan trap) অস্তিত্ব থেকে বর্তমান যুগের লাভা-প্রবাহের কথা চিন্তা করা হয়েছে, যদিও এর সমর্থনে বিশেষ কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় নি।

যাহোক, কয়না ভূমিকম্প যে কারণেই ঘটে থাকুক না কেন, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যে মৃতের মত নিথর, অনড় নয়, একথা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।

"বঙ্গ জননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোন ফল পাইব না, একথা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গসন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরণ আবশ্যক; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী-সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন।...... যদি (তাঁহাদের আবিষ্কৃত) এই তত্ত্ব কেবল বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশীরা অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশা মাত্র।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গড়া পথ দিয়ে হাঁটা, আর পথ গড়ে হাঁটা এক জিনিস নয়। পথ গড়ে নিয়ে যাঁরা হাঁটেন, তাঁরা হাঁটবার শ্রমটুকু তো বটেই, গড়বার ক্লেশটুকুও স্বীকার করতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই দ্বিতীয় দলের পথিক। তিনি গড়তে গড়তে পথ চলেছেন। চলতে চলতে পথ করেছেন।

অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এই দ্বিমুখী কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠতো না, যদি দেখতাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার সময় সাহিত্য-রচনার উল্লেখযোগ্য কোন আদর্শকে তিনি সামনে পেয়েছেন। রচনাদর্শ সাধারণ বাংলা গদ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা-ও বা তিনি পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানের প্রবন্ধের বেলায় তাও পান নি। কারণ, তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের প্রায় সকলেই লিখেছেন কৃত্রিম ও আড়ষ্ট ভাষায়।

অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে, এরূপ লেখার সঙ্গত কিছু কারণ আছে। অক্ষয়কুমারের পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রাচ্য বাঙলার উপযোগী করে পরিবেশন করতে পারেন নি—বিজ্ঞানের ভাষাকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি বাংলা ভাষার সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উইলিয়াম কেরীর ছেলে ফেলিক্স্ কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' (1820) নামে যে অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি লিখেছিলেন অথবা শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক জন ম্যাক্ লিখেছিলেন 'কিমিয়াবিদ্যার সার' (1834) নামক যে রসায়ন বিজ্ঞানটি, বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কোনটিই ঠিক খাপ খায় নি; অর্থাৎ বাঙালীয়ানার চেয়ে সাহেবীয়ানাই প্রকট হয়ে উঠেছে সে সব গ্রন্থে।

এইখানে রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের কথা এবং বিশেষ করে প্রথমোক্ত মনীষীর কথা উঠতে পারে। কেন না, বাংলায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর অবদান কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। 1823 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে রামমোহন অনুরোধ জানিয়েছিলেন এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের জন্যে। তাছাড়া নিজেও তিনি কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলি হলো ইংরেজী ও বাংলায় রচিত ভূগোল—জ্যাগ্রাফী, জ্যোতির্বিদ্যা বা খগোল এবং একটি জ্যামিতি।

উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই দীর্ঘকাল যাবৎ পাওয়া যায় না। এমন কি, রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় 90 বছর আগে প্রকাশিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে'র প্রথম সংস্করণে (1287) পর্যন্ত এদের সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। অতএব, যেহেতু রামমোহনের ওই গ্রন্থগুলির কোনটিই আমরা দেখি নি, সেহেতু ওদের ভাষা সম্পর্কে আজ কোন মন্তব্য করবার উপায় নেই। আজ এটুকুই শুধু বলা যায় যে, রামমোহনের বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি কোনটিই তাঁর সমসাময়িক জনসমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমাদর লাভ করে নি। কেন না, সমাদর লাভ করলে সে যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে হয় এদের সম্বন্ধে উল্লেখ থাকতো, নয় তো খুঁজে পাওয়া যেত সে যুগের রিপোর্ট, ক্যাটালগ বা সংগ্রহশালায়। রাধাকান্ত দেবের

বিজ্ঞানালোচনা আমরা অবশ্য দেখেছি। তাঁর শিশুপাঠ্য রচনা বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থের (1821) ভূগোল এবং গণিত-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলিকে একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির মনে হয়েছে আমাদের। তাই সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে আজ বলা যায়, অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের বেশীর ভাগই হয় দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম, না হয় অজ্ঞাত ও অবহেলিত অথবা একেবারেই অপরিণত।

হয়তো বা ভুল বললাম, বিজ্ঞানসাহিত্য বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। বিজ্ঞাননির্ভর পাঠ্যপুস্তক বা বিজ্ঞানগন্ধী টুকিটাকি রচনা বললেই এদের পরিচয়টা সঠিক হয়।

বিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে প্রথম উন্নীত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে সর্বজনবোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনিই প্রথম লিখলেন। তাঁর রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষার প্রসাদগুণ। যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। সাধারণ পাঠক—এমন কি, সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীরাও যাতে তাঁর লেখা বুঝতে পারে, সেদিকে বরাবরই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, সাময়িক-পত্র সম্পাদনার অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

তিনি বিদ্যাদর্শন পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ—জুন, 1842) অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া এই পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাঁরই রচনা বলে মনে হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশরীতির স্বচ্ছতায় ও যথাযথ তথ্য সমাবেশে। এতে রচনা টেক্‌নিক্যাল হয়ে ওঠে নি কোথাও—বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকদের কাছেও রচনা জটিল বা দুর্বোধ্য হয় নি।

ধারাবাহিকভাবে উচ্চাঙ্গের সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে বিদ্যাদর্শনেই প্রথম দেখা গেল। কিন্তু খুব স্বল্পজীবী হবার ফলে এই পত্রিকা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় কোন আদর্শ স্থাপন করে যেতে পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং তার কর্ণধার অক্ষয়কুমার দত্ত। দীর্ঘ বারো বছর (1843-1855) অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে এতে প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণসাধন করেছিলেন।

দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি পূর্ববর্তী পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর বিজ্ঞান-প্রসঙ্গগুলির কোন তুলনাই চলে না—কেন না, ঐ সব পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ, আর না হয় বিজ্ঞান-প্রস্তাব। তাছাড়া ঐগুলির ভাষা ছিল কৃত্রিম।

ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে। আর বিদ্যাদর্শনে যার সূচনা হয়েছিল, তারই পরিণতি দেখা গেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলি প্রাঞ্জল, সুলিখিত ও সারগর্ভ। বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এই পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এক-একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

1855 খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ত্যাগ করলে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা অনেকখানি হ্রাস পেল। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, তারপর প্রকাশিত হতো গ্রন্থাকারে।

তবে তাঁর প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটির জন্মের বছর দুয়েক আগে 1841 খৃষ্টাব্দে। তত্ত্বোধিনী সভার অনুমতিক্রমে গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও গেজেটিয়ার থেকে সংগৃহীত। পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস এতে আছে। তবে এর প্রধান ত্রুটি, অল্প জায়গায় অধিক তথ্যের সমাবেশ।

অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ—প্রথম প্রকাশ পৌষ, 1773 শক ; দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম প্রকাশ মাঘ, 1774 শক) নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মধর্মকে আশ্রয় করলে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মভাবের কিভাবে উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে, এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে ধর্মবিশ্বাসেরই শুধু নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধিরও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এই গ্রন্থে। 1770 শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে এই গ্রন্থটি তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। জর্জ কুম্ব-এর 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এটি লেখা। তবে কুম্ব-এর গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি অক্ষয়কুমার, ভাবানুবাদ করেছেন এবং অনুবাদের সময় তিনি লক্ষ্য রেখেছেন, এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' সে যুগের বাংলা দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। তাছাড়া 'চারুপাঠ' 1ম, 2য় ও 3য় ভাগ (প্রথম প্রকাশ যথাক্রমে 1775, 1776 ও 1781 শক) সমাদৃত হয়েছিল সেকালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

চারুপাঠ-এর প্রায় সব রচনাই তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এতে প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে সুরু করে ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে রচনা আছে। তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনারই প্রাধান্য।

চারুপাঠে অক্ষয়কুমার তথ্যের উপর ততটা জোর দেন নি, যতটা জোর দিয়েছেন রচনাকে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার দিকে। তথ্যের দিক থেকে চারুপাঠের অধিকাংশ রচনাই দুর্বল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু সরল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী রচনাগুলিকে গল্পের মত সুখপাঠ্য করেছে। অক্ষয়কুমারের অপর একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ পদার্থবিদ্যা (1856) বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে লেখা প্রথম পদার্থবিজ্ঞান।

বাংলায় পদার্থবিদ্যা নাম দিয়ে এর আগেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বটে। ইয়েটস্-এর 'পদার্থবিদ্যাসার' (1824) এবং পূর্ণচন্দ্র মিত্রের 'পদার্থবিদ্যাসার' (1847) অনেককেই কৌতূহলী করেছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান এদের একটিও নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ —জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই এদের মধ্যে আছে। তাছাড়া, পরিভাষার ব্যবহারেও এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন রীতি অনুসৃত হয় নি।

পদার্থবিদ্যায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব্দ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অক্ষয়কুমারের পরবর্তী বিজ্ঞানলেখকদের অনেকেই পরিভাষার ব্যবহারে তাঁকে অনুকরণ করেছিলেন ; যেমন—Inertia-র বাংলা অক্ষয়কুমার লিখলেন জড়ত্ব। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞানলেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও সূর্যকুমার অধিকারীও Inertia অর্থে এই জড়ত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।

এইভাবে অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'চারুপাঠে'র মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় করে তুললেন, অপর দিকে তেমনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার পথ দেখালেন প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়।

কালক্রমে বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানগ্রন্থ হয়তো রচিত হবে, কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্তের নাম মুছে যাবে না কোন দিনই।

"একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। এক্জামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষায় উন্নতি-বিধান, কিম্বা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূর পরাহত। বস্তুতঃ এক্জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ অদ্ভুত প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও-গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্তন করি।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিজ্ঞানের ভাষা

লীলা মজুমদার

ভাবের সঙ্গে ভাষার নিগূঢ় সম্বন্ধ। কি বলা হবে, তার উপরেই নির্ভর করছে, কিভাবে বলা হবে। দুইয়ের মধ্যে কিন্তু বক্তব্যই শ্রেয়ঃ। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়ে একথা আরো বেশী করে খাটে।

বিজ্ঞানের হলো তথ্য এবং নির্ভুল তথ্য নিয়ে কারবার। এমন কি, একবার যে তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী গবেষণায় যদি তার মধ্যে ভুল বা খুঁৎ বেরোয়, বৈজ্ঞানিকেরা তৎক্ষণাৎ তাকে হয় বর্জন করেন, নয় তো নব আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। বিজ্ঞান-জগতে কখনো শেষ কথা বলা যায় না।

বিজ্ঞানের ভাষাকেও তাই এর-ই উপযুক্ত হতে হয়। সব ভাষার মতই এরও একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করা, তবে অন্যান্য বিষয় থেকে এর একটুখানি তফাৎ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের ধর্ম অনেকটা গণিতের ধর্মের মত। একটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে ভিত্তি করে পর পর ক্রমাগত নতুন নতুন তথ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, একই সঙ্গে পাশাপাশি অনেকগুলি চিন্তাকে বসিয়ে তার কাজ হয় না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, নানান বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, বরং ঠিক তার উল্টো। মৌলিক তথ্যগুলি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তফাৎ এইখানে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাশাপাশি সাজানো তথ্য বা তত্ত্বের মধ্যে যদি ভুল বেরোয়, তাহলে অনায়াসে শুধু সেই ভ্রান্ত অংশটুকু উৎপাটন করা যায়, অন্য অংশগুলির তাতে হয়তো কোন ক্ষতিই হয় না।

এই সব কথা মনে রেখে বিশেষ যত্ন করে বিজ্ঞানের ভাষা চয়ন করতে হয়। রস জমানো তার উদ্দেশ্য নয়, প্রসাদ গুণের তার কাছে গুরুত্ব নেই। সবচেয়ে সহজ ভাবে, সবচেয়ে স্পষ্ট করে বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করতে হয়, যাতে কোন ভুল বোঝবার সম্ভাবনা না থাকে এবং কখনো একটি ছেড়ে দুটি মানে করা না যায়।

বিজ্ঞানের লেখক নিজেকে সর্বদা রচনার বাইরে রাখবেন, কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বকালের সর্বজনের এবং নৈর্ব্যক্তিক। একমাত্র বৈজ্ঞানিকের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির বর্ণনা দেবার সময় লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্যের অত্যন্ত বেশী করেই মূল্য থাকে। কিন্তু সে মন্তব্যও নির্ভর করে তাঁর আবিষ্কৃত সত্যগুলির উপর, ব্যক্তিগত সখ-সাধ বা পছন্দ-অপছন্দের উপরে নয়। এমন কি, অপরীক্ষিত আন্দাজ বা হাইপোথিসিসগুলিকেও যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে হয়। সেখানেও কল্পনার উদ্দাম ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে চলে না। নব-রসের স্থান নেই বৈজ্ঞানিক রচনায়। অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানস সরোবরের নীল জল পর্যবেক্ষণ করেন, ঠিক তাই দিয়েই তাঁরা মৃতদেহের ক্রমাবনতিও দেখেন—সমান যত্ন, সমান শ্রদ্ধা দিয়ে। আবেগ বলে কিছুরই স্থান নেই। কারণ আবেগ বিচার-বুদ্ধিকে ধূম্রাচ্ছন্ন করে দেয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই ভাষাকেও হতে হয় শান্ত, সংযত ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সর্বকালের ও সর্বজনের বলে বর্ণিত করা হয়েছে, কোন বিশেষ দেশে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই হয়তো দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে তাই নিয়ে

অভিযান চলতে থাকে আর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তো কথাই নেই—অমনি সেই সূত্রটি ধরে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। কাজেই মনে হয় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি, অর্থাৎ Scientific terms সব দেশবাসীর কাছে যত সহজবোধ্য হয়, ততই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিক সত্য অন্বেষণের কাজে ভাষা যদি বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে অনেক সময় ও শ্রম বৃথা নষ্ট করতে হয়। একই অর্থে একই শব্দ যদি সব দেশে প্রচলিত হয়, তাহলেই সবচেয়ে সুবিধা হয়।

এই নিয়ে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক আর ভাষাবিদেরা একমত হবেন না। দেশাভিমান বলে একটা জিনিষ আছে। তারই বশ হয়ে ভাষাবিদেরা এরোপ্লেনকে বলেন আকাশযান এবং লেসার-এর প্রতিশব্দ নিয়ে মুস্কিলে পড়েন। কোথায় আবিষ্কৃত হলো, কে আবিষ্কার করলো তাই নিয়ে নব-আবিষ্কৃত তথ্যের নামকরণ হতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার সব বিজ্ঞানীরা সেই নামটি মেনে নিলে নিজেদেরই সুবিধা হবে।

নতুন আবিষ্কার ছাড়াও বৈজ্ঞানিক রচনার আরেকটা বড় দিক আছে। সেটি হলো পুরনো তথ্য আর ব্যক্তিগত নানান ছোটখাটো অভিজ্ঞতার প্রচার। আজকাল ছোটদের সাধারণ জ্ঞান দেবার জন্যে কত যে বৈজ্ঞানিক বই লেখা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব বইয়ে কি রকম ভাষা ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েই হলো মুস্কিল। নীরস পাঠ্য-পুস্তকের মত হলেও চলবে না, আবার নিছক পরীদের গল্প কাঁদলেও হবে না। সখ করে কেউ নীরস পাঠ্যপুস্তক পড়বে না; আবার পরীদের গল্পের মত করে বিজ্ঞান শেখাতে গেলে তার কতখানি নিছক কল্পনা আর কতখানিকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই নিয়ে সাধারণ পাঠকের লাগে ধাঁধা।

মনে হয় বৈজ্ঞানিক রচনাতে কোন রকম সৌখীন জেল্লা না দেওয়াই উচিত। সত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে তার গায়ে রাংতা জড়াবার দরকার করে না। বৈজ্ঞানিক লেখাতে কোন কৃত্রিম বা নকল জিনিষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে তুলনা ছাড়া কোন উপমা, অলঙ্কারও বেমানান। আবার তেমনি নীরস ব্যাখ্যা হলেও তার উদ্দেশ্য বিফল হবে, কারণ কেউ পড়বে না।

জন-বিজ্ঞান বা Popular science-এর জন্যে কি রকম ভাষা সবচেয়ে ভাল হয়, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জগতের অনেক বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও গবেষকদের লেখা সত্যকার অভিজ্ঞতার বই থেকে। তার মধ্যেও অবশ্য ভাল-মন্দ আছে। কেউ কেউ পদে পদে ব্যক্তিগত মন্তব্য বা ছোটখাটো বক্তৃতা না করে পারেন না। বিজ্ঞানের দিক থেকে সে সব বাতিল। কিন্তু কেউ কেউ আছেন, যেমন স্বেন হেডিন বা অয়েল-ষ্টাইন, যাঁরা পৃথিবীর নানান দুর্গম অজ্ঞাত জায়গায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্যে প্রাণ হাতে করে দীর্ঘ দিন ধরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা সেখানে যেভাবে গিয়ে যা-যা যেমন-যেমন দেখেছেন, তাই দেখে যা কিছু বুঝেছেন, ঠিক সেভাবেই লিখে গেছেন। এই হলো বৈজ্ঞানিকের আসল পন্থা।

এর আলাদা এক রকম রস। সত্যের অবিকল প্রতিচ্ছবির নিজের একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আছে, তার একটা প্রচণ্ড শক্তি থাকে; তাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষাকেও নিরাভরণ ও নির্ভীক হতে হয়। রচনা যদি ছোটদের জন্যে হয়ে থাকে, তবে ভাষা খুব সহজ ও সরল হবে; কিন্তু খোকামি বা ন্যাকামি থাকবে না। এই বিষয়ে এক রকম পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়।

বাগান করতে ওস্তাদ বলে জাপানীরা খ্যাত। শুনেছি তাঁরা যা কিছুকে অনাবশ্যক ও অবান্তর বলে মনে করেন, অমনি সেটাকে কাঁচি দিয়ে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত বাকী থাকে

কয়েকটি অপূর্ব ভঙ্গীর ডালপালা, কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর পাতার গুচ্ছি আর দু-একটি নিখুঁৎ ফুল। এদের মধ্যে একটিকেও ছিঁড়ে ফেললে বাগানটি ফাঁকা দেখাবে, কারণ তারা সকলেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাকেও বাদ দিলে চলে না। সমস্তটি পরিচ্ছন্ন, প্রকট ও সপ্রকাশ।

বিজ্ঞানের ভাষাকেও ঐরকম হতে হবে—অবান্তর একটি কথাও থাকবে না। যা নইলে নিতান্তই চলে না, শুধু সেটুকুই নিজের মহিমায় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বিরাজ করবে। সমস্তটি হবে পরিচ্ছন্ন, একবার পড়লেই মানে বোঝা যাবে, কোন কিছু প্রচ্ছন্ন থাকবে না।

"গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপ খণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙলা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙলা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Lord Hardinge' এর আনুকূল্যে 'Encyclopaedia Bengalensis' অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথ-প্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙলা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙলা' বলিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার

রাসবিহারী রায়

দামী দামী বই। স্বর্ণাঢ্য মলাট। সোনার জলে নাম লেখা এবং মূল্যবান আধারে রক্ষিত। কিন্তু তাহলে কি হয়, যার বই তার পড়ার কোন স্পৃহা নেই, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সে রসাস্বাদন করে না। দামী আসবাবপত্রের যা মূল্য তার কাছে বইয়েরও তাই মূল্য, এর বেশী কিছু নয়। বই সাজিয়ে রাখে গৃহের শোভাবর্ধন করতে, আভিজাত্যের প্রমাণ দিতে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিত্তবান গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন কয়েকটি অনবদ্য ছত্রে :

> পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ পরে
> আছেন ভাগ্যবন্ত,
> মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
> পঞ্চ হাজার গ্রন্থ ;
> সোনার জলে দাগ পড়ে না
> খোলে না কেউ পাতা ;
> অ-স্বাদিত মধু যেমন
> যূথী অনাঘ্রাতা।

কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবন্ত নন, যাঁদের অর্থকৌলিন্য নেই, তারাও তো বই সংগ্রহ করে মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। এঁদের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত, কিন্তু অধ্যয়নস্পৃহা ও জ্ঞানতৃষ্ণা অসাধারণ, এঁরা জ্ঞানতপস্বী বলেই গ্রন্থপ্রেমিক। তিল তিল করে এঁরা তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন, সঞ্চয় করেন অমূল্য ভাণ্ডার। অ্যারিস্টটল থেকে আশুতোষ এই শ্রেণীর গ্রন্থপ্রেমিক মনীষী। আমাদের দেশে যেসব মনীষী তাঁদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও অর্থে নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য। গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যেমন ছিল তাঁর সযত্ন প্রয়াস, জ্ঞান আহরণেও ছিল তাঁর তেমনি গভীর অনুরাগ।

বিদ্যাসাগর দীর্ঘদিন ভাড়ার বাড়িতে বাস করেন। বাড়ি পরিবর্তনের সময় তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাঁর মূল্যবান বইগুলির ক্ষতি হয়। তাছাড়া ভাড়ার বাড়িতে ইচ্ছামত বইগুলি সাজিয়েগুছিয়ে পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশও সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি পরিণত বয়সে কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ি তৈরির ইচ্ছা করেন। পিতৃভক্ত সন্তান পিতা ঠাকুরদাসের অনুমতি নিয়ে বাদুড়বাগানে একটি বাড়ি তৈরি করান। গ্রন্থপ্রেমিক মনীষীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বাদুড়বাগানের বাড়িতে 1283 সালের শীতকালে সপরিবারে তিনি প্রবেশ করেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিনি 1283 সালের শেষভাগে বাদুড়বাগানে স্বকৃত নতুন বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন। পুস্পোদ্যান পরিশোভিত নির্জ্জন শুভ্র বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখা পড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবারাত্রি কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞানচর্চ্চা বা শাস্ত্রপাঠ করিতে ভালবাসিতেন।"

বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহু গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। শুধু সংগ্রহ নয়, সযত্নে রক্ষাও করেন। চণ্ডীচরণ এই সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখেছেন, "সংস্কৃত

শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে যেরূপ সংগৃহীত ও যত্নে রক্ষিত সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিও বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভালভাবেই শিখেছিলেন, তাঁর সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারদের বহু প্রকার বই তার গ্রন্থাগারের জন্তে তিনি সংগ্রহ করেন। বিদ্যাসাগর 'বিবলিওফাইল' ছিলেন না, সংগ্রহ করার আনন্দের জন্তেই বই সংগ্রহ করতেন না। তাঁর আলমারীতে বই কীটদষ্ট বা ধূলিধূসরিত হতো না, অবহেলায় হৃতসৌন্দর্য হতো না। তার কারণ তিনি সবসময়েই বইয়ের যত্ন নিতেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে বই ক্রয় করতেন, তা পাঠ করতেন। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "যে কোন বিষয়ে যখনই কেহ কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কোন সুপ্রবীণ লেখকের অভিমত উল্লেখ করিয়া তদীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি—স্কট, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, হাক্সলি, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ কবি, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিষয়ের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি।"

সংস্কৃত ও ইংরেজী ছাড়া বাংলা, হিন্দী এমন কি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষার বইও তাঁর লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল। বিদ্যাসাগরের সময় গ্রন্থের ভিত্তিই প্রবর্তিত শ্রেণীবিভাগ ছিল না, কিন্তু তিনি নিজেই গ্রন্থগুলি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রাখতেন। শুধু সাজানো গোছানো নয়, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল বইগুলির বাঁধাই-সৌকর্য। এর জন্তে তাঁকে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো, তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। প্রায় সমস্ত বই-ই সুন্দর ও সুচারুরূপে বাঁধাই করা হতো। অনেক গ্রন্থই ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনী থেকে বাঁধাই হয়ে আসতো। এতে গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব মনোরম হতো। শশিভূষণ বসু বলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতে পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম আরভিঙের স্কেচবুক এই সাধারণ দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক।" বই-বাঁধানোর এই সখ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপ্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে।

প্রথমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর বিদ্যাসাগরের কোন আস্থাই ছিল না, কিন্তু পরে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করে—এমন কি, সুকিয়া স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে কিছুকাল অ্যানাটমি শিক্ষা করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল সরকার বলেন—"'এই সময় তিনি বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতিত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্য পুস্তক আছে।" বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বলেছেন—"বিদ্যা-সাগর মহাশয় প্রতি বৎসর থ্যাকার কোম্পানীর দ্বারা অর্ডার দিয়া বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাইয়া প্রচারের জন্য অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। খৃঃ 1867 সাল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই শত টাকার ঔষধ ও পুস্তক বিতরণ করিতেন।......হোমিও-প্যাথিক পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যেরূপ দৃষ্ট হয় এরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না।"

বিদ্যাসাগরের এই বহু-প্রশংসিত গ্রন্থাগারটির সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব কাহিনীতে বিদ্যানুরাগী গ্রন্থপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহটি দেখে বললেন, এত অর্থ ব্যয় করে বইগুলি বাঁধিয়েছেন কেন? টাকাগুলি তো বাজে খরচ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন—কেন, এতে কি দোষ হয়েছে? ভদ্রলোক সহজভাবেই বললেন, যে টাকা খরচ করে বই বাঁধিয়েছেন, সেই টাকায় তো অনেকের উপকার করতে পারতেন।

বিদ্যাসাগর তখনই ভদ্রলোকের কথার কোন উত্তর দিলেন না। এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শাল জোড়াটা তো বেশ চমৎকার দেখছি। কত টাকায় কিনেছেন?

ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, শালের গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। শালজোড়াটা যে পাঁচ-শ' টাকায় কিনেছেন, তাও সগর্বে জানালেন।

এবার বিদ্যাসাগরের উত্তর দেবার পালা। তিনি বললেন, সে কি মশায় এত টাকা খরচ করে শাল কিনলেন? পাঁচ সিকার একটা মোটা কম্বলেই তো বেশ শীত কাটে। ঐ টাকায় তো অনেকের উপকার হতো। আমি যে৷ মোটা চাদর গায়ে দিয়েই থাকি।

ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন।

লাইব্রেরী থাকলেই বন্ধুবান্ধবেরা পড়বার জন্যে বই নিয়ে যাবে—পড়া হলেই ফেরৎ দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বই আর ফেরৎ আসে না। এমনি করেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের অনেক মূল্যবান বই-ই হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলা যাক।

বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু একদিন তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একটা মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে যান, অবশ্য শীঘ্রই ফেরৎ দেবেন এই কথা বলে। কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবার পর বিদ্যাসাগর বইটার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন—বইটা ফেরৎ দিতে অনুরোধ করেন। বইটার কথা শোনাবামাত্র ভদ্রলোক সহজভাবেই উত্তর দেন, সে কি কথা ও বইটা তো ফেরৎ দিয়ে গেছি।

বিদ্যাসাগর অবাক হলেন। তাঁর একটা মূল্যবান বই হাতছাড়া হয়ে গেল। বইঅন্ত প্রাণ বিদ্যাসাগর ব্যথিত হলেন।

বিদ্যাসাগর ভাগ্যবান, তাই বইখানা তিনি ফিরে পেলেন। কিন্তু কেমন করে বইটা পেলেন, সেও এক কাহিনী।

বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত এক পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা একদিন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। হাতে একটা দামী বাঁধানো বই। বিক্রি করতে এসেছে সে বিদ্যাসাগরের কাছে।

বইখানা দেখামাত্র বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন, বললেন আরে এই বইতো আমার, কোথায় পেলে তুমি? প্রশ্নের উত্তরে পুস্তক বিক্রেতা যা বললো, তা হলো এই—যে বন্ধু তাঁর কাছ থেকে বইটা পড়তে নিয়ে গিয়েছিল সেই তাকে পুরাতন বইয়ের দামে বিক্রি করে দিয়েছিল।

বন্ধুর এই হীন ব্যবহারে বিদ্যাসাগর লজ্জিত হলেন। সেই মুহূর্তেই বইটা তার কাছ থেকে কিনে নিলেন।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর এই প্রাণাধিক প্রিয় বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি লালগোলার রাজার নিকট বন্ধক দেওয়া হয়। 1914 সালে এই বিদ্যানুরাগী রাজা বন্ধকী খতটি রেজেষ্ট্রি করে গ্রন্থাগারটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন।

এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তকের মুদ্রিত তালিকায় পাঁচ শতেরও অধিক গ্রন্থ আছে। বলা বাহুল্য এই সংগ্রহটিতে সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল ধর্ম, ভাষা, কৃষি, ভ্রমণ কাহিনী, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের বই তো আছেই—এমন কি, কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও স্থান লাভ করেছে। যেমন—জেনেস পাইলট কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র, পৃ. 31, তামাকের উপর মাশুল হওয়া বিহিত কিনা (1862), পৃ. 17, স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ধারাপাত 1862, পৃ. 19 এবং গোবীজ প্রয়োগ 1857, পৃ 29। ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিও বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য ছিল। সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ সংগ্রহে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। কোলব্রুক সম্পাদিত অমর কোষ (1808) এবং গোল্ডস্টুকারকৃত সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির স্থান (বার্লিন সংস্করণ) গ্রন্থ দুটির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর সংগ্রহের অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা আজও মুদ্রিত হয় নি।

"দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রজনন নিয়ন্ত্রণ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' কথাটির মত 'প্রজনন নিয়ন্ত্রণ' কথাটি শুনতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হই নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা সীমিত রাখা সম্ভব, কিন্তু সন্তানের লিঙ্গ বা বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পরিবারের ভাবী সন্তানটি পুত্র না কন্যা হবে, ফর্সা না কালো হবে, লম্বা না বেঁটে হবে, তা কোন দম্পতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সন্তানের লিঙ্গ ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের ইচ্ছামত পরিবর্তন বা পরিচালন করাকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ বলে।

বর্তমান জনবিস্ফোরণের যুগে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি কেউই প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু বাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি সকলেই কামনা করেন। কিন্তু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার তারতম্যে শ্রেণীগত সন্তানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ধনী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা যেমন নিয়ন্ত্রিত করেন, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তেমন করেন না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধ, মহামারী অথবা দুর্ভিক্ষে যদি জনসংখ্যা হ্রাস না পায়, তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে বসবাস করবার জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদন করবার পূর্বে তার প্রজনন মূল্যায়ন করা হবে কি না, তা কে বলতে পারে!

প্রজনন-বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে গাছপালা ও পশু-পক্ষীর প্রজনন উন্নতি করা যদি সমীচীন বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করা অসমীচীন বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রজনন-বিজ্ঞানীদের, মতে বাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করাই হবে ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রজনন উন্নতির সহায়ক। অর্থাৎ সমাজে যদি সুস্থ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বেশী সংখ্যক এবং বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করেন, তাহলে কালক্রমে মানব জাতির প্রজনন-চিত্র পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যকে চিরতরে বিলুপ্ত করা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সুস্থ ও বুদ্ধিমান সন্তান যদি বেশী সংখ্যায় বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করবার কাজ দ্রুততরভাবে সম্পন্ন হবে।

কৃত্রিম শুক্র-সঞ্চালনের (Artificial insemination) সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করবার পরিকল্পনা অনেকে করে থাকেন। সমাজে যাঁরা শারীরিক, মানসিক ও বৈত্তিক দিক দিয়ে উন্নত, তাঁদের স্পার্ম নারীদেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন সন্তানের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্পার্ম সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে, যে কোন পুরুষ তার মৃত্যুর পরেও যেমন ভাবী সন্তানের জনক হতে পারবেন, তেমন যে কোন নারী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্পার্ম ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ কস্‌মোপলিটান পরিবার গঠন করতে পারবেন। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

রূপায়িত করতে বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর. জি. এডওয়ার্ডস ও তাঁর সহকর্মীরা স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের করে নিয়ে সেটিকে টেস্ট-টিউবে পুরুষের শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত করে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ভ্রূণ যে কোন স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে সন্তানের জন্ম ঘটানো যেতে পারে। নারীদেহের বাইরে ভ্রূণ উৎপাদনের পদ্ধতি যখন উন্নতি লাভ করবে, তখন নির্বাচিত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে সন্তানের লিঙ্গ, আকৃতি, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পদ্ধতির সাহায্যে নানাবিধ বংশগত ব্যাধির আবির্ভাব রোধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, বংশগত হিমোফিলিয়া (রক্ত জমাট না বাঁধবার রোগ) রোগগ্রস্ত পুরুষের সব কন্যা হিমোফিলিয়া রোগের প্রচ্ছন্ন বাহক হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের অর্ধেক সংখ্যক পুত্রসন্তানের ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাহক স্ত্রীলোকেরা যদি পুং-ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ না করেন, তাহলে তারা রোগাক্রান্ত পুত্রসন্তানের মাতা হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। বিজ্ঞানের কিটোলজি শাখার উন্নতি হলে ভ্রূণের জন্মগত বিকৃতি বা রোগের বীজকে নিরূপণ করা সহজ-তর হবে। ভ্রূণের কোষে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোমো-সোম সংখ্যা 46টির পরিবর্তে যদি 47টি দেখা যায়, তাহলে সেই ভ্রূণ থেকে জড়বুদ্ধি সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রূণের কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কোন ভ্রূণে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলার অস্তিত্ব যদি ধরা পড়ে, তাহলে তাকে পৃথিবীতে আনবার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না।

টেস্ট-টিউব মানব সন্তান সমাজে সমাদৃত হলে যে কোন দম্পতি যেমন ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করবেন, অনেক বন্ধ্যা নারীও তেমনি অপত্য লাভের সুযোগ পাবেন। সন্তানের প্রকৃত মাতা না হলেও অনেক স্ত্রীলোক গর্ভ-ধারিণী মাতা হবার গৌরব অর্জন করবেন। নার্শারি দোকান থেকে বিভিন্ন জাতের ফুলের বীজ কেনবার মত অদূর ভবিষ্যতে যে কোন স্ত্রীলোক দু-চার দিন বয়সের বিভিন্ন গুণের লেবেল-আঁটা মানব-ভ্রূণ কিনে নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানবশিশু উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তখন হয়তো খবরের কাগজে 'Own your own flat'-এর ন্যায় 'Own your own child'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। অনুমান করা যেতে পারে, তখন হয়তো দেশের প্রজননতত্ত্ববিদ্‌দের একটি বোর্ড গঠন করা হবে, তাদের কাছে প্রতি পরিবারের বংশলতিকা থাকবে এবং তারই ভিত্তিতে পুরুষের শুক্রাণু ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু নির্বাচন করে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করা হবে। এইভাবে প্রজনন নিয়ন্ত্রিত হলে মানবজাতির পরিণাম শুভ হবে কি অশুভ হবে, তা বলা শক্ত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার সি. ভি. রামন মন্তব্য করেছেন যে, যে ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মরোধ করা সমস্যা, সে ক্ষেত্রে টেস্ট-টিউবে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার কৃত্রিম ডি-এন-এ আবিষ্কারের পর থেকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের এক নতুন দ্বার খুলে গেছে। এটা আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত যে, মানুষের যাবতীয় বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল তার কোষের কেন্দ্রে ডি-এন-এ (ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড) নামক জৈব-রাসায়নিক পদার্থে নিহিত থাকে এবং তা পিতা-মাতা থেকে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। চার প্রকার নিউক্লিও-টাইডের কয়েক সহস্র শিকলের মত গড়ে ওঠে

ডি-এন-এ-র একটি অতিকায় অণু। এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে জিন বলে এবং তারাই বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডি-এন-এ.অণুর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে নানাবিধ বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং এই অতি-কায় অণুর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন বংশ-গত বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটা যখন পরিষ্কার-ভাবে জানা যাবে, তখন ভাইরাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম ডি-এন-এ মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে তার ত্রুটিপূর্ণ ডি-এন-এ-র অংশবিশেষকে সংশোধন করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। ডি-এন-এ অণুর অংশবিশেষের পরিবর্তন করাকে জেনেটিক সার্জারি এবং সামগ্রিকভাবে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমের রদ-বদল করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বলে। এই পদ্ধতির উন্নতি ঘটলে মানুষের বংশগত ব্যাধির মূলকে চিরতরে উৎপাটন করা ছাড়া ও অর্ডার-মাফিক বংশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

যৌন-প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে কাটিং বা কলম তৈরি করে একটা গাছ থেকে যেমন অনুরূপ অনেক গাছ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াস অন্ত কোষে প্রতিস্থাপন করে একই ধরণের অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করা যাবে বলে অনেকে আশা করেন। এই পদ্ধতিকে ক্লোনিং বলে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্যাঙাচির দেহকোষ থেকে নিউক্লিয়াস বের করে নিয়ে নিউক্লিয়াসবিহীন আর একটি ব্যাঙাচির কোষে যদি প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে কোষের বিভাজন সুরু হতে থাকে এবং কালক্রমে এক নতুন ব্যাঙাচির দেহ ধারণ করে। এই নতুন ব্যাঙাচি গঠনে, প্রকৃতিতে ও আকৃতিতে প্রথম ব্যাঙাচির দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই ক্লোনিং পদ্ধতি যখন উন্নতি লাভ করবে, তখন মানুষের দেহকোষের দ্বিগুণিত নিউক্লিয়াস একটি ডিম্বকোষে বসিয়ে এবং সেটিকে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে যে সন্তান সৃষ্টি করা হবে, তার আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। এভাবে যে অসংখ্য যমজ সন্তানের সৃষ্টি হবে, তাদের চেহারা একে অন্যের অবিকল অনুরূপ হবে।

যাঁরা অসংখ্য যমজ সন্তান সৃষ্টি করবার কথা চিন্তা করেন, তাঁরা বলেন যে, ডি-এন-এ অণুর নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা ক্লোনিং পদ্ধতিতে সহজে ও দ্রুতভাবে বাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া তাঁরা বলেন যে, জগতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সংখ্যা বিরল। হাজার হাজার জিনের এক বিশেষ সম্মেলনের ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের জিন সমষ্টির সমন্বয় না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে অনুরূপ প্রতিভাবানদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তখন হয়তো হাজার নিউটন, আইনষ্টাইন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মোজার্ট, বিঠোফেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। তখন কোন দেশে ব্রেন ড্রেনের সমস্যা আর থাকবে না। খোরানা, চন্দ্রশেখর ও নারলিকারের জন্যে আমাদের আর আফশোষ করতে হবে না। কিন্তু দেবতা গড়তে গিয়ে অসংখ্য দানব যে সৃষ্টি করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

মানবজাতির উন্নতিতে কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছিত এবং কোন্‌গুলি অবাঞ্ছিত, তা বিতর্কিত। যে বৈশিষ্ট্য আজ বাঞ্ছিত বলে স্বীকৃত, আগামীকাল তা বাঞ্ছিত বলে গণ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া মানুষের বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য (যেমন—বুদ্ধিবৃত্তি) কতটা বংশগত এবং কতটা পরিবেশগত প্রভাবের উপর নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বংশানুক্রম ও পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাবে মানব-বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়। শুধু যদি বংশানুক্রমকে উন্নত করে পরিবেশের কোন পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হবে কি না সন্দেহ। তবে ভবিষৎ সমাজে, মানুষ যে বৈশিষ্ট্যকে বেশী মর্যাদা দেবে, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করে সেই বৈশিষ্ট্যের বেশী সংখ্যক সন্তান সৃষ্টি করা হবে। সুতরাং এটা আশা করা বোধ হয় খুব বাড়াবাড়ি হবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ নিজেই নিজের বিবর্তনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ভারতের কন্দ ও খাদ্য হিসাবে তাদের ব্যবহার

বলাইচাঁদ কুণ্ডু *

ক্রমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-সমস্যার যে ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের অধিকতর ফলনের জন্যে যে চেষ্টা চলছে, তা অনেকটা সফল হয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় আগের মতই রয়ে গেছে, অর্থাৎ শস্যের উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি হলেও সাধারণ লোকের খাদ্যাভাব পূরণ হচ্ছে না। খাদ্যের জন্যে সাধারণতঃ আমরা ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের উপর নির্ভর করি। কিন্তু বন্যা, খরা ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণের ফলে শস্যহানি হলে দুর্ভিক্ষ বা সেই রকম অবস্থার উদ্ভব হয়। সেই সময় দরিদ্র জনগণ মহার্ঘতা, তথা অপ্রতুলতার জন্যে এই সব শস্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে না। দেখা গেছে, তখন তারা সহজলভ্য কন্দমূলজাতীয় খাদ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

'চলন্তিকা'র কন্দ শব্দের অর্থ: স্ফীতাকার উদ্ভিদমূল, tuber, (যথা—আলু, কচু)। আলু, কচু ব্যতীত আরো অনেক প্রকার কন্দ আছে, যেমন—লাল আলু, শিমুল আলু, ওল ইত্যাদি এবং এগুলি সবই মূল নয়, কতকগুলি যেমন—আলু, কচু, ওল আদা, শটী প্রভৃতি কাণ্ডের পরিবর্তিত আকার বিশেষ। কিন্তু লাল আলু, শিমুল আলু, শাঁখ আলু প্রভৃতি মূলেরই রূপান্তর। খাদ্য সঞ্চিত হবার ফলে স্ফীতাকার মৃত্তিকানিম্নস্থ মূল বা কাণ্ডকে বাংলা ভাষায় কন্দ বলা হয়।

ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলে এই সব কন্দজাতীয় অনেক প্রকার ফসল স্বতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন জায়গায় কোন কোন জাতীয় ফসলের সামান্য চাষ করা হয়। তবে খাদ্যজাতীয় শস্য বা বহু ব্যবহৃত আলুর মত এদের ব্যাপক চাষ কোথাও হয় না। দেশের বর্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ খাদ্যাভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব কন্দজাতীয় ফসলের চাষের প্রসার ও তাদের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইদানীং পৃথিবীর উন্নতিকামী দেশসমূহে বিভিন্ন জাতের কন্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 1967 সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ট্রিনিডাড শহরে এই সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ভারতীয় কন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রেরণের জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব কন্দজাতীয় ফসল জন্মায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন (Edible rhizomatous and tuberous crops of India (other than potato)—Proceedings International Symposium on Tropical Root . Crops. Trinidad, 1967)। দেখা গেছে যে, সেখানে প্রচলিত অধিকাংশ কন্দ আমাদের দেশজ কন্দের তুলনায় পৃথক।

দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, মালয় প্রভৃতি দেশ থেকে বহুদিন আগে এই সব কন্দ এদেশে আনা হয়েছিল এবং সেগুলি এখন এদেশে সর্বত্র স্বতঃই উৎপন্ন হচ্ছে বা কোন কোন স্থানে চাষও হচ্ছে।

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

'ভারতের খাদ্য-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, April, 1969) লেখক তিন প্রকার কন্দমূলের উপযোগিতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় কতকগুলি ফসলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। অবশ্য আলু, বীট, শালগম, গাজর ও মূলা প্রভৃতি যেগুলি সাধারণতঃ খুবই পরিচিত, তা এই তালিকায় নেই। কন্দজাতীয় ফসলগুলি পতিত বা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জমিতে অথবা অন্যান্য প্রধান ফসলের সঙ্গে একই জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

ক্যাসাভা অথবা ট্যাপিওকা বা শিমুল আলু (Manihot esculenta Crantz)—এটি ভারাণ্ডা জাতীয় দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার ঝোপ-জাতীয় গাছ। এর মূলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে এবং লাল আলুর মত লম্বা ও মোটা হয়। এদের পাতা অনেকটা শিমুল গাছের পাতার মত বলে অনেক জায়গায় একে শিমুল আলু বলা হয়। বহুদিন আগে পর্তুগীজদের দ্বারা এটা ব্রেজিল থেকে দক্ষিণ ভারতে আনীত হয়েছিল। ভারতবর্ষে এই আলু প্রধানতঃ কেরালা ও মাদ্রাজ প্রদেশে প্রায় 500,000 একর জমিতে চাষ হয়। আলু ছাড়া অন্যান্য কন্দজাতীয় ফসলের মধ্যে গুরুত্ব হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয়, লাল আলু প্রথম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন বর্মাদেশ থেকে চাউলের আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, তখন খাদ্য হিসাবে ক্যাসাভার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মাদ্রাজ ও কেরালা ব্যতীত অন্যান্য দেশেও এর চাষের চেষ্টা হয়। সেই সময় দুর্ভিক্ষে যখন বাংলা দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন কেরালায় খাদ্যের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হলেও ক্যাসাভার জন্যে খাদ্যাভাবে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম হয়েছিল।

এই আলুতে Hydrocyanic acid আছে। এজন্যে খাবার পূর্বে জলে ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। এতে প্রোটিনের অংশ খুবই কম। এজন্যে কেরালা প্রদেশে, যেখানে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, সেখানকার দরিদ্র লোকেরা শুধু মাছের সঙ্গে এগুলি খেয়ে থাকেন। এতে তাঁদের খাদ্যমূল্যের সমতা রক্ষিত হয়। বর্তমানে অধিক প্রোটিনযুক্ত শিমুল আলু উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

মহীশূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারে কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে 60 ভাগ ক্যাসাভা চূর্ণ, 15 ভাগ চীনাবাদামের খৈল চূর্ণ ও 25 ভাগ গমজাত সুজি মিশিয়ে এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য (ট্যাপিওকা ম্যাকারোনি) তৈরি করা হয়েছে। এই খাদ্য প্রকৃতিজাত চাউল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর এবং এতে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে।

ধান বা গম যে সব জমিতে চাষ করা যাবে না, সেই সব অনুর্বর জমিতে অবিমিশ্র ফসল হিসাবে অথবা কলা বা লাল আলুর সঙ্গে একই জমিতে শিমুল আলুর চাষ করা যেতে পারে। ব্রেজিলে উচ্চ জমির ধানের সঙ্গে একই জমিতে এর চাষ হয়। ধান কেটে নেবার কিছুদিন পরে আলুগুলি তোলা হয়। এই আলুর ফলন সাধারণতঃ বেশ ভালই হয়। সাধারণতঃ একর-প্রতি 3 থেকে 12 টন পর্যন্ত মূল পাওয়া যায়। কেরালায় কোন কোন স্থানে 20-22 টন পর্যন্ত মূল উৎপন্ন হয়।

লাল আলু (Ipomoea batatus)—আলু ব্যতীত অন্যান্য কন্দসমূহের মধ্যে লাল আলুই প্রধান। এটা কলমি শাকের মত এক প্রকার লতানে গাছ। এর প্রধান কাণ্ডের নিম্নভাগে মাটির নীচে যে সব শিকড় উৎপন্ন হয়, তাদের অধিকাংশ লম্বাকৃতির কন্দমূলরূপে গুচ্ছাকারে থাকে। লতানে কাণ্ডের গাঁট থেকে যে সব আস্থানিক মূল বের হয়, সেগুলিও স্ফীত হয়ে কন্দাকৃতি

ধারণ করে। ভারতে প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে লাল আলুর চাষ হয় এবং 13 লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে মাত্র 6000 একর জমিতে এই আলুর চাষ হয়।

পর্তুগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে লাল আলু নিয়ে এসে এদেশে চাষের প্রবর্তন করে। সাধারণতঃ দুটি বিভিন্ন জাতের আলুর চাষ হয়—একটির ছাল লাল, অন্যটির ছাল সাদা। এই উভয় জাতীয় আলুর ভিতরের শাঁস সাদা। কিছুকাল আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক প্রকার উন্নত জাতের লাল আলু এনে এদেশে কোথাও কোথাও চাষ করা হচ্ছে। এগুলির ছাল হাল্কা বাদামী বা হলদে রঙের এবং শাঁস হলদে বা কমলা রঙের। সিদ্ধ করলে বা আগুনে সেঁকা হলে এই জাতীয় আলুর শাঁস গাজরের রঙের মত হয়। এগুলি খেতেও খুব সুস্বাদু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব হয়, তখন অবহেলিত লাল আলুর উপর সরকারের দৃষ্টি পড়ে। কয়েকটি প্রগতিশীল দেশ থেকে অধিকতর ফলনশীল আলুর আমদানী করে এদেশের জলহাওয়ার উপযোগী করবার ব্যবস্থা হয়। খাদ্য হিসাবে লাল আলু যথেষ্ট পুষ্টিকর।

লাল আলু কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ করে, ভেজে বা আগুনে সেঁকে খাওয়া যায়। রান্না করলে এর মিষ্টত্ব অনেক বেড়ে যায়। এতে যথেষ্ট প্রোটিন ও ভিটামিন থাকে। লাল আলুর শাঁস শুকিয়ে গুঁড়া করে তা ময়দা বা আটার সঙ্গে মিশিয়ে চাপাটি বা রুটি তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করতেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য হিসাবে লাল আলুর প্রচলন যথেষ্ট আছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে লাল আলুর প্রচলন অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক।

খাম আলু বা চুপড়ি আলু (Dioscorea spp)—এটা এক প্রকার একবীজপত্রী লতানে গাছ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রান্তাঞ্চলে বা বনে-জঙ্গলে জন্মায়। বহু জাতীয় খাম আলু আছে, তার মধ্যে 7-8টি প্রজাতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে তিনটি প্রজাতির প্রচলন খুবই বেশী। এদের মধ্যে মূলের আয়তন ও আকৃতিগত পার্থক্য আছে। কোন কোন প্রজাতিতে একটি মাত্র বড় গোলাকার মূল হয়, আবার কোন কোন প্রজাতিতে লাল আলুর মত লম্বাকৃতির অনেকগুলি গুচ্ছাকার মূল থাকে। যেখানে একটি মাত্র কন্দ জন্মে, সে ক্ষেত্রে কখনো কখনো এক-একটি কন্দ 15-20 কিলোগ্রাম ওজনেরও হয়ে থাকে। উঁচু জমিতে আদা, বেগুন, লাল আলু ও ভুট্টার সঙ্গে খাম আলুর চাষ করা যেতে পারে। 7-8 মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়।

খাম আলুর স্বাদ অনেকটা গোল আলুর মত এবং এগুলি খুবই পুষ্টিকর। এদের একটা বিশেষ স্বাদ আছে, এজন্যে অনেকে সব্জী বা তরকারী হিসাবে এগুলি খুব পছন্দ করেন।

ভারতের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ও দণ্ডকারণ্যের আদিম অধিবাসীরা খাদ্যশস্যের অভাবের সময় বনে-জঙ্গলে উৎপন্ন খাম আলুর উপর খুবই নির্ভর করে।

খাদ্য ব্যতীত কোন কোন জাতের খাম আলু নানাবিধ প্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামাল হিসাবে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্টিচোক (Helianthus tuberosus) - এটা সূর্যমুখীফুলজাতীয় উত্তর আমেরিকার এক প্রকার গাছ। মাটির নীচে কাণ্ডের তলদেশে আলুর মত এদের অনেকগুলি কন্দ হয়। ভারতবর্ষে পাহাড়ী অঞ্চলে এদের চাষ হয়। যেখানে অন্য কিছু জন্মানো যায় না; সেখানে আর্টিচোক সহজে জন্মানো যেতে পারে। কন্দগুলি অনেকটা আলুর

মত। তবে এদের চোখগুলি খুব বড় বড়। কাঁচা অথবা সিদ্ধ করে বা ভেজে এই কন্দ খাওয়া যায়।

খাদ্যমূল্য হিসাবে আর্টিচোক আলুর মত উপকারী। যদিও পাহাড়ী অঞ্চলে এরা জন্মায়, তথাপি চেষ্টা করলে সমতল ভূমিতে এদের জন্মানো যেতে পারে। জমি ভালভাবে তৈরি করে ঠিক আলুর মত একটি পুরা আর্টিচোক অথবা 2-1টি চোখবিশিষ্ট টুকরা পাহাড়ী অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বা সমতল ভূমিতে আরো কিছু পরে লাগাতে হয়। গোড়ার দিকে সেচের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। চার থেকে সাত মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণতি লাভ করে এবং একর প্রতি পাঁচ থেকে দশ টন ফলন হয়।

কচু (Colocasia esculentus)—এরা Araceae গোত্রের Colocasia জাতের অন্তর্গত এক প্রকার একবীজপত্রী উদ্ভিদ। Colocasia জাতের 13-14টি প্রজাতি আছে। ভারতে কিন্তু মাত্র 5-6টি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে C. esculentus-এর চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প পরিমাণে হয়। এর আবার নানাবিধ রকমফের (Variety) আছে। কন্দগুলির আকৃতি নানা প্রকারের হয়ে থাকে। পাতার আকৃতিতেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। সাধারণতঃ, কন্দের আকার বা স্বাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের নানাবিধ প্রচলিত নাম হয়েছে; যেমন—মুখী কচু, ঘট কচু, ভোট কচু, জল কচু, মাখন কচু, সর কচু, পোলা কচু ইত্যাদি। এই সব কচুর পাতাও সজী হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য হিসাবে কচু আলুর মত ব্যবহৃত হতে পারে। আলু অপেক্ষা এগুলি অধিকতর পুষ্টিকর, কারণ এতে প্রোটিনের অংশ অনেক বেশী থাকে। তাছাড়া এতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তরকারী ছাড়া এগুলি সেঁকে বা অল্প পুড়িয়ে চাট্‌নী সহযোগে খেতে খুবই মুখরোচক। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোকেরা এভাবে এগুলি খুব খেয়ে থাকে। অন্য অনেক প্রকার খাদ্য তৈরি করাও সম্ভব। লেখক যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপের আদিম অধিবাসীগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কচু থেকে নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করতে দেখেছেন। একটু রকমফের করে সেই সব খাদ্য আমাদের দেশের লোকের খাদ্যোপযোগী করা যেতে পারে।

মানকচু (Alocasia spp)—এরা কচুজাতীয় এবং Alocasia জাতের অন্তর্গত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এশিয়া মহাদেশে প্রায় 60 রকমের Alocasia-এর প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে A. cucullata Schott, A. indica (Roxb) Schott এবং A. macrorrhiza Schott—এই তিনটি প্রজাতির চাষ সাধারণতঃ হয়ে থাকে। এদের কন্দগুলি লম্বাটে ও মোটা হয়ে থাকে—এক-একটির ওজন 1 কিলো থেকে 10 কিলো বা ততোধিক হয়ে থাকে। কচুগুলি দেখতে প্রায় এক রকম এবং বিভিন্ন প্রজাতীয় হলেও সবগুলিকেই মানকচু বলা হয়। এদের মধ্যে আবার A. indica-র চাষ সবচেয়ে বেশী হয়। এদের কন্দগুলি 30 থেকে 60 সেন্টিমিটার বা কখনও আরও বেশী লম্বা হয় এবং ব্যাস 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতের অনেক অংশে, বিশেষতঃ আসাম ও বাংলা দেশে এর চাষ অল্প পরিমাণে হয়।

সাধারণতঃ সজী বা তরকারী হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হলেও এথেকে বিশুদ্ধ শ্বেতসার তৈরি হতে পারে। মানকচুর ময়দা হাল্কা ও পুষ্টিকর এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

40-50 বছর আগে আমরা প্রায়শঃই প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর আঙিনার কোণ বা

কোন প্রকারের মানকচু লাগাতে দেখেছি। পাঁচ বছর আগে বর্তমান পর্যবেক্ষণের (Survey) সময় সেই সব গ্রামে গিয়ে মানকচুর গাছ আর তেমন দেখতে পাই নি। অথচ পুষ্টিকর তরকারী হিসাবে মানকচু এখনও সমানভাবেই আদৃত। এই গাছ লাগানও খুব সহজ।

খামকচু (Xanthosoma sagittifolium)—এই প্রকার কচু কোন কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি স্থল দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলসমূহে। ফিলিপাইন ও মালয়ে এদের চাষ হয়। এই কচু অনেকটা মানকচুর মত, তবে এতে আদৌ ছিবড়া থাকে না। একচে সিদ্ধ করলে খুব মোলায়েম ও খেতে খুব সুস্বাদু হয়।

ওল—ওল কচুর মত Araceae গোত্রের Amorphophallus জাতের এক প্রকার উদ্ভিদ। Amorphophallus জাতের প্রায় 90টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে 14টি ভারতে পাওয়া যায়। এগুলি এখানে-ওখানে, বনে-জঙ্গলে জন্মে এবং সবগুলির প্রায় একই রকমের কন্দ হয়। এর মধ্যে Amorphophallus campulatus blume—এই প্রজাতিটির কন্দ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকীগুলিকে বুনো ওল বলা হয়। এগুলি বিষাক্ত ও অখাদ্য। ওল সাধারণতঃ অর্ধগোলাকার হয়, তবে কখনো কখনো কিছুটা লম্বাকৃতিরও হয়ে থাকে। এদের ওজন এক থেকে দুই কিলো পর্যন্ত হয়। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে 4 থেকে 20 কিলোগ্রাম ওজনের ওল দেখতে পাওয়া যায়।

ওলের চাষ খুব সহজেই হয়। হাল্কা জমিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ওল লাগালে আর বিশেষ কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। 10 থেকে 12 মাসের মধ্যে সেগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। কলকাতার কাছে সাঁতরাগাছি ও নিকটবর্তী অঞ্চল এবং বসিরহাটের চাষীরা ভাল জাতের ওল চাষ করে যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকে।

ওলের একটি বিশেষ স্বাদ আছে। সে জন্যে ওলসিদ্ধ অনেকেরই খুব প্রিয়। আলুর মত তরকারী বা চাট্নী করেও ওল খাওয়া যায়।

শাঁখ আলু (Pachyrhizus erosus)—শাঁখ আলু এক প্রকার শীম জাতীয় লতানে গাছ। এর আদি নিবাস মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত উষ্ণপ্রধান দেশে। ভারতের অনেক অঞ্চলেই সুস্বাদু কন্দমূলের জন্যে শাঁখ আলুর চাষ কিছু কিছু হয়। কবে থেকে শাঁখ আলুর চাষ আমাদের দেশে হচ্ছে, তা ঠিক জানা নেই। তবে অনেক দিন থেকে যে এর ব্যবহার আমাদের দেশে হচ্ছে, তার প্রমাণ এই যে—প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলারা পূজা-পার্বণে সাধারণতঃ তথাকথিত বিলাতী জিনিষ বর্জন করলেও শাঁখ আলু বিভিন্ন পূজা্র ব্যবহার করেন।

কন্দমূলগুলির রং সাদা, আকৃতি গোল বা লম্বাটে ধরণের। এক-একটির ওজন সাধারণতঃ 200 গ্রাম থেকে এক কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হটুগঞ্জের হাটে আমি অনেক দিন আগে খুব বড় শাঁখ আলু (40×20 সেন্টিমিটার) দেখেছিলাম—এক-একটির ওজন 5 থেকে 10 কিলোগ্রাম পর্যন্ত ছিল। তারপর বহু জায়গায় ঘুরেও এত বড় শাঁখ আলু আর কখনও দেখি নি।

সাধারণতঃ দোআঁশ হাল্কা জমিতে বীজ থেকে শাঁখ আলুর চাষ হয়। একরপ্রতি 18-20 কিলো বীজ লাগে। জুন-জুলাই মাসে মাটি ভালভাবে তৈরি করে 30-40 সেন্টিমিটার পর পর সারিতে বীজ লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যে ব্যবধান 60-70 সেন্টিমিটার থাকা দরকার। 6-7 মাসের মধ্যে আলুগুলি

পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। ভাল আলুর ফলনের জন্যে মধ্যে মধ্যে গাছের ডালপালা ছেঁটে দিতে হয়। একরপ্রতি ফলনের পরিমাণ 3000 থেকে 4000 কিলোগ্রাম। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপে ফলন অনেক বেশী—প্রতি হেক্টরে প্রায় 90-95 টন পাওয়া যায়।

শাঁখ আলু কাঁচা খাওয়া যায় এবং অত্যন্ত সুস্বাদু ও স্নিগ্ধকর। এতে শ্বেতসার, বিভিন্ন শর্করা, প্রোটিন, তৈল, নানাবিধ খনিজ পদার্থ ও নানাপ্রকার ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। একজে খাদ্য হিসাবে এটি খুবই পুষ্টিকর; অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে এই সুস্বাদু কন্দমূলের সমধিক সমাদর কখনও হয় নি।

কেশুর (Scirpus keysoor)—এটি মুথা জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণতঃ ভিজা জমিতে বা জলের ধারে এগুলি জন্মায়। প্রত্যেকটি কাণ্ডের নিম্নে মাটির নীচে 1 থেকে 3 সেন্টিমিটার পরিমাণ অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ জন্মায়। কেশুর খেতে খুবই সুস্বাদু। ভারতে অনেক জায়গায় অনবিস্তর কেশুর পাওয়া যায়; তবে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এর কিছু কিছু চাষ হয়। কলকাতায় হগ মার্কেটে অল্প সময়ের জন্যে এর কিছু চালান আসে এবং তখন বেশ ভাল দামে রসিকজনের নিকট তা বিক্রীত হয়।

ইলিওক্যারিস (Eliocharis dulcis Trin.)—ইলিওক্যারিস কেশুরের মত মুথা জাতীয় একপ্রকার পত্রহীন উদ্ভিদ। সাধারণতঃ জলা জমিতে বা জলের ধারে জন্মায়। এদের কাণ্ডের নীচে একটি কন্দ থাকে এবং তাথেকে অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ (1 থেকে 1·5 সেন্টিমিটার ব্যাসের) জন্মায়। ভারতের বহু স্থানে এই কেশুর স্বতঃই জন্মায়—চাষ একেবারে হয় না বললেই হয়। চীন, জাপান ও বার্মায় এর প্রচুর চাষ হয়। চীনদেশে এক প্রকার ইলিওক্যারিসের চাষ হয়—যাদের কন্দ 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয় ও হেক্টর প্রতি প্রায় 7 টন ফলন পাওয়া যায়।

এই কন্দ কাঁচা খাওয়া যায়, খেতে খুবই সুস্বাদু। এদের শাঁস সাদা রঙের এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি ও প্রোটিন থাকে। স্যালাড বা তরকারীতেও এর ব্যবহার প্রচলিত আছে। কলকাতার বাজারে কখনো কখনো এর চালান আসে।

উল্লিখিত কন্দগুলি ব্যতীত শ্বেতসারের জন্যে আরও কয়েক প্রকার কন্দের প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়; যেমন—শটী (Curceema zedsaria)—হলুদ জাতীয় এক প্রকার গাছ। শটী রোগীর পথ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। Maranta arundinacea ও Curceema angustifolia নামক গাছের কন্দ (Rhizome) থেকে অ্যারোরুট প্রস্তুত হয়। Canna edulis—এটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনীত ক্যানা ফুলজাতীয় গাছ। এর রাইজোম থেকেও আর এক প্রকার অ্যারোরুট প্রস্তুত হয়। সকল প্রকার অ্যারোরুটই শিশুর ও রোগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য-সমস্যা ও রসায়ন

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা এবং খাদ্যের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি—এই দুয়ের মধ্যে হয়েছে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। বর্তমানে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় 355 কোটি (1969 সালের গণনা মতে)। পৃথিবীর বার্ষিক খাদ্যশস্য ও বিবিধ আমিষ খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এই বিপুল লোকসংখ্যার জীবনধারণের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। হিসাবে দেখা যায়, গত 30-40 বছরে খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র শতকরা 13-14, কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় শতকরা 40। খাদ্য থেকে মানুষ যে শক্তি পায়, তাকে বিজ্ঞানীরা—তাপশক্তির এককের (ক্যালোরি) সাহায্যে প্রকাশ করেন। একটি সুস্থ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন, তাপশক্তির এককে তার পরিমাণ হয় 2800 ক্যালোরি। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ($\frac{2}{3}$ ভাগ) এই পরিমাণ খাদ্য জোটে না। অবশ্য খুব অল্প কয়েকটি দেশে (যেমন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া) খাদ্যোৎপত্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। মোটামুটি বলা যায়, পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ অধিবাসী ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রতি রাত্রে ঘুমাতে যায়। বর্তমানে যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে আর 30-40 বছর পরে তা যাবে দ্বিগুণ হয়ে অর্থাৎ প্রায় 700 কোটি হবে। খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাড়িয়ে তুলতে না পারলে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। দুর্ভিক্ষে অনশনে ও অর্ধাশনে লোকক্ষয় হবে অনিবার্য ও ভয়াবহ। বিজ্ঞানীরা, বিশেষতঃ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠেছেন। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তির যে সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চলেছে, সংক্ষেপে তারই আলোচনা হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়াতেই বলা যায়, মানুষের সকল খাদ্যের মূল উৎপত্তিস্থান হলো উদ্ভিদ-রাজ্য। সকল প্রকার আমিষ খাদ্যেরও মূলে আছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের এই প্রাণের বাঁধন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তি করতে হলে মানুষকে উদ্ভিদ-রাষ্ট্রের উন্নতি ও বিস্তার বাড়িয়ে তুলতে হবে, অথবা খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভরতা থেকে আপনাকে মুক্ত করতে হবে। এই উভয় জাতীয় প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে মনোনিবেশ করেছেন।

প্রথমতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে মানুষের খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো হচ্ছে, তারই আলোচনা করা হবে। উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয়েছে অন্ততঃ 26টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে। এদের মধ্যে যেগুলির অধিক পরিমাণে অস্তিত্ব দেখা যায়, তাদের নাম হলো: কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগ্নেসিয়াম এবং আয়রন। বাকীগুলি থাকে স্বল্পমাত্র পরিমাণে। ইংরেজীতে এই কারণে এদের বলা হয় Trace element (স্বল্পমাত্রিক মৌল)। ম্যাঙ্গানিজ, কপার, আয়োডিন, ফ্লুরিন, কোবাল্ট, জিঙ্ক, বোরন, মলিবডিনাম, ভেনেডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও

বেরিয়াম হলো এর উদাহরণ। জীব ও উদ্ভিদ দেহে এদের অস্তিত্বের মাত্রা অতি সামান্য বা নগণ্য হলেও দেহের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্যে এদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীব ও উদ্ভিদ-জীবনের উপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব দেখা যায়।

জমিতে অতি সামান্য মাত্রা (50 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ) বোরনের অভাব ঘটলে ঐ জমিতে উৎপন্ন বিনের (শিমজাতীয় উদ্ভিদ) চারা গাছ শুকিয়ে মরে যায়। কোন জমিতে যদি নিকেলের পরিমাণ 40 হাজার ভাগের 1 ভাগেরও কম হয়, সে জমিতে কমলালেবুর গাছ বেড়ে উঠতে পারে না। জমিতে খুব অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্বে ঐ জমিতে উৎপন্ন টমেটোতে ভিটামিন. সি-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, খাদ্যশস্য উৎপাদন করবার জমিতে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রাহী জীবাণুর বৃদ্ধির জন্যে অতি অল্প মাত্রায় মলিবডিনামের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ উদ্ভিদই তাদের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে বায়ু, জল ও জমির লবণজাতীয় পদার্থ বা সার থেকে। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাসিয়াম-ঘটিত উদ্ভিদখাদ্যের অভাব ঘটে। এর প্রতিকার-কল্পে জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্য জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাতার ভিতর দিয়ে, বিশেষতঃ মূলের সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে অভিস্রবণ (Osmosis) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহে প্রবেশ লাভ করে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ তার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে জমিতে সার প্রয়োগের প্রথা অবলম্বন করে আসছে। বহুকাল যাবৎ এবং এখনো কিছুৎ পরিমাণে নানাবিধ পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এক শতাব্দীর কিছু বেশী হলো বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ লিবিগ জলে দ্রবণীয় নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম ও ফস্ফরাসঘটিত অজৈব পদার্থসমূহের চাষের জমিতে সার হিসাবে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা বহু পরীক্ষার ফলে প্রথম প্রমাণ করেন। সেই থেকে এসব অজৈব সারের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চাষের জমি থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টন নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ খাদ্যশস্যের ফসল উৎপাদনের জন্যে ব্যয়িত হয়। এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক বিধানে এবং জৈব সার ব্যবহারের ফলে পুনরায় জমিতে ফিরে আসে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেনের অভাব মিটে অজৈব নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োগে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাষ্ট্রের আন্দিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী প্রদেশে সোডিয়াম নাইট্রেটের (নাইট্রোজেনঘটিত একটি অজৈব লবণজাতীয় পদার্থ) একটি বিরাট স্তর আছে। একে কেলিসে (Caliche) বলা হয়। উদ্ভিদের সার হিসাবে ব্যবহারের জন্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ইয়োরোপের বহু রাষ্ট্রে এবং অন্যত্র বছর বছর প্রচুর পরিমাণে এর রপ্তানী হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মান রাষ্ট্রে এর রপ্তানী বন্ধ করা হয়, জার্মান সম্রাট জার্মান বিজ্ঞানী হাবেরকে (Haber) রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত উদ্ভিদখাদ্য বা সার প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আহ্বান করেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস তাপ ও চাপের প্রভাবে পরস্পরের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া গ্যাসে পরিণত হয়, এই তথ্য অজানা ছিল না। এই দুটি যৌগিক পদার্থ যে কোন দেশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি করা যেতে পারে। বায়ুতে অফুরন্ত নাইট্রোজেন এবং জলে আছে অফুরন্ত হাইড্রোজেন। বায়ু থেকে নাইট্রোজেন ও জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা খুবই সহজ। এ উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি। পরের পৃষ্ঠায় সমীকরণের সাহায্যে এই সংযোগবিধি দেখানো গেল।

$$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সাধারণতঃ শতকরা দু-ভাগের বেশী অ্যামোনিয়া এতে প্রস্তুত করা যায় না। কেন না, যে উষ্ণতায় এই সংযোগ ঘটে, সে উষ্ণতাতেই আবার অ্যামোনিয়া গ্যাস ভেঙে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। ফলে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার অণুর মধ্যে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী হাবের এই সমস্যার সমাধানে সিদ্ধিলাভ করেন। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও নির্দিষ্ট চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণকে তিনি একটি বিশিষ্ট সহায়ক পদার্থের (আয়রন—Iron) উপর পরিচালিত করে এবং তাদের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসকে অনতিবিলম্বে গ্যাস মিশ্রণ থেকে অপসারিত করে শতকরা ত্রিশ ভাগ অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের এই বিধি রসায়ন-বিজ্ঞানে হাবেরের পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক লবণজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট একটি উত্তম নাইট্রোজেন-ঘটিত উদ্ভিদখাদ্য বা সার। আমাদের দেশে সিন্ড্রিতে (বিহার অঞ্চলে) এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে। রাসায়নিক সংশ্লেষণে নাইট্রোজেনঘটিত অজৈব উদ্ভিদখাদ্যের উৎপাদন খাদ্যসমস্যা সমাধানে রসায়নের একটি বিশিষ্ট অবদান বলা যায়।

উপযুক্ত পরিমাণে উপযোগী সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহু গুণ বেড়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেছে যে, সার প্রয়োগে একই জমি থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় 30% (শতকরা 30 ভাগ) বেশী হয়। অবশ্য এই প্রকার সুফল পেতে হলে বীজবপন ও অঙ্কুরোদ্গম থেকে সুরু করে পাকা ফসল সংগ্রহ ও সঞ্চয় অবধি উদ্ভিদ এবং তাথেকে উৎপন্ন শস্যকে সকল প্রকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অপচয় ও বিনষ্টি থেকে রক্ষা করবার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। মানুষের মত উদ্ভিদ-জীবনেরও বহু শত্রু আছে। উদ্ভিদদেহে নানাবিধ রোগোৎপাদক জীবাণু, পরভৃৎ, অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি উদ্ভিদ রাজ্যের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত রয়েছে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, পাখী, পশুও এদের সঙ্গে যোগ দিতে ক্রটি করে না। এর ফলে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন শস্য বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও রসায়ন হয়েছে মানুষের পক্ষে মুস্কিল আসান। কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে উদ্ভিদদের সংরক্ষণের জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বহু শক্তিশালী জৈব সংশ্লেষিত পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী কীটনাশক পদার্থ হচ্ছে D-D-T। এর রাসায়নিক নাম হলো ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন। গত কয়েকবছরব্যাপী কৃষিকার্যের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র এই কীটনাশক পদার্থটির ব্যবহার অবাধে প্রচলিত ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে কোটি কোটি টন D-D-T-এর রপ্তানী হয়েছে ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সম্প্রতি দেখা গেছে যে, পুনঃ পুনঃ D-D-T-এর ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে উদ্ভিদ, পাখী, পশু—এমন কি, মানুষের জীবনের পক্ষেও এর ব্যবহার নিরাপদ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন অধিক নিরাপদ ও সুদীর্ঘ কাল ব্যবহারেও সমান হিতকর কীট-পতঙ্গ নিবারক পদার্থের উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। রসায়নের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে আগাছা বিনাশক পদার্থ। জমিতে আগাছা উঠে অনেক সময় খাদ্যোৎপাদক উদ্ভিদসমূহকে বিনষ্ট করে বা তাদের অঙ্কুরিত হতে দেয় না। এর প্রতিকার

করেছেন রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ডাইক্লোরো-ফিনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আবিষ্কারে। এর বাজার নাম হলো 2·4-D। এই পদার্থটি উদ্ভিদের পক্ষে হরমোনের কাজ করে। অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে এতে উদ্ভিদের খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে আবার উদ্ভিদের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু খাদ্যশস্যবাহী উদ্ভিদের উপর এর কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। এর সোডিয়ামঘটিত লবণকে জলে গুলে জমির উপর পিচকারী দিয়ে সূক্ষ্ম ধারায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদার্থটিরই একটি নিকট আত্মীয় ট্রাইক্লোরো ফিনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (বাজার নাম 2·4·5-T)। এর ব্যবহারে বিনা পরিশ্রমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা চলে। গাছ থেকে কাটবার, ছাটবার বা ঝাড়বার দরকার হয় না। আমসেট বা অ্যামোনিয়াম সালফামেট আর একটি আগাছানাশক পদার্থের আবিষ্কার ও বহুল ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যশস্যোৎপাদনের অন্তবিধ সমস্যা সমাধানে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সচেতন আছেন। হাজার হাজার জীবাণু, ভাইরাস এবং ছত্রাক বা পরভৃতের (Fungus) আক্রমণে উৎপন্ন ব্যাধি ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করে উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হয়। ক্লোরেনিল ও থ্যালিমাইড জাতীয় বিবিধ ছত্রাক-নাশক (Fungicide) পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহারে উদ্ভিদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞানীরা হার মানেন নি।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার পর সঞ্চয় করলেও তার শত্রুর অভাব ঘটে না। এই অবস্থাতেও কীট-পতঙ্গাদি, ইঁদুর ও কাঠবিড়ালী থেকে অপচয় নিবারণের আবশ্যক হয়। এখানেও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা যথাযোগ্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করেন নি। সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিরাপদে সংরক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে বহুবিধ ধূপক (Fumigants) পদার্থের প্রচলন হয়েছে। খাদ্য-শস্যের গুদামঘরে এসব ধূপক পদার্থের বাষ্পের পরিচালনা করে তাথেকে কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি সকল অপচয়কারী জীবকে বিতাড়িত করা হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথিলিন ডাইব্রোমাইড সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে রসায়নের একটি অভিনব অবদান সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। এতে কৃষকের অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়ের লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। ফসল সংগ্রহের অব্যবহিত পূর্বে জমিতে কোন কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিলে 3/4 দিনের মধ্যে ঐ জমিতে উৎপন্ন সকল গাছ থেকে তাদের পাতাগুলি আপনাআপনি ঝরে পড়ে। ফলে, ফসল সংগ্রহে অনেক ব্যয়, শ্রম ও সময়ের সংক্ষেপ ঘটে। ক্যালসিয়াম সায়ানে-মাইড (Calcium cyanamide) এবং ম্যাগ্-নেসিয়াম ক্লোরাইড হলো এই জাতীয় পদার্থের দৃষ্টান্ত। এদের পত্রনাশক (Defoliator) বলা হয়। নাইট্রোজেনঘটিত একটি মূল্যবান সার হিসাবে ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইডের ব্যবহার কৃষি-বিজ্ঞানের একটি পুরাতন সুপরিচিত তথ্য।

কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের উপরে বর্ণিত বিবিধ অবদানের সুবিধা গ্রহণ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কৃষকেরা তার 15/16 বছরের অগ্রবর্তী অনুন্নত প্রাচীন-পন্থাবলম্বী কৃষিকর্মীদের চেয়ে দশ গুণ বেশী কাজ ও দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

যেসব পশুর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের এবং পুষ্টির জন্যেও রসায়নের অবদান নগণ্য নয়। স্বাভাবিক ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের (যথা—অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি) সংমিশ্রণে পশুর খাদ্যকে অধিকতর পুষ্টিকর করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পশুচিকিৎসার সুব্যবস্থাতেও নবাবিষ্কৃত বহু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক

পদার্থের, বিশেষতঃ অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের বহুল প্রয়োগ দেখা দিয়েছে।

আমরা দেখেছি, মানুষের সকল প্রকার খাদ্য আসে উদ্ভিদ বা প্রাণী-রাজ্য থেকে। এসব খাদ্যকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) কার্বোহাইড্রেট: চাল, গম, আলু ইত্যাদি শ্বেতসারবহুল খাদ্য। এদের মধ্যে অল্প পরিমাণ অন্য দুই শ্রেণীর পদার্থও বর্তমান থাকে। শর্করা হচ্ছে একটি পুরাপুরি কার্বোহাইড্রেটের দৃষ্টান্ত।

(2) আমিষ: মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিনবহুল খাদ্য। মাংস, মাছ ও ডিমে অল্প বিস্তর স্নেহ পদার্থ, ডালে অনেক শ্বেতসার এবং বাদামে বিস্তর স্নেহ পদার্থ বর্তমান থাকে।

(3) স্নেহ: তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। দুধে তিন জাতীয় পদার্থই প্রায় সমান ভাগে বর্তমান। এই কারণে দুধকে আদর্শ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। যাবতীয় খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ ও বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন থাকে। দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি এবং ফসলের পরিমাণ যে অভূতপূর্বভাবে বাড়ানো যায়, উপরে তারই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে খাদ্যসমস্যার সমাধানের যে কোন সম্ভাবনা নেই, একথাও গোড়ায় বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ এবং তার উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে সীমাবদ্ধ; অথচ এর তুলনায় পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সীমানা নির্দেশ করা চলে না। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুতের গবেষণা সুরু করেছেন। এছাড়া খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্তবিধ উপায় উদ্ভাবনেরও পরীক্ষা চলছে।

মানুষের প্রয়োজনীয় তিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। কারণ, আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয় প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্যে। তাই মানুষের দৈনিক ভোজনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে ভাত কিম্বা রুটি। এই দুটি শ্বেতসারবহুল খাদ্য। রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট তৈরির প্রচেষ্টা হয়েছে দুই প্রকারে। এক হলো উদ্ভিদদেহে স্বাভাবিক উপায়ে শ্বেতসার সৃষ্টির পন্থার অনুকরণ করে। জানা আছে যে, উদ্ভিদদেহে অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে জলের অণুর সংযোগ ঘটে সূর্যালোকে গাছের পাতার সবুজ রংয়ের (ক্লোরোফিল) সংস্পর্শে। এই কারণে এই প্রক্রিয়ার নাম হয়েছে আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)। গাছের সবুজ পাতায় পাতায় যখন সূর্যরশ্মি পড়ে, তা থেকেই আসে এই সংযোজনক্রিয়ার শক্তি। পাতার সবুজ রং বা ক্লোরোফিল দেয় এর প্রেরণা—তাই একে অনুঘটক (Catalyst) বলা হয়। এই অবস্থায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জল মিলে সৃষ্টি করে ফরম্যালডিহাইড নামক পদার্থ। পরে ফরম্যালডিহাইডের অণুগুলি বহুগুণিত হয়ে সৃষ্টি করে শর্করা ও শ্বেতসারের অণু। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রাণীর মত উদ্ভিদদেহেও দিনরাত অহরহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গাছের সবুজ পাতার তলদেশে উদ্ভিদকোষের ফাঁকে ফাঁকে খুব সরু সরু বহু গর্ত বা ছিদ্র থাকে। এরাই হলো উদ্ভিদদেহে বায়ু চলাচলের পথ। বায়ুর সঙ্গে এই পথে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রবেশ করে। মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে জল এবং বিবিধ লবণ-জাতীয় পদার্থ এসে পাতায় হাজির হয়। এখানে উদ্ভিদকোষের সবুজ রং বা ক্লোরোফিলের সংস্পর্শে সূর্যকিরণের সাহায্যে ঘটে বায়ুর অঙ্গারাম্ল ও

মাটি থেকে সংগৃহীত জলের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোজন। এর ফলে প্রথমে সৃষ্টি হয় ফরম্যালডিহাইড এবং অম্লজান বা অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে যায়: $CO_2+H_2O-CH_2O+O_2$
ফরম্যালডিহাইড

পরে ফরম্যালডিহাইড থেকে শর্করা এবং শর্করা থেকে অবশেষে শ্বেতসার (Starch) ও সেলুলোজের (Cellulose) সৃষ্টি হয়:

$$6CH_2O \rightarrow C_6(H_2O)_6$$
দ্রাক্ষা-শর্করা (গ্লুকোজ)

$$2C_6(H_2O)_6 \rightarrow C_{12}(H_2O)_{11}+H_2O$$
ইক্ষু-শর্করা

$$nC_6(H_2O)_6 \rightarrow (C_6H_{10}O_5)n+nH_2O$$
শ্বেতসার ও সেলুলোজ

গাছের বীজের আঁশ (যেমন তুলা) এবং কাঠ সেলুলোজেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুকরণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ফরম্যালডিহাইড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সরাসরি অঙ্গার বা অঙ্গারাম্ল এবং জল থেকে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুত করা যায়। এভাবে বহুল পরিমাণ কৃত্রিম শর্করা ও শ্বেতসার প্রস্তুতের সম্ভাবনা আছে। কারণ, এক্ষেত্রে তাপ ও চাপের তারতম্যে এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সংযোজন প্রক্রিয়ার গতিবেগ বাড়াবার সম্ভাবনা আছে। ফরম্যালডিহাইড এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে শর্করার উৎপত্তির প্রথম নিদর্শন পান 1861 খৃঃ অব্দে রসায়নবিদ্ বাটলেরভ। 1890 খৃঃ অব্দে এই পন্থা অবলম্বন করে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফিশার ফরম্যালডিহাইড থেকে দ্রাক্ষা-শর্করার পুরাপুরি সংশ্লেষণ করেন।

অঙ্গার এবং জল থেকে শুরু করে বর্তমানে বহুল পরিমাণে ফরম্যালডিহাইডের সৃষ্টি হচ্ছে রাসায়নিক সংশ্লেষণে। ফিশারের পদ্ধতি মতে ফরম্যালডিহাইড থেকে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা তৈরিও এখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-একটি শ্বেতসারের অণুতে বিশটি করে গ্লুকোজের অণু সরাসরি শিকলের মত পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকে। অম্লজলে সিদ্ধ করলে শ্বেতসারের অণু আবার গ্লুকোজের অণুতে ভেঙে যায়। এর বিপরীত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে পারলেই গ্লুকোজ থেকে শ্বেতসার প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার হবে। এভাবে বহুগুণিত হবার প্রণালীর দৃষ্টান্ত রসায়নের ইতিহাসে এখন অভাব নেই। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম এবং বিচিত্র রকমের প্লাষ্টিক সামগ্রী এখন এভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে। যদিও অদ্যাবধি শর্করা থেকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বেতসারের উৎপত্তি হয় নি, তথাপি ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণ শ্বেতসার প্রস্তুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আসল সমস্যা হচ্ছে শ্বেতসারের সংশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার নয়, সমস্যা তার প্রস্তুতি পদ্ধতিকে ব্যয়সাধ্য করে পরিচালিত করা—অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ। ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুতের উপকরণ অঙ্গার এবং জল, উভয়ের কোন অভাব নেই। তাপশক্তি এবং মজুরিতেই খরচ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অদূর ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মি এবং পরমাণুকেন্দ্র থেকে অল্প মূল্যে অপর্যাপ্ত তাপশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যাবে। তখন কৃত্রিম শর্করা এবং শ্বেতসার প্রস্তুতির পথে সকল বাধা ঘুচে যাবে। সম্প্রতি মাটির তলায় খনির অভ্যন্তরের কয়লা থেকে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে মজুরি দিয়ে খনি থেকে কয়লা তোলবার আবশ্যক হয় না। কার্বন মনোক্সাইড ও জলের হাইড্রোজেন থেকে ফরম্যালডিহাইড সংশ্লেষণ হবে তাতে সস্তা:

$CO + H_2 \rightarrow CH_2O$ ।
ফরম্যালডিহাইড

এভাবেও উপরে বর্ণিত আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অনুকরণে সস্তায় ও সহজে ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রোটিন বা আমিষ খাদ্য মানুষের দেহের আর একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপকরণ। প্রোটিন মাত্রেই হচ্ছে একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ। নানাবিধ অ্যামিনো অ্যাসিডের বহু অণু পরস্পর শিকলের মত জুড়ে এক-একটি প্রোটিনের অণুর সৃষ্টি করে। অনেকগুলি সাপের মাথা এবং লেজে পরস্পর জুড়ে দিলে যে ছবি হয়, প্রোটিনের অণুগুলিরও আকার হয় তারই অনুরূপ। রসায়নবিদেরা সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় এপর্যন্ত কোন প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। সেলুলোজ যেমন উদ্ভিদদেহের প্রধান ভিত্তি, প্রোটিন হচ্ছে তেমনি প্রাণীর দেহকোষের প্রধান উপকরণ। সেলুলোজের মত প্রোটিনমাত্রেই অতিকায় অণু গঠিত পদার্থ। হাজার হাজার বিভিন্ন প্রোটিন মিলে প্রাণীর দেহকোষ গঠন করে। রসায়নের ক্ষেত্রে প্রোটিনের সংশ্লেষণ একটি খুব দুরূহ সমস্যা। কাজেই সহসা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিবর্তে যে কোন কৃত্রিম প্রোটিন প্রচলিত হবে, তার সম্ভাবনা নেই। তবে কখনো যে হবে না, একথাও বলা যায় না। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানী উডওয়ার্ড কিছুকাল আগে রেশম ও মাথার চুলে যে প্রোটিন আছে, তার সংশ্লেষণ করে এই বিষয়ে আশার বাণী দিয়েছেন।

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ও সহজে প্রোটিনখাদ্যের অভাব দূরীকরণের অন্তবিধ উপায় রয়েছে। এতে জীবাণুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এক সময়ে মানুষ বনের পশুকে পোষ মানিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে। এখন তার চেষ্টা হচ্ছে জীবাণুকে পোষ মানাবার। এতে তার জীবনযাত্রার উপযোগী বহু সামগ্রী প্রস্তুতের সুবিধা আশাতীতভাবে বেড়ে গেছে। এসব পোষ মানানো জীবাণুকে দিয়ে মানুষ বহুকাল যাবৎ বানিয়ে আসছে তার খাবার জন্যে দই, পনির ও সুরা। ঈষ্ট (Yeast) হচ্ছে এই প্রকারের এক জীবাণু। সুরা প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়। ঈষ্ট হচ্ছে প্রোটিনবহুল জীবাণু। এদের প্রজনন-শক্তি অসাধারণ। পরিত্যক্ত বা উপজাত পদার্থের পরিবেশে এরা প্রবল হারে বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব পদার্থ থেকেই আসে এদের খাদ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও অন্য দেশে খাদ্য হিসাবে এর প্রচলন হয়েছিল।

প্রোটিন খাদ্যের আর একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার হচ্ছে প্ল্যাঙ্কটন। এটিও এক প্রকার জীবাণু। সমুদ্রের জলে এসব জীবাণু ভেসে বেড়ায়। সকল প্রকার সামুদ্রিক মাছের—এমন কি, তিমির মত মহাকায় সামুদ্রিক জন্তুগুলিরও প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে একটি বিশেষ খাদ্য। প্ল্যাঙ্কটন থেকেও বহু উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে থাইল্যাণ্ডে বছরে 5000 টন করে প্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহ হয়। জাপানে এবং ইস্রায়েলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্যে প্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহের পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

প্রোটিনবহুল খাদ্যোৎপাদনের একটি মূল্যবান ও সার্থক উপায় হলো শ্যাওলাজাতীয় (Algae) এক প্রকার জীবাণুর চাষ; এর নাম হলো ক্লোরেলা (Chlorella)। এই জাতীয় জীবাণুর প্রবলভাবে বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা আছে। 24 ঘণ্টার মধ্যে এদের সংখ্যা সাত গুণ বেড়ে যায়। এর চাষের জন্যে প্রয়োজন শুধু জল, অঙ্গারাম্ল ও অ্যামোনিয়াঘটিত লবণজাতীয় পদার্থ। পাড়াগাঁয়ের অনেক পুকুরের জলে সবুজ রঙের যে শ্যাওলা পড়ে, সেগুলি সব ক্লোরেলা। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ও কম খরচে অনেক দেশে ক্লোরেলার চাষের ব্যবস্থা চলছে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। পরিবেশের তারতম্যে প্রোটিন এবং

স্নেহ উভয় জাতীয় পদার্থে ক্লোরেলার চাষে যে ফসল হয়, তাতে শতকরা প্রায় 85 ভাগ স্নেহ পদার্থ থাকে। অতএব ক্লোরেলার চাষ থেকে অবস্থাবিশেষে মানুষের খাদ্যের দুটি প্রধান উপাদান প্রোটিন এবং স্নেহ অনায়াসে ও অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ক্লোরেলা জীবাণুর চাষের জন্যে বেশী জায়গা-জমির দরকার করে না, শুধু খানিকটা জলাজমিতেই কাজ চলে। ক্লোরেলা থেকে নানারকম উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায়।

প্রোটিন খাদ্যের অভাব মেটাবার আর একটি উপায় হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের এই অণু পরস্পর জুড়ে সৃষ্টি করে প্রোটিনের অণু। কিন্তু মানবদেহের পাকস্থলীতে এসব প্রোটিন ভেঙে তাথেকে পুনরায় অ্যামিনো অ্যাসিড বেরিয়ে আসে। এসব অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আবার আমাদের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় দেহের পুষ্টির উপযোগী অন্যবিধ প্রোটিন। সুতরাং প্রোটিনের বদলে অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনের অতিকায় অণুর তুলনায় অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু অনেক ছোট, সহজে এদের সংশ্লেষণ হয়। দাম এবং পুষ্টির দিক থেকে প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। প্রোটিনবহুল মাছ, মাংস, ডিম বা ডালের বদলে অল্প পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করলেই দেহের প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু চর্বণের আস্বাদ হয়তো মিলবে না। খাদ্য হিসাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার প্রচলিত হলে মানব-সভ্যতার একটি দুরন্ত কলঙ্ক কসাইখানা বিলোপ হয়ে যাবে। বর্বরের মত সভ্য মানুষকে আর মরা জীবজন্তু খেয়ে বাঁচতে হবে না।

মানুষের বাকী প্রধান খাদ্য হচ্ছে স্নেহজাতীয় পদার্থ। ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। এরা সব গ্লিসারিন ও স্নেহাম্লের সংযোগ-ঘটিত সরল সহজ রাসায়নিক পদার্থ। বাজারে মাখনের বদলে যে অলিওমার্গেরিন বিক্রী হয়, তা হচ্ছে একটি আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। গ্লিসারিনের সংশ্লেষণ এখন রসায়নবিদ্‌দের অজানা নয়। প্যারাফিন ও অক্সিজেনের সংযোগে স্নেহাম্ল সৃষ্টির পরীক্ষাতেও ভাল ফল পাওয়া গেছে। এতে ভবিষ্যতে স্নেহ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেড়ে উঠেছে। বাজারে যে ভেজিটেবল ঘি বা বনস্পতি বিক্রি হয়, সেগুলি অনেকটা অলিওমার্গেরিনের মত আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী নানাবিধ তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে এদের সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে নিকেল ধাতুর ব্যবহার হয়।

শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন এবং স্নেহ পদার্থের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যেদিন সহজ, সুলভ ও পাকা-পাকি হবে, উদ্ভিদের দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির উপায় মিলবে সেদিন। চাষের জমি তখন বেশীর ভাগ পরিণত হবে বাসের ভূমিতে। সেদিন আসবে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় এবং সার্থক বিপ্লবের বাণী বহন করে। মানুষের সমাজে জীবন-সংগ্রামের উগ্রতা শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কৃত্রিম খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় কতটা উপযোগী—এরূপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহরূপে তিন জাতীয় বনিয়াদী খাদ্য ব্যতিরেকেও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাই বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ এবং খাতব পদার্থ। কৃত্রিম খাদ্যে হবে এদের সম্পূর্ণ অভাব। উত্তরে বলা যায়, এসব পদার্থ কৃত্রিম খাদ্যে আবশ্যক মত মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও রূপ, রস, গন্ধ বিবর্জিত কৃত্রিম খাদ্যে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়াদির কোন ব্যতিক্রম ঘটবে কিনা, তার অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের কোন

বৈষম্য ঘটবে কিনা, এসব গুরুতর প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনের এবং অনুভূতির রাজ্যে এতে যে এক বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার আশঙ্কা করা হয়তো অসঙ্গত নয়। মানুষের দেহ একটি যন্ত্র হলেও তার বিশেষত্ব আছে। এই যন্ত্রটি হচ্ছে সজীব; মনের সঙ্গে রয়েছে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। মনের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে বহুলাংশে দেহের স্বাস্থ্য। মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সবল দেহ নিয়েও মানুষ অকর্মণ্য হয়, সমাজে তাদের সংখ্যা যায় তাতে বেড়ে এবং সমাজ হয় ছিন্নভিন্ন। প্রকৃতির রাজ্যে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে মিলে পরস্পরের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য। জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন সুপ্ত আছে, খাদ্যরূপে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তার বিকাশ ঘটে। উদ্ভিদ থেকে পুনরায় খাদ্যরূপে প্রাণী এবং মানুষের দেহে হয় তার পুরাপুরি জাগরণ। পরিশেষে মানুষে এর পরিণতি ঘটে বুদ্ধি এবং চেতনায়। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের শৃঙ্খল থেকে উদ্ভিদকে বাদ দিতে গেলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য যাবে ছিন্ন হয়ে। ফলে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বপথের একটি সোপান যাবে ভেঙে। এতে মানুষের কল্যাণের পথ পরিণামে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

"বাঙলার এমন দীনহীন কাঙ্গাল, হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্ত নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও!

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনে এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কলকাতায় ভূগর্ভ রেল : একটি সমীক্ষা

সাধনচন্দ্র বসু*

কলকাতায় যাত্রী-পরিবহনের সমস্যা দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে চাই উন্নতমানের পরিবহন-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক যাত্রী বহনের উপযোগী করে তুলতে হবে। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের সাহায্যে যদি এই সমস্যার সুরাহা করা যায়, তবে কলকাতার মত জনবহুল শহরের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ও উন্নয়নমূলক কাজে তাই হবে একমাত্র যুগান্তকারী ঘটনা। শহরতলীর ক্রমবর্ধমান যাত্রীদের মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেওয়াই প্রস্তাবিত ভূগর্ভ-রেলপথের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বহু দেশই যানবাহনক্লিষ্ট শহরের দ্রুত যাত্রীবহনের সমস্যার সমাধান ভূগর্ভযান করেছে।

পরিবহন-সমস্যার সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতার শহরের উন্নয়নকর্ম একটি অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক প্রাবল্যে, যানবাহনের ক্লিষ্টতা, ফুটপাতের বাসিন্দা ও পথচারী অসংখ্য মানুষের চাপে কলকাতার পথেঘাটে যেন সবসময়ই অন্তহীন অবরোধ সৃষ্টি হয়ে চলছে। তার উপর আছে বর্ষা। অল্প বর্ষণেই অধিকাংশ জরুরী পথঘাট এবং মুখ্য শিল্পাঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জল নিষ্কাশনেরও তেমন সুবিধা নেই, অধিকাংশ আবার অকেজো। ফলে জীবনযাত্রা হয় ব্যাহত। শহরের উন্নয়নমূলক কাজে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবেই যে নাগরিক জীবনযাত্রার এই দুর্বিপাক, তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এত বড় প্রাণচঞ্চল মেট্রোপলিটান শহরের দুই বৃহত্তম প্রান্তের মধ্যে পারাপারের একমাত্র সেতু হাওড়া ব্রীজ। দিনে 5,10,000 লোকের নিত্য যাতায়াত এর উপর নির্ভর করে। তাছাড়া আছে রকমারি গাড়ী-ঘোড়ার জোয়ার। ফলতঃ প্রাণচঞ্চল মানুষের কর্মের সূত্রে পড়ে ভাটা। সুষ্ঠু পরিবহন-ব্যবস্থা ও যাতায়াতের উপযোগী বিকল্প সাবওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক চাপ ও যানবাহনের ভিড় কমানো সম্ভব নয়। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত যাত্রীবহনের পরিকল্পনাকে যদি সুষ্ঠু রূপ দেওয়া যায়, তবে শহর কলকাতার সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থারও জটিলতা কিছু কমবে। শহরে যাত্রীর ভিড় কমবে, বৃহত্তর কলকাতার সমৃদ্ধি ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থার অধীন যে কয়টি ট্রাম ও বাস আছে, বৃহত্তর শহরের অগণিত মানুষের পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরের মত ভূগর্ভস্থ রেলপথ ছাড়া এ-যুগের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর কলকাতার যাত্রীর ভীড় কমানো এবং যান-বাহনের চাহিদা পূরণ করা যে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হবেন। তার ফলে দ্রুত যাত্রীবহনের কাজ যেমন ত্বরান্বিত হবে, অন্যদিকে তেমনই প্রায় শতকরা পঞ্চাশ-ভাগ বাঙালী বেকার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ভূগর্ভ রেলের জন্যে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দুটি রেলপথের প্রয়োজন হবে। উত্তর-দক্ষিণে

*কুলজিয়ান কর্পোরেশন (ইঃ) লি.
কলিকাতা—16

দমদম থেকে বেহালা পর্যন্ত 13 মাইল ভূগর্ভ রেলপথ পাইকপাড়া, শ্যামবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, এস-প্ল্যানেড, ময়দান, আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, রসা রোড, বীরেন শাসমল রোড, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ও বেহালা পর্যন্ত যাবে। পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে তিন মাইল ভূগর্ভ রেলপথ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট বরাবর ব্র্যাবোর্ণ রোডের মোড় পর্যন্ত অথবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, গণেশ অ্যাভেনিউ, ডালহৌসি স্কোয়ার, ব্র্যাবোর্ণ রোড, তারপর হুগলী নদীর তলা দিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাবে। এই দুটি ভূগর্ভ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সাড়ে 16 মাইল। যাত্রীসাধারণের চাপ, অন্যান্য যান-বাহনের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে স্টেশনগুলির স্থান নির্বাচন করা হবে। এই রেলপথে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন চলবে 120 থেকে 150 সেকেণ্ডে একখানি করে; অর্থাৎ ঘণ্টায় আপ-ডাউনে প্রায় 400,000 জন যাত্রী চলাচল করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথের উপযুক্ত কিনা? এই বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, কলকাতার মাটি এই পরিকল্পনার পক্ষে অনুপযুক্ত। আবার যদিও প্রয়োজনের পক্ষে ও নগরকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনার কথা তাঁরা স্বীকার করেন, তথাপি তার বিপর্যয়ের কথাও তাঁদের বলতে শোনা যায়। কিন্তু এই সব ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে মাত্র দু-তিন ফুট মাটি খুঁড়লেই জল বেরিয়ে পড়ে, তবু সেখানে ভূগর্ভ রেল চলছে। কলকাতার মাটি সে তুলনায় অযোগ্য হবে কেন? তাই যদি হবে, তবে কলকাতা বহুতলা বাড়ীগুলির ভার সহ্য করছে কেমন করে? কাজেই ভূগর্ভ রেল কলকাতা শহরে না হবার কোন যুক্তি নেই। তবে কলকাতার মাটিতে ভূগর্ভ রেলকে বেশী নীচে নামানো যাবে না, মাত্র কুড়ি ফুট গভীরে রাখতে হবে। প্রশস্ত রাস্তাগুলির মাটির নীচ দিয়ে রেলপথ তৈরি করা যাবে, তাতে রাস্তার পাশের বাড়ীগুলির কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হয়তো কিছুটা হবে ভূগর্ভস্থ ড্রেনের। তবে ড্রেন ভূগর্ভস্থ রেলের সুড়ঙ্গের দু-পাশে সরিয়ে আনা যায়। কলকাতার ড্রেনের যা অবস্থা, তাতে নতুন ড্রেনও করা দরকার। তাতে লাভ বই লোকসান নেই। 'কাট অ্যাণ্ড ফিল' প্রথায় মাটি কেটে নীচ থেকে সিমেন্টের কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে রেলপথের জন্যে সাবওয়ে তৈরি করতে খরচও তেমন বেশী পড়বে না। এর জন্যে স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় উন্নত কারিগরী সুবিধা পাওয়া খুবই সম্ভব। সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্যে ব্যয় সাধারণতঃ বেশী পড়ে এবং প্রস্তাবিত সাত মাইল ভূগর্ভ রেলপথের জন্যে মাত্র অল্প এলাকাতেই তা তৈরির দরকার হবে।

চার বছরের মধ্যেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। আপাততঃ শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসি, ডালহৌসি থেকে কালীঘাট পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন সম্ভব। এতে মোট ব্যয় হবে 60 কোটি টাকার মত। কলকাতার যাত্রী-পরিবহনের নিদারুণ সমস্যায় এই খাতে ব্যয়ের হিসাব যুক্তিসাপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ নগরবাসী এতে উপকৃত হবেন। তাছাড়া খরচের টাকা কালক্রমে টিকিট বিক্রীর টাকা থেকে নিশ্চয়ই উঠে আসবে। বৃহত্তর শহরের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সার্থক রূপায়ণ এই পথেই সম্ভব।

ভারতের কৃষি-সমস্যা

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়*

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 80% প্রত্যক্ষভাবে কৃষিজীবী, পরোক্ষভাবে আরও 10%-এর জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর। এই 80 শতাংশই সমগ্র ভারতের খাদ্যোৎপাদন করে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনমত খাদ্যোৎপাদন হয় না। ঘাটতি পূরণের জন্যে বর্মা, থাইল্যাণ্ড এবং বর্তমানে আমেরিকা থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করবার প্রয়োজন হচ্ছে। খাদ্য সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষিতা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে হানিজনক তো বটেই, নীতিগতভাবেও বর্জনীয়।

কৃষি কেবলমাত্র খাদ্যই উৎপাদন করে না, শিল্প-বাণিজ্যের মূল বস্তুও উৎপাদন করে। খাদ্যোৎপাদনকে এগিয়ে নিতে যদি অধিকতর জমি খাদ্যশস্যের জন্যে ব্যবহার করি, তাহলে শিল্প-বাণিজ্যও সেই অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের সার্বত্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি-সমস্যা সমগ্র দেশেরই সমস্যা।

শস্যোৎপাদন নির্ভর করে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উপাদানের উপর। এদের মধ্যে জমির পরিমাণ ও গুণাগুণ, জলসেচ, বীজ, সার, কীটনাশক-দ্রব্য, কর্ষণের যন্ত্রাদি এবং সর্বশেষ মানুষ কৃষক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সুযোগ ভারতবর্ষে কেন, অন্যত্রও ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানীরা শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে ক্রমশঃ মাটি ছেড়ে জল এবং সমুদ্রতলের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের দেশে অনাবাদী সমস্ত জমি কৃষিযোগ্য করলেও বর্তমান উৎপাদনের হার যদি না বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে কোনমতেই খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারবো না। অতএব প্রতি একরের উৎপাদনের হার বাড়ানোই একমাত্র পথ।

উন্নত জাতের বীজ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় সার ও জলের সাহায্যে উৎপাদন 2/3 গুণ বৃদ্ধি করা খুবই সহজ। কিন্তু সমস্যা হলো, উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করা এবং সার ও কীটঘ্ন ঔষধাদির ব্যবস্থা করা। এই সঙ্গে চাই যথেষ্ট পরিমাণ সেচের জল।

রবিশস্যে একমাত্র গম ব্যতীত অন্য সব শস্যের বেলায় অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতে চাষের কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের অভাব। গমের বেলায় লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত আয়তন অধিকতর। এর মূলে রয়েছে উন্নত জাতের বীজের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রধানতঃ পাঞ্জাব এই অভূত-পূর্ব সাফল্যের কৃতিত্ব পেতে পারে।

চতুর্থ প্রকল্পে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কারণ, দেখা গেছে যে, যদি খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে হয়, তাহলে উন্নত জাতের বীজ, আনুষঙ্গিক সার, জল ইত্যাদির ব্যবহার অনিবার্য।

সেচের জল যথেষ্ট পাওয়া গেলে একাধিক ফসলের পদ্ধতিও প্রসারিত করা সম্ভব হবে। বস্তুতঃ 1973-'74 সালে এই প্রকল্প অনুসারে মোট 400 লক্ষ একর জমি চাষ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে (1968-'69) মাত্র 150 লক্ষ একর জমি এই পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে।

সার, যন্ত্রাদি (ট্র্যাক্টর, পাম্প ইত্যাদি), কীটঘ্ন

*কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

ঔষধাদি কৃষি-উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। গত 8/9 বছরে এদের ব্যবহার প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত উপাদান বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র 11·3%। জন-প্রতি দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ কিন্তু কমেছে।

জল

কৃষি-উন্নয়নে যে বস্তুটির সর্বপ্রথম প্রয়োজন—সেটি হলো জল। এত সহজলভ্য অথচ এত মূল্যবান আর কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

জলসেচের সুযোগ পর্যাপ্ত থাকলে শস্যোৎ-পাদন কত পরিমাণ বাড়ানো যায়, তা পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। পাঞ্জাবে জলসেচের পরিমাণ 59% (নেট জলসেচভুক্ত জমি/নেট চাষভুক্ত জমি × 100), যেখানে সর্বভারতীয় পরিমাণ মাত্র 20%। এজন্যে সেখানে একাধিকবার চাষের পরিমাণ সর্বভারতীয় পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশী, অর্থাৎ 33%। কেবল জলসেচের ব্যবস্থার দ্বারাই লুধিয়ানাতে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃষির উপযোগী জলের যে পরিমাণ মজুদ আছে (জলের উপরি ভাগে 13,600 লক্ষ একর ফুট এবং জমির নীচে 1650 লক্ষ একর ফুট), তাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করলে আগামী 20 বছরে শস্যোৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে 4% বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অধিক মাত্রায় জল ব্যবহারের সঙ্গে যে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে, সেগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তার মধ্যে জল-নিষ্কাশন ও লবণাক্ত জলের আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণকল্পে এবং ব্যবহারের ফল সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জলসেচের সঙ্গে সঙ্গে চাষের পদ্ধতির উন্নয়ন, উন্নত জাতের বীজ, সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যাদির ব্যবহারের দ্বারা নির্দিষ্ট কতকগুলি জায়গায় কৃষি-সম্পদ এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, জন-সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে।

জল সম্পর্কে আরও একটু সতর্কতার কথা উল্লেখ করা উচিত। কৃষি-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অনিবার্য। তার জন্যেও জলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। অতএব যে জলসম্পদ রয়েছে, তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যেমন দরকার হবে, তেমনি জলের নতুন উৎসের কথাও চিন্তা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রজলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টা অন্যান্য দেশে চলছে।

রাসায়নিক সার

প্রতি একরে উৎপাদন বাড়াতে হলে সার ব্যবহার অনিবার্য। বিশেষ করে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করতে গেলে এবং একাধিক ফসল প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সার, জল ও কীটঘ্ন ঔষধাদি ক্রমশঃ বর্ধিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ সার আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। বর্তমান চাহিদা মেটাতেই আমদানীর প্রয়োজন হয়। এই সমস্যার সমাধান হলো অধিক সংখ্যক সার-উৎপাদন কারখানা তৈরি করা। কিন্তু যেটুকু সার প্রস্তুত হচ্ছে এবং বর্তমানে যা আমদানী হচ্ছে, তার সমস্তই যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। সারের দুটি ব্যবহারিক দিক রয়েছে—পরিমাণ ও উৎকর্ষ। পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রায়শঃ মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ-খাদ্য কি পরিমাণ রয়েছে, তার হিসাব না করেই সর্বত্র একই ভাবে সার প্রয়োগ করা হয়। এতে দেখা গেছে যে, প্রয়ো-জনাতিরিক্ত সার ব্যবহার করে মূল্যবান সারের অপচয় ঘটেছে। অতএব মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে

প্রথমেই জানা দরকার, কি পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্য তাতে মজুদ আছে এবং তার মধ্যে কতখানি গ্রহণ-যোগ্য অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করলে অপচয় এড়ানো যায়। দুঃখের বিষয় সার প্রয়োগের ব্যাপারে এখনও মৃত্তিকা বিশ্লেষণের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

সারের উৎকর্ষ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কোন্ রাসায়নিক পদার্থ সার হিসাবে অধিকতর কার্যকরী হবে, তা বিশেষভাবে নির্ভর করে শস্যের প্রকৃতির উপর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর। উদ্ভিদ নাইট্রেট হিসাবেই নাইট্রোজেনকে সহজতর উপায়ে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নাইট্রেট সহজদ্রাব্য বলে মাটি থেকে দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে যায়। তুলনায় অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসাবে ব্যবহার করলে মৃত্তিকায় সাময়িকভাবে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে রূপান্তরিত না হলে কার্যকরী হয় না। অন্য দিকে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস সহযোগে অধিকতর কার্যকরী। এজন্যে অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট এবং নাইট্রো-ফস্‌ফেটের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিন্ধ্রী সার কারখানার বিজ্ঞানীরা গত পাঁচ বছরে কয়েক হাজার পরীক্ষার দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নাইট্রো-ফস্‌ফেটই অধিকতর ফলদায়ী, অথচ অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ। এরূপ পরীক্ষালব্ধ নতুন নতুন তথ্যের সাহায্যে সার প্রয়োগের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়।

গত ষোল বছরে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাশের ব্যবহার বেড়েছে যথাক্রমে 11 গুণ, 70 গুণ এবং 50 গুণ। কিন্তু আমরা বরাবর প্রায়অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং এক-তৃতীয়াংশ ফস্‌ফরাস আমদানী করে আসছি। নিজস্ব কোন ভাল উৎস না থাকবার জন্যে সমস্ত পটাশই আমদানী করতে হচ্ছে। অতএব বহুমূল্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে সার পাই, তার ব্যবহার সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। অভ্রজাতীয় খনিজ পদার্থ থেকে (বিশেষভাবে অপচিত অংশ থেকে) সহজলভ্য উপায়ে পটাশ আহরণ করতে পারলে পটাশের সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, অভ্র থেকে প্রত্যক্ষভাবেই উদ্ভিদাদি পটাশ গ্রহণ করতে পারে। এদিকে মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

উন্নত জাতের বীজ

বিজ্ঞানের নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিক ফলনশীল, আলোকসংবেদনহীন, অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী অভূপাতী ও খর্বকার শস্য-উদ্ভিদের উদ্ভব অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে। বহু গবেষণাগারে নতুন জাতের শস্যবীজ উৎপন্ন করবার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ইণ্ডিকা শ্রেণীর ধান্যের মধ্যে তাইওয়ানে প্রথম এক চীনা বিজ্ঞানী খর্বকায়, স্বল্পমেয়াদী, অভূপাতী এবং আলোকসংবেদনহীন একটি মিউট্যান্ট (Mutant) আবিষ্কার করেন। এটির নাম দেওয়া হয় ডি-জি-বুগেন। এথেকেই 1956 সালে জন্ম হয় টি-এন-1-এর। টি-এন-1-এর সঙ্গে 'পেতা'র মিলনে উৎপন্ন আই-আর-8-কে বলা হয় অত্যাশ্চর্য ধান্যবীজ। আই-আর-8 খর্বকায় এবং অভূপাতী হবার ফলে আলোর সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় দ্রব্য সংশ্লেষণ করতে যেমন সক্ষম, তেমনি অধিকমাত্রায় সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি করতেও অদ্বিতীয়।

স্থানীয় দীর্ঘকায় ধান্যের সঙ্গে আই-আর-8-এর মিলনে কটকে ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটি নতুন জাতের বীজ সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মধ্যে জয়া, পদ্মা, হংসা ও অন্নপূর্ণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জয়া আই-

আর-8-এর তুলনায় 5-10% অধিকতর ফলন দেয় এবং হ্রস্বতর। বর্তমান বছরে 'করুণা' নামে একটি নতুন জাতের ধান্যবীজ মুক্ত করা হবে।

নতুন জাতের বীজের একটি প্রধান সমস্যা হলো, এরা মোটা দানার ধান দেয় এবং খেতে সুস্বাদু নয়। মিহি দানার অথচ অধিক ফলনশীল বীজের চাহিদা মেটাবার জন্তে 'বসুমতী'র সঙ্গে মিলনে জাত বি-সি-5 এবং বি-সি-6 নামক দুটি বীজ মুক্ত করা হবে। এই দুটিই দিল্লীর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফল। অনুরূপ মিহি দানার ধান্যবীজ আই-আর-20 এবং আই-আর-22 আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবদান। ক্রমশঃ এই প্রকার সঙ্কর জাতীয় বীজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বভারতীয় প্রকল্প হিসাবে অধিকতর উপযুক্ত ও খর্বতর সঙ্কর বীজের অনুসন্ধান ও অনুশীলন চলছে।

নতুন জাতের খর্বকায় ধান্যের একটি প্রধান অসুবিধা হলো, রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। সমস্যা যতই কঠিন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরাও সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে ততোধিক উৎসাহের সঙ্গে গবেষণায় ব্রতী হচ্ছেন নতুন নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্তে।

কীট, ছত্রাক, ইঁদুর, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে প্রায় 10-30% খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সময়োপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা খুবই সহজ। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ধান্যে 9·4%, গমে 2·4%, জোয়ারে 12·1%, তুলায় 40·3%, ইক্ষুতে 8·8% এবং আলুতে 10·8% শস্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাধারণতঃ রোগের আক্রমণের পরেই প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। যদি সময়মত ব্যবহার করা যায়, তাহলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সময়মত ঔষধাদি পেতে এবং সেগুলিকে ভালভাবে শস্যে ছড়িয়ে দেবার বাস্তব এবং অনিশ্চিত অসুবিধা আছে। অতএব অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা চলছে; যথা—বপনের পূর্বে বীজগুলিকে রোগমুক্ত করা অথবা বীজগুলিকে প্রতিষেধক দ্রবণে কিছু সময় ভিজিয়ে রাখা। এই পদ্ধতি অবলম্বনে আশানুরূপ ফললাভ হয়েছে। অধিক মূল্যে আমদানী করা ঔষধের ব্যবহার অনেক দিন চলতে পারে না। সুতরাং স্বল্পমূল্যের ঔষধাদির সন্ধানে আমাদের রসায়নবিদ্‌গণের লিপ্ত হওয়া দরকার।

অনার্দ্র কৃষি-ব্যবস্থা

বারিপাতের উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ পূর্ণ আর্দ্র, অনার্দ্র, মৃদু আর্দ্র ও অনার্দ্র—এই চারভাগে ভূমি বিভাগ করা হয়। রাজস্থান, গুজরাট রাজ্যের মধ্যাংশ, সৌরাষ্ট্র এবং মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কতকাংশ অনার্দ্র ভাগে পড়ে। এখানকার জলের উৎস কেবলমাত্র বৃষ্টি। এই এলাকায় কোন দৃঢ় কৃষি-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী মৃদু আর্দ্র এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা সম্ভব। চতুর্থ প্রকারে মৃদু আর্দ্র এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। জল সংরক্ষণের জন্তে পলিথিন, কাগজ অথবা অ্যালুমিনিয়াম পাতায় ঢেকে দেওয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যে সব বীজ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আলোকসংবেদনহীন, সঙ্কর প্রজনন পদ্ধতিতে সেই ধরণের বীজের উদ্ভব হয়েছে। এই সব অনার্দ্র স্থানে রেড়ি, অড়হর ও জোয়ার সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা হয়েছে। তৈল এবং তুলাবীজও অনার্দ্র এলাকায় চাষ করা হয়। সুতরাং নতুন

জাতের বীজ দিয়ে এদের চাষ এবং ফলন বৃদ্ধি করা ফলদায়ী হবে। সার মাটিতে না দিয়ে পাতায় ছড়িয়ে দিলে একই ফল পাওয়া যায়, অথচ জলের প্রয়োজন হয় কম। সুতরাং অনার্দ্র এলাকায় এই পদ্ধতিতে সার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যে প্রোটিন

খাদ্যশস্যের পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তাই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। আমরা জানি যে, খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিনের অভাব অত্যন্ত ব্যাপক, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের খাদ্যে। প্রোটিনের অভাবে কেবল যে দেহবৃদ্ধি বাধা পায় তাই নয়, দেহের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রোটিন খাদ্য সাধারণতঃ মহার্ঘ বলে অনেকেই যথেষ্ট প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে না। অতএব অল্পব্যয়ে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন পরিবেশন একটি গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে সয়াবিন অনেকখানি সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয়। সয়াবিনে প্রায় 40% প্রোটিন এবং 20% তৈলজাতীয় পদার্থ আছে। সেই তুলনায় গমে মাত্র 13% এবং ধানে 7·5% প্রোটিন রয়েছে।

ভারতের সর্বত্র নানা জাতের সয়াবিন নিয়ে পরীক্ষা চলছে—কোন্ জাতের বীজ কোন্ মাটিতে এবং আবহাওয়ায় সর্বাধিক ফলনশীল। অতএব যদি উপযুক্ত জাতের বীজ ব্যবহার করে ধান ও গম চাষের সঙ্গে সয়াবিনকেও কৃষি-কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়, তাহলে উচ্চ প্রোটিন-যুক্ত খাদ্যের অভাব মেটানো যায়। সয়াবিনের দুধ, ছানা ইত্যাদি মোটামুটি উত্তম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণার দ্বারা সয়াবিনের প্রকৃতিজ এবং অনভ্যস্ত গন্ধ বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে। অতএব সাধারণ খাদ্যবস্তুর মধ্যে সয়াবিনের আসন পেতে কোন বাধা নেই। এজন্যে সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার সয়াবিন চাষের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

অন্যান্য কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয়

আমাদের কৃষি-প্রকল্পে ক্রমশঃ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, একাধিক বার শস্যোৎপাদন, সেচ, কীটঘ্ন ও ঔষধাদির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ এতে বাড়বে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। উপরিউক্ত সমস্ত উন্নতিমূলক প্রকল্পে সময়ানুবর্তিতা একটি প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। ঠিক সময়ে কর্ষণ, বপন, সেচ, সার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগ এবং শস্য আহরণ না করতে পারলে সমগ্র প্রকল্প বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এজন্যে যথেষ্ট লোকবল না থাকাই সম্ভব। অতএব যান্ত্রিক সাহায্যের প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। ভারী যন্ত্র আমাদের কাজের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকেজো। কিন্তু ছোট যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন। কতখানি যান্ত্রিক সাহায্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলি আমাদের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে, তা বলা যায় না। এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের আহরণ, গুদামে রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমানে খুবই অবহেলিত। এর জন্যে ক্ষতির পরিমাণ আতঙ্কসূচক। খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ বর্তমানে একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি।

আমাদের সকল প্রকল্পে যে সব উপাদানগুলির প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম হলো সেই মানুষগুলি, যারা প্রকল্পগুলিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অথচ

এই মানুষদের সম্পর্কে এবং তাদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করবার কথা আমরা ভাবি নি—যে রকম ভাবে তাথা উচিত ছিল প্রকল্প আরম্ভের কয়েক বছর আগেই। এদের শিক্ষা এবং মানুষ হিসাবে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা দান সর্বাগ্রে কর্তব্য।

ক্ষুদ্র কৃষকদের অসুবিধা অনেক। দেখা দরকার এরা যাতে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তাহলেই এদের দুর্দশা দূর হবে। ভাগীদার চাষীর অবস্থা আরও শোচনীয়; অর্থাৎ যারা দেশের সকলের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, তাদের নিজের অন্ন নেই। এই অসম্ভব ও অসহনীয় অবস্থাই দেশে ও সমাজে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করেছে এবং চতুর তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাগণ তাদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন। ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও নানা কারণে তাতে বাধা আসছে। জোর করে বলা দরকার যে, এই বিষয়ে যদি কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা আমরা অবলম্বন না করি, তাহলে নবলব্ধ কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-কৌশল কোন কাজেই লাগবে না। এটিই তাহলে প্রকৃত সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।*

[*নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি'বক্তৃতার সারাংশ]

"বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না, মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতুবন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি; আবার রিস্‌লি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমার শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দর

বিজ্ঞান-চিন্তা-পদ্ধতির সার্বজনীনতা

শ্রীমহাদেব দত্ত

মানুষের সমাজের প্রগতিতে বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন চমকপ্রদ আবিষ্কার মানুষের মনকে সাড়া দেয়, বিস্মিত করে, করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক। সভ্য সমাজে মানুষ নানা দিক থেকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। তাঁর প্রতিদিনের জীবনে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিজ্ঞান নানা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে, করছে ও করবে। এসব আবিষ্কার, সুযোগ-সুবিধার সম্যক ব্যবহার করতে গেলে চাই বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি। এর জন্যে গড়ে উঠেছে লোক-বিজ্ঞান।

লোক-বিজ্ঞানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নানা আবিষ্কারের সঙ্গে জনসাধারণকে সহজভাবে যতদূর সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়া ঐ সব আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে। লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা তথ্যমূলক। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে, এদেশেও প্রসার ভালই হয়েছে।

নানা চমকপ্রদ আবিষ্কার, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্র আবিষ্কার ছাড়াও বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের নানা মূলগত তত্ত্ব। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তত্ত্ব প্রথিত হয়। এসব তত্ত্ব যেমন একদিকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্য করছে, দৃশ্য জগৎকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া নানা তথ্যকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করছে, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়ে শিল্প, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানের অপর শাখা-গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষিত-জনসাধারণের সবাই না হলেও একটা বড় অংশ এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি আগ্রহী। কাজেই এসব তত্ত্বের মূল কথা, এদের বিবরণ সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনায় অনেক চেষ্টা হয়েছে। লোক-বিজ্ঞানের এই উদ্দেশ্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওদেশে ও মোটামুটি এদেশেও লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা অবহেলিত নয়।

নানা চমকপ্রদ ও দরকারী আবিষ্কারের ও নানা মৌলিক তত্ত্ব প্রথনের অতিরিক্ত বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, সেটা বিজ্ঞান-চিন্তা, এর ধরন-ধারণ, এর রীতি-প্রকৃতি। প্রত্যেক আবিষ্কার, প্রত্যেক মূলগত তত্ত্বের প্রথনার মূলে এ রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীই সচেতন নন। ওদেশে মাত্র কয়েকজন মনীষীই এই সম্বন্ধে সচেতনভাবে আলোচনা করেছেন। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানে এই বিষয়ে আলোচনা বিরল। আর এদেশে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা, জানা নেই। অবশ্য দেশনেতাদের বক্তৃতায় শোনা যায় নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে সমাধান করার, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে দেশের, সমাজের কুসংস্কার দূর করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। ব্যক্তিগত সাধারণ কথাবার্তায়ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা প্রায়ই বলা হয়। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি? বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য ও ধরন-ধারণ প্রভৃতি

সম্বন্ধে আলোচনা করে সুস্পষ্ট ধারণা করবার বিশেষ চেষ্টা হয় নি। অবশ্য এই বিষয়ে আলোচনা একটা বিরাট ব্যাপার।

এখানে বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হবে, যাতে অধিক লোকের পক্ষে এই আলোচনা সহজে বোধগম্য হয়। এজন্যে যে সব সহজ সমস্যার সমাধান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়, সে সব থেকে উদাহরণ নিয়ে সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ বোঝাবার চেষ্টা করা যাবে। পরে বিজ্ঞানের বাইরের কয়েকটি সহজ সমস্যার সমাধান কিভাবে একই ধরণে চিন্তা করে করা যায় আলোচনা করে দেখানো হবে, যাতে এই ধরণের চিন্তার সার্বজনীন উপযোগিতা বোঝা যায়। বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান-চিন্তার ধরণ-ধারণের, রীতি-প্রকৃতির সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করে এই প্রবন্ধকে জটিল করা হবে না, যথাসম্ভব সহজবোধ্য রাখা হবে। যদি এই বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তবে পরে এই বিষয়ে নানা প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করবার জন্যে সাধারণ পরিচিত মাধ্যমিক জ্যামিতি (বা গণিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত) থেকে আলোচনা সুরু করা যাক। জ্যামিতিতে কয়েকটি মূল বস্তুর (যাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, ধরে নেওয়া হয় পরিচয় জানা আছে) মূলগত ধর্ম বা নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধের নিয়ম (স্বতঃসিদ্ধ নামে সাধারণতঃ পরিচিত) উল্লেখ করে অপরাপর বস্তুর বা সম্বন্ধের সংজ্ঞা দেবার পর নানা সমস্যার সমাধান করা হয়। জ্যামিতির সমস্যাগুলিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়—সম্পাদ্য ও উপপাদ্য। সম্পাদ্যে কোনও না কোনও চিত্র বা চিত্রাংশ অঙ্কন করা হয়, অর্থাৎ কোন কাজ সম্পাদন করা হয়। উপপাদ্যে জ্যামিতির বস্তুর অংশগুলির বা কতকগুলি বস্তুর সম্বন্ধ বা তাদের ধর্ম যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করতে হয়, যদিও সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তবু আলোচনার মূল ধাপগুলি ও চিন্তনের ধরণ একই রকমের, পার্থক্য কেবল বিভিন্ন অংশের গুরুত্বের তারতম্যে। সম্পাদ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব অঙ্কনে, প্রমাণে মাত্র যাচাই করা হয়, যা করবার লক্ষ্য ছিল তা সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা। উপপাদ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রমাণে, অঙ্কন প্রমাণের সহায়ক মাত্র।

সম্পাদ্য ও উপপাদ্য উভয়েরই চারটি প্রধান ভাগ সাধারণ বইতে দেখা যায়; যথা—সাধারণ নির্বচন, বিশেষ নির্বচন, অঙ্কন ও প্রমাণ। সাধারণ নির্বচনে সমস্যার মূল কথাটি সংক্ষেপে সাধারণভাবে বলা হয়। বিশেষ নির্বচনে সমস্যাটি লেখ-র সাহায্যে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে বোঝা বা বোঝানো হয়। সবাই জানেন, সাধারণ নির্বচনে আবার দুই ভাগ থাকে, যথা—স্বীকার ও সিদ্ধান্তের বিষয়। স্বীকারে যে সব জ্যামিতিক বস্তু বা তাদের অংশগুলি দেওয়া হয় ও তাদের মধ্যে যে সব সম্পর্ক, তা সব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। সিদ্ধান্ত কি, প্রতিপাদ্য বিষয় বা কি সম্পন্ন করতে হবে, সঠিকভাবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ নির্বচনে ও সাধারণ নির্বচনে উক্ত স্বীকার ও সিদ্ধান্ত লেখ ও নামের সাহায্যে পরিস্ফুট করে তোলা হয়। সমস্যা সমাধানে কোন সর্ত দেওয়া থাকলে তাও সাধারণ নির্বচনে সাধারণভাবে ও বিশেষ নির্বচনে সবিস্তারে সুস্পষ্ট করে বলা হয়। সাধারণ নির্বচনের সমস্যা সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি বিশেষ নির্বচনে ভালভাবে বোঝা বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ এই দুটি নির্বচনের সাহায্যে বিবেচনাধীন সমস্যাটি সঠিকভাবে বোঝা হয়। সমস্যা ঠিকভাবে বোঝা

গেলে তবেই সমস্যা সমাধানের কথা ওঠে। সমস্যা কি, ঠিকমত না জানলে কি সমাধান করা হবে? জ্যামিতিতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা হয় অঙ্কন ও প্রমাণের সাহায্যে। বিশেষ নির্বচনের পরে আসে অঙ্কন। এতে সম্পাদ্যের সমস্যার উদ্দিষ্ট সমাধানের জন্যে দরকারমত নানা রেখাংশ, বৃত্তাংশ প্রভৃতি লেখ অঙ্কন করে সিদ্ধান্তে উক্ত কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়, আর উপপাদ্যে সিদ্ধান্ত উক্ত বিষয়টি প্রমাণের সহায়ক দরকারমত লেখ অঙ্কন করা হয়। প্রমাণে যুক্তির দ্বারা সম্পাদ্যে যা করণীয় ছিল, তা সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা যাচাই করে দেখে নেওয়া হয়, আর উপপাদ্যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপন্ন করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপে একাধিক সংশ্লিষ্ট বিষয় সহজেই প্রমাণিত বা প্রায় প্রমাণিত হয়েছে আর সম্পাদ্যে অঙ্কন-পদ্ধতিতে আরও কয়েকটি জ্যামিতিক বিষয় অঙ্কিত, প্রায় অঙ্কিত হয়েছে। অনুসিদ্ধান্ত প্রভৃতির আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ফলাফলগুলি সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হয়ে সম্পাদ্যের অঙ্কন রীতি ও উপপাদ্যের প্রমাণ-পদ্ধতির তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আলোচনা অপর সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক হয়।

যে কোন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতেই, এই চারটি প্রধান ধাপ আছে। আবার বাস্তব জগতের সমস্যাগুলিও দুই ধরণের, কতকগুলিতে কিছু না কিছু কাজ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্যাগুলিকে ক্রিয়ামূলক সমস্যা, অন্যগুলিতে কোন একটি বিষয়ের যাথার্থ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা, এগুলিকে বিচারমূলক সমস্যা বলে। ক্রিয়ামূলক সমস্যা সম্পাদ্যের ও বিচারমূলক সমস্যা উপপাদ্যের মত। অবশ্য বাস্তব জীবনের বেশীর ভাগ সমস্যা বিশেষ জটিল, এগুলি অনেকগুলি সমস্যা থেকে উদ্ভূত। কাজেই এসব সমস্যা অংশতঃ ক্রিয়ামূলক, অংশতঃ বিচারমূলক। আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক সমস্যা সমাধানের চেষ্টার আগে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হয়। এদিকটা জ্যামিতির সাধারণ ও বিশেষ নির্বচনের মত। সমস্যা ঠিকমত ধারণা করতে পারলে তখন সমাধানের কথা ওঠে। আর সম্পাদ্যের মতই ক্রিয়ামূলক সমস্যা দরকারমত কর্মের অনুষ্ঠান করে সম্পাদন করতে হবে আর উদ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দেখে নেওয়া উচিত, প্রকৃতই উদ্দিষ্ট কাজটি করা হয়েছে কিনা। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। আগামী পূজার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যকর, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বা শিল্পপ্রধান শহরে ঘুরে আসতে ইচ্ছুক। ধরা যাক, দশজনের একদল ঐ সময় পুরী যেতে চান। এটিকে একটি ক্রিয়ামূলক সমস্যা হিসাবে দেখলে সাধারণ নির্বচন হবে 'আগামী পূজার সময় পুরী যাওয়া'। এর বিশেষ নির্বচনের আকার হবে, কলিকাতায় দশজনের একদল কলিকাতায় আছেন, আগামী অক্টোবর মাসে 6ই থেকে 10ই পর্যন্ত পূজা হবে, ঐ দশজনের পুরী যাওয়া প্রভৃতির জন্যে আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আছে; সিদ্ধান্ত হবে কলিকাতা থেকে 499 কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পুরী যাওয়া। সম্পাদ্যের অঙ্কন যেমন করা হয়, এখানে টিকিট কেটে সময়মত ষ্টেশন বা বিমান বন্দরে গিয়ে ট্রেন বা বিমানে চেপে বা সময়মত মোটরে (ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে) চেপে রওনা। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির, সমুদ্র প্রভৃতি পুরীর বিশেষ নিদর্শন দেখে কৃতনিশ্চয় হওয়া সম্পাদ্যের প্রমাণের সামিল। দেশের খাদ্য-সমস্যাও একটি ক্রিয়ামূলক সমস্যা। সাধারণ নির্বচন হবে 'দেশের বা দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্যাভাব দূর করা'। বিশেষ নির্বচন হবে, দেশের বা খাদ্য-ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্যাভাবের পরিমাণ, কি ধরণের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। ঐ পরিমাণ ঐ ধরণের খাদ্য কোথা কোথা থেকে কি কি ভাবে সংগ্রহ

করা যেতে পারে, তা সঠিক নিরূপণ করা। সিদ্ধান্ত হবে, যে যে স্থানে ঐ খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা সংগ্রহ করে দেশের ঘাটতি অঞ্চলে এনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বণ্টন করা। পরে সিদ্ধান্ত মত কাজ করা সম্পাদ্যে অঙ্কনের সামিল ও পরে তথ্যাদি নিয়ে খাদ্য ঠিক মত অভাবীদের কাছে পৌঁছুলো কিনা দেখা সম্পাদ্যে প্রমাণের সামিল। অবশ্য খাদ্যসমস্যা বাস্তবে একটি বিশেষ জটিল সমস্যা। খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল ঠিকমত নিরূপণ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয়, খাদ্যের প্রাপ্তিস্থান নির্ণয়, খাদ্য-সংগ্রহ, তা যথাস্থানে আনয়ন ও ঠিকমত বণ্টন—প্রত্যেকটিই এক-একটি বিরাট সমস্যা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে মূল ধাপগুলি একই ধরণের। শহরের পরিবহন সমস্যাও এভাবে আলোচনা করা যায়।

এবার বিচারমূলক সমস্যার একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, এক শহরের যদুবাবু একদিন রাতে খুন হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদুবাবুর প্রতিবেশী রামবাবুকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। রামবাবুর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ শ্যামবাবুর ধারণা, রামবাবু নিরপরাধ ও তিনি তা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। এই সমস্যার সাধারণ নির্বচন হবে 'রামবাবু যদুবাবুর খুনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য' (কাজেই নিরপরাধ)। সমস্যার বিশেষ নির্বচনের সামিল হবে যদুবাবুর খুন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ, খুনের সময় রামবাবুর অন্যত্র অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার বিবরণ। প্রমাণ করতে হবে—রামবাবু যদুবাবুর খুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। খুনের সঠিক বিস্তারিত বিবরণ, রামবাবুর খুনের সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে ও যদুবাবুর সঙ্গে রামবাবুর সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রমাণসহ সংগ্রহ করা প্রমাণের সহায়ক অঙ্কনের মত। ঐসব তথ্যাদি ও বিবরণের উপর নির্ভর করে যে সওয়াল করা হয়, তা উপপাদ্যের প্রমাণের সঙ্গে তুলনীয়। অপরাপর বিচারমূলক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও একই ভাবে আলোচনা করা যায়। জ্যামিতির চিন্তার এই ধরণ সার্বজনীন। মনে হয়, একজন্যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জ্যামিতি অবশ্যপাঠ্য মনে করতেন ও যিনি জ্যামিতি পড়েন নি, তাঁকে প্লেটো শিক্ষামন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেন নি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যামিতি বা বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায় সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ে বা পরে মহাবিদ্যালয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন মনের উপরে উক্ত ধরণ সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণের কোন চেষ্টাই হয় না। একজন্যে শিক্ষা সমাপ্তি হলেও শিক্ষিতদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অভ্যাস হয় না ও শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সমস্যা সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি করা হয় প্রকৃত বিশ্লেষণের অভাবে। এর বহু উদাহরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায়। সাম্প্রতিক একটিমাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা গেল। বর্তমানে শিক্ষাজগতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিত্য কাজ চালু রাখা কঠিন হয়েছে। কিভাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী সবাই চিন্তা করছেন। কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ হওয়ায় প্রায়ই ক্লাশ বন্ধ রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে দুটি ছাত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। তখন ক্লাশ বন্ধ করে শান্তি রক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অন্য প্রদেশাগত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিছুদিন পরে ওখানে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ও ঐ পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়। বহিরাগতদের প্রকাশ্য আক্রমণ থেকে অন্য প্রদেশের পুলিশবাহিনী মোতায়েনের সার্থকতা আছে। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই বিভেদ ও সংঘর্ষ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যের ছাত্রেরাই অশান্তির

মূল, সেখানে স্থানীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বহিরাগত পুলিশবাহিনীর পক্ষে দুষ্কৃতকারীদের বের করে শাস্তি দেওয়া ও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়, তাদের ক্রিয়াকলাপ জটিলতাই বৃদ্ধি করবে। এখানে প্রকৃত সমস্যা ঠিক বোঝাই হয় নি।

এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি প্রভৃতির খুব সূক্ষ্ম দিকটা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এসবের সূক্ষ্ম গভীর দিক নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এই আলোচনা সার্থক হবে ও পরে অন্য আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

লেসার রশ্মির কার্যকারিতা

লেসার রশ্মি যে কত জোরালো হয়, এই ছবি থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত জোরালো লেসার রশ্মি এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে অত্যন্ত কঠিন ট্যাণ্টালাম ধাতুর পাত, ভেদ করে একটি ছিদ্র উৎপন্ন করেছে। ট্যাণ্টালাম ধাতুর স্ফুটনাঙ্ক 5,500 ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

থ্রম্বোসিস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

আধুনিক কালে যে সমস্ত রোগের অভিশাপ মানুষের আয়ুবৃদ্ধির পথ রোধ করে অথবা সুস্থ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে পঙ্গু ও অকর্মণ্য করে করে দেয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো থ্রম্বোসিস, বিশেষতঃ করোনারী (Coronary) থ্রম্বোসিস। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ও আমেরিকায় এই ব্যাধিটিকে মানুষের পরম শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতে সঠিক মৃত্যুহার কত তা বলা কঠিন, কারণ এদেশে জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যসমীক্ষায় লিখে রাখবার ব্যবস্থার প্রচলন নেই। সুখের বিষয় এই যে, থ্রম্বোসিস-প্রাদুর্ভূত দেশগুলির মত ভারতের চিকিৎসকেরা এই মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে অবহেলা না করে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই রোগজনিত মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আর জাপানে সবচেয়ে কম। নারীদের অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী সংখ্যায় এই ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে। আরো জানা যায় যে, বৃদ্ধ ও মধ্যবয়স্কদের মধ্যেই ব্যাধিটি সীমাবদ্ধ।

রোগের প্রবণতা

সংবাদপত্র পাঠে দেখা যায় যে, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইদানীং কালে প্রায়ই হৃদ্রোগ বা করোনারী থ্রম্বোসিসের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে উচ্চ পর্যায়ের জনগণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। যাঁরা অতিমাত্রায় চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিক পরিশ্রম নিতান্তই কম করেন (মানসিক পরিশ্রমের তুলনায়)। তাঁদেরই এই ব্যাধি হবার সম্ভাবনা বেশী। এক সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় যে, সমাজে উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা (যেমন—অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ্, প্রতিরক্ষার পদস্থ কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ) শতকরা 8·1% এই রোগের আক্রমণে মারা যান। শিল্পে স্বল্প বেতনের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এর হার শতকরা 3·2%। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের (যেমন—কেরাণী, ছাত্র ইত্যাদি) এই ব্যাধিটিও হয়ে থাকে উপরের দুটি অঙ্কের মাঝামাঝি হারে শতকরা 6·2%।

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস

করোনারী হৃদ্রোগ, করোনারী ধমনীর ব্যাধি এবং ইসকামিক (Ischaemic) হৃদ্রোগ—এই কয়টি আখ্যাই সমার্থবোধক। করোনারী হৃদ্রোগ বোঝাতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসই করোনারী হৃদ্রোগে শতকরা 95% মৃত্যুহারের জন্যে দায়ী।

তিন ধরণের অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস বা অ্যাথিরোমা (Atheroma) রোগে দেহের কোন অতি প্রয়োজনীয় অংশে, বিশেষতঃ হৃদ্যন্ত্র, মস্তিষ্ক কিংবা বৃক্কে (Kidney) রক্ত সরবরাহ বন্ধ বা কম হয়ে জীবকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে যায়। এই অনুসারে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস হয়ে থাকে করোনারী, সেরিব্রাল ও রেনাল ধরণের।

তবে এগুলির মধ্যে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস রোগাক্রান্ত হবার অতি সাধারণ দেহাংশ হলো—রক্তবাহীনালীগুলির করোনারী কাঠামোর। হৃদয়ের বাম নিলয় (Ventricle) থেকে উদ্ভূত মহাধমনী (Aorta) এবং মস্তিষ্কের ধমনীগুলিও সচরাচর এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ে। মাঝারি আকারের ধমনীসমূহের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, করোনারী ধমনীর দুটি প্রধান ব্যাধি—এন্‌জাইনা পেক্টোরিস এবং করোনারী অবরোধ (Occlusion) বা থ্রম্বোসিস এবং দুটিই অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের দরুণ হয়। কিন্তু করোনারী অবরোধ বা থ্রম্বোসিসের ফলে হৃদয়ের পেশীজাতীয় পদার্থের চ্যুতি বা ভাঙন (Myocardial infraction) এবং অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের কোন সাদৃশ্য নেই।

রোগটির নামকরণ ও বিবরণ

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Lobstien—1835 খৃষ্টাব্দে। এটা হলো ধমনীগুলির সাধারণ রোগ, সরল কথায় ধমনীর গাত্র পুরু হয়ে আঁটসাট হয়ে পড়ে। ধমনীসমূহের অন্তর্ভাগে (Intima) রক্ত থেকে কোলেস্টেরল (Cholesterol) অনুপ্রবেশ করে। রক্তবাহীনালীগুলিতে এদের উপস্থিতির ফলে আঠালো পদার্থের সৃষ্টি হয়। লিপিডগুলি অর্থাৎ মুখ্যতঃ কোলেস্টেরলের এস্টারসমূহ জমা হতে হতে আঁশের মত ফলকের (Plaques) সঞ্চার হয়—এটাই হলো অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের গোড়ার অবস্থা (গ্রীক Athere শব্দের অর্থ ফেনজাতীয় জিনিষ বা পরিজ)। বস্তুতঃ রক্তবাহীনালীর অন্তর্ভাগে সঞ্চিত হয়ে থাকে নরম হলুদে ফেনের মত জিনিষ, যার ফলে তাদেরকে রোগটির নামকরণ হয়েছে। করোনারী কিংবা মস্তিষ্কের ছোট ছোট ধমনীগুলিতে ক্ষতের (Lesion) সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে এবং জায়গা-বিশেষে ভিতর ও বাইরের গা থেকে হলুদে রঙের ছোট পিণ্ড দেখা যায়।

উক্ত পিণ্ডগুলি ধমনীর ছিদ্রকে (Lumen) ভীষণভাবে সঙ্কীর্ণ করে অথবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এভাবেই করোনারী ধমনীর পথে ক্রমশঃ বাধার. সূত্রপাত হয়। রোগটি আর একটু অগ্রগতি লাভ করে তখনই, যখন ক্রমে ভিতরের পদার্থগুলি রক্তের পুষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবরোধ বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পদার্থটি ফুলে ওঠে আর অস্বাভাবিক ধরণের লিপোপ্রোটিন জটিল পদার্থে রক্তবাহীনালীগুলি ভরপুর হয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এমনিভাবে জমে থাকে আঁশের মত আস্তরণ বা ফলক। উপরে যে পিণ্ডের কথা উল্লেখ করা হলো, তা নগণ্য হলেও করোনারী ধমনীর মত ক্ষুদ্রতর রক্তবাহীনালীর পথে ভীষণভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, মহাধমনীর মত বড় রকমের আধারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এসে দুই ক্ষতে পরিণত হয় যা এর মধ্যে রক্তক্ষরণ সুরু হয়ে পাকাপাকিভাবে করোনারী থ্রম্বোসিসের ভিত্তি গড়ে তোলে। জলের নলে যেমন ময়লা জমে থাকলে জল-সরবরাহ হ্রাস পায়, এক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়।

গর্ভধারণক্ষম নারীদেহে অ্যাথিরোমা কম হয়, তবে বহুমূত্র বা অন্যান্য কয়েকটি রোগগ্রস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা। বলা বাহুল্য; বহুমূত্র রোগীদের মধ্যে এই রোগ ব্যাপক। বহুমূত্র রোগমুক্তদের চেয়ে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত রোগীদের এই রোগে মৃত্যুহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক এবং তা সব বয়সে হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত মৃত্যুহারের কারণ হলো বৃক্কসম্পর্কিত ও অন্যান্য জটিলতা, দেহের উক্ত অঙ্গগুলি অ্যাথিরোমাযুক্ত ফলক বা আস্তরণে পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই ব্যাধি সম্পর্কে কোলেস্টেরলের ভূমিকা—পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, করোনারী থ্রম্বোসিসে কোলেস্টেরল এবং তার সীমা একটা

প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্যদ্রব্য যত্ন সহকারে বিবেচনা করে গ্রহণ করা কর্তব্য।

স্টেরল ও তার রাসায়নিক গঠনভঙ্গিমা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক তেল বা চর্বিতে কিছু না কিছু পরিমাণে স্টেরল থাকে। স্টেরলগুলি হলো উচ্চ গলনবিন্দুর অসম্পৃক্ত মাধ্যমিক অ্যালকোহলবর্গ। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বিতে যে স্টেরল আছে, তা হলো ফাইটোস্টেরল (গলনবিন্দু 132°-144° সেন্টিগ্রেড কেলাস)। প্রাণিজ তেল ও চর্বির মধ্যে থাকে কোলেস্টেরল (গলনবিন্দু 148.5° থেকে 150.8° সেন্টি. সূচের আকারের দানা)। কোলেস্টেরল ও ফাইটোস্টেরল—এগুলি হলো আইসোমার (Isomer) এবং উভয়ের রাসায়নিক সাংকেতিক সূত্র $C_{27}H_{45}OH$, তবে গলনবিন্দু যে পৃথক, তা আগেই বলা হয়েছে।

ডাঃ কাৎজের প্রামাণ্য উক্তি—'পুষ্টি ও অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস' বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে Dr. Louis P. Katz লিখেছেন—

সাধারণ পরীক্ষাসমূহ অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের পৌষ্টিক মেটাবলিক্ কোলেস্টেরললিপিড-লিপোপ্রোটিন তত্ত্বের ভিত্তিমূল নীতিকে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ বেশী ও চর্বিবেশী কোলেস্টেরল গ্রহণ হলো হাইপার-কোলেস্টেরলিমিয়া ও অ্যাথিরোজেনেসিস সংঘটনের চূড়ান্ত পৌষ্টিক বিপথ। পুনরায় জোর গলায় বলা প্রয়োজন যে, আহার্যের উপর আমরা মূল ভূমিকা আরোপ করে থাকি, কিন্তু একমাত্র ভূমিকা নয়। আমরা কোন রকমেই এটা বুঝিয়ে থাকি না যে, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস একটা পুরাপুরি আহার্যজনিত ব্যাধি।

হঠাৎ মনের উপর ধকল এসে পড়া বা দায়বিক বৈকল্য (সুদীর্ঘ মানসিক ভাবপ্রবণতায় অতিমাত্রায় উদ্বেগ), সুরাপানের ফলে, বসে থাকবার অভ্যাসে, অতিভোজনে, পারিপার্শ্বিক কারণে, আবহাওয়ার চরম পরিণতিতেও থ্রম্বোসিস হয়ে থাকে। অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো ধমনীগাত্রে চুন জমা হওয়া।

কি ধরণের তেল ও চর্বি দেহের পক্ষে প্রয়োজন

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এতাবৎ মনে করা হতো যে, চর্বিজাতীয় জিনিষ অতিমাত্রায় খাওয়ার কুপরিণাম থ্রম্বোসিস। কিন্তু এখন এই মতবাদ আর ঠিক বলে কেমন করে ধরা যায়? একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা অত্যধিক পরিমাণে তেল ও চর্বি ভক্ষণ করে অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের চেয়ে খুব কম হারে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকাশ পাচ্ছে যে, গৃহীত চর্বির পরিমাণের চেয়ে তার ধরণটা বেশী কার্যকরী ও ফলদায়ক অর্থাৎ তার আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর উপর রোগটি হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা যে তেল ও চর্বি আহার করে, সেগুলি হলো প্রকৃতিজাত তেল, বিশেষ করে মাছের তেল (দেশ দুটি সমুদ্রকূলে অবস্থিত হওয়ায় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়)। মাছের তেলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তার ভিতর রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে অসম্পৃক্ত মেদাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড। এই সব দেখে চিকিৎসকগণ থ্রম্বোসিসজাতীয় ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতির সাধারণ উপায় নির্ধারণ করেছেন —কম মাত্রায় সম্পৃক্ত মেদাম্লসমন্বিত তেল ও চর্বি ভক্ষণ অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রচুর অসম্পৃক্ত মেদাম্লসমন্বিত তেল ও চর্বির আস্বাদন। কিন্তু এই বিষয়েও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞের সঙ্গে চিকিৎসকদের মতদ্বৈধ রয়েছে।

ব্যাধির উপসর্গ

ঠিক কোন্ যুগে এই ব্যাধি মানবসমাজে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তা জানা নেই। তবে মিশরের বিত্তশালী লোকেদের মমিতে নাকি অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের লক্ষণ পাওয়া গেছে। করোনারী থ্রম্বোসিস যে যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে উদ্বেগময় জীবনধারণের দরুণ দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞদের তা মনে করবার অনেক কারণ আছে। করোনারী থ্রম্বোসিস আক্রমণের উপসর্গ সব ক্ষেত্রে এক রকমের বা অনুরূপ হতে দেখা যায় না। তবে সব ক্ষেত্রেই বুকে যন্ত্রণা, সময়ে সময়ে রোগী যন্ত্রণার সঠিক জায়গা বলতে পারে না। মনে হয় যেন বুকের সামনের অংশের সর্বত্র যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা কখনো চাপা, মোচড়ানো বা আঁকড়ানো অথবা অম্লশূলের মত। সচরাচর রোগটি খাওয়া-দাওয়ার পর সুরু হয়। এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে, পরিপাকের ব্যাঘাতে বুঝি বুকে ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু মূলে তা নয়—রোগটি হঠাৎ আক্রমণ করছে।

ব্যাধির প্রতিকার

অসুখটির প্রতিকারক হিসাবে অনেক রকমের ওষুধ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ভেষজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে একেবারে অমোঘ ওষুধ কিছু আছে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন না। করোনারী ধমনীর ব্যাধিতে বিভিন্ন উপায়ে রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে আনলেই যে চেহারার কোন পরিবর্তন বা রোগের উন্নতি হয়, এমন মনে হয় না। একবার যখন হৃদ্‌যন্ত্রে চ্যুতি বা ভাঙ্গন ধরে, তখন থেকে টিকে থাকবার সময় এবং রক্তে কোলেস্টেরল সীমার মধ্যে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ এবং তার জমাট বাঁধার সঙ্গে কোন নিকট সম্বন্ধ নেই। সুতরাং এই বিষয়ে এখনও সুদীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন।

"………পাঠ্যাবস্থায় বাঙালী ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশ গুণ শিখা উচিত, 'সিলেবাসে' (Syllabus) নাই—পরীক্ষার কাজে লাগিবে না; অতএব পড়িব না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জ্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। আর মুখস্থ, কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করিবার বিকৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে পাশ করা বুদ্ধি প্রায়ই 'অকেজো' হইয়া দাঁড়ায়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শনিগ্রহ

সোমদত্তা সিংহ

সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ শনির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে নানা ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী শনি বিভাবসু বা সূর্য ও ছায়ার পুত্র। পুরাণ অনুযায়ী শনি ক্রূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং খঞ্জ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, শনি শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ও সর্বদা তপোনিরত থাকতেন। একবার তপস্যাকালে তিনি তাঁর পত্নীর একটি অনুরোধ রাখতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁর পত্নী তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন তাই বিনষ্ট হবে। পত্নীর এই শাপে শনি ক্রূরলোচন হন এবং এই দৃষ্টিপাতের ফলে পার্বতীপুত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হলে পার্বতীর শাপে শনি খঞ্জ হন। প্রাচীন ও আধুনিক রোমানরা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা Cronus বলে অভিহিত করেন। গ্রীসদেশের পুরাণ অনুযায়ী ক্রোনাস আকাশ (Uranus) ও পৃথিবীর (Goea) সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পৃথিবীর এই সন্তানদের Titan বলা হতো। ক্রোনাস তাঁর মাতার অনুরোধে পিতাকে হত্যা করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পিতৃ-রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর প্রজাগণ দেবতাদের মত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। শনির পুত্রেরা দশ বছর ধরে ভীষণ যুদ্ধ করে ক্রোনাসকে পরাজিত করেন। রোমের ক্যাপিটাল পর্বতের পাদদেশে একটি মন্দির আছে, তাতে শনি বা Saturn-এর প্রতিমূর্তি আছে। প্রতি বছর এখানে Saturnalia নামে একটি উৎসব হয়। ইটালিতে প্রাপ্ত বৃত্তান্ত অনুযায়ী শনি বা Saturn এক সময় ইটালীর রাজা ছিলেন; তাই তাঁর শাসিত ভূমণ্ডলকে Saturnia বলে। শনিকে বলা হয় "Lord of Saturday"। শনির নাম অনুসারেই সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটি চিহ্নিত হয়েছে।

আমাদের সৌরজগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে প্রথম ছয়টিকে (অর্থাৎ Uranus, Neptune ও Pluto বাদে) খালি চোখে দেখা যায় বলে প্রাচীনেরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পর-বর্তীকালে অপর তিনটি গ্রহ এবং বহু গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলির মধ্যে বৃহস্পতি আকারে সবচেয়ে বড় এবং তার পরেই শনি গ্রহের স্থান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক অনুযায়ী শনি সূর্য থেকে 9·5 একক অন্তরে অবস্থান করে। এর গতি খুব মন্দ—29·5 বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে এবং এক বছর পর গ্রহটিকে আকাশে 12° পূবদিকে সরে যেতে দেখা যায়। এক-একটি রাশি অতিক্রম করতে এর আড়াই বছর সময় লাগে। শনিকে খালি চোখে একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারার মত মনে হয়। কিন্তু শনি আকারে পৃথিবীর 800 গুণ এবং এর ব্যাস 113000 কিলোমিটার। আকারে বৃহৎ হলেও শনির ভর কিন্তু মোটেই বেশী নয়। পৃথিবীর ঘনত্ব যেখানে 5·5gm/c·c, এই গ্রহের ঘনত্ব সেখানে মাত্র 0·7gm/c.c. অর্থাৎ একটি বিশাল সমুদ্রে শনিকে ফেলে দিলে তা ভাসতে থাকবে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, শনি অত্যন্ত লঘু পদার্থের দ্বারা গঠিত। শনির নিজ অক্ষে আব-র্তনকাল বিষুবরেখায় 10 ঘণ্টা 13 মিনিট ও মধ্য অক্ষরেখায় 10 ঘণ্টা 40 মিনিট, অর্থাৎ শনিগ্রহের একদিন আমাদের মাত্র সোয়া দশ ঘণ্টা। এত দ্রুত ঘূর্ণনের জন্যে এই গ্রহের উত্তর

ও দক্ষিণ মেরু বেশ চাপা। সেই কারণে এর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরুদেশীয় ব্যাস অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ বেশী।

শনিগ্রহটি ঘন মেঘপুঞ্জে আবৃত এবং এর আলোকচিত্র নিলে এর গায়ে ফিতার মত কতকগুলি সমান্তরাল কালো দাগ দেখা যায়। দাগগুলি মাঝে মাঝে বিলীন হয়ে যায়। শনির আলোক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাসে অ্যামোনিয়ার ক্রিস্ট্যাল প্রলম্বিত অবস্থায় রয়েছে। শনির বায়ুমণ্ডল 16000 মাইল গভীর বলে মনে করা হয়। তবে এই বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি বেশ নিয়মিতভাবে শনির বিষুবরেখার সমান্তরালে অবস্থান করে। শনিগ্রহে মিথেন গ্যাসের মাত্রা বেশী। বৃহস্পতির তুলনায় শনির গায়ে কলঙ্ক বা ঝলক (Eruption) প্রভৃতি কম দেখা যায়। বৃহস্পতির বিখ্যাত Red spot-এর মত শনির কোন কলঙ্ক নেই। শনির বিষুবরেখা ও মধ্য অক্ষরেখার আবর্তন বেগের পার্থক্য থাকবার জন্যে একটি নিরক্ষীয় প্রবাহ আছে, যার গতি পূর্বদিকে ও বেগ সেকেণ্ডে 400 মিটার।

সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে এই গ্রহের উপরিতলের তাপমাত্রাও খুব কম। অবলোহিত রশ্মির পরিমাণ অনুযায়ী শনিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় –120°C। শনির এই শীতলতার জন্যেই তার বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অ্যামোনিয়া গ্যাস তরল অথবা কঠিন অবস্থায় গ্রহপৃষ্ঠে বর্তমান। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে শিলাময় শনিপৃষ্ঠকে প্রায় 6000 মাইল পুরু একটি আবরণে ঢেকে রেখেছে। এই আবরণের নীচে শনির দেহপিণ্ড 28000 মাইলের বেশী গভীর বলে মনে হয় না। শনির বায়ুমণ্ডল এত বিশাল যে, তার প্রায় অর্ধেক ভরই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু শনি সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি পায়, তাতে তার তাপমাত্রা আরও কম হওয়া উচিত ছিল। তাই মনে করা হয় যে, শনির অভ্যন্তরে নিশ্চয় এমন কোন বস্তু আছে, যা তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, শনির রাসায়নিক উপাদান ও আভ্যন্তরীণ কাঠামো অনেকটা বৃহস্পতির মত অর্থাৎ এর বেশীর ভাগ অংশই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতির দ্বারা গঠিত।

শনির নয়টি উপগ্রহ আছে এবং 1966 সালে আর একটি অর্থাৎ দশম উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শেষোক্ত উপগ্রহটির কক্ষপথ শনির সবচেয়ে নিকটে ও এর আকারও খুব ছোট। শনির এই উপগ্রহগুলির গতিপথের ব্যাস গ্রহের ব্যাসের 4·1 থেকে 220 গুণ বেশী। সেই জন্যে এরা শনির বিখ্যাত বলয়শ্রেণীর বাইরে অবস্থিত। শনির এই উপগ্রহগুলির সঙ্গে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও শনির উপগ্রহগুলি অনেক বড়। এই নয়টি উপগ্রহের নাম যথাক্রমে Mimas, Encleladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus এবং Phoebe। এদের মধ্যে Titan-এর ভর সর্বাধিক এবং সমগ্র সৌরজগতে এটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। তাছাড়া এটিই একমাত্র উপগ্রহ, যার নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে। Titan-এর বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস আছে।

শনিগ্রহ সম্বন্ধে কৌতূহলের মূল কেন্দ্র হলো তার বলয়শ্রেণী এবং অপরূপ সৌন্দর্য। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে গ্রহটির ঈষৎ হেমকান্তি এবং তার ঠিক মধ্যস্থল বেষ্টন করে আলোকমণ্ডিত বলয়শ্রেণীর শোভা আকাশের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য। তিনটি বলয় শনির বিষুবরেখার সমতলে থেকে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের ব্যাস 135000 থেকে 270000 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই বলয়শ্রেণীর ভর মূল গ্রহের ভরের 1/27000 ভাগ এবং Titan-এর ভরের 1/5 ভাগ। যদিও এই বলয়শ্রেণীর বিস্তৃতি অনেক বেশী, তথাপি এর বেধ সেই

তুলনায় খুবই কম—মাত্র 16 কিলোমিটার। আকাশে গ্রহের বিভিন্ন অবস্থানে বলয়ের উপরি-তল কিংবা নিম্নতল মাত্র দেখা যায়। যখন বলয়ের পার্শ্বদেশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তখন তাকে একটি সরলরেখা বলে মনে হয় এবং একটি কমলা-লেবুকে শলাকার দ্বারা বিদ্ধ করলে যেমন দেখায়, শনিগ্রহ ও বলয়শ্রেণীকেও সেই রকম দেখায়। বলয়ের সমতল আমাদের ঠিক দৃষ্টিরেখায় থাকলে কয়েক দিনের জন্যে বলয়টি অদৃশ্য হয়ে যায়। বলয়ের বেধ কম বলেই এরকম দেখায়। বহির্বলয়, মধ্যবলয় এবং অন্তর্বলয়কে যথাক্রমে A, B এবং C বলে অভিহিত করা হয়। অন্তর্বলয়টি শনিপৃষ্ঠ থেকে 7000 মাইল উচ্চে অবস্থিত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বলয়গুলির মধ্যে শূন্য স্থান আছে। মধ্যবলয় থেকে বেশী সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাকে সব সময়ই প্রায় শনিগ্রহের মত উজ্জ্বল দেখায়; তাই একে 'উজ্জ্বল বলয়' বলা হয়। অন্য বলয়গুলি এত উজ্জ্বল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই বলয়গুলি অসংখ্য ছোট ছোট (কয়েক সেন্টিমিটার মাপের) বিচ্ছিন্ন উল্কাপিণ্ড ও ধূলিকণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সাহায্যে গঠিত। প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি ছোট ছোট স্বাধীন উপগ্রহের মত শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বলবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী শনির এত নিকটে কোন অবিচ্ছিন্ন পদার্থের চাকতি থাকতে পারে না। এর বিভিন্ন অংশে মহাকর্ষীয় বল বিভিন্ন পরিমাণে ক্রিয়া করবার ফলে চাকতিটি ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। শনির বলয় যে খণ্ড খণ্ড উল্কাজাতীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত তার প্রমাণ এই যে, অন্তর্বলয়ের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে শনির পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। বলয় থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই বলয়ের ভিতরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেণ্ডে 12 মাইল ও বাইরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেণ্ডে 10 মাইল বেগে ঘুরছে। এই বলয়শ্রেণীগুলির কোন কোন স্থান শনির বড় উপগ্রহগুলির (উদাহরণস্বরূপ Mimas) মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বৃহস্পতি তার নিকটবর্তী সূর্যপ্রদক্ষিণকারী গ্রহাণুপুঞ্জগুলির উপর অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করবার ফলে গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে—এদের 'Kirkwood gap' বলা হয়। শনির এই বলয়শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্য কোন গ্রহে কিন্তু এই ধরণের কোন বলয় নেই। অনুমান করা হয় যে, কোন উপগ্রহ শনির খুব কাছে এসে পড়বার দরুণ তার আকর্ষণ-বল সহ্য করতে না পেরে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে বলয়ের সৃষ্টি করেছে। শনির নয়টি উপগ্রহ বলয়শ্রেণী থেকে বহু দূরে অবস্থিত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, সুদূর অতীতে শনির নিকটস্থিত একটি উপগ্রহ খুব কাছে চলে আসায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই একটি উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি অংশে বিভক্ত হয়ে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের দ্বারা সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় আর সুদূর পৃথিবী থেকে সেই প্রতিফলিত আলো দেখে এই ভগ্ন উপগ্রহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে আমরা বলয় বলে মনে করি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঐ উপগ্রহের ধ্বংস শনির আর একটি উপগ্রহের দ্বারা ঘটেছে। এই মতবাদে তিনটি বিভিন্ন বলয় সৃষ্টির কারণের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

শনিগ্রহটি যদিও বেশ উজ্জ্বল, তবু নানা কারণবশত: বৃহস্পতির তুলনায় এটি কিছুটা নিষ্প্রভ। পৃথিবী থেকে শনির যে ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বলয়শ্রেণীর কোণের পরিবর্তন। তাছাড়া পৃথিবী ও শনির মধ্যবর্তী দূরত্ব ও উভয়ের গতির পরিবর্তনও ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবার অন্যতম কারণ।

বৃহস্পতির সঙ্গে শনির অনেক সাদৃশ্য থাকলেও শনি থেকে বেতার-ঝলক বৃহস্পতির তুলনায় খুব কমই পাওয়া যায়। তবে শনি থেকে মাঝে মাঝে দুর্বল বেতার-ঝলক যে আসে, তা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। এই বেতার-ঝলকের স্বল্পতার কারণ হিসাবে নানাবিধ মত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শনির হয়তো কোন চৌম্বক বলয় নেই, যা গ্রহটির কাছে তড়িৎসম্পন্ন কণাগুলিকে ধরে রেখে বিকিরণ-বলয়ের সৃষ্টি করতে পারে। আবার কারো কারো মতে, পৃথিবী এবং বৃহস্পতির বিকিরণ-বলয়ে বন্দী তড়িৎকণিকাগুলি যদি সূর্য থেকে তার সৌর প্রবাহের (Solar wind) সাহায্যে আসে, তাহলে শনি থেকে বেতার-তরঙ্গ নির্গমনের অভাব একমাত্র এই কারণেই হতে পারে যে, সৌর প্রবাহ এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে এই গ্রহে পৌঁছুতে পারে না। আরও একটি মতবাদ এই যে, হয়তো শনির বলয়গুলি তার বিকিরণ-বলয় তৈরি হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

শনিগ্রহ ক্রমবিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের পথে আরও লক্ষ লক্ষ বছর চলবার পর শনির পৃথিবীর অবস্থায় পৌঁছুবার সম্ভাবনা আছে বলা যেতে পারে। ফলে শনিতে জীবনের অস্তিত্ব থাকবার সম্ভাবনা খুব কম। বিরাট বায়ুমণ্ডলের চাপ ও বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি জীবের প্রাণধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, এই অবস্থাতেও একটি জিনিষ থাকতে পারে, তা হলো জীবের ক্ষুদ্রতম অণু (Micro-organism)। এমন জীবাণু আছে, যা অত্যধিক উত্তাপ ও শৈত্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এবং ধাতু আত্মসাৎ করে প্রাণধারণ করে। এদের বৃদ্ধি পাবার ক্ষমতাও অদ্ভুত এবং এদের জন্যেই বিষাক্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ শনিতে যে অ্যামোনিয়া ও মিথেন রয়েছে, তার সঙ্গে এই গ্রহের জীবাণুরও সম্বন্ধ আছে। অবশ্য এই বিষয়ে সঠিক এখনও কিছুই বলা যায় না।

শনিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা হওয়া এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তার ফলে নানা রকম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, যার উত্তর পেতে হলে প্রচুর সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। কিছু পরীক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে করা সম্ভব হলেও এমন কিছু বিশেষ তথ্য আছে, যা জানতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রক্ষিপ্ত মহাকাশ-সন্ধানী যন্ত্রবাহী বিশেষ যানের (Space probe) সাহায্যে পরীক্ষা চালানো অবশ্যই প্রয়োজন। মহাকাশ-সন্ধানী বিশেষ যান লক্ষ্যস্থলে গিয়ে সংগৃহীত তথ্য পৃথিবীতে পাঠাতে বেশ কয়েক বছর সময় নেবে। কাজেই এভাবে শনিগ্রহ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা NASA (National Aeronautics and Space Administration) তাদের 1972-'73 সালের কর্মসূচীতে যে মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ করছেন, তার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'Grand tour'। এবারে তাঁরা মঙ্গলগ্রহের পরিক্রমণ পথ ছাড়িয়ে দূরবর্তী গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জের দেশে বিচরণ করবার জন্যে আরোহীবিহীন মহাকাশযান 'Pioneer' তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এই যান গ্রহাণুবলয় ভেদ করে বৃহস্পতির কাছে যাবে। এই মহাকাশযান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান দশকের শেষের দিকে শনি প্রভৃতি গ্রহের দিকে মহাকাশযান পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আন্তর্গ্রহমণ্ডলীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারবো।

ক্রোমোজোম ও মানুষের রোগ

শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী*

ক্রোমোজোম শব্দটির সঙ্গে অনেকেই হয়তো পরিচিত। ক্রোমোজম জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। ক্রোমোজোম (Chromo=colour, রং; Soma=body, বস্তু) নিউক্লিয়াসের সেই বস্তু, যাহার উপর কোন বিশেষ রং প্রয়োগ করিলে তাহা সেই রং গ্রহণ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আমাদের চোখে রঙীন সুতার মত পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী—উভয়ের দেহে প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম থাকে। একই শ্রেণীর উদ্ভিদের কিংবা একই জাতের প্রাণীর কোষে নির্দিষ্ট সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে আমাদের বংশানুগতির এক-একটি একক জীন (Gene) রেখাকারে সাজানো অবস্থায় থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে ক্রোমোজোমের সহিত মানুষের রোগের কি সম্পর্ক, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। কিন্তু এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। জে. আরনল্ড নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী 1879 সালে মানুষের টিউমারের কোষে সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম লক্ষ্য করেন। তাহার পর দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সঠিক সংখ্যা লইয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতবিরোধ চলিতে থাকে। অবশেষে 1956 সালে জে. এইচ. তিজো এবং এ. লিভান নামে দুই জন সুইডিশ বিজ্ঞানী মানুষের ভ্রূণস্থিত ফুস্ফুসের ফাইব্রোব্লাষ্ট টিস্যুর উৎপাদন হইতে প্রমাণ করিলেন যে, মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 46। এই 46টি ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া অটোজোম (Autosome) ও 1 জোড়া সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex-chromosome)। অটোজোম দেহকোষের সেই ক্রোমোজোমগুলি, যেগুলি আমাদের দৈহিক, মানসিক ও শারীরিক

1নং চিত্র। ক্রোমোজোম

বিকাশের জন্য দায়ী। আর সেক্স-ক্রোমোজোমগুলি আমাদের লিঙ্গের বিকাশের জন্য দায়ী। মানুষের দেহ-কোষের সেক্স-ক্রোমোজোম দুইটি যথাক্রমে X এবং Y। নারী ও পুরুষের সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন যথাক্রমে XX এবং XY। আজ বিশ্বের সকল বিজ্ঞানী মানুষের দেহকোষে তিজো ও লিভানের আবিষ্কৃত ক্রোমোজোম সংখ্যাকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যদিও দুই-একজন চীনা

---

*প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা—19

ও জাপানী বিজ্ঞানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্রোমোজোমকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সূতার মত দেখায়, কিন্তু কোষ বিভাজনের মেটাফেজ স্টেজে ক্রোমোজোমকে 1 নং চিত্রের মত দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোজমে দুইটি করিয়া ক্রোম্যাটিড থাকে এবং এই দুইটি ক্রোম্যাটিড যে বিন্দুতে জোড়া লাগিয়া থাকে, তাহাকে সেণ্ট্রোমিয়ার বলা হয়। সেণ্ট্রোমিয়ারের দুই

2নং চিত্র

মানুষের ক্রোমোজোম (ডেনভার কংগ্রেসের মতানুসারে)

দিকের অংশ দুইটিকে ক্রোমোজোমের দুইটি বাহু বলা হয়। এই সেণ্টোমিয়ারের অবস্থানভেদে ক্রোমোজোমের মধ্যখানে, একটু দূরে এবং শেষের দিকে থাকিলে ক্রোমোজোমকে যথাক্রমে মেটাসেনট্রিক, সাবমেটাসেনট্রিক এবং অ্যাক্রোসেনট্রিক বলা হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিউম্যান সাইটোজেনেটিষ্টগণ (অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানী মানুষের দেহকোষ ও ক্রোমোজম ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করেন) যাহাতে একমত হইয়া মানুষের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে গবেষণার কাজে উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তাহার জন্য 1960 সালে ডেনভারে, 1963 সালে লণ্ডনে এবং 1966 সালে শিকাগোতে বিশদভা বসে (এই সম্বন্ধে 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। গবেষণার সুবিধার জন্য ও ক্রোমোজোমের বিভিন্ন গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া মানুষের ক্রোমোজোমকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

গ্রুপ	ক্রোমোজোমের আকার ও সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান	ইডিয়োগ্রাম নম্বর	প্রতি গ্রুপের সংখ্যা পুরুষ	নারী
I, A	সবচেয়ে বড়, মেটাসেনট্রিক	1—3	6	6
II, B	বড়, সাবমেটাসেনট্রিক	4—5	4	4
III, C	মধ্যম, সাবমেটাসেনট্রিক	6—12X	15	16
IV, D	মধ্যম, অ্যাক্রোসেনট্রিক	13—15	6	6
V, E	ছোট, মেটা ও সাবমেটাসেনট্রিক	16—18	6	6
VI, F	সবচেয়ে ছোট, মেটাসেনট্রিক	19—20	4	4
VII, G	সবচেয়ে ছোট, অ্যাক্রোসেনট্রিক	21—22Y	5	4
			46	

মানুষের ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের মূল আলোচনার পূর্বে আরও বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। মানুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াস পরীক্ষা করিয়া ইহা কোন্ লিঙ্গের তাহা বলা যায়। প্রকৃত নারীর দেহকোষের শতকরা 30 হইতে 60 ভাগ নিউক্লিয়াসে সেক্স-ক্রোম্যাটিন নামে একটি বস্তু থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত পুরুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াসে কখনও সেক্স-ক্রোম্যাটিন থাকিবে না। সেই জন্য প্রকৃত নারী ও পুরুষকে যথাক্রমে সেক্স-ক্রোম্যাটিন পজিটিভ ও সেক্স-ক্রোম্যাটিন নেগেটিভ বলা হয়। প্রবন্ধে সিনড্রোম (Syndrome) শব্দটির উল্লেখ আছে। কতকগুলি বৈলক্ষণ্য আমাদের দেহে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া যে রোগের সৃষ্টি করে, তাহাকে সিনড্রোম বলা হয়।

মঙ্গোলিজম—1959 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জে. লুঁজা মঙ্গোলিজম এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। ক্রোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রমে মানুষের দেহে যে নানারকমের বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হইতে পারে, এই ধারণা পূর্বে অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যা আবিষ্কৃত হইবার পর জে. লুঁজা-ই সর্বপ্রথম মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমের দ্বারা ইহা সপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লুঁজা দেখাইলেন যে, মানুষের দেহের কোষে 21 নম্বর ক্রোমোজোমের এক জোড়ার পরিবর্তে যদি তিনটি ক্রোমোজোম থাকে, তবে দেহে একসঙ্গে কতকগুলি বৈলক্ষণ্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে 47, কারণ VII অথবা G গ্রুপের 21 নম্বর দুইটি ক্রোমোজোমের সহিত একটি অতিরিক্ত খুব ছোট অ্যাক্রোসেনট্রিক ক্রোমোজোম থাকিবে। মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহে সাধারণতঃ কতকগুলি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়; যথা—এই রোগী দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া পশ্চাদপদ হয়, বুদ্ধিও খুব কম হয়। চোখের উপরের পাতার উপরে একটি ভাঁজ থাকে। খর্বকায় দেহ, চ্যাপ্টা হাত-পা, ছোট নাক, হাতে অথবা পায়ে অতিরিক্ত আঙুল, ছোট ছোট হাত ও পায়ের আঙুল, শুষ্ক ত্বক, হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্যতম। উভয় লিঙ্গই মঙ্গোলিজমে আক্রান্ত হইতে পারে। তবে শতকরা প্রায় ষাট-শতাংশই দশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই মরিয়া যায়। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি ছয় শত বা সাত শত জন্মের মধ্যে একটি মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর জন্ম হয়। পূর্বে বলি-

যাছি, ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমেই এই মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমের উৎপত্তি; কিন্তু কেন এবং কি করিয়া এই ক্রোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, ইহা বিজ্ঞানীদের নিকট এক বিরাট সমস্যা। আজ অনেক বিজ্ঞানীই এই মত পোষণ করেন যে, শুক্রকোষ অথবা ডিম্ব-কোষের বিভাগের সময় ক্রোমোজোমগুলি (এই ক্ষেত্রে 21 নম্বর অটোজম) ঠিকমত বিযুক্তি-করণ (Disjunction) হইয়া দুইটি নূতন কোষে যাইতে না পারিলে যুক্তিকরণ (Non-disjunction) অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, যাহার ফলে এই সিনড্রোমের উৎপত্তি হয়। অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত বয়সের মায়ের গর্ভজাত সন্তানের দেহেই এই সিনড্রোমের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

ক্লাইনেফেলটার-সিনড্রোম—1959 সালে পি. এ. জেকব এবং জে. এ. স্ট্রং নামে দুইজন বৃটিশ বিজ্ঞানী এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষের সেক্স-ক্রোমোজোম গঠনে সাধারণ পুরুষ অথবা নারীর ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যা যথাক্রমে XY অথবা XX না থাকিয়া XXY থাকে। সুতরাং এই রোগীর দেহকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে 47, কারণ III অথবা C গ্রুপের একটি X ক্রোমোজোমের মত আর একটি অতিরিক্ত মধ্যম আকারের সাবমেটাসেনট্রিক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী বাহিরের দিক হইতে সাধারণতঃ পুরুষ বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠনের জন্য বিবিধ নারীর গুণ লক্ষণীয়। এই রোগী ক্রোম্যাটিন পজিটিভ হয়। মানসিক রোগ, বন্ধ্যাত্ব, দৃশ্যমান স্তনযুগল, বেশী পরিমাণ গোনাডোট্রোফিন নিষ্কাশন, দৈহিক পরিমাপের বিসদৃশ অনুপাত, বিশেষতঃ লম্বা পা ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্যতম। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি চার শত বালকের মধ্যে একটি ক্লাইনেফেলটার রোগী জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমোজোমে ননডিজাংশনের ফলে সেক্স-ক্রোমোজোমে সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে।

টার্নার-সিনড্রোম—এইচ. এইচ. টার্নার নামে একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী 1938 সালে এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। তিনি এই সিনড্রোমের কতকগুলি বৈলক্ষণ্যের কথা উল্লেখ করেন; যথা—শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য, খর্বকায় দেহ, কাঁপানো গলদেশ এবং কিউবিটাস ভালগাস। 1959 সালে আর একজন বিজ্ঞানী ই. বি. ফোর্ড গোনাডাল ডিসজেনেসিস (Gonadal dysgenesis) এই সিনড্রোমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া ঘোষণা করেন। টার্নার-সিনড্রোম রোগীর ক্রোমোজোম সংখ্যা 45। সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন XO অর্থাৎ শুধু একটি X ক্রোমোজোম আর একটি সেক্স-ক্রোমোজোম নাই। শতকরা আশী ভাগ টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর ক্রোম্যাটিন নেগেটিভ হয়। বাহিরের দিক হইতে এই রোগীকে নারী বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য—কান, স্তনহীন বক্ষ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি 10,000 জন্মের মধ্যে একটি টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রেও শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষের বিভাগের সময় সেক্স-ক্রোমোজোমের ননডিজাংশনের ফলেই এই বৈসাদৃশ্যের সেক্স-ক্রোমোজোম সংখ্যার উৎপত্তি হয়।

পূর্বেই ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমে অটোজোমের একটি এবং সেক্স-ক্রোমোজোমের দুইটি সিনড্রোমের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ সংখ্যার ব্যতিক্রমের জন্য অটোজোম ও সেক্স-ক্রোমোজোমের আরও অনেক আবিষ্কৃত সিনড্রোম আছে, কিন্তু সেইগুলি আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তাহার উপরে ক্রোমোজোমের আকৃতির হের-ফেরের জন্ত যে সকল সিনড্রোমের সৃষ্টি হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রবন্ধের আলোচনার বহির্ভূত রহিয়াছে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে হিউম্যান সাইটোজেনেটিসিষ্টগণ মানুষের বংশানুগতিক রোগ-সংক্রান্ত যে সকল রোগের রহস্ত উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ এবং প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের এই দুই শাখার সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিয়াছে ক্লিনিক্যাল সাইটোজেনেটিক্স। এইখানে এই কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, উপরিউক্ত সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আমাদের মধ্যে খুব কম হইলেও এবং এই সকল রোগের কতকগুলি কারণ আমরা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেও ইহাদের চিকিৎসার সাহায্যে নিরাময় করিয়া তোলা এখনও পর্যন্ত আমাদের সাধ্যের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

জল লবণমুক্ত করবার যন্ত্র

ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ডিয়াগোর গাল্‌ফ্‌ জেনারেল অ্যাটোমিক কর্তৃক লবণাক্ত জল সুপেয় করবার জন্তে সহজ বহনযোগ্য স্বল্পমূল্যের এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র 25 কিলোগ্র্যাম। যন্ত্রটিকে চালিয়ে দিনে প্রায় 400 লিটার পরিমাণ লবণমুক্ত পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। বিপরীত অভিস্রবণ পদ্ধতিতে জল থেকে অবাঞ্ছিত ময়লা নিষ্কাশিত হয়। সৈন্তবাহিনী, অভিযাত্রী দল এবং ভ্রমণকারীরা এই যন্ত্রটি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে।

রেডার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ

শ্যামসুন্দর দে*

রেডার কথাটার সঙ্গে আমরা আজ খুবই পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইংল্যাণ্ডে রেডারের আবিষ্কার হয়। অবশ্য প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে 'প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার' কথাটা খুবই সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনী যখন ইংল্যাণ্ডের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ সুরু করে, ঠিক তখনই আত্মরক্ষার তাগিদে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা শত্রুপক্ষ জার্মানদের বোমারু বিমানগুলিকে আগে থেকে সনাক্ত করবার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। কেন না, তাঁরা ভাবলেন যদি বোমাবর্ষণের আগে শত্রুপক্ষের বিমান সনাক্ত করা যায়, তাহলে সময়মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে এবং প্রয়োজনমত আক্রমণও করা যাবে। প্রয়োজনের ফলেই রেডার আবিষ্কৃত হয়—যার দ্বারা ঐ সনাক্তকরণ সম্ভব। Radio Angle Detection And Ranging—ইংরেজির এই শব্দগুলির আগ্যাক্ষর নিয়েই যন্ত্রটির নাম হয়েছে রেডার (Radar); অর্থাৎ রেডার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব—রেডার যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই একে বিজ্ঞানীরা বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা থেকে সুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনেও নানাভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। নিরাপত্তার জন্যে বিমানে রেডারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। আবহাওয়াবিদ্‌দের কাছে রেডার অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। আবহাওয়াবিদ্‌গণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ইত্যাদি নির্ধারণ করে রেডিও, খবরের কাগজ প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিবেশন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রেডার যন্ত্র এবং এর সাহায্যে কিভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রথমে রেডার যন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

রেডার যন্ত্রে তিনটি অংশ থাকে—প্রেরক, গ্রাহক এবং অ্যান্টিনা। 1নং চিত্রে সোজাভাবে

1নং চিত্র

তা দেখানো হয়েছে। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে একটি পর্দা বা নির্দেশক-যন্ত্র যুক্ত থাকে।

প্রেরক-যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পনাঙ্ক বা হ্রস্বতরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (Electro-magnetic pulse) অ্যান্টিনার মারফৎ ছাড়া হয়। ম্যাগ্‌নেট্রন, ক্লিষ্ট্রন ইত্যাদি বিশেষ ধরণের ভাল্‌ব এই প্রেরক-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিনার সঙ্গে একটি অর্ধবৃত্তাকার প্রতিফলক লাগানো থাকে, যা বিক্ষিপ্ত বেতার-তরঙ্গকে এক জায়গায় সংহত করে' সমান্তরাল রশ্মির আকারে প্রতিফলিত করে। প্রতিফলকটিকে ইচ্ছামত বিভিন্ন

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

দিকে ঘোরানো যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নির্দেশক হিসাবে ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহৃত হয়। একই অ্যান্টিনার মারফৎ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ —উভয় কাজই করা হয়। বিচ্ছিন্ন বেতার-তরঙ্গ ব্যবহারের জন্যে এই সুফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ তরঙ্গগুচ্ছ পাঠাবার পর মাঝখানে কিছু সময়ের জন্যে প্রেরক-যন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকে এবং এই অবসরে অ্যান্টিনা গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ করে। এছাড়াও বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম তরঙ্গের শক্তি অবিচ্ছিন্ন বা অবিরাম তরঙ্গ-প্রবাহের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হয় এবং এতে যান্ত্রিক জটিলতাও কমানো

অন্ধকারে টর্চের আলো কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়বার পর আমরা যেমন বস্তুটির চেহারা, দূরত্ব ইত্যাদির হদিশ পাই, ঠিক একইভাবে রেডারের প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ গিয়ে দূর বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে যখন ফিরে আসে, তখন ঐ বস্তুর দূরত্ব এবং অবস্থান জানতে পারি। প্রেরক-যন্ত্র, বেতার-তরঙ্গ এবং গ্রাহক-যন্ত্রকে যথাক্রমে টর্চ, টর্চের আলো এবং চোখের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য টর্চের কার্যকরী দূরত্ব খুবই সীমিত। অন্যদিকে রেডারের অদৃশ্য বেতার-তরঙ্গ মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশের মধ্য দিয়েও কার্যকরী।

পাশাপাশি দুটি বস্তুর অবস্থান আলাদা করে নির্ণয় করতে হলে রেডারে ব্যবহৃত বেতার-তরঙ্গ হ্রস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়। অ্যান্টিনার আকার বাড়িয়েও তা করা সম্ভব, তবে অ্যান্টিনার আকার যথেচ্ছা বড় করলে একে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে যান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দেবে। তাই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকেই কমানো হয়ে থাকে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় রাখলে তা আবার বায়ুমণ্ডলে বেশী পরিমাণে শোষিত হবারও সম্ভাবনা আছে। তাই কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ রেডারে ব্যবহার করা হয়। রেডার কতদূর পর্যন্ত কার্যকম হবে, তা নির্ভর করে প্রেরক-যন্ত্রের শক্তি, গ্রাহক-যন্ত্রের সুবেদী মাত্রা, মাধ্যমে শোষণ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। মেঘ বা বৃষ্টি রেডারের কাজে ক্ষতি করে না বটে, তবে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেরিত তরঙ্গের গতি পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপও সব জায়গায় সমান নয়। তাই বিভিন্ন চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডল দিয়ে বেতার-তরঙ্গ যাবার সময় প্রতিসরিত হয়ে সামান্য বেঁকে যায়।

বেতার-তরঙ্গ লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসলে তাকে বিবর্ধিত করে ক্যাথোড-রে টিউবে ফেলা হয়। এখন দেখা যাক, কিভাবে এই পর্দায় লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত হয়। যান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলেই এর উত্তর মেলে। ক্যাথোড-রে টিউবে প্রতিফলক পাতে বিশেষভাবে আরোপিত তড়িৎ-বিভবের সাহায্যে ইলেকট্রন-প্রবাহকে পর্দার বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে দ্রুত পরিচালিত করবার ব্যবস্থা থাকে। ইলেকট্রন

2নং চিত্র

প্রবাহের সময় পর্দার উপর একটা প্রলেপের সৃষ্টি হয়। এই প্রলেপ রেডার থেকে প্রেরিত

বেতার-তরঙ্গের গতিপথের নির্দেশ দেবার কাজ করে; অর্থাৎ রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের গতিবেগের সঙ্গে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিবেগের একটা সম্পর্ক থাকে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহও বাঁ-দিক থেকে যাত্রা সুরু করে দেয়। বেতার-তরঙ্গ কোন বস্তু থেকে বাধা পেয়ে রেডারের গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরলে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথ সামান্য পরিবর্তিত হয়। ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দাটি দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত থাকে। কাজেই পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের জায়গা থেকে সুরু করে প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তনের জায়গা পর্যন্ত দূরত্বটুকু সোজাসুজি মাপা যেতে পারে। এই দূরত্বই নির্দিষ্ট বাধার দূরত্ব। এইভাবে রেডারের সাহায্যে দূরের বস্তুর অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়। 2 নং চিত্রে রেডারের পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের চেহারা এবং বস্তু থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসবার ফলে ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তিত চেহারা দেখানো হয়েছে।

কোন কোন রেডারে অ্যাণ্টিনা থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গকে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হয়। এই প্রকার রেডারের পর্দায় কেন্দ্র থেকে সুরু করে পরিসীমার দিকে ইলেকট্রন-প্রবাহ হয় এবং ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এই ধরণের রেডারে বিস্তৃত এলাকার চিত্র পাওয়া যায়। 3নং চিত্রে এই জাতীয় রেডারের পর্দাকে দেখানো হয়েছে। চিত্রে একটি বিমান ও মেঘের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় রেডারে একই সঙ্গে বস্তুর অবস্থান ও কৌণিক দূরত্ব—দুই-ই মেলে। পর্দায় বিমানটি ঐ সময় 20 মাইল দূরে 45° কোণ করে আছে। মেঘের অবস্থান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ প্রভৃতি কাজে এই জাতীয় রেডার খুবই কাজে লাগে।

শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারই যে হয় তা নয়, অবিরাম বা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারও হতে পারে। তবে এর বেলায় প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রের জন্যে দুটি আলাদা অ্যাণ্টিনা লাগবে—যা কার্যক্রম করা খুবই অসুবিধাজনক। কয়েকটি

3নং চিত্র

বিশেষ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় রেডার ব্যবহৃত হয়। অবিরাম তরঙ্গের রেডারের প্রেরক-যন্ত্র থেকে তরঙ্গ-প্রবাহ কোন গতিশীল বস্তু থেকে বাধা পেয়ে যখন গ্রাহক-যন্ত্রে ক্রমাগত ফিরে আসে, তখন বিজ্ঞানী ডপ্‌লারের সূত্র অনুযায়ী ঐ তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে তরঙ্গ এবং গতিশীল বস্তুর পারস্পরিক গতিবেগের উপর। কম্পনাঙ্কের পরিবর্তন মেপে বস্তুর গতিবেগ এবং তরঙ্গের যাতায়াতের সময়ের ব্যবধান থেকে বস্তুর দূরত্ব জানা যেতে পারে।

রেডারের প্রয়োগে কিভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ ছাড়া এখনও অনেক দেশেই—এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষেও ফাঁকা জায়গায় কোন নির্দিষ্ট আকারের পাত্রে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থা যে খুবই সীমিত, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। কেন না, অসময়ের বৃষ্টিই মোটামুটি ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে এবং তখনই এই ব্যবস্থা মোটামুট কার্যকরী হয়। কিন্তু বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হয়, তা বেশীর ভাগ সময়েই ব্যাপকভাবে হয় না অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাত বেশী হয়ে থাকে। হয়তো দেখা গেল, সহরের এক প্রান্তে প্রবল বৃষ্টি অথচ অন্য প্রান্তে রোদ। এই অবস্থায় এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা যায় না, নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে গেলে কিছু দূর অন্তর অন্তর জল সংগ্রহ করে তাদের গড় হিসাবকে ধরতে হবে, যা কার্যক্ষম করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে বৃষ্টিপাতের হার জানা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র মোট সময়ের বৃষ্টিপাতেরই পরিমাপ করা যেতে পারে। বৃষ্টিপাতের হার জানবার যে দু-একটি পদ্ধতি আমাদের জানা আছে, তাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। পাত্রে জল সংগ্রহ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করবার পদ্ধতিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, এভাবে কেবলমাত্র পাত্রের মুখের ক্ষেত্রের উপরে বৃষ্টিপাতের পরিমাপই করা হয়ে থাকে—বিস্তীর্ণ জায়গার পরিমাপের বেলায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। এই অবস্থায় রেডারের সাহায্যেই আমরা নিখুঁতভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা সীমিত অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের হার ও পরিমাপ পেতে পারি।

রেডার যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ জলকণার দিকে পাঠালে, তা জলকণা থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই ফিরে-আসা তরঙ্গের শক্তির মান পর্যাপ্ত পরিমাণ হতে হবে, তবেই গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা যাবে। ছোট বস্তুকণা বা জলকণা থেকে বাধা পেয়ে যে শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসে, তা বিজ্ঞানী র‍্যালে কর্তৃক আবিষ্কৃত আলোক-বিচ্ছুরণের নিয়ম মেনে চলে। এই সূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি জলকণার প্রস্থচ্ছেদের ষষ্ঠ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। র‍্যালের সূত্র থেকে আরও জানা যায় যে, বিচ্ছুরিত শক্তি ব্যবহৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক। কাজেই জলকণার প্রস্থচ্ছেদ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে ভাল শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে রেডার দিয়ে খুব ছোট জলকণা দেখতে হলে প্রেরক-যন্ত্রে খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। খুব ছোট তরঙ্গ আবার মেঘ ও বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বেশী শোষিত হয়। জলকণার প্রস্থচ্ছেদও এক থাকে না। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে রেডারে কয়েকটি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ, সাধারণতঃ 1, 3, 5, 10 এবং 20 সেন্টিমিটারের তরঙ্গ রেডারে ব্যবহার করা হয়।

ছোট একটি জলের ফোঁটা থেকে যতটা শক্তি ফিরে আসে, সাধারণতঃ তা রেডারে পরিমাপ-যোগ্য নাও হতে পারে। যেমন—দেখা গেছে যে, 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 0.1 সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি জলের ফোঁটা থেকে একটি 10 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারে মাত্র প্রায় 6×10^{-20} ওয়াট শক্তি ফিরে আসে। অথচ অন্যদিকে 10^{-13} ওয়াটের কম শক্তি হলে গ্রাহক-যন্ত্র তা ধরতে পারে না। তাহলে রেডারে জল-কণাকে কিভাবে পাওয়া যায়? এখন—কোন এক জায়গায় তো মাত্র এক ফোঁটা জল থাকে না! প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 100 থেকে 1000টি পর্যন্ত জলকণা থাকে। রেডার থেকে প্রেরিত রশ্মি-গুচ্ছের আয়তনের মধ্যে এক সঙ্গে অনেক জল-কণাই পড়ে। এদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গড়

বিচ্ছুরিত শক্তির মান গ্রাহক-যন্ত্রে মাপবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কোন নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত জলকণা থেকে কতটা শক্তি আসবে, তা নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

$$P = \frac{A \times N \times D^6}{r^2} \quad \cdots\cdots (1)$$

এখানে P=পাওয়া গড় শক্তি, D=জলকণাসমূহের গড় ব্যাস, A=ধ্রুবক, r=জলকণাসমূহের দূরত্ব এবং N=একক আয়তনের মধ্যে জলকণা-সমূহের গড় সংখ্যা। সাধারণতঃ জলকণাগুলির গড় ব্যাসের চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারের বেলায় এই সমীকরণ প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কণার গড় ব্যাসের (D) সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের (R) একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যার সাহায্যে আমরা পাই—

$$N \times D^6 = 200 \times R^{1.6} \quad \cdots\cdots (2)$$

(1) নং সমীকরণে (2) নং প্রয়োগ করলে

$$P = \frac{200 \times A \times R^{1.6}}{r^2} \quad \cdots\cdots (3)$$

পাওয়া যায়। জলকণার দূরত্ব এবং ধ্রুবকের মান জানা থাকলে (3) নং সমীকরণ থেকে ঐ দূরত্বে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। পরিমাপের সময় রেডারের অ্যান্টিনাকে এমনভাবে রাখা হয়, যাতে সমতলভূমির খুব নিকটেই বৃষ্টি-পাতের পরিমাপ করা যায়। অভিকর্ষের ক্রিয়ায় এবং ঘূর্ণীবাত্যার প্রভাবে জলকণা অনবরতই স্থান পরিবর্তন করে। আবার উঁচু থেকে নীচে পতনের সময় জলকণা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কায় ভেঙে ছোট হয়ে যায়, আবার কখনও একাধিক কণা এক সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বড় হয়ে যায়। এই সব কারণে রেডারের সাহায্যে খুব উঁচু থেকে জলকণা মাপলে সমতলভূমি পর্যন্ত সে পরিমাপ ঠিক নাও থাকতে পারে। বিজ্ঞানী অষ্টিন এবং তাঁর সহকর্মীরা একই দূরত্বে অবস্থিত জলকণা-গুলির একই সঙ্গে রেডারের সাহায্যে এবং পুরনো পদ্ধতিতে (পাত্রের মধ্যে জল সংগ্রহ করে) দেখে (3) নং সমীকরণের যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেন। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রেডারের অ্যান্টিনাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে (3) নং সমীকরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে বহু দূর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। এমন কি, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বৃষ্টিপাতের হার এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও রেডারের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যার প্রয়োজন যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা রেডারের মাধ্যমে অন্যভাবেও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করেছেন, তবে এখানে বর্ণিত পদ্ধতিতেই ভাল ফল পাওয়া গেছে।

গত কয়েক বছরে রেডারের বহুল ব্যবহার আজ হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে রেডারের প্রযুক্তিবিদ্যায় আকর্ষণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে রেডারের অবদান বহুমুখী। মানুষ নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানকে যে কিভাবে প্রয়োগ করছে, রেডার তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সংশ্লেষণের মাধ্যমে জিনের ভাষা বিশ্লেষণ—খোরানার যুগান্তকারী আবিষ্কার

দেবব্রত নাগ ও জগৎজীবন ঘোষ*

জীবনের ভাষা

জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতি অনবরত তিনটি ভাষায় ব্যক্ত হচ্ছে। প্রথমটি হলো—প্রজনন-বিস্তার ভাষা। এই ভাষার রহস্য খুঁজে পাওয়া গেল প্রায় পঞ্চাশ বছরের গবেষণা থেকে। জানা গেল, বংশজাত ধর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে আছে জীবকোষে অবস্থিত একটি বিশেষ সরল মানচিত্রে।

দ্বিতীয়টি হলো—প্রোটিনের ভাষা, যার মূলে আছে প্রায় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম-পর্যায়। বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলি থাকবার দরুণ বহু হাজার রকম বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রোটিনের সৃষ্টি হয়েছে।

আর তৃতীয়টি হলো—নিউক্লিক অ্যাসিডের ভাষা, যার মূলে আছে মাত্র চারটি নিউক্লিয়োটাইড। পিউরিন অথবা পিরিমিডিনের সঙ্গে যুক্ত রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং ফস্ফরিক অ্যাসিডের যৌগগুলিকে নিউক্লিয়োটাইড বলা হয়।

ইদানীং তিনটি ভাষার মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, যা জীব-জগতের বহু সমস্যা সমাধান করবে। এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ.

আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর আগে অর্থাৎ 1866 সাল নাগাদ—মেণ্ডেলের মতে জিন হলো বংশানুক্রমের মূলাধার, যদিও জিনের রাসায়নিক পরিচয় পাওয়া গেল 1940-'44 সালে। 1869 সালে সুইস বিজ্ঞানী Friedrich Miescher প্রথম জীবকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল থেকে নিউক্লিন নামক একটি পদার্থ পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে এর নামকরণ করা হয়েছিল নিউ-ক্লিক অ্যাসিড। এর বহু বছর পরে নিউক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্ব জানা গেছে। O. Avery এবং তাঁর দুই সহকর্মী C. Macleod এবং M. McCarty (1940-'45) দেখলেন যে, নিউমোকক্কাস নামক ব্যাক্টিরিয়া দুই রকমের হয়ে থাকে। কতকগুলি মসৃণ প্রকৃতির এবং কতকগুলি অমসৃণ প্রকৃতির। মসৃণ নিউমোকক্কাস-গুলি নিউমোনিয়া রোগের কারণ, কিন্তু অমসৃণ-গুলি নয়। যদি ইঁদুরের দেহে জীবিত অমসৃণ নিউমোকক্কাসের সঙ্গে মৃত মসৃণ নিউমোকক্কাস মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়, তবে ইঁদুরের রক্তে জীবিত মসৃণ নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়; অর্থাৎ মসৃণ নিউমোকক্কাসের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য মৃত অবস্থাতেও অমসৃণ নিউমোকক্কাসকে মসৃণে পরিণত করতে পারে। এবার মৃত মসৃণ নিউমোকক্কাসের ডি. এন. এ. জীবিত অমসৃণ নিউমোকক্কাসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, অমসৃণগুলি মসৃণে পরিণত হয়েছে। কেবল তাই নয়, এরপর মসৃণ ধর্মটির স্থায়িত্বও প্রমাণিত হলো। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো যে, জিন—যা হলো বংশানুক্রমের মূলাধার, তার রাসায়নিক পরিচয় ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। ডি. এন. এ. সম্পর্কে কৌতূহল তখন আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

---

* [illegible]

ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের সম্পর্ক

একদিকে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি এবং অন্যদিকে ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে Beadle এবং Tatum দেখালেন যে, জিন এবং জৈব অনুঘটকের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। জিনে কোন রকম ত্রুটি দেখা দিলে জৈব অনুঘটকটি হয়তো তৈরি নাও হতে পারে কিংবা অকেজো প্রোটিন অণু তৈরি হয়ে থাকে। সমস্ত জৈব অনুঘটকই প্রোটিন। তাই জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ. জানবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন সংশ্লেষণে ডি. এন. এ.-র ভূমিকাও প্রমাণিত হলো।

ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি

1953 সালে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির পরিচয় দিলেন বৈজ্ঞানিক Watson এবং Crick। তাঁদের মতে, ডি. এন. এ. হলো দ্বি-তন্ত্রী (Double stranded)। এর এক-একটি তন্ত্রী তৈরি হয়েছে চারটি বিভিন্ন নিউক্লিয়োটাইডের বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে। নিউক্লিয়োটাইডগুলি হলো অ্যাডেনিন নিউক্লিয়োটাইড, গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড, থাইমিন নিউক্লিয়োটাইড এবং সাইটোসিন নিউক্লিয়োটাইড। এক-একটি নিউক্লিয়োটাইডে থাকে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন—এই চারটি জৈব পদার্থের যে কোন একটি শর্করাজাতীয় পদার্থ, যেমন—ডি-অক্সিরিবোস এবং অজৈব ফসফরিক অ্যাসিড। এদের মধ্যে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) পিউরিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ আর সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন (T) পিরিমিডিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ। বলার কথা এই যে, কেবল মাত্র A-এর সঙ্গে T এবং G-এর সঙ্গে C দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধনীর (Hydrogen bonding) সাহায্যে যুক্ত হতে পারে। তাই দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র একটি তন্ত্রীতে যখন A থাকে, অন্যটিতে থাকে তখন T, তেমনি G হলো C-এর পূরক। এভাবে ডি এন. এ.-র একটি তন্ত্রী অপরটির পরিপূরক হয়ে থাকে। Watson এবং Crick-এর মতে, দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র এক-একটি তন্ত্রী সমান্তরালভাবে থেকে মোচড় দেওয়া লোহার সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে। এক-একটি তন্ত্রী অপরটির সঙ্গে বহু সংখ্যক AT এবং GC-এর হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। পরবর্তী বহু রাসায়নিক, প্রাণরাসায়নিক এবং ভৌত পরীক্ষা থেকে Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি প্রমাণিত হয়েছে। ডি. এন. এ.-র এই একটিমাত্র গঠন-প্রকৃতি, কোষ বিভাজন, বংশজাত ধর্ম, বংশজাত ধর্মের সংমিশ্রণ, বংশজাত ধর্মের স্থায়ী পরিবর্তন (Mutation) এবং তার প্রকাশ প্রভৃতি জীববিদ্যার বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কেবল তাই নয়, বংশানুক্রমের মূলাধার জিন যে স্বাতন্ত্র্য (Specificity) এবং অনুলিপি (Replicability) বজায় রেখে চলে, তা Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির দ্বারাই পুরাপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব (1নং চিত্র)।

1956 সালে বৈজ্ঞানিক Kornberg ডি. এন. এ. পলিমারেজ জৈব অনুঘটকটি আবিষ্কার করেন এবং প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, ডি. এন. এ. নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে।

আর. এন. এ.-র পরিচয়

এতক্ষণ ডি. এন. এ.-র কথা বলা হলো। আর এক রকম নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, তার নাম রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর. এন. এ.। ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র মধ্যে পার্থক্য শুধু ডি. এন. এ.-র ডি-অক্সিরিবোস এবং

থাইমিন-এর জায়গায় আর. এন. এ. তে যথাক্রমে রিবোস এবং ইউরাসিল থাকে। আর. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি যতটা জানা গেছে তা হলো, আর এন. এ. কোথাও দ্বি-তন্ত্রী আবার কোথাও এক-তন্ত্রী। আর. এন. এ. প্রধানতঃ তিন রকমের।

1নং চিত্র
ডি. এন. এ.-র গঠন।

1960 সালে বৈজ্ঞানিক Jacob এবং Monod এক রকমের ডি. এন. এ. সদৃশ ক্ষণস্থায়ী আর. এন. এ. আবিষ্কার করেন। এর নাম বার্তাবহ আর. এন. এ. (messenger—RNA) বা সংক্ষেপে m-R. N. A.। আর এক রকম আর. এন. এ. আছে, যা কোষের রিবোসোম নামক যন্ত্রের সঙ্গে বেশীর ভাগ যুক্ত থাকে। তাছাড়া কতকগুলি আর. এন. এ. অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে। এদের বলা হয় পরিবাহক আর. এন. এ. (transfer-R. N. A)। জীবকোষে প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবাহক আর. এন. এ. আছে। এগুলি আকৃতিতে ছোট এবং গঠন-প্রকৃতি অনেকটা লবঙ্গ পাতার (Clover leaf) মত। 2নং চিত্রে ফিনাইল অ্যালানিন পরিবাহক আর. এন. এ-টির গঠন-প্রকৃতি দেখানো গেল।

জিনের ভাষা বিশ্লেষণ

আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র ভাষা পড়বার ক্ষমতা এখনও আমরা অর্জন করি নি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ডি. এন. এ. কিংবা আর. এন. এ.-র ভাষা নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায়ের উপর নির্ভর করে। আর প্রোটিনের ভাষা নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায়ের উপর। বৈজ্ঞানিক Sanger-এর পদ্ধতিতে আজকাল প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় জানা সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণের তেমন কোন প্রণালী এখনও সাফল্য লাভ করে নি।

জীবকোষ থেকে যে ডি. এন. এ. পাওয়া যায়, তার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রথমে খানিকটা ধারণা করে নিলে হয়তো নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ যে এক জটিল ব্যাপার, তা অনুমান করা সহজ হবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহ রক্তকোষ, পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ, চর্মকোষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রায় 10^{13}টি কোষ দিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে আছে 46টি ক্রোমোজোম। আর এক-একটি ক্রোমোজোমে ডি. এন. এ. এমন জটিল প্যাঁচ খেয়ে আছে যে, একটি মানুষের জীবকোষ থেকে যতটা ডি. এন. এ. উদ্ধার করা যায়, তা লম্বালম্বিভাবে সাজালে দৈর্ঘ্যে দাঁড়ায় প্রায় 2 গজ অর্থাৎ 6 ফুট। এই 6 ফুট ডি. এন. এ.-তে আছে বহু হাজার নিউক্লিয়োটাইড। এবার ধারণা করা যাক, 10^{13}টি কোষের ডি. এন. এ. গুলিকে যদি পাশাপাশি রাখা যেত, তবে কি হতো? দৈর্ঘ্য দাঁড়াতো 6×10^{13} ফুট অর্থাৎ 11×10^{9}

মাইলেরও বেশী। তার মানে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব (প্রায় 24×10^4 মাইল), তা 20 হাজার বারেরও বেশী যাওয়া-আসা করা যেত।

সুতরাং এটা অনুমেয় যে, জীবকোষের ডি. এন. এ.-র সমান দৈর্ঘ্যের একটি কৃত্রিম ডি. এন. এ., যার মধ্যে বহু হাজার নিউক্লিয়োটাইড

এন. এ.-পলিমারেজ দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র কেবল মাত্র একটি তন্ত্রীর ভাষাই প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ-কে সহায়তা করে। কিন্তু ইদানীং জানা গেছে, আর. এন. এ.-পলিমারেজ যখন যে তন্ত্রীর যে স্থানে যুক্ত হয়, সেখান থেকেই একটি নির্দিষ্ট গতিপথে ডি. এন. এ.-র ভাষা প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ.-কে

2নং চিত্র

ফিনাইল অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. র গঠন।

আছে, তা সংশ্লেষণ করা আধুনিক রসায়নের মাপকাঠিতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় অর্থাৎ ডি. এন. এ.-র দুর্ভেদ্য ভাষা যে বর্ণমালায় সজ্জিত, তা সহজেই প্রতিলিপিকরণ এবং অনুবাদন করতে পারে একমাত্র আর. এন. এ.। এই কাজে আর. এন. এ.-কে সহায়তা করে আর. এন. এ.-পলিমারেজ নামক একটি জৈব অনুঘটক। আগে ধারণা ছিল, আর.

সহায়তা করে।

খুবই আশার কথা এই যে, মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন পরিবাহক-আর. এন. এ. ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক ডক্টর হোলি (1965) ঐ আর. এন. এ. টির গঠন-প্রকৃতি ও নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করেছেন। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. কেবলমাত্র অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করতে পারে। এর গঠন-প্রকৃতি

অনেকটা লবঙ্গ পাতার মত। যদিও মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-তে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় জানা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা এক অতি দুরূহ ব্যাপার। এর কারণ হলো, প্রচলিত বিকারকগুলি (Reagents) নিউক্লিক অ্যাসিডকে এলোপাথারি ভেঙ্গে দেয়। ফলে পর পর নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা যায় না। তাই বলা যায়, খোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড-সংশ্লেষণ পদ্ধতিটি নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় বিশ্লেষণের প্রকৃত উপায়। কেবল তাই নয়, জিন-এর কতটুকু অংশ কোন্ বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, তার কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিচায়ক।

খোরানার পদ্ধতিতে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ

অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র পরিচয় খোরানার কাজকে অনেকটা এগিয়ে দিল। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র মূলে যে জিনটি অংশগ্রহণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় খোরানা কাগজে-কলমে লিখলেন। উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি জিন সংশ্লেষণ করা, যা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে। কেবল তাই নয়, সংশ্লেষিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. প্রাণরাসায়নিক প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা।

খোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ তিনটি প্রধান ধাপে আলোচ্য।

প্রথম: (1952-1962)—কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত পলিনিউক্লিয়োটাইড এবং ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতির উদ্ভাবন।

দ্বিতীয়: (1962-1967)—বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে জিনের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য, যা কোন নির্দিষ্ট প্রোটিন কিংবা আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তা নির্ধারণ করা। আর. এন. এ.-র নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় অবলম্বন করে যে জিনটি আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা।

তৃতীয়: (1967 থেকে সুরু)—প্রথমে ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ এবং পরে ঐগুলি বিশেষ প্রণালীতে জুড়ে একটি লম্বা ডি. এন. এ. তৈরি করা, যা স্বাভাবিক প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে আর. এন. এ. কিংবা প্রোটিন তৈরি করতে পারবে।

পলিনিউক্লিয়োটাইডে থাকে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড। সুতরাং ধাপে ধাপে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি হতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, পিউরিন অথবা পিরামিডিনের সঙ্গে রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস যুক্ত থাকলে নিউক্লিয়োসাইড তৈরি হয়। দু-একটি নিউক্লিয়োসাইড, নিউক্লিয়োটাইড এবং পলিনিউক্লিয়োটাইডের পরিচয় দেওয়া গেল (3নং চিত্র)।

সংশ্লেষণ-পদ্ধতি

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নিউক্লিয়োসাইডে কতকগুলি মুক্ত হাইড্রক্সিল বা $-OH$ মূলক এবং অ্যামিনো বা $-NH_2$ মূলক আছে। নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে এই মূলকগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। মূলকগুলি নানাভাবে দুটি নিউক্লিয়োসাইডকে ফস্ফরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে যুক্ত হতে বাধা দেয়। সে জন্যে মূলকগুলিকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বিকারক থেকে রক্ষা করা

হয়ে থাকে। যে সব প্রচলিত রক্ষক-বিকারক (Protecting agent) —OH, —NH_2 এবং ফস্‌ফেট (PO_4-3) মূলককে রক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো বেঞ্জয়িল ক্লোরাইড, অ্যানিসোয়িল ক্লোরাইড, পেরামিথোক্সিফিনাইল, ট্রাইটিল ক্লোরাইড ইত্যাদি। রক্ষক-বিকারকগুলি সংযোজক বিকারক (Condensing agent)। উল্লেখযোগ্য যে, সংযোজক বিকারকগুলি হলো ডাইসাইক্লোহেক্সাইলকার্বোডাই-ইমাইড বা সংক্ষেপে ডি. সি. সি. অ্যারোমেটিক সালফোনিক অ্যাসিড ক্লোরাইড প্রভৃতি।

রক্ষক-বিকারক, সংযোজক-বিকারক ইত্যাদি

পিউরিন :-

অ্যাডেনিন (A) গুয়ানিন (G)

পিরিমিডিন :-

সাইটোসিন (C) থাইমিন (T) ইউরাসিল (U)

ছোট পলিনিউক্লিয়োটাইড

নিউক্লিয়োসাইড :-

নিউক্লিয়োটাইড :-

অ্যাডেনিন-নিউক্লিয়োসাইড সাইটোসিন-নিউক্লিয়োসাইড সাইটোসিন-নিউক্লিয়োটাইড অ্যাডেনিন-নিউক্লিয়োটাইড

3নং চিত্র

ব্যবহার করবার সুবিধা হলো, পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি হয়ে গেলে রক্ষক-বিকারকগুলিকে সহজেই সংশ্লেষিত অণু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়।

কতকগুলি বিকারক আবার নিউক্লিয়োটাইড-গুলির মধ্যেকার ফস্‌ফেট সেতু-বন্ধনী তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এদের বলা হয় ফস্‌ফেট সেতু ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ধাপে খোরানা ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ করেছেন।

মূল উপাদান

1 রক্ষক-বিকারকের সাহায্যে বিভিন্ন —OH এবং —NH_2 মূলকগুলি রক্ষা করা।

(2) সংযোজক-বিকারকের সাহায্যে নিউক্লিয়োটাইডগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং ধাপে ধাপে ছোট পলিনিউক্লিয়োটাইড প্রস্তুতি (5-20টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত)।

(3) উন্নত আধুনিক প্রণালীতে বিশুদ্ধ পলিনিউক্লিয়োটাইড স্বতন্ত্রীকরণ।

প্রণালীতে ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী পলিনিউক্লিয়োটাইডের সংযোজন।

ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের সক্রিয় জিন বা ডি. এন. এ.

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাসায়নিক প্রণালীতে কেবলমাত্র কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইড

খোরানার পদ্ধতিতে ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ

4নং চিত্র
সংশ্লেষিত ডি. এন. এ

(4) পলিনিউক্লিয়োটাইড থেকে রক্ষক-বিকারক বিচ্ছিন্ন করা।

(5) রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক

সমন্বিত পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি করা সম্ভব। এগুলিকে ওলিগোনিউক্লিয়োটাইড (Oligonucleotide) বলা হয়। ওলিগোনিউক্লিয়োটাইড-

গুলিকে রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক প্রণালীতে জুড়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি করা হয়। একাজে লাইগেজ নামক একটি জৈব অনুঘটক ব্যবহার করা হয়। দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি হয়ে গেলে তার পরিপূরক এক-তন্ত্রীগুলির অনেক জায়গা থাকে ভাঙা। সেগুলিকে জোড়বার জন্যে E. coli থেকে পাওয়া ডি. এন. এ. পলিমারেজ নামক জৈব অনুঘটকটি ব্যবহৃত হয় (4নং চিত্র)।

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের বাস্তব রূপ

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণই সব শেষ নয়। দেখতে হবে, নিউক্লিক অ্যাসিডের কোন্ ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য জীবকোষের কোন্ একটি বিশেষ ঘটনাকে রূপ দিতে সক্ষম। এটি যাচাই করে দেখতে হলে জিন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জিন অথবা ডি. এন. এ. এবং এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিমধ্যে একরকম প্রায় জানা হয়ে গিয়েছিল।

জিন বা ডি. এন. এ. —প্রতিলিপিকরণ→ আর. এন. এ. —অনুবাদন→ প্রোটিন

জিন-সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে বৈজ্ঞানিকেরা নানা উপায়ে জিনের ক্ষুদ্রতম অংশ, যা কোন একটি বিশেষ প্রাণরাসায়নিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা জানবার চেষ্টা করেছিলেন। দু-একজন খানিকটা সফলতা অর্জন করলেও এই কাজ শ্রমসাপেক্ষ—এমন কি, কোন নির্দিষ্ট পথের নির্দেশও নেই। খোরানার পদ্ধতিটিতে পথের নির্দেশ তো আছেই—এমন কি, সফলতা লাভের আশাও অনেক গুণ বেশী। মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত পূর্বনির্ধারিত নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় জানা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-কে যে জিনটি সংশ্লেষণ করতে পারে, তার সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় প্রথমে ডক্টর খোরানা কাগজে লিখলেন। এরপর 5-20টি নিউক্লিয়োটাইডের দৈর্ঘ্যের সমান 15টি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তারপর জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে তিনটি পৃথক লম্বা ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তিনটি লম্বা ডি. এন. এ.-কে জুড়ে 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত একটি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। এই ভাবে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের ডি. এন. এ., যা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে, তা পরীক্ষা-নলে সংশ্লেষণ করলেন। এবার পরীক্ষা-নলে 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত ডি. এন. এ.-টি ব্যবহার করে এবং অন্যান্য যা যা প্রয়োজন, তা দিয়ে অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টিও তৈরি করলেন। সংশ্লেষিত আর. এন. এ.-টি সক্রিয় কিনা, এবার তা পরীক্ষা করবার পালা। C^{14}-চিহ্নিত অ্যালানিন, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ. এবং বিক্রিয়ার অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকলে দেখা গেল, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ.-টি C^{14}-অ্যালানিনকে প্রোটিনে জুড়ে দিতে পারে। এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে—

ডি. এন. এ. —প্রতিলিপিকরণ→ আর. এন. এ. —অনুবাদন→ প্রোটিন

ঘটনাটির বিভিন্ন ধাপগুলি প্রমাণ করলো। খোরানার অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি কতটুকু সক্রিয়, তা আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন একটি জীবাণুতে, যার মধ্যে অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি অনুপস্থিত। এই ধরণের কাজ জীবকোষে সংশ্লেষিত জিনের সক্রিয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

তাৎপর্য

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের তাৎপর্য বহুমুখী। সুদূরপ্রসারী কল্পনায় না যেতে আমাদের বাস্তব পরিকল্পনাটি প্রথম তৈরি করতে হবে। মনে হয়, আধুনিক আণবিক প্রজনন প্রয়োগ-বিদ্যার উন্নতি সাধন করে বহু বংশজাত ত্রুটি সংশোধন করতে বিজ্ঞানীসমাজ এখন বেশ উৎসাহী। ইতিমধ্যে অনেকেই ডায়াবেটিস নামক ভয়ঙ্কর রোগের স্থায়ী প্রতিবিধান করবার জন্যে চিন্তা ও চেষ্টা করছেন। যকৃৎ থেকে স্বাভাবিকভাবে ইনসুলিন নামক উত্তেজক রসটি সংশ্লেষিত না হলে কিংবা স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত না হলে ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। আশার কথা এই যে, ইনসুলিনের গঠন-প্রকৃতি এবং এর অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় বৈজ্ঞানিক Sanger বহুদিন আগেই নির্ধারণ করেছিলেন। এখন বাকী শুধু এমন একটি ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের জিন তৈরি করা, যা ইনসুলিন তৈরি করতে পারে। পশ্চাৎ অপসরণ পদ্ধতি (Extrapolation method) অবলম্বন করে প্রথমে ইনসুলিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় থেকে আর. এন. এ.-র সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা এবং পরে ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় স্থির করা—এর পর খোরানার পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে ডি. এন. এ.-টি তৈরি করা। এখানেই সফলতা সম্পূর্ণ নয়। সংশ্লেষিত ডি. এন. এ.-টি সাধারণ জীবকোষে কতটা সক্রিয়, তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোন রকম ভুলত্রুটি থাকলে হয়তো আরও দুরারোগ্য ব্যাধির সম্মুখীন হতে হবে। সে জন্যে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি জটিল ব্যাধিগুলির মোকাবেলা করবার আগে আমাদের আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেলে নিকট ভবিষ্যতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নির্মূল সাধনে খোরানার 'জিন-সংশ্লেষণ' হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

পুস্তক-পরিচয়

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা—ভি. রিড্‌নিক প্রণীত। প্রকাশক—মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদ করেছেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুমিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও ডক্টর জয়ন্ত বসু। ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও ডক্টর জয়ন্ত বসু। পৃষ্ঠা-323 ; মূল্য 6·00 টাকা।

বাংলাভাষী পাঠকের সম্মুখে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ, চমকপ্রদ আবিষ্কার এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যকে উপস্থাপিত করবার মত উল্লেখযোগ্য পুস্তকের একান্তই অভাব। এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় মৌলিক পুস্তক রচনা নিঃসন্দেহে কাম্য, তবে তার অভাবে অন্য ভাষায় রচিত প্রামাণ্য পুস্তকের অনুবাদও সমভাবে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। এই পুস্তকের প্রকাশ সে জন্যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

1900 সালের 17ই ডিসেম্বর ম্যাক্স প্লাঙ্ক বস্তুর তাপীয় বিকিরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সে দিন থেকে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হলো, ক্লাসিক্যাল পদার্থ-বিজ্ঞান চিন্তার অপূর্ণতা ধরা পড়লো। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে যে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের শুভ আবির্ভাব, তা স্বল্পকালের মধ্যে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত শাখাই পদার্থ-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে প্রভাবিত হয়ে পুষ্টিলাভ করেছে এবং মানবসমাজের চিন্তাধারাকেও গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ—প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে প্রাথমিক বস্তুকণা সম্পর্কিত অতি আধুনিক ধারণা কোয়ার্ক পর্যন্ত—এই পুস্তকে খুবই সরল এবং চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুস্তকটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার সীমাবদ্ধতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবির্ভাব বিবৃত হয়েছে। তপ্ত বস্তুর উত্তাপ বিকিরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তেজস্ক্রিয়তা ও রঞ্জেন রশ্মির আবিষ্কার ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। আইনষ্টাইনের ফোটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া প্লাঙ্কের তত্ত্বকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

1912 সালে নীল বোর হাইড্রোজেন-বর্ণালীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 1924 সালে লুই দ্য ব্রগ্‌লি জড় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করেন। এর কয়েক বছর পরে ডেভিসন ও জারমার এবং ডার্টাকভ্‌স্কি কেলাসের দ্বারা ইলেকট্রনের অপচ্যুতি (Diffraction) পরীক্ষা করেন; এতে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম প্রমাণিত হয়। পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব বিষয় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 1927 সালে ভার্ণার হাইসেনবার্গ এবং অ্যারভিন শ্রোয়েডিঙ্গার আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রপাত করেন। ক্লাসিক্যাল বলবিদ্যার বক্তব্য নিশ্চয়তামূলক, তাতে সম্ভাব্যতার কোন স্থান নেই। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বক্তব্য সকল সময়ের সম্ভাব্যতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে ইলেকট্রন বা অন্যান্য কণার স্থৈতিক বাধা (Potential barrier) অতিক্রমণের ঘটনা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরমাণু, অণু ও কেলাসের ধর্ম ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ বিবৃত হয়েছে। পরমাণুর মিলনে অণু গঠনে বিনিময়ী মিথস্ক্রিয়ার (Exchange interaction) ভূমিকার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। রেখাচিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন মেঘের ব্যাখ্যাও খুব সুন্দর।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ শুধু পারমাণবিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরমাণু-কেন্দ্রকের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরমাণু-কেন্দ্রকের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, মৌল কণার সৃষ্টি ও পারস্পরিক প্রক্রিয়ার আধুনিক তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। কেন্দ্রকে নিউট্রন ও প্রোটনের একত্র অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী টাম এবং উকাওয়া কেন্দ্রকের নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে তীব্র বিনিময়াত্মক আকর্ষণী বলের অনুমান করেন। উকাওয়া অন্ত কোন মৌলিক কণা (পরে যার নাম দেওয়া হয়েছে মেসন) বিনিময়ের ফলে এই বলের সৃষ্টি হয় বলে প্রস্তাব করেন। 1947 সালে পাওয়েল সেই অভীপ্সিত পাই-মেসন আবিষ্কার করেন। মৌল কণার পারস্পরিক ক্রিয়াসঞ্জাত বলসমূহের মধ্যে কেন্দ্রকীয় বলই সর্বাধিক জোরালো—অবশ্য এর বিস্তার খুবই কম।

পুস্তকটির শেষ অংশে কেন্দ্রকের বিভিন্ন মডেল, কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং মৌল কণার বিপরীত কণার অস্তিত্ব, মৌলকণার অনুনাদ প্রভৃতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মৌল বিন্যাসে ত্রিতয়, অষ্টতয় প্রভৃতির অনুমান ও সেই সঙ্গে কোয়ার্ক ইত্যাদিরও যথেষ্ট ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পুস্তকে সন্নিবেশিত বহুল তথ্যের পরিচয় এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া দুঃসাধ্য। মৌল কণাসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হওয়াতে পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তকটিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সেগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা পুস্তকটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন ডক্টর জয়ন্ত বসু। বাংলা ভাষায় রচিত প্রতিটি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকে এরূপ তালিকা প্রদত্ত হলে তা পরিভাষা-সমস্যার সমাধানে বহুলাংশে সহায়ক হবে।

এই তথ্যবহুল ও জনপ্রিয় পুস্তকের অনুবাদে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই প্রকার অনুবাদ পুস্তকের বহুল প্রচার সর্বথা কাম্য এবং বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি প্রচেষ্টা প্রথম বলেই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কয়েক ক্ষেত্রে অনুবাদ আক্ষরিক অর্থেই ইংরেজীর অনুগামী হয়েছে। ফলে স্থানে স্থানে ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য হয়েছে। এই ধরণের অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সাবলীল করবার জন্যে অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ভাব অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী এবং বাংলার বাচনভঙ্গী তো একরকম নয়।

একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, গ্রন্থটির উপযোগিতার কথা চিন্তা করলে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুবই নগণ্য মনে হয়। সর্বস্তরের শিক্ষিত বাংলাভাষী পাঠকই এই গ্রন্থ পাঠে আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বস্তুতপক্ষে এইরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুবাদক এবং প্রকাশক আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের দ্বার সবার কাছে উন্মোচিত করেছেন—এই জন্যে বাংলাভাষী জনসাধারণ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত*

---

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — নবম-দশম সংখ্যা

বসন্ত সমাগমে অ্যারিজোনার মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্যে বিরাট আকৃতির ক্যাকটাস গাছে (সিজ বা মনসাজাতীয় গাছ) ফুল ফুটেছে।

কৃত্তিকা যার নাম

শুধু চোখে দেখা।

সন্ধ্যার নির্মল আকাশে যখন তারা ফোটে এক, দুই, তিন—তখনও মহাকাশ এমন কিছু নয়, কিন্তু তারপর এক সময়ে যখন অন্ধকার জমাট বেঁধে ঘন হয়ে আসে, তখন দিনের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য তারকার মেলায় মহাকাশ অপরূপ দর্শন হয়ে ওঠে।

ঊর্ধ্বাকাশ—যেদিকে তাকানো যায়, তারা আর তারা। তার কোনটি উজ্জ্বল—সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কোনটি ম্রিয়মাণ—চেষ্টায় যার অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কোনটি একক—মহাকাশে সে নিঃসঙ্গ, কোনটি যুগ্ম—দূরবীনে যা লক্ষ্য করবার মত। তারকাগুলির বর্ণবৈচিত্র্যও আছে। কোনটির বর্ণ হলুদ—আকাশের অধিকাংশ তারকাই তাই, কোনটি রক্তিম—সেগুলি অতীব সুন্দর, সন্দেহ নেই।

আকাশে যত উজ্জ্বল এবং দর্শনীয় তারা, প্রাচীন কালের মহাকাশ অনুসন্ধানীরা সেই সব তারাগুলি নিয়ে বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর ভাবনা। সে ভাবনার পরিচয় পাই—রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনী ও উপাখ্যানে।

শীতের আকাশে সন্ধ্যাবেলায় যদি সরাসরি মাথার উপরে চোখ তুলে তাকানো যায়, তাহলে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল তারকায় মেশা একটি তারকাগুচ্ছ সকলেরই নজরে আসবে, অনেকটা মুড়ির ঠোঙার মত আকৃতি—নাম তার কৃত্তিকা। মণ্ডলটিতে কয়টি তারা আছে? সহজ দৃষ্টিতে ছয়; কিন্তু দৃষ্টি যদি একটু তীক্ষ্ণ করা যায়, তাহলে মণ্ডলটিতে আর একটি তারাও নজরে আসতে পারে। সব জড়িয়ে তখন সেখানে সাতটি তারা। বাংলায় এই মণ্ডলটির একটি আটপৌরে নাম আছে। সেটি হলো সাত-ভেয়ে বা সাত ভাই চম্পা। ইংরেজীতে এটির নাম Pleiades। এটির অবস্থান পাঁচ-শ' আলোক-বর্ষ দূরে।

এই কৃত্তিকাকে নিয়ে বাংলায় আর একটি তারামণ্ডল আছে—সেটি বৃষ রাশি, ইংরেজী নাম Taurus। সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মণ্ডলটির বিভিন্ন তারা নিয়ে একটি বৃষের মূর্তি কল্পনা করেছিলেন বলেই মণ্ডলটির এই নাম। বৃষ রাশিতে রীতি-মত উজ্জ্বল একটি তারা আছে। মহাকাশে সর্বোজ্জ্বল তারাগুলির মধ্যে এটি চতুর্দশ। তারাটির নাম রোহিণী।

মহাকাশের তারা বা তারামণ্ডল নিয়ে ভারতীয় পুরাণের যে সব আখ্যান বা উপাখ্যান মনকে চমৎকৃত করে, সে রকম একটি উপাখ্যান হলো কৃত্তিকামণ্ডলের তারাগুলিকে নিয়ে। কাহিনীটি বিচিত্র সন্দেহ নেই।

কৃত্তিকা নক্ষত্রকে নিয়ে কাহিনীটি বলতে গেলে মহাকাশের আর একটি তারা-মণ্ডলের কথা না বলে উপায় নেই। এটির নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। মহাকাশে কৃত্তিকামণ্ডলে কিছুটা উত্তর-পূর্বে এটির অবস্থান। অনেকটা স্থান জুড়ে উজ্জ্বল তারা নিয়ে মণ্ডলটির অন্তহীন সৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মত। মণ্ডলটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, মণ্ডলটিতে আছে সাতটি তারা, সেই সাতটি ঋষির নামাঙ্কিত। মণ্ডলটির পূর্ব প্রান্তে আছে মরীচি, তারপর বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি। অত্রির দক্ষিণে পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ ও পুলহের উত্তরে ক্রতু।

বৃষ রাশি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর পশ্চিম প্রান্তের দুটি তারা পুলহ ও ক্রতুকে যোগ করে উত্তর দিকে বর্ধিত করলে আমরা ধ্রুবতারাটিতে পৌঁছুবো। এই ধ্রুবতারাটি উত্তর দিক-নির্দেশ করে এবং প্রাচীন কালে সকলের কাছে ঐ তারাটিই ছিল দিক-নির্দেশক। তারাটি বিশেষ উজ্জ্বল নয়। পাছে ভুল হয়, এই কারণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুলহ ও ক্রতুকে অবলম্বন করেই ধ্রুবতারাকে চিনবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, সপ্তর্ষিমণ্ডলে যে সাতজন ঋষি আছেন, তাঁদের স্ত্রীদের কথায় আসা যাক। সপ্তর্ষির স্ত্রীদের নাম অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, অরুন্ধতী, শিবা এবং লজ্জা। এর মধ্যে অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের খুব কাছেই একটি অনুজ্জ্বল

তারা আছে, সেটিই বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী হিসাবে নির্দিষ্ট। অন্যান্য ঋষিদের কাছে কোন তারা নেই। ফলে সপ্তর্ষির অন্য ছয় ঋষির সঙ্গে তাঁদের পত্নীরা যুক্ত হন নি। তাহলে তাঁরা কোথায়? পৌরাণিকেরা তাঁদের কৃত্তিকামণ্ডলে প্রত্যক্ষযোগ্য ছয়টি তারায় নির্দিষ্ট রাখলেন। কিন্তু সে শুধু মুখের কথায় নয়। বক্তব্যকে কাহিনীযুক্ত করে তাঁরা তা নতুন ভাবে পরিবেশন করলেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

শাস্ত্রে আছে, অগ্নিদেব নিঃসঙ্গ—পরিবার-পরিজন কেউ নেই। হঠাৎ একদিন সপ্তর্ষির সাত পত্নীকে দেখে অগ্নিদেবের তাঁদের দাসী করবার বাসনা হলো। সেই মত প্রস্তাব—কিন্তু রাজী হলেন না ঋষি-পত্নীরা। সে বড় ভয়ানক অপমান। তখন লজ্জায় প্রাণত্যাগের জন্যে গভীর জঙ্গলে বসে অগ্নিদেব ধ্যান করতে লাগলেন।

দক্ষের কন্যা স্বাহা দেবী অগ্নিদেবের এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের কাছে এলেন। খুসী হলেন অগ্নিদেব, শিবাকে বিবাহ করলেন।

দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু সপ্তর্ষির অন্যান্য স্ত্রীদের দাসী করবার ঝোঁক তাঁর গেল না। স্বাহা কি করেন! একে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে তিনি অন্যায় করেছেন, আবার অন্য ঋষি-পত্নীদের রূপ ধারণ করতে তাঁর আগ্রহ হলো না। স্বাহা মনের দুঃখে পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বাঁধলেন।

কিন্তু অগ্নিদেবকে ছেড়ে স্বাহার বেশী দিন থাকা হলো না। স্বাহা নেই, অগ্নিদেব অস্থির—দিশাহারা। সেই অবস্থা দেখে ফিরে এলেন স্বাহা। ছয় ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে তিনি অগ্নিদেবের মনস্তুষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর রূপ

তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুন্ধতীও ছিলেন ঠিক সেই রকম মহাবিদুষী ও তাপসী। ফলে অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে তিনি সাহস পেলেন না।

সময় এগিয়ে চললো। স্বাহা একটি পুত্রের মা হলেন। অদ্ভুত দেখতে ছেলেটি। ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না। যে পাহাড়ে স্বাহা পাখী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই পাহাড়ের একটি গুহায় ছেলেটি বড় হতে লাগলো।

এদিকে মহা হুলুস্থুল। সপ্তর্ষির ছয় ঋষি শুনতে পেলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসীপনা করছেন। রুষ্ট হলেন ঋষিরা। আর রক্ষা নেই। তাঁরা স্ত্রীদের ভৎর্সনা করলেন আর সেই সঙ্গে বহিষ্কার।

অসহায় ঋষি-পত্নীরা নিরাশ্রয় হয়ে স্বাহার পুত্র স্কন্দের কাছে এসে সব বললেন। স্কন্দ বললো, চিন্তার কি আছে? ঐ উদার মহাকাশ আপনাদের আশ্রয়স্থল। আপনারা সমবেতভাবে ওখানে আশ্রয় নিন।

উদার মহাকাশ ভারতীয় পুরাণের বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের অনেক অবলম্বনেরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আজ আমাদের অবহেলায় সেগুলির মহাকাশে তারা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই।

[মহাকাশে তারকাচিত্র লক্ষ্য করবার সময়ে মনে রেখ, তারকাচিত্রকে নিম্নাভিমুখী করে মাথার উপরে ধরে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমকে সঠিকভাবে মিলিয়ে নিতে হবে।]

অরূপরতন ভট্টাচার্য

জানবার কথা

তোমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পড়ে থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ঝড়ের খবর জান কি? বিজ্ঞানীদের মতে—1934 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় প্রবাহিত ঝড়ই নাকি সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়েছিল। সেই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 231 মাইল। বিজ্ঞানীরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর্বতশীর্ষে এই ঝড় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

* * * *

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়—পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত কোন্‌টি? সবাই একবাক্যে বলবে—হিমালয় (এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্টের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হলো 29.028 ফুট)। কিন্তু জেনে রাখ—হাওয়াইয়ের মউনাকেয়া নামক পর্বতের উচ্চতা হচ্ছে 30,785 ফুট। এর মধ্যে 17.000 ফুট অবশ্য সমুদ্রের নীচে অবস্থিত।

চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্স

চিকিৎসা বলতে সাধারণতঃ যা আমাদের মনে আসে, তা হলো শিশিভর্তি মিক্সচার বা ওষুধের বড়ি, যন্ত্রপাতির মধ্যে ষ্টেথিস্কোপ বা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। আর ইলেকট্রনিক্স বলতে আমরা বুঝি রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার ইত্যাদি—যাতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব, ট্রানজিষ্টর বা ঐ জাতীয় সব উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাহলে চিকিৎসার সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের সম্পর্ক কোথায়?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের একটা ব্যবহারের কথা অবশ্য আমরা অনেক দিন থেকেই জানি। দেহের কোন ভিতরের অংশের—যেমন, কোন হাড় বা ফুসফুসের ছবি তোলবার জন্যে যখন রান্টগেন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই রশ্মি উৎপাদনের জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রধানতঃ যে কারণে সম্প্রতি চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে মরা ব্যাং নিয়ে এক ধরণের মজার পরীক্ষা।

গ্যালভানির পরীক্ষা ও জৈব বিদ্যুৎ

সে প্রায় দু-শ' বছর আগেকার কথা। ইতালির লুইজি গ্যালভানি এক মেঘলা দিনে একটি সগুমৃত ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা দেখিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একেবারে অবাক করে দিয়েছিলেন। বজ্রপাত থেকে তাঁর বাড়িকে রক্ষা করবার জন্যে বাড়ির ছাদে যে লৌহদণ্ড খাড়া করা ছিল, তাতে একটা তার বেঁধে তিনি সেই তারের অন্য প্রান্তে বাঁধলেন মরা ব্যাংটির মাথার দিকে; আর একটি তার ব্যাঙের এক পায়ে বেঁধে সেই তারের অপর প্রান্ত রাখলেন তাঁর বাড়ির কুয়ার জলের ভিতর। এরপর যখনই কাছাকাছি বজ্রপাত হচ্ছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল—ব্যাঙের দেহটি সজোরে নড়েচড়ে উঠছে। অনেকেই একে ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করলেন। কিন্তু গ্যালভানি আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের একটা অংশ ছাদের লোহদণ্ডে ধরা পড়ছিল এবং তখন ব্যাঙের দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হচ্ছিল। মরা ব্যাঙকে নাচানো যে বিদ্যুতেরই কারসাজি, তা গ্যালভানি আন্দাজ করেছিলেন।

গ্যালভানি এই ধরণের আরও পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুতের ক্রিয়ায় দেহের পেশী ও স্নায়ুতে গতির সঞ্চার হয়। তাই যদি হয়, তাহলে জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মূলেও কি বিদ্যুৎ রয়েছে? ক্রমে জানা গেল, ধারণাটা ঠিকই—প্রাণীর বোধশক্তির কেন্দ্র যে মস্তিষ্ক, সেখানে সব

খবর জানিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে কাজ করবার আদেশ পৌঁছে দেবার ব্যাপারে বিদ্যুৎপ্রবাহই দূতের কাজ করে। দেহের প্রত্যেকটি পেশী বা স্নায়ু হাজার হাজার জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের চারধারে একটি অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লীর (Membrane) আবরণ থাকে। দেহের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই সঙ্গে ঐ ঝিল্লীর বিশেষ ধর্মের ফলে ঝিল্লীর ভিতরে ও বাইরের অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব-বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বিভব-বৈষম্য থেকে কিভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ কেমন ভাবে দেহের মধ্যে কাজ করে, একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, শ্যামের পায়ে রাম একটা চিমটি কাটলো। শ্যামের পায়ের ঐ অংশের স্নায়ুকোষগুলির ভিতর ও বাইরের মধ্যে যে বিভব-বৈষম্য, তার তখন পরিবর্তন ঘটলো এবং সে জন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হলো। অতঃপর ঐ সব কোষের পার্শ্ববর্তী কোষগুলিরও ভিতর ও বাইরের বিভব-বৈষম্যের পরিবর্তন হয়ে সেগুলির মধ্য দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলো। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছুলো এবং তখনই কেবল চিমটির অনুভূতি শ্যামের বোধগম্য হলো। অতঃপর শ্যামের মস্তিষ্ক যদি মনে করে যে, তার ডান হাত দিয়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিলে ভাল হয়, তাহলে বিদ্যুৎপ্রবাহ মারফৎ মস্তিষ্কের আদেশ গিয়ে পৌঁছুবে ডান হাতের এমন সব স্নায়ুতে, যাদের সক্রিয়তায় ডান হাতটি পায়ে হাত বুলোতে থাকবে।

জৈব বিদ্যুৎ ও রোগ-নির্ণয়

প্রাণিদেহে নিরন্তর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনবরত বিদ্যুৎতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোন লোকের হাতের কব্জি বা পায়ের গোড়ালিতে ছোট ছোট ধাতব পাত্ রাখলে সেগুলি তড়িদ্দ্বার হিসাবে কাজ করে এবং তাদের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে যন্ত্রে এই সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ (Electro-cardiograph)। তড়িদ্দ্বার থেকে পাওয়া সঙ্কেত ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত সঙ্কেতের দ্বারা একটি বিশেষ কলমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আবার যন্ত্রটির এক বিশেষ ব্যবস্থায়—একটি কাগজের বাণ্ডিল থেকে ক্রমাগতই কাগজ বেরিয়ে এসে ঐ কলমের মুখের ঠিক তলা দিয়ে সমান গতিতে সরে যেতে থাকে। এই ব্যবস্থায় ঐ কাগজের উপর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হতে থাকে, তা কলমের গতির উপর নির্ভর করে। আবার ঐ কলমের গতি নির্ভর করে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের উপর—যে সঙ্কেত উৎপন্ন হয়েছে হৃৎস্পন্দনজনিত বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী। সুতরাং রেখাচিত্রটি ঐ তরঙ্গের প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই চিত্রকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম

(Electrocardiogram)—সংক্ষেপে ECG বা EKG। হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকলে ECG-এর প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট ধরণের হয়। কোন হৃদ্‌রোগ থাকলে ECG-এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ECG দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ আছে কি না। কোন রোগ থাকলে ECG পরীক্ষা করে চিকিৎসক বহু ক্ষেত্রেই রোগটি নির্ণয় করতে পারেন।

আমাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph)। এই যন্ত্র থেকে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (Electroencephalogram)—সংক্ষেপে EEG। স্নায়বিক রোগ নির্ধারণে EEG-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের পেশী, চোখ বা চোখের রেটিনায় বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যেও পৃথক পৃথক যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স

আমাদের দেহের ভিতরের বিদ্যুৎতরঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। যখন কোন গুরুতর অস্ত্রচিকিৎসা চলতে থাকে, তখন দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চিকিৎসকের সব সময়েই জানা দরকার। এই ব্যাপারে ইলেকট্রনিক্স তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা বলি। হৃৎপিণ্ড উন্মুক্ত করে যখন অস্ত্রোপচার করা হয়, তখন রোগীর দেহের অবস্থা ক্রমাগত নির্ধারণ করবার জন্যে উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে রোগীর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ প্রভৃতি চব্বিশটি বিভিন্ন বিষয় একই সঙ্গে নির্ণয় করা হতে থাকে। টেপ-রেকর্ডারে যে টেপ বা ফিতা ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ফিতায় ঐ সব তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার মাধ্যমে কতকগুলি বোর্ডের উপর সেগুলি প্রদর্শিত হয়। চিকিৎসক ঐ বোর্ডগুলির দিকে একবার তাকিয়েই রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক জানতে পারেন। প্রতি আধ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর বোর্ডের সংখ্যাগুলি পাল্টে যেতে থাকে। ফলে রোগীর অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন হয়, তা প্রায় তখনই চিকিৎসকের নজরে পড়ে। এছাড়া রোগীর হৃৎস্পন্দনের শব্দ পরিবর্ধিত করে চিকিৎসককে শোনাবার ব্যবস্থা থাকে। কোন সময় যদি ঐ শব্দ অস্বাভাবিক বলে চিকিৎসকের মনে হয়, তিনি পাঁচ মিনিট আগেকার শব্দের সঙ্গে তখনই তা তুলনা করে দেখতে পারেন। যে ফিতার উপর ঐ শব্দের সঙ্কেত ধরা থাকছে, সেটির পাঁচ মিনিট আগেকার অংশ আবার বাজালেই পাঁচ মিনিট আগের শব্দ তিনি এখন ফের শুনতে পারেন। অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রোগীর অবস্থা কেমন থাকছে এবং সেই

অনুযায়ী চিকিৎসার কোন হেরফের করতে হবে কি না, চিকিৎসক এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে পারেন। কঠিন অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে ঐ যন্ত্রের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসকে অচল করে তার পরিবর্তে 'হার্ট-লাং' যন্ত্র (533 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নামে একটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার চলবার সময় এই যন্ত্রটি দেহের বাইরে থেকেই হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের কাজ সঠিকভাবে করে যায়। এই যন্ত্রের জন্যে যে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দরকার, তা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক্সের যথাযথ প্রয়োগে।

বিবিধ

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হলে ক্রমাগত সেই অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। যদি অবস্থা গুরুতর হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাবার জন্যে যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই একটি ঘণ্টা বাজতে থাকে বা একটি আলো জ্বলে ওঠে।

হৃদ্রোগের ফলে যদি কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন ব্যাহত হতে থাকে, তবে সেটা তার দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। এরকম রোগীর জন্যে ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র (পৃঃ 619) নির্মিত হয়েছে। সামান্য অস্ত্রোপচার করে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে বক্ষচর্মের নীচে বসিয়ে তার দিয়ে একে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। ব্যাটারী-চালিত এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে তার স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার এখন প্রতি বছর কয়েক হাজার করে বাড়ছে।

যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁদের জন্যে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও শব্দকে যথেষ্ট পরিবর্ধিত করে তাঁদের শুনতে সাহায্য করে। যাঁদের কোন অঙ্গহানির ফলে কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের ঐ অঙ্গের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়।

দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাদের কোনটির মধ্যে কোন ভাঙচুর ঘটেছে কি না বা ফোড়াজাতীয় কোন কিছুর উৎপত্তি হয়েছে কি না—দেহের বাইরে থেকেই এই সব নির্ণয় করবার জন্যে আজকাল শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ মাথার মধ্যে ফোড়া হলে তা নির্ধারণ করবার পক্ষে এই তরঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী। শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রকৃতি সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত, তবে এর কম্পনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী। এই তরঙ্গ আমাদের দেহের মধ্যে সহজেই প্রবেশ

করতে পারে। শব্দোত্তর তরঙ্গের উৎপত্তি ও প্রয়োগের মূলে রয়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ঐ যে মাথার মধ্যে ফোড়ার কথা বলা হলো, ওটা দেহের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বর্তমানে এর চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে লেসার নামক

হৃৎস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র

এই ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে রোগীর বক্ষচর্মের নীচে বসিয়ে তার দিয়ে একে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। বর্তমানে কেবল আমেরিকাতেই প্রায় 12,000 লোক এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

এক ধরণের যন্ত্রের সহায়তায়। লেসার থেকে যে শক্তিশালী আলোকরশ্মি পাওয়া যায়, তাকে মাথার মধ্যে পাঠিয়ে ফোড়া নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া লেসার-রশ্মি প্রয়োগে চোখের রেটিনার ছিন্ন স্নায়ু জোড়া দেবার মত সূক্ষ্ম কাজও এখন করতে পারা যাচ্ছে।

রোগ নির্ণয়ের জন্যে নানারকম যন্ত্রপাতির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নামে যে যন্ত্র আছে, তা আবার অন্যভাবে চিকিৎসককে

রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কোন্ রোগে কি কি উপসর্গ দেখা দেয়, সেই বিষয়ে যত তথ্য জানা আছে, তা সব কম্পিউটারে সঞ্চিত করা থাকে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি দেখে কম্পিউটারকে জানালে কম্পিউটার সেগুলিকে বিভিন্ন রোগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক রোগটি নির্ণয় করে জানিয়ে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্যে বহু বইপত্র ঘেঁটে চিকিৎসককে যে সময় ব্যয় করতে হয়, কম্পিউটারের সাহায্য পেলে তার আর দরকার হয় না।

কোন রোগীকে প্রয়োজনমত অচেতন করবার জন্যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের কথা তোমরা বোধ হয় শুনেছ। এখন কিন্তু রোগীর মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়েও তাকে অচেতন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে রোগীর কোন রকম কষ্ট হয় না। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেই আবার রোগীর চেতনা ফিরে আসে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়, তার নাম ইলেকট্রোঅ্যানাস্থেসিয়া (Electroanaesthesia)। এই যন্ত্র আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে।

বস্তুতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রনিক্সের ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে, নানারকম ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন আধুনিক হাসপাতালের কথা এখন প্রায় ভাবাই যায় না।

জয়ন্ত বসু*

---

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

নাইলনের জাল

নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রনের নাম আজ সকলের মুখে। আমাদের নিত্য পরিধেয় জামা-প্যান্ট থেকে সুরু করে নানারকম সৌখিন দ্রব্যও আজকাল প্রস্তুত হচ্ছে এগুলি থেকে। তোমরা শুনলে অবাক হবে, সম্প্রতি নাইলন থেকে মাছ ধরবার সুতা ও জাল তৈরি হচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য দেশে নাইলনকে মাছ ধরবার জাল তৈরির কাজে অরবিস্তর লাগানো হয়েছে।

এই নাইলন হচ্ছে পলিঅ্যামাইড গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এক রকম রাসায়নিক তন্তু। প্রথমে এই তন্তুর নাম ছিল 'পলিমার 66'। এত প্রয়োজনীয় নাইলন কিন্তু হঠাৎ একদিনে আবিষ্কৃত হয় নি। এই নাইলন আবিষ্কারের কাজে যৌথভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার অন্তর্গত New York থেকে NY এবং যুক্তরাজ্যের London-এর Lon মিলিয়ে NYLON শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে সৌখিন দ্রব্যের প্রস্তুতি ছাড়াও মাছ ধরবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাইলন তন্তুকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাছ ধরবার জন্যে যে সব সূতা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে নাইলনের সূতাই সবচেয়ে শক্ত। শুধু তাই নয়, নাইলনের সূতাকে টানলে স্প্রিংয়ের মত লম্বায় বেড়ে যায় আর আয়তনেও কমে যায়। তাছাড়া নাইলনের সূতা ওজনেও খুব হাল্কা। তাই এই সূতা থেকে তৈরী জাল মাছ ধরবার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। নাইলন সূতার ধারণশক্তি খুব বেশী, তবে এই ধারণশক্তি ঘনত্ব প্রতি 6 থেকে 7 গ্র্যামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাইলনের সূতা নানারকম ধকল সহ্য করতেও সক্ষম। সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোত, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলের মধ্যে মাছের লড়াই সহ্য করবার ক্ষমতাও আছে এই সূতার। উচ্চ প্রসারণ ক্ষমতার দরুণই নাইলনের সূতা এত গুণের অধিকারী। অথচ সাধারণ সূতাকে অল্প একটু টানলেই লম্বা হওয়া তো দূরের কথা, ছিঁড়ে যাবে। আবার অন্যান্য সূতার তুলনায় নাইলনের সূতা খুবই মসৃণ।

আগেই বলেছি, নাইলনের সূতা অন্যান্য সূতার চেয়ে অনেক হাল্কা, কারণ এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·14। ফলে নাইলনের তৈরী বড় বড় জাল বয়ে নিয়ে যেতে জেলেদের কোন কষ্টই হয় না। অথচ সাধারণ সূতা দিয়ে ঐ আকারের জাল তৈরি হলে জালের আয়তন যেমন বড় হবে, তেমনি ভারীও হবে খুব। তবে নাইলনের জালের অসুবিধা হলো—এই জাল খুব আস্তে আস্তে জলে ডোবে আর জালটাকে জলে ছুড়ে দেবার পর নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিকভাবে নাও পড়তে পারে। ফলে মাছ ধরায় দেরী হয়। তেমনি আবার সুবিধাও আছে। অন্যান্য সূতার চেয়ে নাইলন কম জল শোষণ করে। ফলে জালকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে নিতে কম পরিশ্রম হয় ও জাল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

নাইলনের সূতা অশেষ গুণের অধিকারী। এই সূতা খুব মসৃণ আর আকারেও বেশ সরু। তাই নাইলনের জাল দিয়ে মাছ ধরবার খুব সুবিধা, কারণ মাছ সহজে এই জালকে দেখতে পায় না। আর মসৃণতার জন্যে জালের কোথাও গেরো পড়লে একটু টান দিলেই খুলে যায়। নাইলনের তৈরী জাল খুব দীর্ঘস্থায়ী, অযত্নে বেশ বেশ কিছুদিন ফেলে রাখলেও সহজে নষ্ট হয় না। অথচ সাধারণ সূতার জাল সামান্য অযত্নেই অকেজো হয়ে পড়ে। নাইলনের জালের গায়ে কোন প্রলেপ দেবার প্রয়োজন হয় না। তীব্র সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ ফেলে রাখলেই নাইলনের জাল শুকিয়ে যায়। তবে বেশীক্ষণ রাখলে জাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে মাছ ধরবার জন্যে নাইলনের জাল তৈরি করবার প্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে Central Institute of Fisheries Technology (C.I.F.T.) এই জালকে আরও উন্নত করে তোলবার জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকাল নাইলনকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজেও লাগানো হচ্ছে।

শ্রীহিল্লোল রায়

সৌরজগতে প্রাণের সন্ধানে

500 বছর আগেও বাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। প্রথমতঃ, পৃথিবীটা গোল বটে, তবে থালার মত না বলের মত? 230 খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টারকাস পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘুরছে বললেও উল্টো ধারণাটাই চালু ছিল। কারণ সাধারণভাবে সূর্য, চন্দ্র নিয়ে সমস্ত আকাশটাই যেন পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে বলে মনে হয়। তেমনি পৃথিবীর বাইরে মহাকাশ, তথা মহাবিশ্ব কত দূর বিস্তৃত, সে সম্পর্কেও ধারণা পরিষ্কার ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় সুরু থেকে গ্যালিলিও (1610 খৃষ্টাব্দে) যখন প্রথম স্বনির্মিত দূরবীন বা টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, চাঁদ যেন আসলে আর একটা ছোট পৃথিবী এবং বৃহস্পতি গ্রহের আবার চারটি চাঁদ আবিষ্কার করলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিশাল মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যে সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বহু দূর এগিয়ে গেছে।

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

সূর্যের চারধারে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে নয়টি গ্রহ—সূর্য থেকে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, (এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রহ), তারপর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন (এগুলি বেশ বড় আকারের গ্রহ) এবং সব শেষে প্লুটো—এটা আকারে আবার পৃথিবীর মত।

সূর্য আসলে একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্রের মত। সূর্যের চেয়ে বড় এবং ছোট, নানা রকমের প্রায় দেড়-শ' কোটি নক্ষত্র নিয়ে একটি বিরাট তারকাজগৎ বা গ্যালাক্সি—একটি দ্বীপপুঞ্জের মত, যেটি নিজের চারধারে নিজে ঘুরছে।

আমাদের তারকাজগতের মত এই রকমের অগুণতি তারকাজগৎ ছড়িয়ে আছে, যাদের নিয়ে মহাবিশ্ব।

এই বিশাল মহাবিশ্ব সসীম কি অসীম, তা নিয়ে অবশ্য তর্কের মীমাংসা হয় নি। তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় অসীম বা অনন্ত বলতে বাধা নেই। তোমরা জান বোধ হয়, মহাকাশের দূরত্ব আলোর গতিবেগ দিয়ে মাপা হয়।

আলো দৌড়য় প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল—সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বস্তু, এত গতিবেগ আর কারোর নেই। আলো এক বছরে চলে যায় প্রায় 6×10^{12} মাইল বা ছয়ের পিঠে বারোটা শূন্য দিলে যে অঙ্কটা হয়, তত মাইল। একে বলা হয় এক আলোক-বছর।

মহাবিশ্বে আমরা 400 কোটি আলোক-বছর দূরেও নক্ষত্রমণ্ডলীর সন্ধান পেয়েছি; তার তুলনায় সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র 9 মিনিট (বা দূরত্ব 9 আলোক-মিনিট), সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব মাত্র 5 আলোক-ঘণ্টা। তাহলে 400 কোটি বছরের তুলনায় 5 ঘণ্টা যতটুকু মাত্র সময়, সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ মাত্র ততটুকু।

প্রাণের বলয়

এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে আজ যখন আমরা মহাকাশে সবে যাত্রা শুরু করেছি—এই বিশাল মহাবিশ্বে প্রাণ কি একমাত্র আমাদের এই ছোট্ট গ্রহ পৃথিবীতেই সৃষ্টি হয়েছে? প্রশ্নটির জবাব বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক, প্রাণ সৃষ্টি কি করে সম্ভব? প্রাণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে কার্বন

প্রাণের বলয়
সূর্য থেকে গ্রহগুলির গড় দূরত্ব: বুধ—3½ কোটি মাইল, শুক্র—6¾ কোটি মাইল, পৃথিবী—9 কোটি 30 লক্ষ মাইল, মঙ্গল—14 কোটি মাইল, বৃহস্পতি—48 কোটি মাইল।

পদার্থের (Element) অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রায় অফুরন্ত ক্ষমতা। আর এই জোট বাঁধবার জন্যে প্রয়োজন একটা সমপরিমাণের তাপমাত্রা—খুব বেশী গরম বা ঠাণ্ডা, কোনটাই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়।

আচ্ছা, আমাদের সৌরজগতে তাপের উৎস নিশ্চয়ই সূর্য। তাহলে সূর্য থেকে কত

খানি দূরত্বে থাকলে কতটুকু তাপ পাওয়া যাবে, যাতে কার্বন পদার্থের জোট বেঁধে প্রাণসৃষ্টি সম্ভব, সেটা আমরা সহজেই হিসাব করতে পারি।

সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ রয়েছে 3½ কোটি মাইল দূরে (সব গড়পড়তা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে)। খুবই গরম প্রাণসৃষ্টির পক্ষে। তারপর রয়েছে শুক্র 6½ কোটি মাইল দূরে, পৃথিবী 9 কোটি 30 লক্ষ আর মঙ্গল 14 কোটি মাইল দূরে। সূর্যের 6½ কোটি থেকে 14 কোটি মাইল দূরত্বে এই অঞ্চলটিই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা পেয়ে থাকে। এই এলাকাটিকে তাহলে আমরা সৌরজগতের 'প্রাণের বলয়' বা 'লাইফ বেল্ট' বলতে পারি। মঙ্গলের পরে 48 কোটি মাইলে বৃহস্পতি—খুবই ঠাণ্ডা, তার পরে পরে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বও অনেক বেশী এবং দারুণ ঠাণ্ডাও বটে।

পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী

তাহলে আমরা দেখলুম 'প্রাণের বলয়' এলাকার এক প্রান্তে, সূর্য থেকে 6½ কোটি মাইল দূরে রয়েছে শুক্র, অন্য প্রান্তে 14 কোটি মাইল দূরে রয়েছে মঙ্গল; আর এই এলাকার একেবারে প্রায় মধ্যে বা কেন্দ্রে, সূর্য থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে পৃথিবী। প্রাণের সৃষ্টি ও তার লীলার জন্যে পৃথিবী যে বিশেষ যোগ্যতম স্থানে রয়েছে, সেটা তাহলে বোঝা গেল।

এখন দেখা যাক, পৃথিবীর একদিকে শুক্র অন্যদিকে মঙ্গলে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে কিনা?

শুক্র: এতদিন একটা চালু ধারণা ছিল যে, শুক্রে হয়তো প্রাণের প্রভাব বা নাট্যলীলার সবে সুরু হয়েছে। কারণ, শুক্রগ্রহকে ঘিরে রয়েছে ঘন পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি মেঘ। এখন পৃথিবীতেও প্রাণের প্রভাবে অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় ছিল না, ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদজাতীয় প্রাণ, তথা গাছপালা, অরণ্যানী যেমন যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি তারা কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সূর্যালোকের সাহায্যে শুষে নিয়ে অক্সিজেন রূপে ফেরৎ দিয়েছে। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis)।

পৃথিবীর আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে আজ যে শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন রয়েছে, সেটা তার জন্মের সুরু থেকেই ছিল না; পরে এসেছে—যেমন যেমন উদ্ভিদজাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে।

আবার এটাও ঠিক যে, আমরা পৃথিবীর 300 কোটির বেশী মানুষ যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে পরিত্যাগ করি, তাতে কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আর অক্সিজেন না থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হচ্ছে না, কারণ আমাদের

নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে আবার অক্সিজেনরূপে ফেরৎ দিচ্ছে।

কাজেই শুক্রগ্রহের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি মেঘ দেখে সেখানে প্রাণের নাট্যলীলায় প্রথম অঙ্ক সবে সুরু হয়েছে—এরকম ধারণা করা কিছু অযৌক্তিক ছিল না। মনে হয়েছিল যে, ঐ ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড মেঘের (যাকে ভেদ করে আমাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি চলে না) তলায় রয়েছে ঘন বাষ্পাকুল অরণ্যানী, হয়তো বা প্রাণের ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ির আর এক ধাপ উপরে পৃথিবীর জুরাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীরও উদ্ভব ইতিমধ্যেই হয়েছে।

মঙ্গল: মঙ্গলের আকাশ বেশ পরিষ্কার, অক্সিজেন নেই, তার জমির চেহারা লাল; বোঝা গেছে, মঙ্গলের জমিটা যেন মরচে-পড়া লাল (ফেরাস অক্সাইড)। আসলে মঙ্গলের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে শুষে নিয়েছে মঙ্গলের জমি, তাতেই মরচে-পড়া লাল রঙের চেহারা। প্রসঙ্গতঃ, মঙ্গলকে খালি চোখে দেখলেও মনে হবে যেন একটি মাঝারী আকারের লাল 'তারকা'র মত; অবশ্যই 'তারকা' নয়, গ্রহ—কারণ মঙ্গলের নিজের কোন আলো নিশ্চয়ই নেই।

যাই হোক, মরচে-পড়া গ্রহ মানে বুড়ো গ্রহ, অর্থাৎ মঙ্গলের প্রাণের নাট্যলীলার পঞ্চম বা শেষ অঙ্ক আজ অভিনীত হচ্ছে। এটা আরো বোঝা যায়, যখন টেলিস্কোপে দেখি, মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে তার মেরুপ্রদেশের বরফে ঢাকা সাদা টুপি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় বা গলে যায় এবং একটা ধূসর রং মঙ্গলের বিষুবরেখার অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে।

অবশ্য এক সময়ে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশ থেকে বিষুবরেখা অবধি দাগ টানা হয়েছে দেখে প্রথমে ইতালিয়ান সিয়াপেরেলি, পরে প্রফেসর লাওয়েল টমাস ভেবেছিলেন যে, ওগুলি বিরাট খালের দাগ। সিয়াপেরেলি 'খাল' বলতে বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির হাতে-গড়া খাল। লাওয়েল টমাস বলতে চেয়েছিলেন, না ওগুলি কৃত্রিম। মঙ্গলে জলের একান্ত অভাব বলে তার বুদ্ধিমান প্রাণীরা বিরাট খাল খনন করে মেরুপ্রদেশ থেকে বিষুবরেখা অবধি সারা মঙ্গলগ্রহের গোলক জুড়ে খাল খনন করে রেখেছে। আজকে অবশ্য এই চিত্তাকর্ষক মতটি বাতিল।

তথাপি মঙ্গলের গ্রীষ্মে তার বিষুবরেখাতে ধূসর রঙের বিস্তার দেখে সেখানে উদ্ভিদ রয়েছে, এটা আজ প্রায় প্রমাণিত হয়েছে।

গত দশ বছর আগেও পৃথিবীর এই দুই প্রতিবেশী সম্পর্কে চিত্রটি ছিল বেশ সুসংবদ্ধ। পৃথিবীতে প্রাণের মধ্যাহ্ন; তার একদিকে (সূর্যের দিকে) শুক্রে প্রাণের প্রত্যুষ, অন্যদিকে মঙ্গলে প্রাণের রাত্রি।

কিন্তু এখন মানুষের তৈরি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ যানগুলি শুক্রে পৌঁছে খবর পাঠিয়েছে, সেখানকার তাপমাত্রা প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত বেশী, 400° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

বা আরো বেশী। অতএব শুক্রে এখনও প্রাণের যবনিকার উত্তোলন হয় নি, এটাই বলতে হবে। তেমনি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মনে হচ্ছে ছিটেফোঁটাও নাইট্রোজেন নেই। তাহলে অবশ্য সেখানে কোনদিনই প্রাণসৃষ্টি হয় নি, এটাই বলতে হয়।

অবশ্যই এই দুয়েরই আবার পাল্টা নানা রকমের যুক্তি আছে, যার বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

নক্ষত্রলোকের গ্রহান্তরে

একমাত্র পৃথিবীতেই কি তাহলে প্রাণসৃষ্টি হয়ে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে? আমাদের সৌরজগতে হয়তো তাই, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মহাকাশের প্রায় অনন্ত কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক কোটি নক্ষত্রের (বা সূর্যের) চারধারে আমাদের মত 'সৌরজগৎ' বিরাজ করছে এবং তাহলে সেই কয়েক কোটি সৌরজগতে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ 'পৃথিবীর' ধরণের গ্রহ পাওয়া যাবে। পৃথিবীর ধরণের বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই সমস্ত গ্রহগুলিকে, যারা তাদের নিজ নিজ সূর্য (বা নক্ষত্র) থেকে ঠিক ততখানি দূরত্বে আছে, যাতে তারা তাদের 'প্রাণের বলয়ের' একেবারে মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে। আর পৃথিবীর ধরণের গ্রহ থাকলে সেখানে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে হয়তো পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

সমগ্র পৃথিবীর বয়স যেখানে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর, প্রাণের জন্ম সেখানে দশ কোটি বছর অতীতে, আর মানুষের জন্ম তো মাত্র লাখ দশেক বছর আগে। তার মধ্যে আবার তার সভ্যতার বয়স খুব বেশী হলেও দশ হাজারের বেশী নয়। কাজেই পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর, তথা প্রাচীনতর সভ্য প্রাণী মহাকাশের অন্য নক্ষত্রের অন্য গ্রহে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। অবশ্য তাদের অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবে যুক্তির দিক থেকে আমাদের সেটা মেনে নিতে হচ্ছে। হয়তো একদিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও তাদের সঙ্গে আমাদের হবে।

দিলীপ বসু

ধাঁধা

1। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন চিহ্নের (Operators) সাহায্যে 3 সংখ্যাটিকে মাত্র তিনবার ব্যবহার করে কি ভাবে 0, 1, 2,……...10 পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়? (উদাহরণ : $1=3^{\circ}\times3^{\circ}\times3^{\circ}$)।

2। এক বৃদ্ধের চার পুত্র। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিই বেশ নির্বিঘ্নে ভাগাভাগি হয়ে গেল, কিন্তু যত বিবাদ বাঁধলো, এক টুকরা জমি নিয়ে। জমিটার আকার এমনই যে, সমান চার ভাগে ভাগ করতে সকলেই বেশ হিমসিম খেয়ে গেল।

চেষ্টা করে দেখ না। সেই জমিটিকে (চিত্রে দ্রষ্টব্য) সমান চারভাগে ভাগ করে দিয়ে এই বিবাদের অবসান ঘটাতে পার কি না।

3। পরেশবাবু ব্যাঙ্কে গেলেন চেক ভাঙ্গাতে। ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার বাবু বরাবরই একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির। তিনি ভুলবশতঃ পরেশবাবুর চেকটিতে টাকার অঙ্কটাকে পয়সা ও পয়সার অঙ্কটাকে টাকা হিসাবে ধরে গণ্ডগোল করে ফেললেন। আর সেই মত টাকাও দিয়ে ফেললেন পরেশবাবুকে। ফেরার পথে পরেশবাবু সেই টাকা থেকে শুধুমাত্র 20 পয়সা দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনলেন। বাড়ী ফিরে পরেশবাবু টাকা-পয়সা গুণে দেখলেন যে, চেকে যে পরিমাণ অঙ্ক ছিল, ঠিক তার দ্বিগুণ অঙ্ক তাঁর কাছে রয়েছে।

চেকে প্রকৃত কি পরিমাণ অঙ্ক ছিল ?

4। একটি নিরেট গোল কাঠের বলের মাঝখান থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা চোঙাকৃতি (Cylindrical) একটি অংশ কেটে বের করে নেওয়া হলো। বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন কত হবে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও তোমাদের মনে হতে পারে যে, প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ বা প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া নেই, তবুও এর সমাধান করা সম্ভব। চেষ্টা করে দেখ না। (উত্তর 629 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সমীরকুমার ঘোষ*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মজার যন্ত্র

সাধারণ বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল দর্শকদের নতুন নতুন জিনিষ দেখানো হচ্ছে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর অন্যতম অঙ্গ। বর্তমানে ট্রানজিষ্টরের বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বর্তনীর সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ জিনিষ তৈরির প্রাচুর্য বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলিতে ট্রানজিষ্টরকে কাজে লাগিয়ে চোর-ধরা, কালো-কয়লার মান বিচার, প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বহু যন্ত্রের মডেল তৈরি করে দেখানো হয়। এই রকম একটা যন্ত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো।

মাছ-ধরা যন্ত্র

বাঁশির সুরের প্রভাবে বিষধর সাপকে বশে এনে সাপুড়েদের খেলা দেখানোর সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাছাড়াও রাখালদের বাঁশি বাজিয়ে গরুকে পোষ মানাবার উদাহরণ দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, জীব-জগতের উপর সুরের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশেষ ধরণের শস্যের উদ্ভিদের উপর দিয়ে বিশেষ কম্পনাঙ্কের শব্দপ্রবাহ চালিত হলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জলচর প্রাণীরাও পোকামাকড়ের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এই শব্দ-সংকেতকেই জলচর প্রাণীরা আহার সংগ্রহ বা প্রয়োজন অনুযায়ী আত্মরক্ষার কাজে লাগায়। কাজে

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাছের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শ্রুতিগোচর শব্দ আছে, যার দ্বারা তারাও আকৃষ্ট হয়। সাধারণ ট্রানজিষ্টরকে বৈদ্যুতিক বর্তনীতে কাজে

লাগিয়ে আমরা এই জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, হয়তো উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রকৃত মাছ ধরবার কাজেও প্রয়োগ করতে পারি।

যন্ত্রটি আসলে একটা সাধারণ শ্রুতিগোচর আন্দোলক (Audio Oscillator)। চিত্রে বর্তনীটি বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। কণ্ডেন্সার, কুণ্ডলী, রোধক, তড়িৎ-কোষ ও একটা ট্রানজিষ্টরের (OC 71 বা AC 125) সাহায্যে এই শ্রুতিগোচর কম্পন সৃষ্টি করা যেতে পারে। চিত্রে প্রদর্শিত পরিবর্তনীয় রোধকের সাহায্যে কম্পন-সংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। এই কম্পন ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে স্পীকারে শ্রুতিগোচর শব্দ উৎপন্ন করে। এইবার এই যন্ত্রের সাহায্যে মজা উপভোগ করবার জন্যে একটি বড় পাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ জলে বিভিন্ন প্রকার মাছ রেখে যদি স্পীকারটিকে পলিথিন কাগজে মুড়ে (যাতে জলে ভিজে না যায়) ঐ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়, তাহলে আন্দোলকের কম্পনাঙ্ক পরিবর্তন করলে দেখা যাবে যে, কোন বিশেষ কম্পনাঙ্কের দ্বারা কিছু মাছ আকৃষ্ট হচ্ছে। আবার কম্পনাঙ্কের পরিবর্তন করলে তারা দূরে চলে যাবে এবং অন্য জাতীয় মাছ শব্দের উৎসের দিকে আকৃষ্ট হবে। এথেকে বোঝা যায়, উৎস থেকে নির্গত বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শব্দ বিভিন্ন জাতের মাছকে আকর্ষণ করে। এই ব্যাপারটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

মহুয়া বিশ্বাস

ধাঁধার উত্তর

1। $0=3\times(3-3)$, $1=3^{0}\times3^{0}\times3^{0}$; $2=3-\frac{3}{3}$

$3=\frac{3\times3}{3}$ বা $3^{0}+3^{0}+3^{0}$; $4=3+\frac{3}{3}$; $5=3+3^{0}+3^{0}$

$6=3+\frac{3}{3^{0}}$; $7=3+3+3^{0}$, $8=3\times3-3^{0}$

$9=3+3+3$; $10=3\times3+3^{0}$।

2। জমিটি ভাগ করতে হবে (ক) চিত্র অনুযায়ী। (খ) চিত্র দেখলে জমি ভাগ করবার কৌশলটা বুঝতে পারবে।

3। চেকে প্রকৃত অঙ্কের পরিমাণ ছিল 26 টাকা 53 পয়সা। হিসাব করে দেখলেই এই অঙ্কটি বের করতে পারা যায়।

4। নীচের চিত্র অনুযায়ী চোঙ্গাকৃতি অংশের আয়তন $6\pi r^2 = 6\pi R^2 - 54\pi$। টুপির আকৃতির দুটি অংশের আয়তন $\frac{2\pi h}{6}(3r^2 + h^2) = \frac{\pi}{3}(R-3)[3(R^2-9) + (R-3)^2] = \frac{4}{3}\pi R^3 - 6\pi R^2 + 18\pi$। সুতরাং চোঙ্গাকৃতি অংশ ও টুপির আকৃতির

দুটি অংশের মোট আয়তন $\frac{4}{3}\pi R^3 - 36\pi$। বলের আয়তন $\frac{4}{3}\pi R^3$ থেকে এই আয়তন বাদ দিলে বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন হবে 36π, যেটা ধ্রুবক; অর্থাৎ এই অংশের আয়তন বলের আকার বা চোঙ্গার ব্যাসের উপর নির্ভর করবে না।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটে কি ভাবে?

রেবা রায়, হাসনাবাদ।

প্রশ্ন 2. আকাশ কেন নীল দেখায় এবং সমুদ্রের জলই বা নীল দেখায় কেন?

অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা

উঃ 1. বস্তুজগতের মূলে রয়েছে পরমাণু। এই পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রীন, যার মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎধর্মী প্রোটন ও তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা অবস্থান করে। কেন্দ্রীনের বাইরে চারদিকে প্রোটনের সমান সংখ্যক কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী ইলেকট্রন কণিকা বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরমাণুর প্রোটনের বা ইলেকট্রনের সংখ্যা পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা নির্ধারণ করে। নিউট্রন ও প্রোটনের সম্মিলিত সংখ্যা হচ্ছে পরমাণুর ভর সংখ্যা।

যে কোন পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 8 ও 7। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন উপায়ে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8 করা যায়, তাহলেই আমরা অক্সিজেন পরমাণু পেতে পারি। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন এবং বাইরের কক্ষপথে আছে দুটি ইলেকট্রন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্‌ফা কণিকা নির্গত হয়। এই আল্‌ফা কণিকা আর কিছুই নয়—হিলিয়াম কেন্দ্রীন অর্থাৎ একটা হিলিয়াম পরমাণু, যার বাইরের দুটি ইলেকট্রন খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাদারফোর্ড প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট এই আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন কণিকা নির্গত হয়। প্রক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্যে নীচে দেখানো হলো:

$${}_{7}N^{14} + {}_{2}He^{4} = {}_{8}O^{17} + {}_{1}H^{1}$$

নাইট্রোজেন আল্‌ফা কণিকা অক্সিজেন প্রোটন কণিকা

এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে বোরন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণায় আবিষ্কার হলো আরও অনেক কণিকা (প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরিয়াম, গামা-রশ্মি

ইত্যাদি), যেগুলির দ্বারা পরমাণুকে আঘাত করে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই রূপান্তর ঘটাবার ক্ষেত্রে নিউট্রনের অবদানই সবচেয়ে বেশী—কেন না, নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা বলে পরমাণু কেন্দ্রীনের দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না—যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে পারে। এই নিউট্রন কণিকার সাহায্যেই সাধারণ ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে প্রাকৃতিক অস্তিত্ববিহীন নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত কণিকার আঘাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানো আজ মোটামুটি ভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন। তবে এই কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

উঃ 2. সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালি, জলকণা ইত্যাদির দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশে নীল রঙের সৃষ্টি করে। ঘনসন্নিবিষ্ট ধূলাবালি, জলকণা—এমন কি, বিভিন্ন প্রকার অণু-পরমাণুর দ্বারা আলোক বিচ্ছুরিত হবার ফলে এর তীব্রতা হ্রাস পায়। বিজ্ঞানী র‍্যালের তত্ত্ব অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ার একটা ব্যাখ্যা মেলে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছুরণের হার আপতিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।

কাজেই সূর্য থেকে আগত দৃশ্য আলোক-বর্ণালীর বেগুনী ও নীল অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় বেগুনী ও নীল আলো হলুদে এবং লাল আলোর তুলনায় বেশী বিচ্ছুরিত হয়। বেগুনী আলোর তীব্রতা নীল আলোর তুলনায় কম, তাই তীব্রতর নীল আলোকের বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত আকাশকেই আমরা নীল দেখি।

একইভাবে সমুদ্রের জলকণা ও সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন বস্তুকণা আপতিত আলোককে বিচ্ছুরিত করবার ফলে সমুদ্র নীল দেখায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | নভেম্বর, 1970 | একাদশ সংখ্যা

মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

সম্প্রতি বহু আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগৎকে নাড়া দিয়েছে। চন্দ্রাভিযান বা পরমাণু বিস্ফোরণের মত তাদের সব কয়টি সাধারণের গোচরীভূত না হলেও বা সাধারণের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করলেও এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে, যা বিজ্ঞানে বহু আকাঙ্খিত অথবা বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নে কিছু না কিছু আলোকপাত করেছে। এই রকম একটি আবিষ্কারের নাম দেওয়া যায় মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ (Gravitational waves)। বিস্তৃত আলোচনার আগে সংক্ষেপে বিষয়টির আভাস দেওয়া যেতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণের কথা কারও অবিদিত নয়—সব বস্তুই অন্য সব বস্তুকে আকর্ষণ করে—সূর্য-পৃথিবী-গ্রহাদি ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং চলমান বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র যে পরিবর্ত্তনশীল হবে, এটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর কোনও আলোড়নের সৃষ্টি হবে কি? প্রশ্নটি বোঝাবার জন্যে একটি উপমা নেওয়া যাক। সমুদ্রের এক স্থানে একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলে সে স্থানের কিছু জল স্বস্থানচ্যুত হয়। জাহাজটি চলতে আরম্ভ করলে জলের স্থানচ্যুতির ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ এক স্থানের জল স্বস্থানে ফিরে আসে ও অন্য স্থানের জল স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু এটা ভিন্ন অন্য একটা জিনিষও হয়—সমুদ্রের বুকে আলোড়নও

*ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি, খড়্গপুর

সৃষ্টি হয়—সেখানে তরঙ্গ ওঠে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রশ্ন—কোনও ভারী বস্তু এক স্থান থেকে অন্যত্র নীত হলে পূর্বস্থানের কাছে মাধ্যাকর্ষণ কমে যায় ও নতুন স্থানে মাধ্যাকর্ষণ বাড়ে। কিন্তু তাছাড়াও ঐ সমুদ্রের তরঙ্গের মত আর কিছু ঘটে কি? উপরিউক্ত উপমা আশ্রয় করে আরও একটা কথা বলে নেওয়া যায়—একটি চৌবাচ্চায় একটি বড় বল অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ঘুরলে জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ প্রশ্ন মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও তোলা যায়—ঘূর্ণায়মান ভারী বস্তুর কাছে মাধ্যাকর্ষণঘটিত কোনও আলোড়ন ওঠে কি? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে এরূপ কোনও আলোড়নের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আইনষ্টাইনের তত্ত্বে দেখা গেল যে, ঘূর্ণায়মান দণ্ড থেকে তরঙ্গের উদ্ভব হবে। 1916 সালে আইনষ্টাইন এই বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনও ঐ বিষয়ে গবেষণা করেন। আইনষ্টাইনের তত্ত্বের সুরুতেই যাঁরা আপেক্ষিকতা তত্ত্বে উৎসাহী ছিলেন, এডিংটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরে আরও অনেক বিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে তত্ত্বীয় আলোচনা করেছেন। পরীক্ষায় কিন্তু এতদিন এই তরঙ্গ ধরা পড়ে নি এবং মনে করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, পরীক্ষায় এই তরঙ্গ ধরা অতি দুরূহ। তবু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আকর্ষণের উপমার কথা চিন্তা করে অনেক বিজ্ঞানীই মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গে বিশ্বাস করতেন। আজ এই দুরূহ পরীক্ষা সফল হতে চলেছে। এর কিছু বর্ণনা দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার আগে বেশ একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

আইনষ্টানের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special theory of relativity) ও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General theory of relativity)। পরস্পরের কাছ থেকে অপরিবর্তিত বেগে অপসৃয়মান বস্তুদ্বয়ের একের দৃষ্টিতে অপরের দৈর্ঘ্য ও সময়ের মানের পরিবর্তন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা। এরই ফলে বেশ একটু দুরূহ গণিত ও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় যে, গতিবেগ বাড়বার সঙ্গে সকল বস্তুই বেশী ভারী হয়ে ওঠে—সঠিকভাবে বললে তার ভর (Mass) বেড়ে যায়। দ্রুতবেগে ধাবিত ইলেকট্রন-প্রোটনাদির ভর কত বাড়ে, তা খুব ভাল করে মাপা যায় এবং এই ভাবে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রতিনিয়তই পরীক্ষায় প্রমাণিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এত নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, কণাতত্ত্ব তত্ত্বের (Quantum mechanics) সমস্ত সূত্রই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই না করলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন না। কণাতত্ত্ব তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে আজ অতি মূল্যবান তত্ত্ব। সুতরাং কণাতত্ত্ব তত্ত্ব যে বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েছে, তা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে যে একান্ত প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

এবার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথায় আসা যাক। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মনোভাব অন্য রকম। এত সর্বাঙ্গসুন্দর তত্ত্ব পদার্থবিদ্যায় যে আর নেই, এই কথা স্বীকার করলেও এবং যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করে বিজ্ঞান-জগতের পূজনীয় আইনষ্টাইন এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন, তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হলেও বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দৈনন্দিন পদার্থবিদ্যার আলোচনায় আদৌ এই তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায় না। পদার্থবিদ্যার তোরণে তোরণে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায় না। এর কারণ, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বক্তব্য কি, সেটা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে—মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের পরীক্ষার গুরুত্বও সেই সঙ্গে বোঝা যাবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে পরস্পরের দৃষ্টিতে অসম বেগে ধাবিত বস্তুনিচয়ের আলোচনায়

প্রায় অক্ষম। যেখানে ভারী বস্তু বর্তমান ও তার টানে তার দিকে অসম বেগে অন্যান্য বস্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে, সেখানে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়—সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের চিন্তাধারা আরও গভীর। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে বুঝতে পারা যায় যে, ভারী বস্তুর কাছে 'স্থান ও কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয়'। কথাটার অর্থ একটু বিশদ করবার চেষ্টা না করে উপায় নেই। আমাদের সাধারণ মাপজোখ যে ভাবে চলে, বক্রতাপ্রাপ্ত দেশে তা চলে না—মাপজোখের এই নিয়ম বদ্লানোটাই দৃশ্যমান সত্য, বক্রতাটা একটা নাম মাত্র—এই নামের পিছনে একটা উপমা লুকিয়ে আছে, এই ভাবে বুঝলেই বোধ হয় বোঝবার সবচেয়ে সুবিধা। উপমাটাই বলা যেতে পারে। সমতল ভূমিতে অঙ্কিত কোনও ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের অন্তস্থিত ক্ষেত্রফল একটি বর্তুলের উপর অঙ্কিত সেই একই ব্যাসের অন্তস্থ ক্ষেত্রফলের বেশী হবে। ক্ষেত্রফলটি কত কম হলো, তার পরিমাণ থেকে বর্তুলটির ব্যাস অর্থাৎ তার বক্রতা বোঝা যায়। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে ভারী বস্তুর নিকটস্থ দেশে ঐ রকম মাপজোখের নিয়ম পরিবর্তিত হবে, যথা—একটি বর্তুলের অন্তস্থ আয়তন ভারী বস্তুর কাছে যা হবে, দূরে তা হবে না। এ হলো শুধু স্থান বা দেশের বক্রতার কথা। 'স্থান-কালের বক্রতা'র অর্থ অনুরূপভাবে এই যে, স্থান-কালের বক্রতা হেতুই ভারী বস্তুর কাছে ছোট বস্তু আর তার দৃষ্টিতে সরলরেখায় সমবেগে ধাবিত হয় না

বহুদিন পর্যন্ত তত্ত্বটি পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এবং সেই জন্যেই পদার্থবিদ্যার খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায়। এদের সবগুলিই মহাকাশে ঘটিত ঘটনা নিয়ে এবং যেখানে স্থান-কালের বক্রতা স্থির—সেখানে। অধুনা যদিও রসায়নের একেবারে একটি পরীক্ষাকে পৃথিবীপৃষ্ঠঃ ঘটনার উপর পরীক্ষাকে সম্ভাব্যের কাছাকাছি এনেছে, তবুও স্থান-কালের বক্রতার আলোড়নের স্থান সেখানে নেই। মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ স্থান-কালের বক্রতার আলোড়ন, ঠিক যে আলোড়ন সমুদ্রবক্ষে চলমান জাহাজের কাছে দেখি। সুতরাং পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ ধরতে পারা শুধু যে একটি নতুন পরীক্ষা তা নয়, আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যে অংশ এযাবৎ আদৌ পরীক্ষিত হয় নি, সেই রকম একটি পরীক্ষা।

প্রবন্ধের গোড়াতেই ঘূর্ণায়মান দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ঐ দণ্ডের আলোচনায় দুটি বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে। দণ্ডটির ঘূর্ণনহেতু যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব হবে, তা যন্ত্রে ধরবার মত শক্তিশালী করতে হলে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ খুবই বেশী করতে হয়। এত অধিক বেগে ঘুরতে গেলে কিন্তু দণ্ডটি ভেঙে যাবে। সুতরাং এই পরীক্ষা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় যা পরিস্ফুট হয়েছে তা এই যে, ঘূর্ণিত দণ্ড উৎসারিত মহাকর্ষণ-তরঙ্গ খানিকটা শক্তি নিয়ে যাবে—এই কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ ক্রমেই কমে আসবে বটে, কিন্তু আরও অন্যান্য কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ আরও দ্রুত কমবে। সুতরাং সরাসরি মহাকর্ষণ-তরঙ্গ না দেখে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগের হ্রাস মাত্র দেখেই যে মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যাবে, সে আশাও নেই।

পরীক্ষায় মহাকর্ষণ-তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন মহাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব ঘটানো, তারপরে প্রয়োজন, সেই তরঙ্গ যন্ত্রে ধরা। যদিও আইনষ্টাইন ও এডিংটনের পরেও মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েক জন বিজ্ঞানী তত্ত্বীয় চিন্তা করেছেন এবং তদ্দ্বারা বিজ্ঞান-জগৎ কিছু লাভবানও হয়েছে, তবু মহাকর্ষণ-তরঙ্গ যন্ত্রে ধরবার প্রারম্ভে যে তত্ত্বীয় চিন্তার প্রয়োজন ছিল, সে সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ-

ক্ষেপ করেন অধ্যাপক জোসেফ ওয়েবর। সেটি প্রথমে বর্ণনা করা যাক।

স্থিতিস্থাপক বস্তু বলতে কি বোঝায়, সে কথা অনেকেই জানেন। প্রায় সব বস্তুর উপরেই চাপ বা টান পড়লে বস্তুটিতে কিছু সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটে। বস্তুর অংশের সব স্থানেই যে সমানভাবে এই সম্প্রসারণাদি ঘটবে, তা নয়। চাপ বা টানের ধর্মের উপর নির্ভর করে, কি রকম সম্প্রসারণ বা সংকোচন কখন কোথায় ঘটবে। সম্প্রসারণ ও সংকোচনের তরঙ্গ কখনও কখনও বস্তুটিতে উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানী ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ অর্থাৎ স্থান-কালের বক্রতার তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুতে কম্পনের সৃষ্টি করতে পারে। অনুরূপভাবে স্থিতিস্থাপক বস্তু থেকেও মহাকর্ষ-তরঙ্গের উদ্ভব সম্ভব। অন্যান্য বহু তত্ত্বীয় গবেষণার মত এই গবেষণাতেও কিছু আদর্শীকরণ ছিল। ওয়েবর বস্তুতঃ প্রমাণ করেন যে, স্প্রিং-এ বাঁধা দুটি ভারী বস্তু মহাকর্ষ-তরঙ্গের দোলায় দোল খেতে পারে। যেহেতু স্থিতিস্থাপক বস্তুমাত্রেই যেন স্প্রিং-এ বাঁধা বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি, সেহেতু মহাকর্ষ-তরঙ্গের দোলায় দোল খাবে, এমন মনে করা যায়। কিন্তু কেমনভাবে বিভিন্ন ধরণের তরঙ্গ বিভিন্ন ধরণের দোলন বা কম্পনের সৃষ্টি করবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুকে একটু কাঁপিয়ে দিলে এবং বাইরে থেকে কোনও বল (Force) তার উপর কার্যকরী না হলে সেটা একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে কম্পিত হয়; অর্থাৎ একই অবস্থা থেকে বার বার সেই অবস্থায় ফিরে আসে। সেকেণ্ডে যতবার ফেরে, সেই সংখ্যাটির নামই কম্পাঙ্ক (Frequency)। শুধু স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তু কেন, একটি সূতায় ঝোলানো অল্প ওজনের বলও দুলিয়ে দিলে একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে দোলে। এই কম্পাঙ্কের নাম দেওয়া যায় স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক (Natural frequency), অর্থাৎ বহিস্থ বলের অভাবে যে কম্পাঙ্ক, তারই নাম স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক। বহিস্থ বল যদি প্রযুক্ত হয় এবং বলটি যদি বিশেষ কম্পাঙ্কে বাড়ে-কমে, তাহলে অবশ্য স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুটি বলের কম্পাঙ্কেই কম্পিত হবে। কিন্তু বলটির কম্পাঙ্ক তার স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের চেয়ে ভিন্ন হলে কম্পনের পরিমাণটা অল্প হবে। বলের কম্পাঙ্ক স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের কাছাকাছি হলে ঐ পরিমাণ আরও বাড়বে এবং স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে কম্পন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এসবই দীর্ঘদিন তত্ত্বে প্রমাণিত ও বহুধা পরীক্ষিত। ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর অর্থাৎ আদর্শীকৃত স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুর উপর বহিস্থ বলের মতই কাজ করে—অর্থাৎ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক স্থিতিস্থাপক বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে স্থিতিস্থাপক বস্তুটিতে শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়, অন্যথায় অল্প শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্র।

যন্ত্র নির্মাণের প্রথমেই এলো, কোন্ ধাতু বা অধাতু নির্মিত বস্তুকে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের দ্বারা কম্পিত করা সুবিধাজনক হবে। ডক্টর রবার্ট ফরোয়ার্ড অধ্যাপক জোসেফকে এই সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। অ্যালুমিনিয়ামকেই তিনি এই কাজের জন্যে প্রকৃষ্ট মনে করেন। অতঃপর ডক্টর সিনিক ও অধ্যাপক ওয়েবর একত্রে যন্ত্রের দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে অন্য একটি যন্ত্রে এই তরঙ্গ ধরেন। তরঙ্গটি ধরা হয়েছিল 154 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের 20 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভে। একে একটি বায়ুশূন্য কক্ষে রাখতে হয়েছিল এবং কম্পনটিকে দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনবার জন্যে পিউজোইলেকট্রিক কেলাস ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই কেলাসের বর্ণনা

অব নিষ্প্রয়োজন—শুধু জেনে রাখলেই হলো যে, অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভের কম্পন ধরবার জন্যে আরও একটি যন্ত্র এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরীক্ষা হয় প্রায় 1967 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

1967 থেকে 1969 সালের মধ্যে অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে আরও অনেক জানবার মত ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে বা কিছু হয়তো তারও আগে কত আরও কয়েকটা অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করা হয় এবং বেশ কয়েকটি কল্পনা সামনে রেখে অধ্যাপক ওয়েবর তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। চন্দ্র ও গ্রহাদির 3600 কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র, পাল্‌সারের তরঙ্গ ধরবার চেষ্টা—এইরূপ আরও বেশ কয়েকটি চেষ্টা অধ্যাপক ওয়েবরের গবেষণাগারে চলতে থাকে। তবে বিশেষ করে বলবার মত যা ঘটেছে, তা 1660 কম্পাঙ্ক আশ্রয় করে। এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু বর্ণনার প্রয়োজন।

বর্ণনা আরম্ভ করবার আগে বলা দরকার, উক্ত অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভকে কম্পিত দেখলেই যে, সে কম্পন মহাকর্ষণ-তরঙ্গঘটিত, একথা মনে করা সর্বৈব ভুল। পৃথিবীর কম্পন, শব্দ ইত্যাদি নানা কারণে স্তম্ভ উত্তেজিত অর্থাৎ কম্পিত হতে পারে। কোন্ কোন্ কারণে কতটা কম্পন হওয়া সম্ভব, সেটা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার বিষয়। যে যে কারণে কম্পন হতে পারে বলে সন্দেহ, তার মধ্যে কিছু হয়তো বিশ্লেষণের পর বোঝা গেল যে, এরা কম্পন ঘটাবে না, আবার কিছুর সম্বন্ধে বোঝা গেল যে, এদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ওয়েবরের দল বিশেষ ভীত শব্দ সম্পর্কে—তাই তাঁদের যন্ত্রের জন্যে তাঁরা শব্দহীন প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেছেন। আরও একটা ভয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মিকে—এর কথা পরে বক্তব্য।

1969 সালের প্রায় মাঝামাঝি অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে ছয়টি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভ ছিল। এদের মধ্যে চারটি 153 সেন্টিমিটার লম্বা এবং অন্য দুটির একটি 66 ও একটি 61 সেন্টিমিটার লম্বা। 66 সেন্টিমিটার লম্বা একটি স্তম্ভ মেরিল্যাণ্ডের 100 কিলোমিটার দূরস্থিত অ্যারাগন জাতীয় যন্ত্রাগারে (Aragonne National Laboratory) স্থাপিত। পরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে, মেরিল্যাণ্ড ও অ্যারাগনস্থ যন্ত্র একই সঙ্গে কম্পিত হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে, এই কম্পনের উত্তেজনা আসছে মহাজগৎ থেকে। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ কম্পন অ্যারাগন থেকে মেরিল্যাণ্ড যেতে যে সময় লাগে ও পৃথিবী কম্পনের কেন্দ্র কোথায় হলে প্রায় একত্র মেরিল্যাণ্ড ও অ্যারাগনে কম্পন পৌঁছাবে—এসব হিসাব করে এই সম্ভাবনা খুবই কম দেখা গেছে। 1/2 সেকেণ্ডেরও কম একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে কম্পন অ্যারাগন ও মেরিল্যাণ্ডে হলে তাকে ওয়েবরের দল 'একত্র-কম্পন' বলছেন। বহুসংখ্যক 'একত্র-কম্পন' দেখে মহাজগৎ থেকে আগত এই কম্পন সম্বন্ধে উক্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ প্রায় নিঃসন্দেহ।

আগেই বলা হয়েছে যে, যে কম্পাঙ্কে প্রধানতঃ পরীক্ষা চলছে, তা হলো 1660। সুপারনোভার কারণ এই কম্পাঙ্ক মহাজগৎ থেকে আসা খুবই স্বাভাবিক এবং যন্ত্রেও তা ধরা পড়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই তরঙ্গ মহাজগৎ থেকে আগত হলেও এটা কি মহাকর্ষণ-তরঙ্গই বটে? 1969 সালে অধ্যাপক যখন তাঁর কীর্তি—বিশেষ করে 1967 থেকে 1969-এর কীর্তি—লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন, তখনও এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। 1970-এর এপ্রিলে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ঘোষিত হয়েছে যে, মহাজাগতিক রশ্মির কারণে তাঁদের যন্ত্রের কম্পন ঘটবে না। সুতরাং কম্পনের কারণ যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ, সে সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

চাঁদ শব্দশূন্য। এই জন্যে ও অন্যান্য কারণে চাঁদ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র বসাবার প্রকৃষ্ট স্থান।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন—পরে তাকে ধরে ধরেন হার্টস (Hertz)—আইনষ্টাইনের অনুমিত মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ সেই মত ধরে ধরলেন অধ্যাপক ওয়েবর। তাঁদের গবেষণা আরও অগ্রসর হলে—আরও অজ্ঞাত কম্পাঙ্কের তরঙ্গ নিয়ে কাজ হলে—এক কথায়, বিজ্ঞান-জগৎ এই বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ হলে (সত্যানুসন্ধানে চট্ করে নিঃসন্দেহ হওয়া ভুল) ওয়েবরের কীর্তি বিজ্ঞান-জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের অবদান

মিনতি চক্রবর্তী

প্রত্নতত্ত্ব বলিতে সাধারণতঃ মানুষের তৈয়ারী প্রত্নবস্তুর বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বুঝায়; অর্থাৎ প্রাচীন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা যদি কোনও স্থান হইতে চিহ্নস্বরূপ উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে সেই সময়ের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাই প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে কোনও প্রাচীন স্থানের সময় নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের কিরূপে সাহায্য করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণ সাধারণতঃ দুই রকমভাবে হইতে পারে:—

প্রথমটি হইল আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ আর দ্বিতীয়টি হইল পরম সময় নির্ধারণ।

আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ—যখন কোনও স্থানের অবিদিত সময়কে অন্য স্থানের বিদিত প্রত্নতাত্ত্বিক সময়ের সহিত তুলনা করিয়া আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহাকে বলা হয় আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ। এইভাবে যে সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন—পুরাপ্রস্তর যুগ (Paleolithic Age), মধ্যপ্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) প্রভৃতি।

আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ নিম্নলিখিত প্রকারগুলিতে পাওয়া যায়:—

(ক) **প্যালিওন্টোলজিক্যাল**—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্মের সাহায্য লওয়া হয়। এই জীবাশ্মগুলি প্রাচীন মেরুদণ্ডী অথবা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হওয়া চাই। এইরূপ কোন প্রাণীর জীবাশ্ম যদি কোন একটি বিশিষ্ট স্তরে বা স্তূপের উপর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রাণীটির অস্তিত্ব যে যুগে ছিল, সেই যুগ হইতে সেই বিশিষ্ট স্তরের সময় তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যদিও কোনও স্থান হইতে টাইপ ফসিল (যাহা কোনও বিশিষ্ট সময় ও বিশিষ্ট কালচারের নির্দেশ দেয়) পাওয়া যায়, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের নর্মদার উপকূলে পুরাপ্রস্তর যুগের যে স্তরবিন্যাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে এইরূপ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম এলিফ্যাস অ্যান্টিক্যুয়াস নোমাডিক্যাস এবং ইহার অস্তিত্ব হইতে এই স্থানের সময় নির্ধারিত হইয়াছে প্লাইস্টোসিনের মধ্যভাগ।

(খ) **প্যালিওবটানিক্যাল**—এই ভাবে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্মের

পরিবর্তে প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের সাহায্য লওয়া হয় এবং কোনও স্তরের ভিতর ঐ জীবাশ্মের উপস্থিতি হইতে উহার সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(গ) ইকোলজিক্যাল—আবহাওয়া পরিবর্তনের মাত্রা নির্ধারণের দ্বারা এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন—প্লুভিয়াল পিরিয়ডে কোনও স্থানে সঞ্চয় ও ইন্টারপ্লুভিয়াল পিরিয়ডে ক্ষয় হইলে সেই সঞ্চয় ও ক্ষয়ের মাত্রা লক্ষ্য করিয়া ঐ স্থানের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ভারতে সোয়ান উপত্যকায় এইভাবে সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

টাইপোলজিক্যাল—এইভাবে সময় নির্ধারণে মানুষ কর্তৃক তৈয়ারী ও ব্যবহৃত প্রাচীন আয়ুধ, হাতিয়ার অথবা মৃৎপাত্রের সাহায্য লওয়া হয়। খননকার্যের ফলে ঐ সকল প্রত্নবস্তু যদি কোন বিশিষ্ট স্তর হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তু একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অথবা প্রাগৈতিহাসিক সময়ের নির্দেশ করে। এখন, অনুরূপ আর একটি প্রত্নবস্তু যদি অন্য কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায় এবং উহাদের গঠন-কৌশল যদি এক রকমের হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুটি পূর্বোক্ত সময় নির্ধারিত বস্তুটির সমসাময়িক এবং ঐ বস্তু হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারিত হয়।

ম্যাগ্নেটিক—পোড়া মাটি, ইট, চুল্লী, টেরাকোটা প্রভৃতি জিনিষ, যাহার মধ্যে লৌহজাতীয় পদার্থ আছে, তাহা কোন স্থানের সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। এই সকল পদার্থ যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীর চুম্বকীয় ভ্রামক প্রাপ্ত হয়। যে সকল বস্তু এইরূপ ভ্রামক প্রাপ্ত হয়, তাহা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে কোনরূপ পরিবর্তিত হয় না। আমরা জানি, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। যদি উপরিউক্ত কোন বস্তু কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায়, তবে ঐ সকল বস্তু পোড়াইলে তাহা হইতে লৌহজাতীয় পদার্থ পৃথক করা যায় এবং দেখা যায় যে, সেই লৌহের চৌম্বকত্ব প্রাপ্তির ফলে তাহা যে যুগের তৈয়ারী, সেই যুগের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিগ্নির্ণয় করিতেছে। এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণের জন্য অন্য একটি বস্তুর (যাহার সময় পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছে) সাহায্য লওয়া হয়। যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত বস্তুর সময়, সময়-নির্ধারিত বস্তুর সময়ের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বস্তুর নির্মাণকার্য একই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ দুইটি বস্তু একই সময়ের।

ফ্রান্সের থেলিয়ার, ইংল্যাণ্ডের কুক, আইতকেন এবং জাপানের ওয়াটনেবল এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেক স্থানের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

কেমিক্যাল—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমূহের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ইহা কার্বন-14 পদ্ধতির ন্যায় বস্তুসমূহের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। কার্বন-14 পদ্ধতিতে সাধারণতঃ 70,000 বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু তাহার অধিক হইলে কার্বন বহনকারী বস্তুসমূহ তাহাদের তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য যে সকল হাড় 70,000 বৎসর পূর্বেকার (যেমন প্লাইস্টোসিন যুগের প্রথম ভাগের), রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা তাহার সময় নিরূপিত হইতে পারে। এই পরীক্ষার জন্য হাড়জাতীয় পদার্থের আভ্যন্তরীণ ফ্লোরিন, নাইট্রোজেন এবং ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

খননকার্যের ফলে মাটি হইতে প্রাচীন মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর যে সকল হাড় পাওয়া যায়, সেগুলির অভ্যন্তরে যে হাইড্রোক্সি-

অ্যাপেটাইট থাকে, সেগুলির মাটির অভ্যন্তরের জল শোষণ করিবার একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। এই সকল ফ্লোরিন হাইড্রোক্সি-অ্যাপেটাইটের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাড়ের মধ্যে বর্তমান থাকে। যতদিন এই সকল হাড় মাটির মধ্যে থাকিবে, ততদিন উহার অভ্যন্তরের ফ্লোরিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হাড়ের এই ফ্লোরিন গ্রহণ করিবার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার বেশী ফ্লোরিন আর হাড়গুলি গ্রহণ করিতে পারে না। এই হাড়ের ফ্লোরিনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহার সহিত অন্ত কোন নির্ধারিত সময়ের হাড়ের তুলনা করিয়া প্রথমোক্ত হাড়ের সময় নির্দেশিত হয়। তবে এই পদ্ধতিতে একটি অঞ্চলের হাড়ের গুণাগুণ পরীক্ষার দ্বারাও সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ গ্রাউণ্ড ওয়াটারে ফ্লোরিনের পরিমাণ স্থানানুযায়ী পৃথক হইয়া থাকে।

হাড়ের আভ্যন্তরীণ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ দেখিয়াও উহার আপেক্ষিক সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ সগু-প্রাপ্ত হাড়সমূহে ইউরেনিয়াম থাকে না।

ডেনড্রোক্রোনোলজিক্যাল—বিজ্ঞানের যে শাখায় সাধারণতঃ বৃক্ষের বলয় গণনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় ডেনড্রোক্রোনোলজি। গাছের অভ্যন্তরে যে ক্যাম্বিয়াম থাকে, তাহার কর্মক্ষমতায় প্রতি বৎসর গাছের বাৎসরিক বৃদ্ধি-বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধি-বলয়গুলি গাছের পুরাতন অংশ ও ছালের মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ যে ঋতুতে (যেমন বসন্তকালে) গাছের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন গাছে বড়, পাতলা প্রাচীর-বিশিষ্ট কোষ গাছের কাঠে যুক্ত হয়। গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার শেষের দিকে ঐ কোষগুলি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরের বৎসর বসন্তে একই প্রকারে আবার নূতন কোষ উৎপন্ন হইয়া গাছের বলয়ের সৃষ্টি করে। গাছের অভ্যন্তরে এইরূপ নূতন ও পুরাতন অর্থাৎ ছোট ও বড় বলয়ের সৃষ্টির ফলে একটি নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায়।

গাছের যে স্থানে এই বলয়ের সৃষ্টি হয়, সেই অংশ হইতে একটি পাতলা গোলাকার অংশ কাটিয়া উহার উপর কোন তরল পদার্থ দিয়া পরীক্ষাগারে বলয়ের সংখ্যা গণনা করা হয়। এই গণনা সাধারণতঃ গোলাকার অংশের ব্যাসার্ধ ধরিয়া করা হয়। প্রতিটির 10টি বলয় যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটি পিনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যে বলয়গুলির বেধ খুব পাতলা, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয় না, কেবলমাত্র গণনা করা হয়। কিন্তু যে সকল বলয়ের বেধ বেশ মোটা অথবা পার্শ্ববর্তী বলয়ের তুলনায় মোটা, তাহাই কেবল চিহ্নিত করা হয়।

গাছের বলয় গণনার পদ্ধতি কয়েক রকমের হইতে পারে। নিয়ে Douglass-এর পদ্ধতিটির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে:—

ডগলাস গাছের বলয়ের বেধ নির্ণয় করিয়া একটি সরল রেখার উপর কতকগুলি লম্ব টানেন। যে বলয়গুলি সাধারণ বেধের, সেগুলিকে কেবল B, BB প্রভৃতি অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করেন এবং যে বলয়গুলির বেধ একটু বেশী মোটা, সেগুলিকে কেবল বড় বড় লম্বাকৃতির রেখার দ্বারা চিহ্নিত করেন। তারপর ঐ রেখাগুলির পরিবর্তন দেখিয়া তাহা হইতে গাছের বলয়ের সংখ্যা নির্ণয় করেন।

বৈজ্ঞানিক গ্লক যে পদ্ধতির আবিষ্কার করেন, তাহাতে তুলনামূলকভাবে বলয়ের সংখ্যা বাহির করা হয়। ইহাতে সাধারণতঃ দুই রকম গাছের বলয় লওয়া হয়। কতকগুলি গাছ লওয়া হয়, যাহাদের প্রকৃত বলয় আছে। আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভিদ লওয়া হয়, যাহাদের প্রকৃত বলয়ের সংখ্যা পাওয়া যায় না। কোনও প্রাচীন উদ্ভিদের বলয় কোনও নূতন উদ্ভিদের বলয়ের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। উভয় গাছের

বলয়গুলি যদি এইরূপে মিলিয়া যায়, তবে একটি বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বলয়ের সহিত ও অন্য বৃক্ষের বাহিরের বলয়ের সহিত একটি সরল রেখা টানিয়া সময় নির্ধারিত হয়। যে সকল বৃক্ষের প্রকৃত বলয় পাওয়া যায় না, এই পদ্ধতিটি সেই সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। উভয় পরীক্ষাতেই যে সকল গোলাকার অংশ লওয়া হয়, তাহার ব্যাস, মূলের উপর হইতে সেই অংশের উচ্চতা, যে স্থান হইতে উদ্ভিদটিকে লওয়া হইয়াছে, সেই স্থানবিশেষের বিবরণ বা Topography ও অবস্থান, যে মাটি হইতে উদ্ভিদটিকে তোলা হইয়াছে তাহার প্রকৃতি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোন প্রস্তর বা গাছ-গাছড়া যদি পাওয়া যায়, তাহা চিহ্নিত করা হয়। গোলাকার অংশ যদি মূলের কাছাকাছি বৃক্ষের কোনও স্থান হইতে পাওয়া যায়, তবে সেই অংশ সময় নির্ধারণের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত।

ভার্ভ-ক্লে অ্যানালিসিস—বৈজ্ঞানিক De Geer 1878 সালে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বরফাবৃত স্থানে হিমবাহ হইতে বরফ গলিবার পর হিমবাহনিঃসৃত যে জল থাকে, তাহার উপর প্রতি বৎসর কতকগুলি স্তর পড়ে। এই স্তরগুলিকে সুইডিশ ভাষায় বলা হয় ভার্ভস (Varves) এবং স্তরের সমাবেশকে ভূতাত্ত্বিকগণ ভার্ভ-ক্লে (Varve clay) অথবা স্লাওস বলিয়া থাকেন। এই সমাবেশ সাধারণতঃ লেক, টারমিনাল মোরেন, সমুদ্র বা নদীর উপরেই হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে বরফ যখন খুব বেশী-মাত্রায় গলিতে থাকে, তখন বরফাবৃত অঞ্চলের নিকটবর্তী জলাধারসমূহে খুব বেশী মাত্রায় এই ভার্ভ-ক্লে-র সমাবেশ দেখা যায়। এই সমাবেশে অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় কণিকাগুলি সাধারণতঃ নীচের দিকে এবং সূক্ষ্মতর কণিকাগুলি উপরিভাগে জমিতে থাকে এবং সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি সর্বাপেক্ষা উপরে থাকে। পরের বৎসর আবার সেই স্থানে এইরূপ ভার্ভ-ক্লের সমাবেশ হয়। এই-ভাবে বৃক্ষের বলয়ের ন্যায় জলাধারসমূহে এক-একটি বলয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বলয় এক-একটি বৎসরের নির্দেশ করে। প্রতি বৎসরের এই সমাবেশ হইতে বৃক্ষের গোলাকার অংশ লইয়া উহা হইতে সেই স্থানের সময় জানা সম্ভব। যদি কোন স্থানের ভার্ভ অন্য কোন স্থানের ভার্ভের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দুইটি স্থানের ভার্ভ একই সময়ে গঠিত হইয়াছে। এইভাবে ভার্ভ-ক্লে পরীক্ষা করিয়া কোনও বিস্তৃত স্থানের সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। দ গীয়ার এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, উত্তর ইউরোপের শেষ শৈত্যযুগের সমাপ্তি 12,000 বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।

পোলেন অ্যানালিসিস—এই পদ্ধতিটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের পরাগরেণুর পরীক্ষার দ্বারা একটি সময়-নির্দেশ পাওয়া যায়। এই পরাগ সাধারণতঃ দেখা যায় উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলা-ভূমির মৃত্তিকার উপর জৈব পদার্থসঞ্চিত হ্রদ এবং কর্দমাক্ত স্থানের উপর। এই পরাগসমূহ বহুদিন ধরিয়া জমা হইবার পর বাতাসের সংস্পর্শে জীবাশ্মে পরিণত হয়। কোনও স্থানের পরাগ পরীক্ষা করিয়া সেই স্থানে কি ধরণের ফুলের আধিক্য ছিল, তাহা জানিয়া আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই আবহাওয়া নির্ণয় করিয়া সেই স্থানের সময় নির্দেশ করা সম্ভব। পোলেন অ্যানালিসিসের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল—উদ্ভিদের উপাদানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা। একটি নমুনা হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভিদের উপাদানের যে পরিবর্তন হয়, তাহা বোঝা সম্ভব নয় বলিয়া বিভিন্ন রকমের নমুনা লওয়া হয়।

পোলেন অ্যানালিসিসের ফলাফল সাধা-

রণতঃ তালিকার পরিবর্তে চিত্রের সাহায্যে সূচিত করা হয়। প্রত্যেকটি পোলেন নির্দেশের জন্য একটি বিশিষ্ট চিহ্নের সাহায্য লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রতিটি উদ্ভিদের গণ (Genus) অথবা প্রজাতির (Species) জন্য একটি মানচিত্র তৈয়ারী করেন এবং তাহা হইতে বিভিন্ন পোলেনের আবর্তনের ব্যবধান মাপিয়া সময় নির্ধারণ করেন।

আলট্রাসোনিক—বৈজ্ঞানিক স্পেক্ট এবং বার্গ সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীদের হাড়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নূতন হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের যে বেগ দেখা যায়, তাহা 500 বৎসর পূর্বের হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগের ঠিক অর্ধেক, আবার 5000 বৎসর পূর্বেকার হাড়ের শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ তাহারও অর্ধেক। হাড়ের এই শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী হ্রাস পাইবার মাত্রা সর্বত্র সমান নয় এবং এই ভাবে যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহা ভ্রমশূন্য নয়। তাহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে কতকগুলি বাধা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া, যেমন—ক্যালসিফিকেশন, সিলিসিফিকেশন অথবা ফেরুজিনাইজেশন প্রভৃতির হাড়ের উপর বিভিন্ন রকম বিক্রিয়ার ফলে বাধা সৃষ্টি করে।

স্ট্র্যাটিগ্রাফিক জিওমরফিক—এই পদ্ধতিটি ভূতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। অধঃক্ষেপণ ও ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর উপর যে বিভিন্ন স্তর, নদীতটচত্বর প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার উপর যদি কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূতাত্ত্বিক স্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব। যে স্তরে ঐ প্রত্নবস্তু পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত নিকটবর্তী কোন অধঃক্ষেপের ভূতাত্ত্বিক স্তরের স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক টানিতে হইবে। যদি উভয়ের স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক এক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উভয় স্তর এক সময়ে গঠিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ভারতের ব্রহ্মগিরির সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

নদীতটরেখার স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন—যদি কোন প্রত্নবস্তু সমুদ্র বা নদীর তীর-সংলগ্ন কোন স্থানে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়। এই তীরসংলগ্ন স্থানগুলি পূর্বে যে ঐ স্থানে নদী অথবা সমুদ্র ছিল এবং ভূমির উচ্চতা অথবা সমুদ্র-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করে। ঐ তীরসংলগ্ন যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া যাইবে, সেগুলিকে যে সময়ে ঐ ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেই সময়ের বুঝিতে হইবে।

বালুকাস্তূপের স্থান পরিবর্তনের হার—ষ্টুং নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, বালিয়াড়ি বিচলনের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় লাগে, তাহা বায়ব অধঃক্ষেপের সর্বাপেক্ষা কম সময়ের সহিত মিলিয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতিতে বালিয়াড়ি বিচলনের সময় মাপিয়া সেই স্থানের সময় নির্ধারণ সম্ভব করা হয়।

ট্রাভারটাইন সঞ্চয়ের হার—স্তরের অন্তর্ভুক্ত স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাকটাইট সঞ্চয়ের হার নির্ধারণপূর্বক সেই স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কোন স্থানের আবহাওয়া নির্ধারণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারণও সম্ভব হয়।

তেজস্ক্রিয়তার পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে মোটামুটিভাবে পরম সময় নির্ধারণ (Absolute dating) সম্ভব হয়।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলির রশ্মি বিকিরণের হার সাধারণতঃ অর্ধ-জীবনকাল বা হাফ লাইফের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরমাণুগুলি

রূপান্তরিত হইতে থাকে। যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক সংখ্যক পরমাণুর রূপান্তর ঘটে, তাহাকে ঐ পদার্থের হাফ লাইফ বলা হয়। পরীক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লীয় বিভাজনের ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়। এই ধ্রুবকের সাহায্যে ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ নির্ণয় করা সম্ভব। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ জানা গেলে যে প্রস্তরে ঐ পদার্থ থাকে, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনও শূন্য সময় (O-time) হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই প্রস্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়।

কার্বন-14—আমরা জানি, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি আছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন 12। বায়ুস্তরের উপরিভাগে যে নাইট্রোজেন-14 আছে, তাহা নভোরশ্মি হইতে আগত নিউট্রনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বন^{14} উৎপন্ন করে। এই কার্বন-^{14} তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিক্রিয়াটি এইরূপ :—

নিউট্রন + নাইট্রোজেন-14 = প্রোটন + কার্বন^{14}। এই কার্বন পরমাণুগুলি বাতাসের অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করে। এই শেষোক্তরূপ কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন 14 এবং ইহা জীবমণ্ডলে সঞ্চালিত হয়।

যখন বাতাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, তখন এই কার্বন^{14} কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। প্রাচীন উদ্ভিদসমূহের দেহ হইতে এই কার্বন^{14} বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন^{14} তাহার পর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করিতে থাকে। অতঃপর যে স্থান হইতে প্রাচীন উদ্ভিদ লওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে কিছু নূতন উদ্ভিদ লওয়া হয়। অনুরূপভাবে ঐ সকল উদ্ভিদের দেহ হইতেও কার্বন^{14} বাহির করিয়া উহার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ তুলনা করিয়া প্রাচীন উদ্ভিদটির সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে কার্বন^{14}-এর অর্ধজীবনকাল 5,560 বৎসর। এই পদ্ধতিতে 50,000 বৎসরের মধ্যেকার উদ্ভিদের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। এইভাবে সময় নির্ধারণে যে ভ্রম ধরা হয়, তাহা হইল 100 হইতে 12,000 বৎসর।

তেজস্তিলকের (Pleochroic halo) বর্ণায়নের তীব্রতা পরিমাপ পদ্ধতি—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি আল্‌ফা কণা বিকিরণ করে। আল্‌ফা কণাগুলির বিশেষ ধর্ম হইল এই যে, সেগুলি কাচ, স্ফটিক এবং অভ্রের বর্ণবিকৃতি বা উহাদের রঞ্জিত করিতে পারে। এই অংশগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে বৃত্তাকার অংশরূপে দেখা যায়। এই বৃত্তাকার অংশগুলির নাম তেজস্তিলক (Pleochroic halo)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এই বৃত্তাকার অংশগুলির সমবর্তন তল পরিবর্তনের ফলে প্রাখর্যের পরিবর্তন ঘটে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাখর্য হইতে রঞ্জন ঘটিতে কতটা বিকিরণ ঘটে, তাহা স্থির করা হয়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট তালিকা-সূচী প্রস্তুত করা হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তরের বিকিরণের দ্বারা প্রাখর্য স্থির করা হয়। যে প্রাখর্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য কতটা আল্‌ফা কণা দরকার, তাহা তালিকা-সূচী হইতে বাহির করা হয়। এই আল্‌ফা কণা বিকিরণ করিতে যে সময় লাগে, তাহা হইতে ঐ নির্দিষ্ট প্রস্তরের সময় বাহির করা হয়।

ইউরেনিয়াম ও হিলিয়ামের অনুপাত—ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিভাজনের ফলে আটটি আল্‌ফা কণা নির্গত হয়। আল্‌ফা কণা দুই

একক ধনবিদ্যুৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। ঘনীভূত পদার্থের মধ্যে এই হিলিয়াম পরমাণুর গতি খুব কম হইবার ফলে ইহাদের অধিকাংশই প্রস্তরের মধ্যে আটকা পড়িয়া যায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তরের মধ্যে যে থোরিয়াম থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। কারণ থোরিয়ামও হিলিয়াম কণার বিকিরণ ঘটায়। সূর্যরশ্মি হইতেও হিলিয়াম কণা বিকিরিত হয়। এই হিলিয়াম কণার পরিমাণ মাপিবার পর উপরি-উক্ত ফর্মূলার সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা হয়।

$$T = \frac{88\ He}{U + 0.27\ Th} \times 10^{6} \text{ years.}$$

ইউরেনিয়াম লেড^{206} এবং থোরিয়াম লেড^{208}-এর অনুপাত—ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলে যে স্থায়ী পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইল লেড^{206}। মাস-স্পেকট্রোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হয় লেড^{206}-এর পরিমাণ কত বা লেড^{208}-এর পরিমাণ কত। লেড^{206}-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফর্মূলার (1) সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়। আর লেড^{208}-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফর্মূলা (2)-এর সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$(1)\quad t = 15.15 \times 10 \log \left(1 + 1.58 \frac{Pb^{206}}{U}\right) \text{ years}$$

$$(2)\quad t = 46.2 \times 10^{9} \log \left(1 + 1.116 \frac{Pb^{208}}{Th^{232}}\right) \text{ years.}$$

এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণের সুবিধা এই যে, লেড^{208} স্থায়ী পদার্থের পরিমাণ প্রাকৃতিক সংস্পর্শে কম ক্ষয় হয়।

ইউরেনিয়াম-লেড ও অ্যাক্টিনিয়াম-লেড-এর অনুপাত—পূর্বোক্ত পদ্ধতির ন্যায় লেড^{206} ও লেড^{207}-এর পরিমাণ মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপিবার পর নিম্নোক্ত ফর্মূলায় ফেলা হয়।

$$\frac{\text{লেড}^{206}}{\text{লেড}^{207}} = \frac{1}{139}\left(\frac{e^{\lambda u^{235} t} - 1}{e^{\lambda u^{238} t} - 1}\right) \text{ years.}$$

(λ= নিউক্লিয় বিভাজন ধ্রুবক)

লেড^{210} ও লেড^{206}-এর অনুপাত—

ইহা চার নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ। প্রাচীন প্রস্তরে লেড^{210} ইউরেনিয়ামের সহিত একই সমতায় থাকে। মাস-স্পেকট্রোমিটারে প্রথমে লেড^{206}-এর পরিমাণ মাপা হয়, তাহার পর রেডিও কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের দ্বারা লেড^{210}-কে মাপা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত ফর্মূলায় সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$t = 15.15 \times 10^{9} \log \left(1 + 1.58 \frac{Pb^{206} + Pb^{210}}{U}\right) \text{ years.}$$

পটাশিয়াম^{40} ও আরগন-এর অনুপাত—পটাসিয়াম^{40} তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা আরগন স্থায়ী পদার্থ বা ক্যালসিয়াম দিতে পারে। আরগন^{40}-এর পরিমাণ মাপিয়া ফর্মূলায় ফেলা হয়—

$$\frac{A^{40}}{K^{40}} = \frac{\lambda K}{\lambda K + \lambda_B}\left[e^{(\lambda_B + \lambda K)t} - 1 \right]$$

রুবিডিয়াম ও ষ্ট্রনসিয়ামের অনুপাত—রুবিডিয়াম^{87} তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা বিশ্লেষণ-পূর্বক স্থায়ী পদার্থ ষ্ট্রনসিয়াম দিতে পারে। মাস-স্পেকট্রোমিটারের দ্বারা ষ্ট্রনসিয়াম^{87}-এর পরিমাণ মাপিয়া নিম্নোক্ত ফর্মুলায় ফেলা হয়—

$$t = \frac{6{\cdot}2 \times 10^{10}}{0{\cdot}6993} \times \frac{Sr^{87}}{Rb^{87}}$$

তেজস্ক্রিয়াজাত লেড ও সাধারণ লেড-এর অনুপাত—যে প্রস্তরের মধ্যে লেড^{206}, লেড^{207} এবং লেড^{208}—এই তিনটি পদার্থ থাকিবে, সেই প্রস্তরগুলিরই এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা যাইবে। লেড^{206}, লেড^{207} ও লেড^{208}-কে রেডিওজিনিক লেড (Radiogenic lead) বলা হয়। তেজস্ক্রিয়াজাত নহে, এরূপ আদিম লেড-এর 206 ও 207-এর অনুপাতের সহিত তেজস্ক্রিয়াজাত লেড-এর উক্ত আইসোটোপগুলির অনুপাত তুলনা করিয়া প্রস্তরের সময় নির্ধারণ করা যায়।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রসায়নের ভূমিকা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মত উদ্ভিদের দেহও নানাপ্রকার রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন কয়েকটি হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধিও তেমনি কয়েকটি হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হর্মোন হচ্ছে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এমন এক শ্রেণীর পদার্থ, যা দেহের কোন বিশেষ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে অন্তঃস্রাবী হর্মোনগুলির সন্ধান বহু পূর্বেই পাওয়া গেছে এবং সেগুলিকে সনাক্ত করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ-দেহের হর্মোনগুলির সন্ধান ও সেগুলির সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

এখন পর্যন্ত উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টিসহায়ক তিন শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তিন শ্রেণীর হর্মোন হচ্ছে, অক্সিন (Auxin) জিবারেলিন (Gibberelin) এবং সাইটোকিনিন (Cytokinin)। এই তিন শ্রেণীর হর্মোনের আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি হর্মোনের কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে—যার প্রভাব হচ্ছে বিপরীত, অর্থাৎ যা উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা না করে বরং তা রোধ করে থাকে। সেটি হচ্ছে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid) বা সংক্ষেপে ABA।

উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে এই হর্মোনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি জৈবিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ABA-এর ভূমিকা হচ্ছে অপর তিনটি হর্মোনের বিপরীত; অর্থাৎ প্রথমোক্ত হর্মোন তিনটি যেখানে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ABA সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রোধের পক্ষে সহায়ক হয়। এই

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-29।

প্রসঙ্গে ইথিলিনের (Ethylene) কথাও উল্লেখ করতে হয়। দীর্ঘকাল থেকে জানা আছে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ইথিলিনের প্রভাব আছে যথেষ্ট এবং উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরেই তা সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে উদ্ভিদের পুষ্টি সহায়ক তিন শ্রেণীর হর্মোনের মধ্যে।

অক্সিন

উদ্ভিদের দেহে অক্সিনের প্রভাবে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, মূলের বৃদ্ধিরোধ, অস্থানিক মূলের উৎপত্তি, পাতা ও ফলের পতনরোধ এবং পরাগযোগ ছাড়াই ফলের উৎপত্তি।

উদ্ভিদ-দেহ থেকে যেসব অক্সিন এখন পর্যন্ত পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে AA।

ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড

অনুরূপ প্রতিক্রিয়া বহু সংশ্লেষিত অক্সিন যৌগেও দেখা গেছে। এই ধরণের সংশ্লেষিত অক্সিন বর্তমানে বিশেষ বিশেষ আগাছানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লঘু দ্রবণে অক্সিনগুলি আগাছা বিনাশে খুবই কার্যকর। কিন্তু অধিক মাত্রায় অক্সিন ব্যবহার করলে মূল গাছই দু-এক সপ্তাহের মধ্যে মরে যায় অথবা কাণ্ড বিদীর্ণ হয়ে ও পাতার আকার বিকৃত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের উপর অক্সিনগুলি যে কাজ করে, তার মূলে আছে কয়েকটি কারণ:

(1) যেসব গাছ অক্সিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, দেখা যায় সাধারণতঃ তাদের পাতা প্রশস্ত ও অনুভূমিকভাবে ছড়ানো হয়ে থাকে। এর ফলে বীজতম (Herbicide) দ্রবণ যখন স্প্রে করে পাতার উপর ছিটানো হয়, তখন সেই দ্রবণের কণাগুলি সহজেই পাতায় লেগে থাকে; কিন্তু যেসব গাছের পাতা সরু ও খাড়াভাবে ছড়ানো থাকে, তাদের পাতার উপর এই দ্রবণের কণাগুলি লেগে থাকে না এবং তার ফলে এই সব গাছে অক্সিন দ্রবণের তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না।

(2) অক্সিনের আগাছানাশক বিষক্রিয়ায় একবীজপত্রী উদ্ভিদের তুলনায় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি প্রভাবান্বিত হয়।

(3) কোন কোন উদ্ভিদের ত্বকে বীজতম সহজেই অনুপ্রবেশ করে। সংশ্লেষিত অক্সিনের অনেকগুলির ক্রিয়া উদ্ভিদ-দেহে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ IAA-এর মত জৈবিক বিক্রিয়ায় তারা সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অক্সিনের আর একটি মূল্যবান উপযোগিতা হলো—যেখানে প্রাকৃতিক পরাগযোগ ঘটে না, সেখানে অক্সিনের সাহায্যে উদ্ভিদে ফল উৎপাদন করা যায়। সংশ্লেষিত অক্সিনের দ্রবণ যখন টোম্যাটো গাছের উপর স্প্রে করা হয়, তখন একেবারে স্বাভাবিকভাবেই সে গাছে ফল ধরে এবং সেই ফলে সাধারণতঃ কোন বিচি থাকে না।

জিবারেলিন

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জাপানে এই শ্রেণীর হর্মোন প্রথম আবিষ্কৃত হয়। জাপানে ধানগাছে Gibberella fujikuroi নামে এক প্রকার ছত্রাকের দ্বারা সৃষ্টি রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার সময় জিবারেলিন আবিষ্কৃত হয়। যেসব ধান গাছ এই ছত্রাকের দ্বারা

আক্রান্ত হয় নি, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, এই ছত্রাকাক্রান্ত ধানগাছ তাদের চেয়ে সরু ও লম্বা হয় এবং বৃদ্ধির দিক থেকে তাদের ছাড়িয়ে যায়। 1938 সালে এই ছত্রাকের কোষমুক্ত নির্বীজিত নির্যাসে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উদ্ভিদ-দেহের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নির্যাস থেকে রাসায়নিক পদার্থটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন এবং তার নাম দেন জিবারেলিন। এখন পর্যন্ত 27টি জিবারেলিন সনাক্ত করা গেছে। এদের মধ্যে সমধিক পরিচিত হচ্ছে জিবারেলিক অ্যাসিড GA_3। বাণিজ্যিক

জিবারেলিক অ্যাসিড

ভিত্তিতে এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রস্তুত করা হয় ছত্রাক চাষের পচন (Fermentation) থেকে। রাসায়নিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের বিচারে GA_3 থেকে অপরাপর জিবারেলিনের পার্থক্য অতি সামান্যই, কিন্তু জৈবিক ক্রিয়াকলাপে তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Forget Me Not নামক ফুলগাছে GA_7 এবং GA_1 ব্যবহার করে সহজেই ফুল উৎপাদন করা যায়, কিন্তু GA_3, GA_4, GA_6 এবং GA_9 ব্যবহার করলে ফুল ধরে না।

জৈবিক ক্রিয়াকলাপের তারতম্যের হেতু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, এই ফুলের গাছগুলি সাধারণতঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করে যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর খর্বকায় গাছগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করতে পারে না বলে তাতে ফুল ধরে না। লক্ষ ভাগের এক ভাগ ঘনত্বে যদি জিবারেলিন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে দেখা যায়, উদ্ভিদের বিটপ ও অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। খর্বকায় সীমজাতীয় গাছের পাতায় GA_3-এর উপরিউক্ত ঘনত্বের দ্রবণ ব্যবহার করলে গাছের আকারে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু এই দ্রবণ যদি প্রয়োগ না করা হয়, তা হলে আকারে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না।

জিবারেলিনের এই বৃদ্ধিসহায়ক ক্রিয়া দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই ক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। বস্তুতপক্ষে পরীক্ষায় দেখা গেছে, জিবারেলিন উদ্ভিদবিশেষের পুষ্টিবৃদ্ধিতেই শুধু সহায়তা করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তার পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নয়। তবে ইক্ষু-শর্করা গাছে জিবারেলিন ব্যবহার করে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা গেছে এবং শণজাতীয় গাছের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কিছু সুফল পাওয়া গেছে।

সাইটোকিনিন

উদ্ভিদের বৃদ্ধিসহায়ক তৃতীয় শ্রেণীর হর্মোন হচ্ছে সাইটোকিনিন। 1955 সালে হেরিং স্পার্মের DNA থেকে কাইনেটিন (Kinetin) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করবার পর সাইটোকিনিনের আবির্ভাব হয়। তামাকগাছের Tobacco callus টিস্যুতে কোষবিভাজনে (Cyto kinesis) পূর্বোক্ত রাসায়নিক পদার্থটি সহায়ক বলে এর নাম দেওয়া হয় কাইনেটিন। কিন্তু যেহেতু N_6-প্রতিস্থাপিত অপর বহু অ্যাডেনিন (Adenine) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ একই ফল দেয়, সেহেতু তাদের থেকে পার্থক্য

বোঝাতে সাইটোকিনিন নামটির প্রস্তাব করা হয় এবং এই শ্রেণীর সমস্ত হর্মোনের সাধারণ নামকরণ করা হয় সাইটোকিনিন। উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-নিয়ন্ত্রণে, শাখা-প্রশাখার বিস্তারে এবং ফুল ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করার কাজে সাইটোকিনিন সহায়ক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

কাইনেটিন

উদ্ভিদ-দেহে সাইটোকিনিন এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাদের পৃথক ও সনাক্ত করা খুবই দুরূহ। এর ফলে 1964 সালের আগে পর্যন্ত কোন সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয় নি। 1964 সালে ভুট্টার অপক্ব অন্তর্বীজ থেকে জিয়াটিন (Zeatin) নামে প্রথম প্রকৃতিজ সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে একাধিক উদ্ভিদ-সাইটোকিনিন আবিষ্কৃত হয়েছে।

খর্বকায় আপেল গাছের ফুল ও ফলের উপর সাইটোকিনিনের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সাইটোকিনিনের প্রভাবে আপেল ফলের আকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। কি ধরণের এবং কি পরিমাণ সাইটোকিনিন ব্যবহার করা হয়, তার উপর ফলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির তারতম্য নির্ভর করে। উদ্যানপালনবিদ্যায় (Horticulture) অক্সিন এবং জিবারেলিন যেমন ব্যবহার করা হয়, অনুরূপভাবে সাইটোকিনিনও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড

আগেই বলা হয়েছে অক্সিন, জিবারেলিন ও সাইটোকিনিন যেমন উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড তার বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে থাকে; অর্থাৎ

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড

শেষোক্ত এই হর্মোনটির প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে থাকে। বৃদ্ধিরোধক এই হর্মোনটিকে সর্বপ্রথম পৃথক ও সনাক্ত করা হয় 1965 সালে। ঘাস, সীম, আলু, আপেল ইত্যাদি বহু উদ্ভিদে ABA-এর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ABA উদ্ভিদের ফল ও পাতা তাড়াতাড়ি ঝরিয়ে দেয় এবং ফুল ও অঙ্কুরোদ্গম দীর্ঘায়িত করে।

উদ্ভিদ-দেহে এই হর্মোনগুলি কিভাবে কাজ করে, তার জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি। এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এই হর্মোনগুলির জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ যেদিন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে, সেদিন উদ্ভিদরাজ্যে তার উপযোগিতা পুরামাত্রায় কাজে লাগানো যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো এই হর্মোনগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সাধনে সক্ষম হবো।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা

শঙ্কর চক্রবর্তী

গত কয়েক বছর ধরে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি ভূমিকা তৈরি হয়ে চলেছে। চাঁদে মানুষের অবতরণের ঘটনার পাশে এই ভূমিকাকে তত উজ্জল মনে না হলেও এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। বর্তমান প্রবন্ধে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

1962 সালে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিদ্যা-সংক্রান্ত উপসমিতি মহাকাশের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্যে নিরক্ষীয় এলাকার কোন অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেন। ভারত সরকার অগ্রণী হয়ে ভারতের জমিতে এই জাতীয় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ভারতের পারমাণবিক সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর হোমি ভাবা এবং মহাকাশ গবেষণা কমিটির প্রধান ডক্টর বিক্রম সরাভাইয়ের উপর এই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে থুম্বা নামে একটি জায়গাকে এই কাজের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

থুম্বা থেকে 1963 সালের 21শে নভেম্বর ভারতের প্রথম সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

থুম্বা

থুম্বা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিভান্দ্রাম শহর থেকে 16 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। থুম্বার সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক বিশেষত্ব হলো, জায়গাটি রয়েছে পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার উপর। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি মহাদেশের জমির উপর থুম্বার মত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার উপর কোন জায়গা থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব অঞ্চলে, ভূপৃষ্ঠের উপর 90 থেকে 130 কিলোমিটারের মধ্যে একটি Electrojet বা বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিদ্যুৎস্রোতের প্রকৃতি এবং ধর্ম সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীরা আজও সঠিকভাবে জেনে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরির পিছনে ঐ বিদ্যুৎস্রোতের যে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল।

চৌম্বক বিষুবরেখার কাছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পুরাপুরিভাবে অনুভূমিক অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আবার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে জোরালো এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপর সবচেয়ে দুর্বল। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি নিম্ন অক্ষাংশের অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির অত্যন্ত শক্তিশালী কণাসমূহ এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এসব কারণের জন্যে থুম্বার উপরে কয়েক-শ' কিলোমিটার বিস্তৃত একটি অঞ্চল রয়েছে (এর অবস্থিতি হলো আয়নমণ্ডলের F স্তরের উপরে), যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চৌম্বক বিষুবরেখার উপর কোন জায়গা থেকে আয়নমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে 30 কিলোমিটার থেকে 200 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, সন্ধানী রকেট হলো তার গবেষণার একমাত্র মাধ্যম। কারণ এই অঞ্চলটি যেমন গবেষণার যন্ত্রপাতিসজ্জিত বেলুনের পরিক্রমা-অঞ্চলের ঊর্ধ্বে, তেমনি আবার কৃত্রিম উপগ্রহগুলির পরিক্রমা-পথেরও অনেক নীচে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনুসন্ধানের কাজে থুম্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সন্ধানী রকেটের পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল না হবার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাকে কাজে রূপ দেওয়াও সম্ভব ছিল।

ভারতের থুম্বা কেন্দ্রে তৈরী একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে

সন্ধানী রকেট

1963 সালের 21শে নভেম্বর থুম্বা কেন্দ্র থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রথম যে রকেটটি ছোঁড়া হয়, সেটি পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার National Aeronautics and Space Administration বা NASA নামে বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে। রকেটটি ছিল এক স্তরবিশিষ্ট। ঘণ্টায় এটি প্রায় 3500 কিলোমিটার বেগ অর্জন করেছিল এবং পৃথিবী থেকে এর সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রায় 180 কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে 100 কি. মি. দূরত্বে রকেটটির মাথায় বসানো Payload-রূপী আধার থেকে 30 কিলোগ্র্যামের মত সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে একটি কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়। সূর্যালোকিত সেই মেঘের চেহারা যে রকম সর্পিল গতি লাভ করেছিল, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জায়গা থেকে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়।

থুম্বাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

1967 সালের 31শে অগাষ্ট থুম্বা থেকে রোহিণী নামে দুটি রকেট ছোঁড়া হয়। এই রকেট দুটির সমগ্র অংশ তৈরি করেছিলেন ভারতীয়

বিজ্ঞানীরা—এটিই ছিল ঘটনাটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

থুম্বা থেকে গত কয়েক বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের প্রায় 50 কি. মি. উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে মেনকা নামে বেশ কিছু আবহাওয়া রকেট পাঠানো হয়েছে। ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি বোঝবার জন্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক আবহাওয়া-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই উপলব্ধি করছিলেন। টাইরস ও নিম্বাস শ্রেণীর আবহাওয়া উপগ্রহগুলির কাছ থেকে Automatic Picture Transmission System-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মত ভারত মহাসাগরীয় এলাকারও বহু ছবি (প্রতিটি প্রায় 10 লক্ষ কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চল জুড়ে) বোম্বাইয়ের কোলাবাতে আবহাওয়া কেন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছয়। এই সব ছবির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে জুলাই মাসেও সবচেয়ে ঘন দুটি মেঘের স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যে দুটি স্তরের মাঝে আবার স্বল্প ঘন একটি মেঘের স্তরও ছিল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অনুসন্ধানের কাজে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1968 সালের গোড়ার দিকে থুম্বা কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পণ করেন।

1969 সালের 26শে ফেব্রুয়ারী থুম্বাতে সেন্টর নামে একটি রকেটের পরীক্ষার কাজ সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা দুই স্তরবিশিষ্ট এই রকেটটিকে এদেশেই তৈরি করেন। ফ্রান্সেরই সাহায্যে সেন্টর রকেটের জন্যে প্রয়োজনীয় কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি কারখানাও থুম্বাতে চালু করা হয়েছে, যেখানে পরবর্তী কালে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মালমশলার সাহায্যে জ্বালানী তৈরির ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হবে।

মহাকাশ গবেষণা

থুম্বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এপর্যন্ত 70টিরও বেশী সন্ধানী রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এবং ভারতে তৈরী 50টিরও বেশী রকেটকে সাফল্যের সঙ্গে ছোঁড়া হয়েছে। রকেট প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ গবেষণার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, ঊর্ধ্বাকাশের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আয়নমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট কণিকা বা আয়ন এবং তড়িৎনিরপেক্ষ (Neutral) কণিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর যে Electrojet বা বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণার কাজ পরিচালনা এবং সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা। তৃতীয়তঃ, বায়ুমণ্ডলের উপরের দুটি স্তর—ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে আবহবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা এবং চতুর্থতঃ, জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকটি ক্ষেত্র, বিশেষ করে দূরবর্তী নক্ষত্রলোক থেকে কি পরিমাণে রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তার পরিমাপ সংগ্রহ করা।

থুম্বা থেকে রকেট ক্ষেপণের মাধ্যমে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের গঠন-প্রকৃতি ও গতিবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রকেটের মাথায় বসানো বৈজ্ঞানিক আধার থেকে বাষ্পের মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠের উপরে 30 থেকে 60 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বায়ুর বেগ মাপা হয়েছে। আবার

বায়ুমণ্ডলের মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে ঐ আধার থেকে লক্ষ লক্ষ তামার টুক্‌রা ছড়িয়ে দিয়ে রেডারের সাহায্যে ঐ টুক্‌রাগুলির গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রেখে সেখানে বায়ুর গতি এবং দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডলের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি ও গঠনসংক্রান্ত গবেষণার জন্যে রকেটের মাথায় চাপিয়ে Electronion probe, Plasma noise probe, Ultraviolet detector এবং Ion mass-spectrometer জাতীয় যন্ত্র পাঠিয়েছেন।

ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর বিদ্যুৎস্রোতের গঠন, বিস্তৃতি এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রকেটের মধ্যে Proton Precession Magnetometer নামক যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, থুম্বার 105 কিলোমিটার উপরে এই বিদ্যুৎস্রোতের সর্বোচ্চ তীব্রতা হলো প্রতি বর্গ-কিলোমিটার ক্ষেত্রে 500 অ্যাম্পিয়ারের মত।

নৈনিতালে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় মানমন্দির, আমেরিকার Smithsonian Astro-physical Observatory-র সঙ্গে সহযোগিতায় গত দশ বছর ধরে আলোকরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই জাতীয় কাজ করা হচ্ছে পৃথিবীর আরো এগারটি কেন্দ্র থেকে। নৈনিতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং তার চেহারার সঠিক জ্যামিতিক পরিমাপ (Geodesy নামে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বা বিষয়বস্তু) নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানগুলির স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) প্রায় নির্ভুলভাবে 15 মিটারেরও কম বিচ্যুতির সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। এভাবে সংগৃহীত আরো কয়েকটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, ত্রিভান্দ্রামের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্রের 90 মিটার কাছে রয়েছে এবং ডোভারের কাছাকাছি ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় এই নৈকট্যের পরিমাণ 140 মিটারের মত।

1962 সালে মহাকাশে X-রশ্মি নির্গমনকারী নক্ষত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যার জগতে এক নতুন গবেষণাক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই জাতীয় বহু নক্ষত্র থেকেই কোন আলোক বা রেডিও-তরঙ্গ নির্গত হতে দেখা যায় না। 1969 সালের এপ্রিল মাসে আমেদাবাদের Physical Research Laboratory এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Space and Aeronautical Science, X-রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একটি যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। SCO-X-1, Centaurus-X-2 এবং TAU-X-1 প্রভৃতি নক্ষত্র থেকে নির্গত X-রশ্মির পরিমাণ ও শক্তির মাত্রা নিরূপণের জন্যে ঐ দুই বিজ্ঞান সংস্থা যৌথভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করেন। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ বা জরীপের কাজ করাও ঐ পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। SCO-X-1 নক্ষত্রটি থেকে নির্গত আলোক ও X-রশ্মির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করবার জন্যে একই সঙ্গে ভারতের কোদাইকানাল মানমন্দির ও টোকিওর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির থেকে নজর রাখা হয়। মাঝে মাঝেই সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা ঐ নক্ষত্রটি থেকে X-রশ্মির নির্গমনের পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার উপর নজর রাখা হয়েছে।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

থুম্বা কেন্দ্রে গত আট বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আগামী দশকের জন্যে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অন্যতম

প্রধান লক্ষ্য—মহাকাশ গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বিতা অর্জন করা।

থুম্বা একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত এবং থুম্বা থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা যাবে একমাত্র পশ্চিম দিকেই। ফলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে আপন অক্ষের উপর ঘণ্টায় যে 1760 কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে, সেটি আর কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেটের দেহে যুক্ত হবে না। এই অসুবিধাগুলির কথা ভেবে ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীহরিকোটার কাছে একটি দ্বীপে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এখান থেকে রকেটগুলিকে ছোঁড়া হবে পূব দিকে, ফলে পৃথিবীর ঘণ্টায় 1760 কিলোমিটাররূপী বেগ আপনা-আপনি ওদের দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

আগামী দশকের ভারতীয় মহাকাশ কার্যক্রমের আর একটি কাজ হলো—সন্ধানী রকেটের সাহায্যে ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরো উন্নত করা এবং মাঝারি ধরণের আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে আরো নিখুঁত করা। এর ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিও যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে, যেহেতু বৃষ্টির উপর আমাদের কৃষিকাজের এক বিরাট অংশকে এখনো নির্ভর করতে হয়।

থুম্বা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিষুবীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় আবহবিদ্যা বিষয়ে আমাদের পূর্বেকার ধারণা ইতিমধ্যেই অনেক বেশী সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

ত্রিভান্দ্রামে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণকারী একটি কেন্দ্র অদূর ভবিষ্যতে গড়ে তোলা হবে। ঐ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্থানাঙ্ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

আমেরিকার NASA-র সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা 1972 সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর ভূপৃষ্ঠ থেকে 35,900 কিলোমিটার দূরে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে এবং দু-বছরের জন্যে ওর ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ ভারতের হাতে তুলে দেবে। সমগ্র ভারতভূমি থেকে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সব সময়েই মাথার উপরে একই জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করতে দেখা যাবে।

উপগ্রহটির দৃষ্টিগোচর এলাকার দুটি বহু দূরবর্তী অঞ্চল এই synchronous বা সমগতিসম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অতি নিখুঁত রেডিও ও টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে পারবে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে বহু দূরবর্তী কোন স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে যে একাধিক রিলে ষ্টেশনের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সে ছাড়াই কাজ চলবে। আমেদাবাদে, কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা আলোচ্য কৃত্রিম উপগ্রহটির কাছে ভারতের টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে পৌঁছে দেবে

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী 1973 সাল নাগাদ তাঁরা ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কৃত্রিম উপগ্রহটির বাহক রকেট হবে চারটি পর্যায়বিশিষ্ট, রকেটের মাথায় চাপানো উপগ্রহরূপী বৈজ্ঞানিক আধারটির ওজন হবে 30 কিলোগ্রামের মত এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 400 কিলোমিটারের দূরবর্তী একটি কক্ষপথে বস্তুটি

পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলবে। কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেট, আন্তঃস্তরীণ এবং রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী জটিল যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত গবেষণা এবং নির্মাণের কাজ খুবার মহাকাশ-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে চলেছে।

এই দশকের শেষের দিকে 1980 সাল নাগাদ মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি যে পর্যায়ে পৌঁছুবে, তাতে প্রায় 1200 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট একটি রেডিও ও টেলিভিশন যোগাযোগ রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহকে ভূপৃষ্ঠের 35,900 কিলোমিটার উর্ধ্বে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। ওটি হবে একটি synchronous কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ওকে সব সময়ে একই জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যাবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবে, সে আশাই আমরা পোষণ করি।

পেঁয়াজ

প্রণবকুমার তপস্বী*

খাদ্যশস্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর সর্বত্র এর জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। পেঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম Allium cepa, এটি লিলি পরিবারের অন্তর্গত। এর আদি জন্মস্থান মধ্যপ্রাচ্য। তাছাড়া পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও প্রাচীনকাল থেকে এর চাষ হয়ে আসছে। বর্তমানে পেঁয়াজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জন্মায়—বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন প্রধান প্রধান শস্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অধিকাংশ তৈরী খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাছ, মাংস কিংবা ডিমের তরকারীতে এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। তরকারীর স্বাদ ও মান বাড়াতে পেঁয়াজের বিকল্প নেই।

পেঁয়াজের উপকারিতা—পেঁয়াজ চক্ষুরোগের একটি ভাল ওষুধ। চোখ টনটন করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, কিংবা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া ও পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি রোগ পেঁয়াজ উপশম করে। প্রত্যহ সকালে বা রাত্রে শোবার আগে একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে চোখের কোন রোগের তেমন আশঙ্কা থাকে না এবং চোখের দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

দাঁত ভাল রাখবার জন্যে পেঁয়াজ খুব উপকারী। পেঁয়াজ চিবানোর ফলে এথেকে মুখের মধ্যে যে রস নির্গত হয়, তা দাঁত এবং মুখের ক্ষতিকারক জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে অথবা ঐগুলির আক্রমণের আশঙ্কা দূর করে। এর ফলে দাঁত ও মুখগহ্বর জীবাণুশূন্য হয় এবং সজীবতা লাভ করে। সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা রাশিয়ান চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খায়, তাহলে সে কখনও দাঁত বা মাড়ির রোগে ভুগবে না।

পেঁয়াজের আর একটি গুণ হচ্ছে—উষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে লু-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার। যদি কেউ প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ খায়, তবে সে লু-এর আক্রমণের

*এগ্রোনোমি রিসার্চ ইউনিট, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-35

বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করবে। অনেকের ধারণা, কেউ যদি সারাদিন পকেটে একটি করে পেঁয়াজ রাখে—তাতেও নাকি ফ্লু-এর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গরম দেশে মারাত্মক ফ্লু-এর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে পেঁয়াজ মানুষের পরম বন্ধুর মত কাজ করে।

পেঁয়াজের সবচেয়ে বড় গুণ (যার খবর এখনও অনেকেই জানেন না) হচ্ছে হৃদ্‌রোগে এর বিশিষ্ট ভূমিকা। অনেকেই জানেন, শিরার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া হৃদ্‌রোগের একটি অন্যতম কারণ। রক্তজমাট বাঁধবার কাজে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে ফাইব্রিন (Fibrin)। এটি সরু সূতার মত জিনিষ, যা রক্তের কোষগুলিকে ঘিরে ধরে প্লেট্‌লেট নামক আর এক প্রকার কোষের সহযোগিতায় রক্তকে জমাট বাঁধায়। সাধারণতঃ শরীরের মধ্যে এই রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ হয় না। কোন জায়গা কেটে গেলে রক্ত বাইরে বেরিয়ে এসে জমাট বাঁধে। কিন্তু শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যে হঠাৎ যদি ফাইব্রিন রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন সেই জমাট-বাঁধা রক্ত স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। এটাই হৃদ্‌রোগের একটি অন্যতম কারণ। পেঁয়াজের ভূমিকা হলো, এটি জমাট-বাঁধা রক্তের মূল কারণ ফাইব্রিনকে ফাইব্রিনোলাইসিস (Fibrinolysis) অর্থাৎ তরল করে দেয়, যাতে জমাট রক্তও অপসারিত হয়ে যায় এবং রক্তের চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে একটা রীতি প্রচলিত আছে, যখন কোন ঘোড়ার পায়ের শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে, তখন তাকে পেঁয়াজের তরকারী খাইয়ে সারিয়ে তোলা হয়। এই সূত্র ধরে তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী—ডাঃ এন. এন. গুপ্ত, আর. মেহরোত্রা এবং এ. সরকার 1966 সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, চর্বিযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে পেঁয়াজ যোগ করে হৃদ্‌রোগীকে খাওয়ালে রোগীর রক্তের ত্বরিত জমাট বেঁধেযাওয়া কমে তো যায়ই, উপরন্তু ফাইব্রিনের রক্ত জমাট বাঁধবার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয় অর্থাৎ ফাইব্রিনের তরল হয়ে যাবার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এর পর ডাঃ মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা তাজা পেঁয়াজ ও সিদ্ধ পেঁয়াজ নিয়ে আরও কাজ করেন এবং দেখান যে, রক্তের ফাইব্রিনোলাইসিসের ক্ষমতা তাজা পেঁয়াজের আরও বেশী পরিমাণে আছে।

পেঁয়াজের মধ্যে আছে মূল স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি (Essential oils), Allypropyl, Disulphide, Catechols, Thiopropione-aldehyde, Protocatechuic acid, Thiocyanates এবং কিছু ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ এবং ভিটামিন। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি এই ফাইব্রিনোলাইসিস ত্বরান্বিত করবার কারণ, তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। জানা গেলে শুধু সেই জিনিষটি দিয়েই হৃদ্‌রোগের আরও ভাল ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হৃদ্‌রোগীদের পক্ষেও পেঁয়াজ একটি বিশেষ উপকারী পদার্থ। প্রত্যেক হৃদ্‌রোগী বা প্রেসারের রোগী প্রত্যহ কিছুটা করে তাজা পেঁয়াজ বা পেঁয়াজি অথবা পেঁয়াজ সিদ্ধ খান (অবশ্য পেটের অবস্থা বুঝে) তাহলে হৃদ্‌রোগের হঠাৎ আক্রমণ থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। প্রত্যহ পেঁয়াজ ভক্ষণ হৃদ্‌রোগের অন্য যে কোন পেটেন্ট ওষুধ অপেক্ষা অনেক বেশী ফলদায়ক।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পেঁয়াজের আরও অনেক ব্যবহার দেখা যায়। দিনে দিনে পেঁয়াজের আরও অনেক গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমাশয়, সর্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগেও পেঁয়াজ ভাল কাজ করে।

মহাবিশ্ব

আব্দুল হক খন্দকার *

দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর আলোয় মহাকাশের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। মনে হয়, আমাদের এই পৃথিবী এবং দূর আকাশের সূর্য ছাড়া বিশ্বলোকে যেন বিস্ময়কর আর তেমন কিছুই নেই। কিন্তু সূর্য যখন বিদায় নেয়, তখন বেশ বোঝা যায়—মহাকাশে শুধু সূর্য আর পৃথিবীই নয়, আরও অনেক রহস্যময় বস্তু রয়েছে—আকাশের চাঁদ, রাশি রাশি তারকা, বিচিত্র নীহারিকা, আব্‌ছা মেঘের মত দিগন্তবিস্তৃত ছায়াপথ ইত্যাদি। আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি নিষ্প্রভ, কোনটি বা মিট্‌মিট করে জ্বলে, কোনটিকে আবার মনে হয় যেন স্থির, নিষ্কম্প। যেগুলি মিট্‌মিট করে জ্বলে, সেগুলি হলো তারা, আর যেগুলি স্থির কিরণ ছড়ায়, সেগুলি হলো গ্রহ অথবা উপগ্রহ। গ্রহের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়—জানার মধ্যে এখন এদের সংখ্যা হলো নয়টি, কিন্তু তারার সংখ্যার কোন পরিমাপ করা সম্ভব নয়—সারা জীবনেও গুণে শেষ করা যাবে না।

এদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যে এবং দীপ্তিতে যেটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হলো চাঁদ—পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ, সকল জ্যোতিষ্করাশির মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। চাঁদকে যদিও আমরা সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী বলছি—তবুও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় দু-লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইলের মত। রাতের আকাশে চাঁদ সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখালেও তার কিরণ কিন্তু স্নিগ্ধ। অবশ্য এই আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্যের আলো চাঁদের বুকে প্রতিফলিত হয়েই এই স্নিগ্ধ আলোর উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম অধুনা হয়েছে—চান্দ্রশিলা পরীক্ষা করে সম্প্রতি এই মতবাদ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ করা হয়েছে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট—পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে 13 লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ সূর্যের দেহের মধ্যে পৃথিবীর মত 13 লক্ষ বিরাটকায় বস্তুপিণ্ড অনায়াসে স্থান পেতে পারে। পৃথিবী থেকে বহু দূরে আছে বলেই সূর্যকে অত ছোট দেখা যায়—আসলে কিন্তু সূর্যই আমাদের সব কিছু। সূর্য একদিকে যেমন আমাদের পৃথিবীর জন্মদাতা, তেমনি আমাদের সকল সত্তা—আমাদের জীবনধারণের সকল রকমের শক্তি এবং কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। শুধু পৃথিবীর উপরই যে সূর্যের আধিপত্য, তা নয়—সমগ্র সৌরজগৎ জুড়েই রয়েছে তার বিশাল প্রভাব। নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ (সর্বমোট 31টি) ও গ্রহাণুপুঞ্জ প্রভৃতি নিয়ে মহাশূন্যের কোটি কোটি মাইল জুড়ে যে সৌরজগৎ বিস্তৃত, তার মধ্যে সূর্যই একচ্ছত্র সম্রাট। তার বিপুল মহাকর্ষের আকর্ষণে গ্রহগুলি তার সৃষ্টির আদি থেকে তাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের বিপুল শক্তির সামান্য অংশ লাভ করেই পৃথিবী হয়েছে এমন শস্যশ্যামলা, অগণিত জীবজন্তুর বাসস্থল এবং বিচিত্র বৃক্ষলতা ও ফল-ফুলে হয়েছে সমৃদ্ধ। সূর্যের তাপ ও আলোর প্রেরণায় পৃথিবীতে জেগেছে

---

* পি. সি. এস. আই. আর. ঢাকা—5, পূর্ব-পাকিস্তান।

একদিন প্রাণের স্পন্দন, আর সেই প্রাথমিক জীবনস্পন্দন কালে বর্ধিত এবং বিস্তৃত হয়ে দিনে দিনে ভরে তুলেছে পৃথিবীর এই বিরাট সম্পদ।

সূর্যের অভাবে চাঁদ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে—তার এই কিরণ যেমন আর দেখা যাবে না কোন দিন, তেমনি পৃথিবীও হারাবে তার যাবতীয় সম্পদ—গাছপালা, জীব-জন্তু সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে চিরতরে সাঙ্গ হবে সকল সৌন্দর্য, সকল জীবজন্তুর জীবনধারা—আলোর অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে সমগ্র পৃথিবী আর তাপের অভাবে ডুবে যাবে সে তুহীন শীতলতার অতলে।

কিন্তু এমন যে বিরাট সূর্য, যার তুলনায় পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, জানা গেছে—সেই সূর্যও শূন্য আকাশে তেমন কোন গৌরবের আসনে সমাসীন নয়। সূর্যের চেয়েও বিরাট—তার চেয়েও উজ্জ্বলতর বস্তু বিরাজ করছে মহাশূন্যের বুকে—পৃথিবী থেকে যাদের দূরত্ব আরও অনেক বেশী। সেগুলিকে আমরা বলি নক্ষত্র বা তারকা। অবশ্য সব তারকাই যে সূর্যের চেয়ে বড় এবং বেশী উজ্জ্বল তা নয়, তবে বেশীর ভাগ তারকাই সূর্যের চেয়ে বড়—তার চেয়েও উজ্জ্বল। অবশ্য ছোট কিংবা বড়ই হোক, সব তারকাই রয়েছে পৃথিবী থেকে বহু দূরে, আর তাদের সংখ্যারও কোন সীমা নেই। খালি চোখেই আকাশে 7 হাজারের মত তারকা দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট প্যালোমারের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 10 কোটির মত তারকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। আকাশের আলোকচিত্র নিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় আরও অনেক বেশী। আবার এমন অনেক তারকাও আছে, যেগুলি নিষ্প্রভ—এক কালে জ্বলে জ্বলে সেগুলি এখন নিবে গেছে।

কাজেই বিশ্বে তারকার সংখ্যা নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জেম্‌স জীন্‌স তারকাগুলির সংখ্যার হিসাব দিতে গিয়ে তাই নিরুপায় হয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সাগর উপকূলে যত বালিকণা রয়েছে, সমগ্র বিশ্বে তারকার সংখ্যাও অনেকটা তেমনি।

যাহোক, এই তারকারাশি যেমন অগণিত, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বও তেমনি অভাবনীয়। আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে যে তারকাটি, তার দূরত্ব 25,000,000,000,000 মাইলের মত; অর্থাৎ ঘণ্টায় 25 হাজার মাইল গতি-সম্পন্ন রকেটের পক্ষেও এই তারকাটিতে পৌঁছুতে প্রায় 1 লক্ষ 15 হাজার বছর লাগবে। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রকেটে চড়ে সারাজীবন পাড়ি দিয়ে তো দূরের কথা, সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষের বয়সকে বিশ হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েও সেই সময়ের মধ্যে এই তারকাটির কাছাকাছি পৌঁছুতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ। এর পরের তারকাটির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশে যদি তেমন অসুবিধা নাও দাঁড়ায়, তথাপি তার পরের তারকাগুলির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশ করতে গেলে হয়রানির আর অন্ত থাকবে না। কাজেই এই অসুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীরা তারকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করতে অন্য এক মাপকাঠির সাহায্য নিয়েছেন। সে মাপকাঠি হলো আলোর গতি। মাত্র এক সেকেণ্ডেই আলো 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এক সেকেণ্ড আলো যতটা পথ পাড়ি দেয়, তা যদি বেশী দূরের জিনিষের দূরত্ব পরিমাপ করবার কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে তাদের দূরত্ব প্রকাশের কাজটি যেমন সহজ হয়, তেমনি তাদের দূরত্বের পরিমাপ করবার ব্যাপারেও সুবিধা হয়। সূর্যের কথাই ধরা যাক। পৃথিবী থেকে সূর্য যে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে, সে দূরত্ব যদি আলোর মাপকাঠিতে মাপা যায়, তবে সূর্যের দূরত্ব দাঁড়াবে আট আলোক-মিনিটের সামান্য কিছু বেশী। এমনি ভাবে সব-চেয়ে নিকটের তারকা—প্রোক্সিমা সেন্টোরাই,

যার দূরত্ব হলো 25 লক্ষ কোটি মাইল—আলোর মাপকাঠিতে তার দূরত্ব দাঁড়াবে 4·2 আলোক-বছর এবং লুব্ধকের (Sirius) দূরত্ব দাঁড়াবে, 8·7 আলোক-বছর। এর পর অবশ্য আরও অনেক তারকাই রয়েছে, কিন্তু সেগুলির দূরত্বের কথা বলতে গেলে তা লিখে শেষ করা যাবে না কোন দিন। তাই সবচেয়ে দূরের তারকাটির দূরত্বের কথাই এখানে বলছি। এই দূরত্ব হলো 11 কোটি আলোক-বছর। কাজেই দেখা যায়, আকাশের বুকে ছোট ছোট প্রদীপের মত মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে যে তারকাগুলি, তাদের দূরত্বের তুলনায় আমাদের চাঁদ বা সূর্যের দূরত্ব ধরতে গেলে, কত তুচ্ছ! তাছাড়া এই নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে শুধু যে দূরে দূরেই অবস্থান করছে তা নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যেও রয়েছে দুস্তর ব্যবধান।

তারকাগুলির দূরত্বের কথা বলতে গিয়ে একটি বেশ মজার কথাও মনে আসে। এই মুহূর্তে যে তারকাটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা যে সত্য সত্যই আকাশের বুকে এখন বিরাজ করছে—তার কিরণ ছড়াচ্ছে, এমন কথা কিন্তু বলা চলে না। হয়তো অনেক আগেই সে তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়তো বা তার কোন নিশানাই নেই—জ্বলে জ্বলে সেটি হয়তো এখন অথবা অনেক আগেই নিবে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অসীম দূরত্বের জন্যে তার এক কালের অস্তিত্ব তাকে এখনও আমাদের দৃষ্টি থেকে মুছে দিতে পারে নি। তবে হিসেব করলেই দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। সবচেয়ে কাছের তারকা প্রোক্সিমা সেন্টোরাই-এর কথাই ধরা যাক। মনে করা যাক, 4 বছর আগে কোন কারণে সেই তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব হলো 4·2 আলো বছর; অর্থাৎ 4·2 বছর আগে প্রোক্সিমা সেন্টোরাই আকাশের বুকে যে কিরণ ছড়িয়েছে, সেই কিরণ সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগে ছুটে আসা সত্ত্বেও পৃথিবীতে পৌঁছুতে তার সময় লাগবে দীর্ঘ 4·2 বছর। তারকাগুলির অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি তাদের আলোর সূত্রে। কাজেই প্রোক্সিমা সেন্টোরাই ধ্বংস হবার সময় যে শেষ আলোক-রশ্মিটি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, আমাদের কাছে আসতে তার লাগবে 4·2 বছর। কাজেই তার ধ্বংস হবার সংবাদ 4 বছর পরেও আমরা জানতে পারবো না, জানবো 4 বছরের আরও প্রায় আড়াই মাস পরে। কাজেই 4 বছর আগে তা ধ্বংস হলেও তাকে আমরা দেখতে পাব আকাশে। পৃথিবী থেকে কোন তারকা 10 লক্ষ আলোক-বছর দূরে রয়েছে বললে বুঝতে হবে—বিদ্‌ঘুটে, বিরাটাকারের জন্তুজানোয়ার যখন পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো, তখন সেই তারকাটি যে আলো ছড়িয়েছিল, সেই আলোই আমরা এতদিন পর আজ প্রত্যক্ষ করছি।

আগেই বলেছি, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে 13 লক্ষ গুণ বড় যে সূর্য, তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল তারকা মহাকাশের বুকে বিরাজ করছে। সূর্যের ব্যাস যেখানে 8 লক্ষ 65 হাজার মাইল, সেখানে সবচেয়ে বড় তারকাটির ব্যাস হলো 180 কোটি মাইল। বস্তুতঃ সূর্য একটি সাধারণ তারকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য তারকাগুলির তুলনায় সূর্য আমাদের অনেক কাছে আছে বলেই তাকে আমরা অন্য তারকাগুলির চেয়ে বড় দেখি, তার তাপ ও আলো আমরা বেশী করে পাই। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য আয়তনে—এমন কি, তার তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকেও একটি মাঝারি ধরণের তারকা মাত্র। আবার বিশ্বজগতের তুলনায় এই সূর্য, এই অগণিত তারকা, সকলে মিলেও তেমন বিশাল কিছু নয়, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যা বিপুল বিশ্বের বিশালতাকে শুধু আভাস-

ইঙ্গিতে কেবল যেন প্রকাশ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। মহাশূন্যের অগণিত তারকারাশিকে নিয়ে গঠিত যে ছায়াপথ, সুদূরের শত শত নীহারিকা যেন বিশাল এক সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত এক-একটি ভাসমান ক্ষুদ্রকার বিশ্ব।

শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, আকাশের উত্তর দিগন্ত থেকে সুরু করে মাথার উপর দিয়ে একটি জ্যোতির্ময় নদী যেন দক্ষিণ প্রান্তে মিশে গেছে। একে ছায়াপথ বা ইংরেজীতে গ্যালাক্সি বলে। খালি চোখে ছায়াপথকে দেখায় হাল্কা মেঘের মত, কিন্তু শক্তিশালী কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেখানে ভীড় করে রয়েছে রাশি রাশি তারকা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ছায়াপথে 10 হাজার কোটির মত ছোট-বড় নানা আকারের তারকা রয়েছে। সম্পূর্ণ আকাশকে আমরা যদি একেবারে দেখতে পেতাম, তাহলে দেখা যেতো, এই ছায়াপথটি যেন একটি বিরাট বলয়ের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে আজ পর্যন্ত প্রায় এমন 100 কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্ধকার রাতে যে ছায়াপথটিকে আমরা সারা আকাশে পরিব্যাপ্ত থাকতে দেখি, তার একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে—ইংরেজীতে যাকে বলে মিল্কিওয়ে

এই মিল্কিওয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো আমাদের পৃথিবী, যার আকার অনেকটা আতসী কাচের মত। পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থান করছে—মিল্কিওয়ে সেই ছায়াপথটির সীমানা নির্দেশ করে থাকে। আমাদের এই ছায়াপথটি, যার মাঝের অংশটি লেন্সের মত চওড়া, তার ব্যাস হলো 10 হাজার কোটি আলোক-বছরের মত। আদিতে লোকের ধারণা ছিল যে, সৌরজগৎটি এই ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু অধুনা জানা গেছে যে, সূর্য এর কেন্দ্র থেকে দু-হাজার পাঁচ-শ' কোটি আলোক-বছর দূরে রয়েছে এবং এই সৌরজগৎটিও মোটেই স্থির নয়, প্রচণ্ড বেগে ঘূরপাক খাচ্ছে। অবশ্য ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগছে প্রায় 225 কোটি বছর; অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যে অনুমান করেন, তাতে 200-300 কোটি বছর আগে পৃথিবী তথা সৌর জগৎ সৃষ্টির যে সূচনা ঘটেছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সূর্য প্রবল বেগে ঘূরপাক খেয়েও একবারই মাত্র এই ছায়াপথের কেন্দ্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের এই ছায়াপথটি, যার ব্যাস 10 হাজার কোটি আলোক-বছর, মাইলের হিসাবে তার ব্যাস যে কত দাঁড়াবে—কত বৃহৎ যে তার আয়তন, সহজে তা ধারণা করা যায় না। আবার সমগ্র বিশ্বে একটি-দুটি নয়, ইতিমধ্যেই 100 কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আরও অজানা কত ছায়াপথ রয়েছে, তার হিসাব কে করবে? ছায়াপথের বাইরে যে সকল ছায়াপথ রয়েছে, সেগুলিকে আমরা দেখতে পাই এক-একটি নীহারিকারূপে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের কোনটিকে দেখায় উজ্জ্বল হাল্কা মেঘের মত, কোনটিকে দ্যুতিমান চরকির মত, আবার কোনটি মোটেই উজ্জ্বল নয়, অনেকটা নিষ্প্রভ। বিজ্ঞানীদের মতে, যেগুলি উজ্জ্বল, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। অনেকের মতে এরা নিজেরা জ্যোতির্ময় নয়, কাছাকাছি তারকার আলোয় আলোকিত। অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের মধ্যে কোন তারকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। চরকির মত নীহারিকাগুলিই কিন্তু বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুলেছে সবচেয়ে বেশী। এরা যেন বিশালাকার প্রজ্বলিত গ্যাসের এক-একটি চরকি—মহাশূন্যে বন্ বন্ করে ঘুরছে অবিরাম। নিষ্প্রভ নীহারিকাগুলির নিজস্ব কোন আলো নেই। সুদূরের তারকাপুঞ্জের মাঝে তাই এদের দেখা যায় ঘন কালো মেঘের

মত। মনে হয়, রেণু রেণু ধূলিমেঘে ঢাকা আচ্ছাদনের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন এক-একটি কালো সুড়ঙ্গের মুখ হাঁ করে রয়েছে। নিষ্প্রভ নীহারিকাগুলি আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে, তাদের পিছনের তারকাগুলিকে আমরা দেখতে পাই না।

পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে যাবতীয় নীহারিকা। আমাদের কাছের দুটি নীহারিকার দূরত্ব হলো 1 লক্ষ আলোক-বছরের মত। দূরের নীহারিকাগুলি যাদের সন্ধান মেলে শুধু আলোকচিত্রের সাহায্যে, সেগুলি রয়েছে 10 কোটি আলোক-বছর দূরে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকাটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোক-বছর দূরে আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এক-একটি নীহারিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে কোটি কোটি তারকা। পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে বলে নীহারিকার তারকাগুলিকে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতে দেখা যায়।

নীহারিকা সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবার জেনেছেন আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একমাত্র অ্যাণ্ড্রোমিডা ছাড়া সকল নীহারিকাই তীব্র গতিতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অ্যাণ্ড্রোমিডা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সেকেণ্ডে প্রায় 200 মাইল গতিবেগে। আর আমরা সেকেণ্ডে প্রায় 25 হাজার মাইল গতিতে দূরে সরে যাচ্ছি। প্যালোমারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যে সকল অস্পষ্ট বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কতকগুলি নাকি সেকেণ্ডে 60 হাজার মাইল গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই এই সব নীহারিকা বা অস্পষ্ট বস্তুকে কিছু দিন পরে আর আমরা দেখতে পাব না। চিরকালের জন্যে তারা চলে যাবে আমাদের দৃষ্টির বাইরে সীমাহীন বিশ্বের কোন্ সুদূর লোকে, কে জানে।

প্রায় সকল নীহারিকাই আমাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে যে অসীম ব্যবধান রচনা করে চলছে, সে জন্যে অনেকে অনুমান করেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগতই প্রসারিত হয়ে চলেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, 150 কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের আয়তন দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ।

কাজেই দিনে দিনে যতই নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাশূন্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে, বিস্ময়ও আমাদের ক্রমাগত ততই বেড়ে চলেছে। অবশ্য বিস্ময়ের ব্যাপার শুধু এদিক থেকেই নয়—অন্য দিকেও রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবী স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে নিজের মেরুদণ্ডের উপর, সূর্যের চার ধারে, অনেকটা লাটিমের মত টলমল করে। সূর্যও গতিশীল—একদিকে যেমন অভিজিৎ নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে তীব্র গতিতে ছুটছে, তেমনি আবার আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে সেকেণ্ডে প্রায় 175 মাইল বেগে প্রদক্ষিণ করছে। তারকাগুলিও গতিশীল—এমন কি, যে তারকারাশি কিংবা গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টিতে ছায়াপথ গঠিত, জানা গেছে সেগুলিও স্থির নয়, তীব্র তাদের গতিবেগ। কেন যে সব কিছুই এমন গতিশীল—ছুটছে তীব্র গতিতে কিংবা ঘুরপাক খাচ্ছে তীব্র বেগে, তা আমরা সঠিক জানি না। তবে এটুকু জানা গেছে যে, মহাবিশ্বে সব কিছুই গতিশীল। শুধু মাত্র বড় বড় বস্তুর মধ্যেই যে এই গতিশীলতা বিদ্যমান তা নয়, সকল পদার্থের মধ্যে রয়েছে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু—এমন কি, পরমাণুর মধ্যেও যে ততোধিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণা রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যেও পেয়েছেন তীব্র গতিবেগের সন্ধান। কাজেই দেখা যায়, বিশ্বে কোন কিছুই স্থির নেই। সবাই চঞ্চল—সব কিছুই অস্থির। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে যেন এক অপরূপ নৃত্য। আর এই বিশ্বনৃত্যে, এই চঞ্চল গতিছন্দে, যোগ দিয়েছে ছোট-বড় যাবতীয় বস্তু।

এমনি ছোট-বড় যাবতীয় বস্তু নিয়ে যে বিশাল বিশ্বজগৎ, সে যে কত বড়, তার ধারণা আমাদের আসে না। মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তাতে জানা যায় যে, মহাবিশ্বের ব্যাস অনেকটা 260 কোটি আলোক-বছরের মত; অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে যদি কোন আলো মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে চলতে থাকে, তবে তার সুদীর্ঘ চলার পথ শেষ হবে একেবারে আমাদের আধুনিক জামানায় এসে। কাজেই খালি চোখে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অধুনা আবিষ্কৃত রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাবিশ্বের যে বিশালতার পরিচয় আমরা পাই, তা একদিকে যেমন আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে, অপরদিকে তেমনি এই মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের অস্তিত্বকে করে তোলে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ– প্রাণে জাগায় পরম নৈরাশ্য। একদিন মানুষের ধ্যান-ধারণায় পৃথিবীই ছিল বিশাল, আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর চেয়ে বড় বলে সে ভাবতে পারে নি—শুধু নয়, নিজেকে সে দাবী করেছে সৃষ্টির সেরা জীব তাই হিসেবে আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের সূত্রে সে ভেবেছে বিশ্বের সব কিছু একমাত্র তার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তারই উপকারার্থে—তারই মঙ্গলের নিমিত্ত! এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাই সে কল্পনা করেছে, সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবী। ভেবেছে, এই পৃথিবীর ভাবেদারে তাকে ঘিরেই ঘুরছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র আর নীহারিকা—এক কথায় আকাশের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? মহাবিশ্ব তো দূরের কথা, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে রয়েছে যে সৌরজগৎ, তারই এক সাধারণ গ্রহ হলো আমাদের এই পৃথিবী। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ তার চেয়েও অনেক বৃহৎ। সূর্য মোটেই তার চারদিকে ঘুরছে না, বরং সে নিজেই প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে, আকারে সূর্য তার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। অন্য-দিকে এই সূর্যও আবার তেমন বিরাট কিছু নয়—একটি মাঝারি গোত্রের তারকা মাত্র। এমনি সূর্যের সমান এবং তার চেয়ে ছোট-বড় প্রায় 10 হাজার কোটি তারকা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক-একটি ছায়াপথ—যাদের মোটামুটি ব্যাস হলো 17 হাজার কোটি আলোক-বছর। আবার সেই ছায়াপথের সংখ্যাও কম নয়—100 কোটির মত। এই 100 কোটি ছায়াপথ 260 কোটি আলোক-বছর ব্যাসের মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে, যেন এক মহাসমুদ্রে ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত। মহাবিশ্বের এই বিশালতা তাই আমাদের ঠিক বোধগম্য হয় না, উপলব্ধি করতে পারি না আমরা সে বিশালত্ব। মোটের উপর এই ছায়া-পথের বিশালতা আমাদের কল্পনাতীত। কাজেই এমনি বিপুল মহাবিশ্বের মাঝখানে আমাদের পৃথিবীর স্থান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দূরবীক্ষণ, রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের সূত্রে সুদূর নক্ষত্র-লোকেও আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। অনেক কিছুই আমরা জেনেছি সত্য, কিন্তু তবু অনেক কিছুই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। কবে এবং কখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হবে, কতক্ষণই বা তা স্থায়ী থাকবে, কখন কোন্ ধূমকেতু আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করবে—বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিতভাবেই সে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আজও তাঁরা সঠিকভাবে বলতে অক্ষম, কখন এবং কি ভাবে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। সে কি চিরন্তন, না তার বিলুপ্তি ঘটবে কোন দিন? এই বিশ্ব বা মহাবিশ্ব কি সসীম, না অসীম? কেউ কেউ বলেছেন—বিশ্ব সসীমও নয়, সুস্থিরও নয়—সুরু থেকে সে শুধু সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে! আবার কেউ কেউ বলেছেন—না, তা নয়, বিশ্ব বিশাল হলেও সসীম—একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে, পুনরায় প্রসারিত হচ্ছে। যে মহাকালের স্রোতে আমরা

ভেসে চলেছি, তার সুরু যে কোথায়, কোথায় যে তার শেষ, কেন এই বিশালকায় বিশ্বলোকের সৃষ্টি, আর কেনই বা সেখানে আমাদের স্বল্পক্ষণের জন্যে উপস্থিতি—কোন বিজ্ঞানীই তা আজও বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেছেন, এই সৃষ্টির আদিও নেই, অন্তও নেই—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে ভাঙা-গড়া—একদিকে ধ্বংস, অন্য দিকে সৃষ্টি—দুই-ই চলছে সমান তালে। যা ধ্বংস হচ্ছে, তা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুনের, প্রতিনিয়ত চলছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা—যার আদি নেই, সমাপ্তি নেই, আর এমনি ভাবেই চলবে তা অনন্ত কাল ধরে।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সার রোগের নতুন ওষুধ

জীবন্ত কোষের ভিড়ের মধ্যেও রোগদুষ্ট মারাত্মক কোষ কি করে এমন বিপুল পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসকদের কাছে সেটি হলো এক বিরাট প্রহেলিকা।

জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই পদার্থ ঐ রোগদুষ্ট কোষগুলি থেকে বেরিয়ে আসে এবং সংলগ্ন সুস্থ ও স্বাভাবিক কোষসমূহের ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোষের মত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। রোগদুষ্ট কোষের চারপাশের কোষসমূহের এই বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে থাকে? ক্যান্সার রোগাক্রমণের ফলে ঐ কোষের গঠন-প্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, তা জানা গেলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে এবং এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পথেরও সন্ধান দিতে পারে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আণবিক জীববিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারি রুবিন একটি মুরগীর ভ্রূণকে ক্যান্সার জীবাণু বা ভাইরাস দিয়ে সংক্রামিত করবার চার-পাঁচ দিন পরে ভ্রূণটির কোষ পরীক্ষা করে ঐ রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পান। তাঁর ধারণা, যে সকল রক্তসংবাহক নালী ও সংযোজক তন্তুর জন্যে রোগদুষ্ট কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ঘটে এবং ঐ সকল কোষ বেঁচে থাকে, সেই সকল শিরার কোষ ও তন্তুসমূহের বৃদ্ধির মূলে রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ। তাছাড়া ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষসমূহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূলেও ঐ বস্তুটি থাকতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। রোগদুষ্ট কোষের সন্নিহিত স্বাভাবিক সুস্থ কোষের বৃদ্ধি কোন রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে প্রতিহত করতে পারলে এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এই বৃদ্ধি প্রতিহত হলে রোগদুষ্ট কোষগুলি বেঁচে থাকবার জন্যে রক্তসংবাহক নালী বা ব্লাড ভেসেল ও সংযোজক তন্তুর কোন রকম সাহায্য পাবে না।

ঐ পদার্থ কি কি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত, তা এখনও পুরাপুরি জানা যায় নি। ডাঃ রুবিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়, ঐ বস্তুটি কোন প্রোটিন অথবা এন্‌জাইম হতে পারে।

তবে পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, ভাইরাস-দুষ্ট কোষ থেকে ঐ রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করে নিলে স্বাভাবিক কোষসমূহের সাময়িক

অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এর ফলে ঐ সকল কোষের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং এরা মারাত্মক ক্ষতিকরও হয় না।

ডাঃ রুবিন গত পনেরো বছর ধরে পশুর ক্যান্সার রোগের ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে যে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটও সমর্থন করছেন।

অন্যান্য কোষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবার সময় প্রত্যেকটি জীবন্ত কোষের আকার, আয়তন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবারও ক্ষমতা থাকে। এই বিষয়টির উপরেও ডাঃ রুবিনের নতুন উদ্ভাবন বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারে।

গবেষণাগারে জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষ নিয়ে গবেষণার সময় দেখা গেছে, অন্যান্য কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবার সময় ক্যান্সার রোগ-বাহক ভাইরাস ও কোন কোন রাসায়নিক উপাদান জীবন্ত কোষকে অন্যান্য কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ঐ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। সাধারণতঃ যে সকল রাসায়নিক উপাদান ঐ সকল কোষকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে চালিত করে, তাদের কাজে পুরাপুরি বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং জীবদেহে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ডাঃ রুবিন গবেষণাগারে মুরগীর ভ্রূণের কোষে রুস সারকোম নামক ভাইরাস প্রয়োগ করেন। পাখীর দেহে এই সকল ভাইরাস ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

কয়েক দিন পরেই যখন দেখা গেল, সংক্রামিত কোষগুলি মারাত্মক হয়ে উঠেছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ডাঃ রুবিন ঐ সকল কোষের চারপাশের জলীয় অংশ এবং ভাইরাসগুলিকে সযত্নে বের করে আনলেন। ভাইরাসমুক্ত এই জলীয় অংশ বিভিন্ন সময়ে কয়েকবারই বের করে আনা হলো। তারপর স্বাভাবিক মুরগীর ভ্রূণের জীবন্ত কোষের মধ্যে ঐ জল ঢোকানো হলো।

তখন দেখা গেল, যেখানে স্বাভাবিক সুস্থ কোষের সংখ্যা খুব কম এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হওয়ায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু যেখানে কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং যাদের বৃদ্ধি খুবই মন্থর, ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হবার তিন দিন পরে দেখা গেল, ঐ সকল কোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোষগুলি দ্বিগুণিত হয়েছে এবং ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষের মত অস্বাভাবিক আকৃতি নিয়েছে। 100 ঘণ্টার পর দেখা গেল, ঐ সকল কোষ আবার স্বাভাবিক আকার ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

রুস সারকোম ভাইরাসের তুলনায় ঐ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে কোষসমূহের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়ে থাকে। ডাঃ রুবিন ঐ রাসায়নিক পদার্থ কোন্ কোন্ মৌলিক উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তা নিরূপণের চেষ্টা করছেন। ক্যান্সার রোগের ওষুধ উদ্ভাবনের পক্ষে এটি হবে একটি বিরাট পদক্ষেপ।

পরমাণু ভাঙবার বৃহত্তম যন্ত্র

অ্যাটম স্ম্যাসার নামে পরমাণু ভাঙবার পৃথিবীর বৃহত্তম যন্ত্র নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। 1971 সালের মাঝামাঝি সময়েই এটি চালু হতে পারে। বিজ্ঞানী ও যন্ত্রনির্মাতারা মনে করেছিলেন, এই যন্ত্র নির্মাণের কাজ শেষ হতে আরও এক বছর লাগবে।

আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সহর ব্যাটাভিয়ার কাছে 6800 একর জমির উপর মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি তৈরি করছেন। গত দু-বছর ধরে এর নির্মাণকার্য চলছে। 50,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে। তবে প্রথমে 20,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই যন্ত্রটির ছয় কিলোমিটার পরিধির চারপাশে রয়েছে বিশ টন ওজনের 1000 চুম্বক। এগুলি আছে মাটির নীচে। এই যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বের করে আনা প্রোটনগুচ্ছটার গতি বাড়ানো হবে এবং আলোর গতির কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল।

মনুষ্য-সৃষ্ট কোন রশ্মির অগ্রভাগে এরকম প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিকে এর আগে আর এভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয় নি। এই প্রোটন রশ্মিগুচ্ছটার [অ]গ্রভাগ পরমাণুর কেন্দ্রে এসে আঘাত করবে [এ]বং পরমাণুটি ভেঙে যাবে। ঐ ভাঙা পর[মা]ণুর কেন্দ্রীনের পদার্থসমূহ গবেষণাগারে পরীক্ষা [ক]রে দেখা হবে। পরমাণু সম্পর্কে এই ধরণের তথ্যানুসন্ধান এর আগে সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পদার্থের মৌলিক গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে অনেক কিছু জানা যাবে।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সহর ব্যাটেভিয়ার সন্নিকটবর্তী ন্যাশন্যাল অ্যাকসিলেরেটর লেবরেটরীর এই নতুন অ্যাটম স্ম্যাসার বা পরমাণু ভাঙবার যন্ত্রটি হবে একটি বিশেষ আকর্ষণ। কেবল আমেরিকারই নয়, ভারত, পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য, ইজ্‌রায়েল এবং জাপানের বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানীদেরও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

এর আগে 1960 সালে আর একটি পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র নির্মাণের কাজও সেখানে সমাপ্ত হয়েছে। এটি ছিল 3,300 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের। এই যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেন লেবরেটোরীতে। সোভিয়েট রাশিয়ায়ও 7,600 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের একটি যন্ত্র সারপুখভে স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার এই নতুন যন্ত্রটি হবে এক্ষেত্রে পৃথিবীর বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র।

নিউইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেন লেবরেটারীর এই যন্ত্রটি পরমাণু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রের গভীরে আঘাত করে তা ভাঙবার মত শক্তি ও তীব্রতা ঐ যন্ত্রটির প্রোটনগুচ্ছটার নেই। তত্ত্বের দিক থেকে বহু পদার্থ-বিজ্ঞানীই বলেছেন যে, পরমাণুতে প্রাথমিক যে সকল কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার চেয়ে গভীরে পরমাণুর কেন্দ্রে অন্যান্য মৌলিক কণার আর একটি স্তর থাকতে পারে। 1960-এর দশকে ব্রুকহ্যাভেনের যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রে পজিট্রন, মেসন, মিউন, হাইপেরন, লেপ্‌টন এবং অন্যান্য বহু মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে। পরমাণুর কেন্দ্রে 100-টিরও বেশী মৌলিক কণা বা সাব-নিউক্লিয়ার কণার অস্তিত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলেছে। তাঁদের ধারণা, মৌলিক পদার্থের একটি সহজ গঠন-প্রণালী রয়েছে।

এই অদ্ভুত, বিস্ময়কর পৃথিবীতে বস্তুর ভর এবং শক্তি পরস্পর বিনিময়যোগ্য—একটি অন্যটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এক অনাদি শক্তির বন্ধনে পদার্থের বিভিন্ন উপাদানসমূহ আবদ্ধ রয়েছে, ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে না। মৌলিক পদার্থের গভীরে এই সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ বিজ্ঞানীরা এই প্রথম এই যন্ত্রের সাহায্যে পাবেন।

পরমাণুর কেন্দ্রে মৌলিক কণার আর একটি

স্তরের অস্তিত্বের কথা প্রথম জানিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলোজির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মুরে গেলম্যান। পদার্থের চরম মৌলিক উপাদানের সন্ধান ব্যাটেভিয়ার এই অ্যাটম স্ম্যাসারটিই দিতে পারে। সেদিন হয়তো মৌলিক পদার্থের মূল উপাদান তৈরি করাও সম্ভব হবে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারেই এর সন্ধান চলছে। 1969 সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আংশিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ এই বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে হামেশাই দেখা যাচ্ছে যে, নতুন উদ্ভাবন প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে যায়। পদার্থের মূল উপাদান উদ্ভাবনের জন্যে যে তথ্যানুসন্ধান চলছে, এই নতুন পরমাণু ভাঙবার যন্ত্রটি তাতে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারে। এই সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তাতে তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। মৌলিক পদার্থ যে কি কি উপাদানে গঠিত, তা নির্ণয় করবার ও তার প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা সফলকাম হলে পদার্থের গঠন ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা সম্পূর্ণ জানা গেলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচিত হবে এবং এর তাৎপর্য হবে সুদূরপ্রসারী।

ঘর গরম করতে রঙের অভিনব ভূমিকা

রং শুধু দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে না, এখন থেকে তা ঘরকে গরমও করতে পারবে। যে কোন সাধারণ রঙের মতই এই নতুন রং স্প্রে বা ব্রাসের সাহায্যে লাগানো যাবে।

তবে এই রঙের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য হলো, এই রং বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে সক্ষম। তার কারণ, এই রঙে উদ্ভিজ্জ তেল বা রঞ্জনের বদলে রয়েছে সিলিকেট।

বৈদ্যুতিক উনুনকে যেমন, তেমনি এই রংকে 'সুইচ অন' করা বা বিদ্যুৎযুক্ত করা যায়। কিন্তু বৈদ্যুতিক উনুনে হাত দিলে যেমন 'শক্' খেতে হয়, এতে তেমন কোন আশঙ্কা নেই এবং রং-লাগানো দেয়াল কখনই বিপজ্জনকভাবে গরম হয়ে ওঠে না। এই রং একেবারেই নিরাপদ—এমন কি, শিশু ও গৃহপালিত পশুদের পক্ষেও। বাড়ীর যে সাধারণ বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা, তার সঙ্গেই দেয়ালগুলি সংযুক্ত থাকে—শুধু মাঝপথে একটি ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি 40 ভোল্টে নামিয়ে রাখা হয়। দেয়ালের মাথায় ও তলায় দুটি অ্যালুমিনিয়াম পাত্ বসানো থাকে—এদের মাধ্যমে সারা দেয়ালে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়।

দেয়ালে সাধারণভাবে যে রং লাগানো হয়, তার চেয়ে এই রঙের খরচ খুব বেশী নয়। এদিকে বিদ্যুতের খরচ অতি অল্প। এই ব্যবস্থায় বাড়তি জায়গাও ছেড়ে দিতে হয় না। দেয়ালগুলি সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সমভাবে গরম হয়ে ওঠে। 'সুইচ অফ' করে দিলেও দেয়ালগুলি অনেক সময় পর্যন্ত গরম থাকে।

প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড দেয়ালগুলি গৃহ-নির্মাণের সময়েই রং করে দেওয়া সম্ভব। এভাবে গৃহ নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর গরম করবার ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

ছয় মাস ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই রঙের বিশেষ গুণ নষ্ট হয় না। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই রং বাজারে দেখা যাবে।

আবিষ্কারকেরা এই রঙের নাম দিয়েছেন 'স্প্রে-অন সেন্ট্রাল হিটিং'। লণ্ডনের নিকটে টেডিংটনের বৃটিশ পেন্ট রিসার্চ ষ্টেশনে এটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের নতুন ওষুধ

অ্যাণ্ড্রু ওয়াকার এই সম্বন্ধে লিখেছেন—পৃথিবীর দেড় কোটি থেকে দু-কোটি লোক এখনো কুষ্ঠরোগে ভোগে, যদিও আধুনিক ওষুধের দ্বারা এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বৃটিশ লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের মেডিক্যাল সেক্রেটারির ভাষায়—যদি কুষ্ঠরোগসংক্রান্ত আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়, তাহলে বর্তমান সময়েই এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা নির্মূল করা অসম্ভব হবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ লেপ্রোসি অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরালিওনের জন্যে গত বছর একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সিয়েরালিওনে কুষ্ঠরোগীর আনুমানিক সংখ্যা 50,000।

এই রোগের আধুনিক চিকিৎসায় একে প্রশাসনিক সমস্যা হিসাবেই বেশী করে দেখা হচ্ছে। রোগীদের এক কলোনীতে জড়ো করবার চেয়ে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করায় অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায় বলে এখন মনে করা হয়।

1965 সালে পূর্ব আফ্রিকার মালাউইতে একটি পুরোধা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তাথেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতি কত কার্যোপযোগী। ল্যাণ্ড রোভার বা কখনো সাইকেলের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়। কয়েকটি কেন্দ্র থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোগীকে প্রতি সপ্তাহে পরিদর্শন করা হয় এবং এতে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এভাবে ব্লানটিরের 2,000 বর্গ মাইল এলাকা থেকে কুষ্ঠরোগ বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই কুষ্ঠরোগের কথা জানা আছে। মধ্যযুগে ইউরোপে এই রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সময় রোগীদের প্রতি সাধারণের মনে কুসংস্কারজনিত ভয়ের ভাব দেখা যেত।

একটি গ্রীক শব্দ—রুক্ষ বা খস্খসে থেকে এই রোগের নামের উৎপত্তি। এই রোগ মূলতঃ ত্বককে ভাই করে তোলে। কিন্তু এর জন্যে রোগীকে কলোনীবদ্ধ করে রাখবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই রোগ সামান্যভাবে সংক্রামক—সংক্রমণের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সান্নিধ্য ঘটা চাই।

এই রোগের কারণ যক্ষ্মারোগের অনুরূপ এক প্রকার জীবাণু। ড্যাপসোন (Dapsone) বা ডি. ডি. এস. (DDS) নামে এক ওষুধে এই রোগ নিরাময় হয়। পূর্ব নাইজেরিয়ায় কাজ করবার সময় ডাঃ জন লোয়ে নামে এক মেথডিষ্ট মিশনারি এই ওষুধ আবিষ্কার করেন।

স্বল্প মূল্যের এই ট্যাবলেটগুলি নিয়মিত ব্যবহার করলেই রোগ সেরে যায়, কিন্তু বর্তমানে পাঁচ জনে একজন মাত্র রোগীকে এইভাবে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তার নানা কারণ রয়েছে। একটি হলো রোগ নির্ণয়ের অসুবিধা—সংক্রমণের পর থেকে এই রোগ প্রকাশ পেতে 5 বছর সময় লেগে যায়। আর একটি কারণ হলো—এর সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে থাকে; তাছাড়া এই রোগে সহজে লোক মরে না, শুধু পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনেক সময় এই রোগের চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেন না।

যাহোক, এটি এমন একটি রোগ, সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে যার নিরাময় করা সম্ভব, শুধু ইচ্ছা থাকা চাই। আশা করা যায়—কালক্রমে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

চা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

চা-ই সবচেয়ে সুলভ, নির্দোষ এবং উদ্দীপক পানীয়। চা-পান প্রথমে চীনদেশে সুরু হয় এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজী Tea কথাটি চীনদেশের আময় ভাষার Tay শব্দটি থেকে গৃহীত, আর চা শব্দটিও চৈনিক—ক্যান্টন থেকে এসেছে। বাইবেল বা সেক্সপীয়রের রচনায় চায়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, 350 খৃষ্টাব্দে চীন দেশের গ্রন্থকর্তা কুও পো তাঁর লেখা অভিধান আর ইয়াতে চায়ের প্রথম উল্লেখ করেন। খুব সম্ভব চায়ের আদিম উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া; অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, উত্তর-পূর্ব ভারত, বর্মা, শ্যাম এবং ইন্দোচীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলই চায়ের সর্বপ্রথম উৎপাদন স্থল বলে অনুমিত হয়। চায়ের বিষয় প্রথম বই চা চিং লেখেন চৈনিক পণ্ডিত লুঈ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। তখনকার কালে ফুটন্ত লবণাক্ত জলে চা ভিজিয়ে পান করা হতো। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই চীন থেকে জাপানে চা আনীত হয়। 1684 খৃষ্টাব্দে জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও ডাক্তার এণ্ড্রিয়াস ক্লিয়ার যবদ্বীপে চায়ের প্রচলন করেন।

1815 সালেও কর্নেল ল্যাটার আসামীর উপজাতিদের মধ্যে চা-পানের অভ্যাস দেখতে পেয়েছিলেন। 1823 সালে মেজর রবার্ট ব্রুস উত্তর আসামে স্বভাবজাত বন্য চা-গাছ আবিষ্কার করেছিলেন।

বঙ্গীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন টার্নার 1783 সালে দৌত্যকার্য উপলক্ষ্যে যখন তিব্বতে তাশি লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন এই প্রদেশে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চা-পানের অভ্যাস প্রচলিত ছিল। ভুটানের রাজা দেবরাজ তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন—এই চা জল, আটা, মাখন ও লবণ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। হল্যাণ্ডের লোকেরাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সর্বপ্রথম ইউরোপে চা আমদানী করে। 1618 সালে রাশিয়ায়, 1648 সালে প্যারিসে এবং 1650 সালে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় চায়ের প্রচলন হয়।

ভিনিসের সুপ্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক গিয়াম্বাতিস্তা রামুসিও 1559 খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা ভ্রমণ-কাহিনীতে চীনদেশের চায়ের কথা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত ডাচ নাবিক হিউগো লিন স্কুটেন 1598 সালে রচিত তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিশেষ করে চায়ের কথা বলেছেন। 1658 সালে মার্কিউরাস পলিটিকাস নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রে প্রথম চায়ের বিজ্ঞাপন বের হয়। সামুয়েল পেপিস 1660 সালে তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন—আমি এক পেয়ালা চীন দেশের পানীয় চা আনতে বলেছি, যা এর আগে কখনও পান করি নি।

1600 থেকে 1858 সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই-শ' বছর ধরে চায়ের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একাধিপত্য করেছিল। আমেরিকায় 1773 সালের চা আইন রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম কারণ হয়েছিল। 1778 সালে স্বনামধন্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও ভৌগোলিক স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস ভারতবর্ষে চায়ের চাষের কথা উত্থাপন করেন। এরপর 1834 সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এদেশে চা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এতে কোম্পানির উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ওয়ালিচ ও দুজন ভারতীয়

এবং তিন জন বণিক যোগ দেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রধানতঃ চীনদেশ থেকেই সারা পৃথিবীতে চা রপ্তানী হতো। 1856 সালে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম চা চালান হয়। ভারত থেকে 1885 সালে নিয়মিতভাবে বিদেশে চা রপ্তানী হতে থাকে। যবদ্বীপ থেকে চা আসে 1864 সালে আর সিংহল থেকে চা যায় 1880 সালে।

1753 খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক কার্ল লিনে চা-গাছের নামকরণ করেন Thea sinensis, কিন্তু বর্তমানে একে Camellia sinensis বলা হয়। চা-গাছ চৈনিক ও আসামীয়—এই দুই উপ-জাতিতে বিভক্ত। সিংহল দ্বীপে 1870 সালে কফির ফসল ব্যাধিবিধ্বস্ত হবার পর থেকে সেখানে চা চাষের সূচনা হয়। রাশিয়া 1847 সাল থেকে চায়ের আবাদ আরম্ভ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার চার্লস সেপার্ড (1890-1915) প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চা চাষের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হন—ঐ দেশের জলবায়ু অনুকূল হলেও শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার খুব বেশী হবার দরুণ চা-শিল্প লাভজনক হয় নি। নিরক্ষবৃত্তের 42° উত্তর এবং ও 33° দক্ষিণ পর্যন্ত প্রধানতঃ চা-গাছ রোপিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ুতে সমুদ্রসমতল প্রদেশ থেকে 6000 ফুট উঁচু পর্যন্ত জায়গা চা চাষের পক্ষে অনুকূল।

চা-গাছ চিরহরিৎ—25 থেকে 50 ফুট অবধি দীর্ঘ হয়। চায়ের পাতা এক ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। সাধারণতঃ গাছ ছেঁটে 3 থেকে 5 ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। চায়ের ফুলে সাধারণতঃ পাঁচটি সাদা পাপড়ি ও বহু সংখ্যক হলুদে রঙের কেশর থাকে। ফুলের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। চায়ের ফল সবুজ রঙের, মার্বেলের গুলির মত বড় হয় এবং ওজনে প্রায় দুই গ্র্যামের মত। ভিতরে দুই-তিনটি গাঢ় বাদামী রঙের বীজ থাকে।

চা-গাছ প্রথমে বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। ছয় মাসের মধ্যে গাছগুলি ছয়-সাত ইঞ্চি বড় হলেই অন্যত্র নিয়ে পাঁচ ফুট অন্তর লাগানো হয়ে থাকে। চার বছর পর থেকেই গাছ থেকে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয়। এক-একটি চা-গাছের গড় আয়ু তিরিশ-চল্লিশ বছর হবে। এক একর জমিতে তিন-চার হাজার চা-গাছের ঝোপ জন্মায়। সাররূপে পটাস, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ফস্‌ফেট ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও চা-গাছ কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণে ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারের জন্যে তাম্র-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়।

চা-গাছ যথেষ্ট বড় হলে নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ শীতকালে) শ্রমিকেরা প্রত্যেকটি ডাল থেকে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি চয়ন করে ঝুড়িতে ভর্তি করতে থাকে। চারটি চায়ের ঝোপ থেকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় এক পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। চা-গাছের প্রায় 3200টি শাখাগ্র ছিঁড়ে নিলে তবেই এক পাউণ্ড আন্দাজ চা-পাতা পাওয়া যায়। সংগৃহীত চায়ের পাতা এরপর পুরা একদিন ঘরের মধ্যে বা উন্মুক্ত সূর্যালোকে রেখে রসশূন্য করা হয়। তারপর ঘণ্টা তিনেক ধরে ঐ চা-পাতা পাকানো হয়। চায়ের পাকানো পাতা দুই-তিন ঘণ্টা আর্দ্র হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গাঁজানো হয়। এর ফলে পাতার কষার গুণ কমে গিয়ে তাতে সুগন্ধের সঞ্চার হয়ে থাকে। সর্বশেষে একটি উষ্ণ কক্ষে আধ ঘণ্টা পাতাগুলিকে রেখে গরম বাতাস দিয়ে শুষ্ক করা হয়।

পরিপক্ক চা সবুজ, কালো ও বাদামী—এই তিন রকমের হয়। সবুজ চা-পাতা সংগ্রহের পরেই শুষ্ক করা হয়। কালো চা গাঁজানোর পর শুষ্ক করা হয় আর বাদামী চা অল্প অক্সিজেনযুক্ত

হবার পর রসশূন্য করা হয়ে থাকে। মরক্কো ও আফগানিস্থানে সবুজ চায়ের কিছু সমাদর আছে। সর্বশেষে আকার অনুযায়ী চা-পাতাকে পূর্ণপত্র, ভগ্নপত্র ও চূর্ণপত্র—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে এক-শ' পাউণ্ড করে কাঠের বাক্সের ভর্তি করা হয়। পৃথিবীতে প্রায় 1500 রকমের চা উৎপন্ন হয় এবং তাথেকে আবার 2000 রকমের মিশ্রণ তৈরি করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মোট কুড়িটি দেশে চা উৎপন্ন হয়। 1958-60 সালে বিভিন্ন দেশে চা উৎপাদনের হার এই রকম ছিল—

ভারতবর্ষ	319	হাজার টন
সিংহল	185	" "
চীন	147	" "
জাপান	77	" "
ইন্দোনেশিয়া	43	" "
সোভিয়েট রাশিয়া	32	" "
পূর্ব আফ্রিকা	31	" "
পাকিস্তান	24	" "

বর্তমান বিশ্বের বাজারে শতকরা প্রায় 80 ভাগ চা ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে আসে। এর মধ্যে 44 ভাগ চা এখন ভারত থেকেই রপ্তানী হয়ে থাকে। 1959 সালে সারা পৃথিবীতে 170 কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়েছিল। এর মধ্যে 52 কোটি পাউণ্ড গ্রেট বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 10 কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষ 25 কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহার করেছিল। যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে নিজ প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ ও চীন থেকে এক-তৃতীয়াংশ চা আমদানী করে। 1952 সালে পৃথিবীতে বার্ষিক জনপ্রতি চা-পানের হার এরূপ ছিল—

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ 9 পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া 6·5 পাউণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড 5 পাউণ্ড, ইরাক 4 পাউণ্ড, ক্যানাডা 3·4 পাউণ্ড, মরক্কো 3·2 পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা 2 পাউণ্ড, ঈজিপ্ট 1·78 পাউণ্ড, হল্যাণ্ড 1·58 পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ·66 পাউণ্ড, ভারতবর্ষ 9 আউন্স মাত্র। আজকাল আমেরিকার লোকেরা চায়ের চেয়ে বেশী কফি পান করে আর ইংল্যাণ্ডবাসীরা কফি অপেক্ষা অনেক অধিক চা ব্যবহার করে, কিন্তু অতীতে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল।

1950-61 সালে বিভিন্ন দেশ থেকে চা রপ্তানীর হার এই প্রকার ছিল—

ভারতবর্ষ	212	হাজার টন
সিংহল	188	" "
চীন	43	" "
ইন্দোনেশিয়া	37	" "
পূর্ব আফ্রিকা	29	" "

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় 10,000 চা-বাগান আছে, সর্বসমেত দশ লক্ষ লোক এখানে কাজ করে। এই ব্যবসায়ে প্রায় 70 কোটি টাকা নিয়োজিত আছে। ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় 70 ভাগ আসামেই উৎপন্ন হয়, বাকী দশ ভাগ দার্জিলিং অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট কুড়ি ভাগ দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও কুর্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতি বছর গড়ে এদেশে 55 কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে স্বাদে ও গন্ধে দার্জিলিংয়ের চা-ই সর্বোৎকৃষ্ট।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে যখন চায়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন পাউণ্ড প্রতি চায়ের দাম ছিল প্রায় 10 পাউণ্ড। এখন সর্বোৎকৃষ্ট চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি 4 পাউণ্ড আন্দাজ হবে। চায়ের নীলাম ও বিক্রয়-কেন্দ্র প্রধানতঃ লণ্ডন, কলিকাতা, কলম্বো, চট্টগ্রাম ও কোচিন।

চা উত্তেজক পানীয়, রাসায়নিক বিশ্লেষণে এতে ক্যাফিন, ট্যানিন ও সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। ক্যাফিন নামক উপকারটি মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককে প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত করে। ট্যানিন একটু কষায় স্বাদবিশিষ্ট। এক পেয়ালা চায়ে

প্রায় এক গ্রেন ক্যাফিন ও প্রায় দুই গ্রেন ট্যানিন থাকে। ভারতীয় কালো চায়ে 2% থেকে 3% ক্যাফিন এবং 6% থেকে 10% ট্যানিন থাকে। আর চীনদেশের চায়ে 2% থেকে 3·7% ক্যাফিন এবং 5% থেকে 10% ট্যানিন বর্তমান। সাধারণতঃ ফুটন্ত গরম জলে তিন-চার মিনিট চায়ের পাতা ভিজিয়ে নেবার পর ছাঁকনিতে ছেঁকে তাতে দুধ ও চিনি মিশিয়ে পান করা হয়। দুধ চায়ের কষায় স্বাদ নষ্ট করে দেয়, আর চিনি মিষ্টতা ও সুস্বাদ আনে। চা-পানের পনেরো মিনিটের মধ্যেই ক্যাফিনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়।

সমানভাবে দেহ-মনের পক্ষে উত্তেজক ও আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তিকর অথচ সস্তা পানীয় বলেই চায়ের এত আদর। অবসন্ন ও ক্লান্ত শরীরে চা কি রকম উপভোগ্য এবং উপকারী, তা আর কাউকে নতুন করে বলে দিতে হবে না। তবে অতিরিক্ত চা-পান করলে অজীর্ণ, অনিদ্রা এবং হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত ও অনিয়মিত হবার সম্ভাবনা আছে।

গ্রীষ্মকালে আমেরিকায় দুধের সর ও চিনি মিশ্রিত বরফশীতল চা-পানের প্রথা প্রচলিত। রাশিয়াতে লেবুর রসের সঙ্গে চিনি কিম্বা জ্যাম মিশিয়ে চা-পান করা খুব প্রীতিপদ মনে করা হয়। এক সময় মধ্যএশীয় অঞ্চলে মাখন ও লবণ সহযোগে চা পান করা হতো।

চায়ের আরক প্রস্তুত-প্রণালী :

(1)

সর্বোৎকৃষ্ট চা	175 ভাগ
দারুচিনি	3 ,,
লবঙ্গ	3 ,,
ভ্যানিলা	1 ,,
র‍্যাম (60% মদ্য)	1000 ,,

কঠিন উপকরণগুলি চূর্ণ করে নিয়ে প্রায় তিন দিন ধরে অ্যালকোহলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই সুরাসার ছেঁকে পৃথক করতে হবে। ঠিকমত তৈরি হলে এই তরল মিশ্রণ বেশ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও উত্তেজক পানীয় হয় এবং অনেক দিন ভাল থাকে।

(2)

চা চূর্ণ	1 আউন্স
চিনি	3 ,,
বিশুদ্ধ সুরা	10 ,,
জল	10 ,,

দুই সপ্তাহ ভিজাবার পর ছেঁকে নিতে হবে।

চায়ের সরবৎ :

(3)

চা	8 আউন্স
চিনি	36 ,,
ফুটন্ত গরম জল	16 ,,

(4)

চা	2 আউন্স
ফুটন্ত গরম জল	20 ,,
সাইট্রিক অ্যাসিড	¼ ,,
চিনি	56 ,,

প্রথমে ফুটন্ত গরম জলে প্রায় 5 মিনিট কাল চা ভিজিয়ে নেবার পর সেই কাথ ছেঁকে নিয়ে তাতে সাইট্রিক অ্যাসিড ও চিনি যোগ করতে হবে।

জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীমিতি

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

ভর-বর্ণালীমিতি বা মাস্‌-স্পেকট্রোমেট্রি আধুনিক যুগের রসায়ন-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে ভেষজ-রসায়নবিদ্‌দের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই পদ্ধতির সরলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা। বর্তমান যুগে ভেষজ-রসায়ন-বিজ্ঞানীরা যে সব জৈব যৌগ নিয়ে কাজ করে থাকেন, সেগুলি প্রাকৃতিক জগতে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়, যার ফলে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ের প্রচলিত রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি ভালভাবে পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অতি অল্প (1মিঃ গ্রাম বা আরও কম) যৌগ নিয়ে এবং খুব সহজভাবে ভর-বর্ণালীমিতির পদ্ধতি পরিচালনা করে পরীক্ষাধীন যৌগের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই রকম একটা পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তার যে সকল রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কাম্য হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং কালে অধিকাংশ ভেষজ জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয় প্রধানতঃ ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই হচ্ছে।

ভর-বর্ণালীমিতিকে এক কথায় ইলেকট্রন শক্তির সহায়তায় পরিচালিত একটা বিশেষ যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশল বলা যেতে পারে। এই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলটি মূলতঃ রাসায়নিক পদার্থের ভর (Mass) নির্ণয় এবং আইসোটোপগুলির পৃথকীকরণের কাজেই প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কোন একটি পদার্থকে কিংবা পদার্থের মিশ্রণকে (সাধারণতঃ আইসোটোপের মিশ্রণ) মাঝারী শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হয়। এর ফলে নানান ধরণের আয়ন তৈরি হয়; যেমন—

(ক) $M + e^- \rightarrow M^-$

(খ) $M + e^- \rightarrow M^+ + 2e^-$

(গ) $M + e^- \rightarrow M^{+n} + (n+1)e^-$

(M এখানে কোন পদার্থ বা পদার্থের মিশ্রণ এবং e^- হচ্ছে ইলেকট্রন)

এরপর ঐ আয়নগুলিকে পৃথক করে তাদের ভর নির্ণয় করা হয়। এই সম্পর্কে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ভর-বর্ণালীমিতির ক্ষেত্রে ইউনিপজিটিভ আয়নই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ অন্যান্য আয়নের চেয়ে এগুলিই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। যে বিশেষ যন্ত্রটির সাহায্যে ইলেকট্রন-রশ্মি পরিচালিত করে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা হয় এবং পরে সেগুলিকে পৃথক করা হয়, তাকে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের বিভিন্ন রকম ব্যবহারের কথা রসায়নশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। তাদের মধ্যে ডেম্পস্টার ও অ্যাস্টনের তৈরি যন্ত্র দুটিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

এই যান্ত্রিক পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে—ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাধীন মিশ্রণ থেকে প্রথমে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা এবং পরে ঐ আয়নগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় যন্ত্রস্থিত চৌম্বক সীমানায় নিক্ষেপ করা। এখন পজিটিভ আয়নগুলি তাদের ভর অনুযায়ী

---

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, নদীয়া।

চৌম্বক সীমানার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পড়বে। যদি আয়নটা খুব ভারী হয় অর্থাৎ ভর বেশী হয়, তাহলে সেটা আয়নের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি যে চৌম্বক সীমানা আছে, সেখানে গিয়ে পড়বে আর আয়নটা হাল্কা হলে উৎপত্তি-স্থলের অনেক দূরের চৌম্বক সীমানায় গিয়ে পৌঁছুবে। এই ভাবে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন গঠিত আয়ন পৃথক করা হয়। এর পর ভর নির্ণয়ের জন্যে ঐ আয়নগুলিকে আয়ন-সংগ্রাহকের ভিতরে নেওয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, প্রত্যেকটি আয়নের জন্যে কি পৃথক পৃথক আয়ন-সংগ্রাহকের দরকার? না, পৃথক পৃথক শক্তি) যে কোন একটাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করলে দেখা যাবে, কোন নির্দিষ্ট নিক্ষিপ্ত শক্তিতে কোন একটি বিশেষ আয়নই ঐ নির্দিষ্ট চৌম্বক সীমা অতিক্রম করে সংগ্রাহকে পৌঁছুতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে আয়নের উৎপত্তিস্থল ও সংগ্রাহকের মধ্যবর্তী দূরত্ব একই রাখা হয় এবং চৌম্বক শক্তি ও নিক্ষেপিত শক্তির যে কোন একটিকে অপরি-বর্তিত রেখে অন্যটিকে আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। দেখা গেছে, নিক্ষিপ্ত শক্তিকে একই রেখে চৌম্বক শক্তি পরিবর্তন করলে ভালভাবে ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয় (1নং চিত্র)

1নং চিত্র

সংগ্রাহক নেবার দরকার নেই। একটি মাত্র সংগ্রাহক থাকলেই যথেষ্ট। কেন না, আমরা জানি, কোন একটি বিশেষ আয়ন চৌম্বক সীমানার কোন্ জায়গায় গিয়ে পড়বে, তা এক দিকে যেমন তার ভরের উপর নির্ভর করে, অন্য দিকে তেমনি নির্ভর করে, কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির সহায়তায় তাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বা কি রকম শক্তিসম্পন্ন চৌম্বক সীমানায় সেটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং আয়নের উৎপত্তি-স্থল ও সংগ্রাহকের দূরত্ব একই রেখে চৌম্বক শক্তি এবং নিক্ষেপিত শক্তির (অ্যাক্সিলারেটিং

যখন ঐ আয়নটি সংগ্রাহকে পৌঁছয়, তখন একটা বিশেষ সঙ্কেতের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্কেতটিকে তখন অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বর্ধিত করে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করা হয়[1]।

---

1. সঙ্কেতগুলিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে রেকর্ডার থাকে। সাধারণতঃ তিন প্রকার রেকর্ডার ব্যবহৃত হয়। যথা—অসিলোগ্রাফ, পেন ও ইঙ্ক রেকর্ডার এবং ডিজিটাইজার। এর মধ্যে অসিলোগ্রাফ এবং ডিজিটাইজার যুক্তভাবে ব্যবহার করলে সন্তোষ-জনক ফল পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটা মনে রাখা একান্ত দরকার, তা হচ্ছে, ঐ বিশেষ সংকেতটি কখনই আয়নের অনাপেক্ষিক (অ্যাবসোলিউট) ভরের নির্দেশক নয়। সব সময় ওটা ভর (m) এবং চার্জ (e, ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি)-এর অনুপাতকে (m/e) বুঝিয়ে থাকে। এখন ঐ m/e সংকেতটিকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রের এক অক্ষ আয়ন সংকেত (m/e) এবং অন্য অক্ষ আয়নের আপেক্ষিক তীব্রতা[2] নির্দেশ করে। এর ফলে ঐ লেখচিত্রের বিভিন্ন m/e স্থানে পৃথক পৃথক আয়ন সংকেতগুলি শৃঙ্গের আকারে অবস্থান করে এবং বিশেষ একটি m/e স্থানের মান নির্দিষ্ট একটি আয়নের ভরের পরিমাপক হিসাবে কাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ভর-বর্ণালীমিতির আসল কথা হচ্ছে, কোন পদার্থ কিংবা পদার্থের মিশ্রণ থেকে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করে তাদের ভর নির্ণয় করা। সুতরাং যদি কোন যৌগ থেকে অনুরূপভাবে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে ভর-বর্ণালীমিতির সাহায্যে সেই সব যৌগের ভর নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে জৈব যৌগগুলি ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে আয়নিত হয় এবং দেখা গেছে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতে বহু পারমাণবিক জৈব যৌগগুলি টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে গিয়ে অনেক ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করতে পারে। এখন ঐ টুকরাগুলির ভর নির্ণয় করে ঠিকমত সন্নিবেশিত করতে পারলে পরীক্ষাধীন ঐ বহু-পারমাণবিক অণুটির পুরা কাঠামো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের জন্মাতে পারে এবং এই মূলনীতিই হচ্ছে আলোচ্য যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশলের বৈশিষ্ট্য এবং জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো, কি কি পরিমাণ ইলেকট্রন শক্তি ব্যবহার করলে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে কোন্ অণু থেকে তখনই একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যেতে পারে[3], যখন সেই আঘাতকারী ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি ইলেকট্রন-আহত ঐ অণুর আয়নীকরণ শক্তির (আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল) সমান কিংবা তার চেয়ে বেশী। জৈব যৌগের আয়নীকরণ শক্তি সাধারণতঃ 7 থেকে 15 ইলেকট্রন-ভোল্টের মত হয়। কাজেই জৈব অণুকে আয়নিত করতে হলে কম পক্ষে ঐ ধরণের শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি যদি অণুর আয়নীকরণ শক্তির সমান হয়, তাহলে অণুটিকে আয়নিত করতে হলে ঐ ব্যবহৃত শক্তিকে পুরাপুরিভাবে পরীক্ষাধীন অণুতে স্থানান্তরিত করতে হবে (যা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে)। এই রকম ক্ষেত্রে খুব কম তীব্র আণবিক শৃঙ্গ ভর-বর্ণালীতে বিধৃত হয় কিন্তু ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাণ বাড়ালে পরীক্ষাধীন অণুটির আয়নিত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে এবং তার ফলে ভর-বর্ণালীতে উল্লেখযোগ্য তীব্র আণবিক শৃঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই জন্তেই এই পদ্ধতিতে আণবিক-আয়নের উৎপত্তির জন্তে সাধারণতঃ 30 থেকে

2. সবচেয়ে বেশী তীব্র যে সংকেতটি তাকে মূল সংকেত ধরা হয় এবং সেই সংকেতের জন্তে যে শৃঙ্গটি পাওয়া যায়, তাকে মূল শৃঙ্গ বলা হয়।

3। ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ কণা, সুতরাং সে রকম একটা কণা অণু থেকে বেরিয়ে গেলে একটা ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে। এই ইউনিপজিটিভ আয়নকে আণবিক আয়ন বা মলিকিউলার আয়ন (M^{+}) বলা হয় এবং এর ভরকে আণবিক ভর বলা হয়।

50 ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

এবার ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাণ যদি ধীরে ধীরে আরও বাড়ানো হয় এবং পরীক্ষাধীন অণুটি যদি বহু-পারমাণবিক হয় (জৈব যৌগগুলি প্রায়শঃ এরূপ হয়ে থাকে), তাহলে দেখা যাবে, ঐ বর্ধিত অতিরিক্ত শক্তি এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছুবে, যখন তা ঐ আণবিক আয়নের মধ্যস্থিত কোন একটা বিশেষ বাহুকে ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে বিবেচনাধীন অণুটির খণ্ডীকরণ ঘটতে থাকবে। আণবিক আয়নের মত এক্ষেত্রেও অণুর খণ্ডীকরণের সম্ভাবনা ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভর-বর্ণালী পাবার জন্যে সাধারণতঃ 60 থেকে 90 ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এই সব ভর-বর্ণালীগুলি কিন্তু বেশ জটিল। কারণ বহু-পারমাণবিক যৌগে বিভিন্ন ধরণের বাহু থাকতে পারে এবং তাদের ভাঙনের ফলে বিভিন্ন ভরখণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ভর-বর্ণালীতে অনেক ভর-শৃঙ্গ পাওয়া যাবে। একটা উদাহরণ দিলে এই কথার যাথার্থ্য খুব সহজেই বোধগম্য হবে। ধরা যাক, ABCD একটা কাল্পনিক বহু-পারমাণবিক অণু এবং এটাকে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি দিয়ে আঘাত করা হলো। এর ফলে অণুটির নিম্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে।

$$ABCD + e^- \longrightarrow ABCD^+ + 2e^- + ABCD^{\cdot} \quad \cdots \quad (1)$$

$$ABCD^+ \longrightarrow A^+ + BCD^{\cdot} \quad \cdots \quad (2)$$

$$\longrightarrow AB^+ + CD^{\cdot} \quad \cdots \quad (3)$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$A^+ + B^{\cdot} \quad A^{\cdot} + B^+ \quad \cdots \quad (4)$$

$$\longrightarrow CD^+ + AB^{\cdot} \quad \cdots \quad (5)$$

$$\longrightarrow AD^+ + BC^{\cdot} \text{ ইত্যাদি} \quad \cdots \quad (6)$$

$$ABCD^+ + ABCD \longrightarrow [ABCD.\ ABCD]^+ \rightarrow ABCDA^+ + BCD \quad \cdots \quad (7)$$

উপরের পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আণবিক আয়নের সঙ্গে নিউট্র্যাল ভরখণ্ডেরও সৃষ্টি হয় এবং পরে সেই আণবিক আয়ন ভাঙবার ফলে অনেকগুলি ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হয়। যেহেতু ভর-বর্ণালীতে যে কোন পজিটিভ আয়ন বিধৃত হতে পারে, সেহেতু এই ধরণের বহু-পারমাণবিক অণুর ভর-বর্ণালীতে অনেকগুলি ভর-শৃঙ্গ দেখা যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, আণবিক আয়নের জ্যামিতিক গঠন এমনই যে, সেটা ভেঙে ভরখণ্ড তৈরি হবার আগে তার পুনর্বিন্যাস ঘটে যায় এবং সে সব ক্ষেত্রে ঐ পুনর্বিন্যস্ত আয়ন থেকে এমন এক বা একাধিক ভরখণ্ড তৈরি হয়, যাদের সঙ্গে মূল অণুর কোন রকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই রকম পরিস্থিতিতে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ বেশ জটিল হয়ে পড়ে। ঠিক এই ধরণের জটিলতা নিয়োপেনটন হাইড্রোকার্বনের

$$\left[\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C-CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array}\right]$$

ভর-বর্ণালীতে সৃষ্টি হয়। দেখা যায় ঐ যৌগের m/e 29 স্থানে একটা শৃঙ্গ আছে। হাইড্রো-কার্বনজাতীয় যৌগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইথাইল পুঞ্জ ($-C_2H_5$)-এর উপস্থিতির জন্যে উক্ত স্থানে শৃঙ্গ দেখা যায়। নিয়োপেনটেনে কিন্তু সে রকম ইথাইলপুঞ্জ নেই, অথচ ঐ শৃঙ্গটি ভর-বর্ণালীতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আণবিক আয়নের পুনর্বিন্যাস ঘটছে—এই রকম কল্পনা করতেই হবে। এই ধরণের পুনর্বিন্যাস সাধারণতঃ অসম-পারমাণবিক (হেটারো-অ্যাটমিক) যৌগগুলিরই বিশেষত্ব এবং সেক্ষেত্রে এই জাতীয় পুনর্বিন্যাসের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকলে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ করা মোটেই দুরূহ নয়।

আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। আমরা জানি আয়নগুলি বেশ কম পরিমাণে তৈরি হয়। সুতরাং বেশী পরিমাণে পড়ে থাকা অপরিবর্তিত (নিউট্র্যাল) অণুগুলি ক্রমাগত ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে আণবিক আয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে নিউট্র্যাল অণু থেকে একটা পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে আণবিক আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তখন অন্য একটা আয়ন তৈরি হয় (সমীকরণ নং 7), যার ভর বিবেচনাধীন অণুর চেয়ে বেশী। সুতরাং এই রকম অবস্থায় আণবিক ভর নির্ণয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভর-খণ্ডীকরণ পরিচালনা করা হয়, তাতে নিউট্র্যাল অণু থেকে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হতে পারে তাই। (M+1) শৃঙ্গই সাধারণতঃ ভর-বর্ণালীতে বিধৃত হয়। (M+1) ভর-শৃঙ্গ প্রধানতঃ সেই সব যৌগের (অ্যামিন, ইথার, এস্টার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যাদের আণবিক আয়নটা খুবই নরম এবং ভঙ্গুর, কিন্তু (M+1) আয়নটা বেশ শক্ত ও স্থায়ী। অতএব এখানেও আমরা দেখছি, যৌগের জ্যামিতিক কাঠামোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বা নিউট্র্যাল অণু থেকে হাইড্রোজেনের বিচ্যুতি মোটামুটিভাবে জ্যামিতিক গঠনের উপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এখন সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আণবিক আয়নের উৎপত্তি এবং পরবর্তী কালে তার খণ্ডীকরণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করে:—

(ক) পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্ব।

(খ) যে বাহুটা ভাঙবে, তার দৃঢ়তা (বণ্ড-এনার্জি)।

(গ) নিউট্র্যাল খণ্ডের স্থায়িত্ব।

(ঘ) পরীক্ষাধীন যৌগের জ্যামিতিক কাঠামো।

এই সব তথ্যগুলির মধ্যে পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর উপরই নির্ভর করছে ভর-শৃঙ্গ বা ভরখণ্ড-শৃঙ্গের তীব্রতা এবং একথা এখন আর আমাদের অজানা নেই যে, শৃঙ্গের তীব্রতাই হচ্ছে ভর-বর্ণালীর ব্যাখ্যানের প্রধান ভিত্তি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, যৌগের মধ্যে পাই-ইলেকট্রন ব্যবস্থা উপস্থিত থাকলে কিংবা যৌগের কাঠামো চক্রাকার হলে আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তপুঞ্জ, বিশেষ করে অসম-পারমাণবিকপুঞ্জ আণবিক আয়নের খণ্ডিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তাপ পারমাণবিক সংযোজন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রিত তাপ পারমাণবিক সংযোজন বা কনট্রোল ও থার্মো-নিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটানোর জন্যে গত 20 বছর ধরে চেষ্টা করছেন।

সমুদ্রের জলে সস্তায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম পাওয়া যায়। এই সস্তা ইন্ধন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার উপযোগী রি-অ্যাক্টর তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে উন্নতি খুবই মন্থর গতিতে হয়েছে। তার প্রধান কারণ—প্রথমতঃ বিদ্যুতাহিত প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তুকণাকে ধরে রাখবার উপযোগী পাত্র চাই। এই সকল কণা একে অন্যকে প্রতিহত করে। এই ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাসকে বলা হয় প্লাজ্‌মা। যে কোন পাত্রে ঐ গ্যাস রাখা মাত্র তা বাষ্প হয়ে উবে যাবে। তাই বিজ্ঞানীরা ঐ গ্যাস ধরে রাখবার পাত্র উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন।

সম্পূর্ণ ফাঁকা একটি পাত্রের মাঝখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে ঘিরে প্লাজ্‌মা রাখা যায় কিনা, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে—প্লাজ্‌মাও বিদ্যুৎবাহী। ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে একে ঘিরে রাখা সম্ভব হয় না, বেরিয়ে আসে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই ত্রুটি দূর করবার পথে খানিকটা এগিয়ে গেছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানডিয়াগোর গাল্‌ফ জেনারেল অ্যাটমিক সংস্থার বিজ্ঞানী ডাঃ তিহিরো ওকাওয়া কর্তৃক একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

যন্ত্রটি হলো সম্পূর্ণ ফাঁকা উঁচু গোলাকার একটি আধার। এর ব্যাস 16 ফুট। এর মধ্যে খুব পাতলা রড দিয়ে অনেকগুলি গোল রিং ঝোলানো আছে। ঐ সকল রিঙের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত হলেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এর তীব্রতা বাইরের দিকে বেড়ে যায়। ফলে নির্দিষ্ট স্থানে প্লাজ্‌মাকে ধরে রাখা যায়। তিনি 0.07 সেকেণ্ড প্লাজ্‌মা আটক করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই সময় পূর্বেকার তুলনায় 10 গুণ বেশী। ওকাওয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাই-ড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন ঘটাবার জন্যে প্রথমতঃ প্লাজ্‌মাকে বেশ কিছু সময় যাতে ধরে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবেই, কারণ সংযোজন ঘটাবার রি-অ্যাক্টর তৈরির পথ সন্ধানের জন্যে বেশ কিছু বার কোন আধারে প্লাজ্‌মা রেখে সংযোজন ঘটাতে হবে।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জীবাশ্মের সন্ধান

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ভূগর্ভে খনন করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অধুনালুপ্ত এক প্রকার সরীসৃপ জাতীয় জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন। এই সকল জীব 20 কোটি বছর পূর্বে আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিচরণ করতো।

পৃথিবীর মহাদেশসমূহ বর্তমানে যেমন একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন, বহু কোটি বছর পূর্বে এরকম ছিল না। পৃথিবীর মোট স্থলভূমি একটি বা দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগুলি সরে সরে যায়। বিজ্ঞানীদের এই কথার প্রমাণ এই জীবাশ্ম আবিষ্কারে পাওয়া যায়।

একটি মত অনুসারে একদা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ছিল নিরক্ষবৃত্ত এলাকার খুব কাছে এবং এর সঙ্গে ছিল বর্তমান আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা,

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া। এই বিরাট ভূখণ্ডকে বলা হতো গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

1928 সালে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে বার্ড অভিযান চালানো হয়, তাতে প্রধান বিজ্ঞানী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডাঃ লরেন্স এম. গুল্ড। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই আবিষ্কারে অতীত যুগের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে এক বিরাট মহাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইলো না।

এই জীবাশ্মটি লিস্ট্রোসোরাস নামে অতিকায় জন্তুর মাথার একাংশ। জন্তুটি দেখতে ছিল অনেকটা হিপোপটেমাস বা জলহস্তীর মত। ঐ সকল জন্তু ভারত ও আফ্রিকায় প্রচুর ছিল। জন্তুটি জলচর হলেও এর পক্ষে সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে বহু সমুদ্র পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া সম্ভব ছিল না—এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আবিষ্কৃত এটিই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম। ডাঃ গুল্ড বলেছেন, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে সব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যেই কেবল নয়, আজ পর্যন্ত অতীত যুগের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের সকলের মধ্যেই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

দক্ষিণ মেরু থেকে 400 মাইল দূরবর্তী ট্র্যান্স অ্যান্টার্কটিক পর্বতমালার বালিপাথরের স্তূপ থেকে এই প্রাগৈতিহাসিক জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে।

দোষমুক্ত ডি. ডি. টি. তৈরির উদ্যোগ

কীটবিনাশক ডি. ডি. টি-র ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, পশ্চিম জার্মেনী, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ডস ও হাঙ্গেরীতে আংশিক ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কীটঘ্ন দ্রব্য হিসাবে এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকলেও আবহাওয়া দূষিত করবার মত এরকম বস্তু আর নেই। পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণে এবং কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এখনও ডি. ডি. টি. ব্যবহার করা হচ্ছে, এর আংশিক বা পুরাপুরি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় নি।

তবে সর্বদোষমুক্ত একপ্রকার ডি. ডি. টি. তৈরির জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পরীক্ষামূলক-ভাবে ঐ ধরণের ডি. ডি টি. তৈরি করাও হয়েছে। মানুষ অথবা জীবজন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর নয় বলে প্রমাণিত হলে আগামী এক বছরের মধ্যে এসকল বাজারে ছাড়া হবে এবং পরিণামে বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হতে পারে।

ছড়াবার পর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ডি. ডি. টি., ডি. ডি. ই নামে যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। জলে অথবা যেখানেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, বহু রকমের মাছ ও পোকামাকড় ডি. ডি. ই-তে মরে যায়। মানুষের পক্ষে উপকারী বহু পোকামাকড়ও এর মধ্যে রয়েছে। ডি. ডি. ই. খুবই বিষাক্ত দ্রব্য।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এরোজেট জেনারেল কর্পো-রেশন নামে একটি সংস্থা ডি. ডি. টি. পাউডারের সঙ্গে অন্য একটি উপকরণ মিশিয়ে এক নতুন ধরণের কীটঘ্ন দ্রব্য তৈরি করেছেন। ডি. ডি. টি-কে বিষমুক্ত করবার জন্যে এতে রাসায়নিক অনু-ঘটক হিসাবে কি উপকরণ যোগ করা হয়েছে, তার নাম প্রকাশ করতে ঐ সংস্থা সম্মত নন। বর্তমানে ঐ সংস্থার গবেষণাগারের মাছের উপর এই নতুন ধরণের ডি. ডি. টি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই বস্তুটি কতখানি বিষমুক্ত হয়েছে, তা বর্তমানে নিরূপণ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক দপ্তরের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যানপোনস্‌ করজিয়াতি এ-সম্পর্কে বলেছেন যে, এই নতুন ধরণের ডি ডি. টি. যে অনেকখানি দোষমুক্ত, এতে বিষ সৃষ্টি যে অনেক কম হয়ে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে এই নতুন ধরণের ডি. ডি. টি-র দ্বারা পৃথিবীর শিল্পোন্নত এবং উন্নতিশীল উভয় অঞ্চলই বিশেষভাবে উপকৃত হবে। পুরনো ডি. ডি. টি-র তুলনায় এর মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ধরণের ডি. ডি. টি-র তাৎপর্য ও সুফল অনুধাবন করলে এই মূল্যবৃদ্ধি যৎসামান্যই মনে হবে।

পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে ফসল সংরক্ষণের জন্যে যে কীটঘ্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্ধেকেরও বেশী ডি. ডি. টি. এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ধারণা পৃথিবীর উন্নতশীল রাষ্ট্রসমূহে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ না করলে অর্ধেকেরও বেশী তুলা নষ্ট হয়ে যেত। ব্রেজিলে পেয়ারা প্রভৃতি ফল সংরক্ষণের জন্যে ব্যাপক ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করা হয়।

ঐ সকল দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ডি. ডি. টি-র প্রয়োগ অপরিহার্য। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল এম. জি. ক্যানডো বলেছেন যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি-র স্থান অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হতে পারে না। এর ব্যবহার সীমিত করলে পৃথিবীর বেশীর ভাগ উন্নতিশীল রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে।

পৃথিবীর কোন কোন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মোট মৃত্যুর শতকরা 20টি এবং শিশু মৃত্যুর শতকরা 10টি এখনও ম্যালেরিয়ার জন্যেই হয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এখনও মানুষের অন্যতম বড় শত্রু ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগবাহক মশককুলের বৃদ্ধি এখনও ডি. ডি. টি. ছড়িয়েই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা

জীবন-ত্রাণ যন্ত্র

দুর্ঘটনায় অজ্ঞান হয়ে গেলে এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সহজ। মুখে মুখোস লাগিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ টিপলেই প্রচুর হাওয়া ফুসফুসে ঢুকে যায় এবং ফুসফুস থেকে নিঃসৃত হাওয়া অন্য একটি নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। পশ্চিম জার্মেনীর লুইবেকে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

হাম্‌ফ্রি ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভিকে একজন প্রশ্ন করেছিল—আপনার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোন্‌টি? ডেভি সগর্বে উত্তর দিয়েছিলেন—মাইকেল ফ্যারাডে। গরীব কামারের ছেলে বই বাঁধাইকারী তেরো বছরের কিশোর ফ্যারাডের মধ্যে বিস্ময়কর সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া সত্যই ডেভির একটি বড় আবিষ্কার। শুধু সন্ধানই নয়, অখ্যাত সেই ছেলেটিকে বিশ্ববিখ্যাত মাইকেল ফ্যারাডে করে গড়ে তোলবার সব কৃতিত্বই ছিল সার হাম্‌ফ্রি ডেভির।

লণ্ডনের কাছে ছোট্ট একটি গ্রামের গরীব কামার পরিবারে 1791 খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর পিতামাতার ছিল না। তেরো বছর বয়সেই জীবিকা অর্জনের জন্যে ফ্যারাডেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজের চেয়ে তাঁর মন বেশী পড়ে থাকতো বইয়ের পাতায়, বিজ্ঞানের বই পেলে বাঁধবার আগে সবটা পড়ে ফেলতেন। না পড়ে কোন বিজ্ঞানের বই তিনি কখনও ফেরৎ দিতেন না। ডেভির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তাঁর কাছে বিজ্ঞান শেখবার প্রবল বাসনা ছিল ফ্যারাডের। ডেভির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলি সযত্নে টুকে নিতেন। টুকে নেবার সময় সংশ্লিষ্ট চিত্রাদিও এঁকে রাখতেন। পরে সেগুলি বাঁধিয়ে ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ডেভি তাঁর আগ্রহ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে জানতে চান—তাঁর ইচ্ছা কি? ফ্যারাডে লেবরেটরীতে একটি চাকুরীর প্রার্থনা জানান। ফ্যারাডের আন্তরিক বিজ্ঞানানুরাগ বুঝতে ভুল করেন নি ডেভি। তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনের একটি লেবরেটরীতে অ্যাসিষ্ট্যান্টের পদে ফ্যারাডেকে নিয়োগ করেন। এই চাকুরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। ডেভি তখন রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টর। ফ্যারাডেকে চাকুরী দেবার ব্যাপারে তিনি ইনষ্টিটিউসনের একজন কর্মকর্তার মতামত জিজ্ঞাসা করলে কর্মকর্তাটি জবাব দেন—বেশ তো, ওকে শিশি-বোতল পরিষ্কার করবার কাজে নিয়োগ করুন। ছেলেটি রাজী হলে বোঝা যাবে, তার মধ্যে পদার্থ আছে, রাজী না হলে জানবেন—কোন কাজের নয়। ডেভি সেই মত শিশি-বোতল পরিষ্কার করবার কাজে যোগ দেবার জন্যে ফ্যারাডেকে নিয়োগ পত্র পাঠান। ফ্যারাডেও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। পরে ডেভি তাকে অ্যাসিষ্ট্যান্টের পদে উন্নীত করেন।

ফ্যারাডের কাছে বিজ্ঞান-সাধনার সুযোগের দ্বার খুলে গেল। ডেভির কাছে তিনি লাভ করলেন শিক্ষা আর লেবরেটরীতে হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার সুযোগ। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্যে ছিল ফ্যারাডের অসীম

আগ্রহ। আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের নতুন নতুন দ্বার খুলে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

1825 খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর লেবরেটরীর অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। রসায়নের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন অনেক কিছু। সেগুলির কোনটিই ছোট নয় এবং প্রতিটির ব্যবহারিক মূল্যও অপরিমেয়। তবে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। 1820 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অরস্টেড দেখিয়েছিলেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবার সময় কাছে কোন চৌম্বক শলাকা থাকলে তা বিচলিত হয়। অরস্টেডের এই পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ফ্যারাডে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে 1831 খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের মধ্য দিয়েই তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জানা যায়। এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কার বিদ্যুৎকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবার সন্ধান দেয়, আর সেই সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সভ্যতায় বিদ্যুতের অপরিহার্য ভূমিকার সূচনা হয়।

ফ্যারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্র রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে সুদৃঢ় সেতু রচনা করে। এই সূত্রই আবার ধাতুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির সোপান গড়ে তোলে। 1825 খৃষ্টাব্দে তিনি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বেঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার জৈব রসায়নের বিপুল সম্ভাবনাময় অ্যারোম্যাটিক শাখার সূত্রপাত করে। এই আবিষ্কারটি হয় একটু বিচিত্র ধরণে। সে সময় তিমির তেল থেকে পাতনের দ্বারা প্রাপ্ত গ্যাসকে বাড়ীর আলো জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। গ্যাস থাকতো উচ্চ চাপে লোহার পাত্রে। গ্যাস কোম্পানী দেখলেন—শীতকালে এই গ্যাস থেকে খুব উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কোম্পানী ফ্যারাডেকে বলেন। ফ্যারাডে দেখলেন, উচ্চ চাপ আর ঠাণ্ডায় এই গ্যাসের একটি অংশ তরল হয়ে যায়। গ্যাসের এই অংশই আলো-কে উজ্জ্বল করে। শীতকালে এই গ্যাস তরল অবস্থায় থাকবার ফলে ততটা উজ্জ্বল আলো দিতে পারে না। ফ্যারাডে এই তরল অংশকে পৃথক করেন। এটিই হলো জৈব রসায়নের অতি মূল্যবান যৌগ—বেঞ্জিন।

ফ্যারাডের অন্যান্য বহু আবিষ্কারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সঙ্কর-লৌহ প্রস্তুত, বিভিন্ন অপ্‌টিক্যাল কাচ প্রস্তুত, সমতলীয় একমুখী আলোক-রশ্মিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা বিক্ষিপ্তকরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1867 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সাধনায় অন্যতম প্রধান হোতা—সার হামফ্রি ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উমা চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর বয়স

তোমাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়—তোমার বয়স কত? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার জন্ম-তারিখ থেকে প্রশ্নের দিন পর্যন্ত হিসেব করে তোমার বয়সটা বলবে, তাই নয় কি? কারোর বয়স জানতে গেলে তার জন্ম-তারিখটা জানা অত্যাবশ্যক। পৃথিবীরও যদি বয়স নির্ণয় করতে হয়, তাহলে তার জন্ম-তারিখটা অর্থাৎ কবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের জানতে হবে। মহাশূন্যে এই পৃথিবীটার কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন অনুশীলন করেছেন, তেমনি ঠিক কত বছর আগে এই পৃথিবীটা মহাশূন্যে তার নিজের কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে সৌরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তা নিয়েও তাঁরা দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। ভাবতে কেমন লাগে বল তো—আজকের এই শস্য-শ্যামল সুন্দর পৃথিবীটা একদিন শুধু জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডমাত্র ছিল, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার পর তার বুকে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, স্থলভূমি, আরো পরে জীবন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ সুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এক এক করে পদ্ধতিগুলির কথা বলছি।

সমুদ্রের তলদেশে প্রতি বছর পলি জমা হচ্ছে এবং তার ফলে সমুদ্রের তলদেশে পলিস্তরের উচ্চতা প্রতি বছরই মোটামুটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন যদি কোন এক বছরের জমা পলিস্তর এবং সমগ্র পলিস্তরের উচ্চতা মাপা যায়, তাহলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে একটা সংখ্যা খাড়া করা যাবে। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স দু-কোটি পাঁচ লক্ষ বছরের কাছাকাছি বলে জানা গেছে। কিন্তু পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে—কারণ, প্রথম অবস্থায় পলি জমা হওয়া সম্ভব ছিল না এবং ভূত্বকও এই দীর্ঘ সময়ে বহু পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে।

আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে—পৃথিবী প্রতি বছরই তাপ হারাচ্ছে এবং প্রায় নির্দিষ্ট হারেই। বৈজ্ঞানিকেরা কোন এক বছরে পৃথিবী কর্তৃক বর্জিত তাপ এবং সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে বর্জিত তাপের মোট হিসাব করে বলেছেন, পৃথিবীর বয়স চার কোটি বছরের কাছাকাছি। এই হিসাবটিও নির্ভুল নয়; কারণ যে সব কারণে পৃথিবী তাপ হারাচ্ছে, তার সবগুলি কারণ প্রথম অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব কবে থেকে প্রথম সুরু হয়েছিল, জীব-বিজ্ঞানীরা তা গবেষণা করে পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের কাছাকাছি বলে মনে করেন।

স্পষ্টতঃ পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। কারণ পৃথিবী সৃষ্টির বহু বছর পরে পৃথিবীর বুকে জীবন পালিত হবার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

আর একটি পদ্ধতি হলো সমুদ্র কর্তৃক লবণ গ্রহণের গড় হিসাব বের করা। সমুদ্রের গড় লবণাক্ততা হলো 3·5%, এথেকে সমগ্র জলভাগের মোট লবণের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই পরিমাণকে বছরে সমুদ্র কর্তৃক গৃহীত লবণের গড় পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা বারো কোটি বছরের কাছাকাছি। এই পদ্ধতিটিও ত্রুটিযুক্ত, কারণ সমুদ্র কর্তৃক লবণ-গ্রহণ চিরদিন সমহারে হয় নি এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর জলভাগ অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো, তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমন্বিত শিলার পরীক্ষা করা। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ প্রতিনিয়ত আল্‌ফা, বিটা ও গামারশ্মি বিকিরণ করে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করছে। আল্‌ফা কণার ভর হিলিয়াম পরমাণুর ভরের সমান। আল্‌ফা কণাসমূহ নির্গত হবার পর যখন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরমাণুগুলিকে আঘাত করে, তখন আল্‌ফা কণা দুটি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হবার দরুণ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরমাণু থেকে দুটি ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ায় আধান-নিরপেক্ষ হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়। বিটারশ্মি হচ্ছে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার বিকিরণ। গামারশ্মি কিন্তু আধানবিহীন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুরূপ অবিরাম ভাঙ্গনের ফলে হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে পদার্থটি অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ-সমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ধর্মবিহীন সীসায় রূপান্তরিত হয়। হিলিয়াম গ্যাসীয় পদার্থ হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে হারিয়ে যায়, কিন্তু ধাতব অবশেষ সীসা পড়ে থাকে। এক গ্রাম রেডিয়াম 1600 বছর ধরে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের পর ½ গ্রাম রেডিয়াম পড়ে থাকে। এই ভাঙ্গনের হার স্থান-কালের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সময়ে ভাঙ্গনের ফলে ঐ পরিমাণের অর্ধেকে দাঁড়ায়, সেই সময়কে ঐ পদার্থের অর্ধজীবনকাল (Half-life span) বলে। এই অর্ধ-জীবনকাল বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। যেমন—ইউরেনিয়ামের অর্ধ-জীবনকাল 760 কোটি বছর, রেডিয়ামের 1600 বছর, থোরিয়ামের 21,1000 লক্ষ বছর ইত্যাদি। শিলাখণ্ডের বিকিরণের পর অবশিষ্ট ভর এবং উৎপন্ন সীসার ভরের অনুপাত থেকে শিলাখণ্ডটির বয়স প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এভাবে প্রাচীনতম শিলাখণ্ডটির যে বয়স বৈজ্ঞানিকেরা নির্ণয় করেছেন, তা 250 কোটি বছরের কাছাকাছি। এখন এই শিলাখণ্ড সৃষ্টির আগে পৃথিবী প্রথমে জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড এবং পরে

গলিত অবস্থায় ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে, অর্থাৎ শিলার রূপ পেতে আরো 250 কোটি বছর লেগেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। কাজেই এথেকেই পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

টিন

এপর্যন্ত যতগুলি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহারের দিক দিয়ে টিনের গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে টিনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রয়োজন মিটাবার জন্যেই ভারত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, বলিভিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে টিন কিনছে।

টিনের ব্যবহার চতুর্দিকেই পরিব্যাপ্ত। সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতিতে, টিনের প্রলেপ দিতে প্রচুর টিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে ইস্পাতের তৈরী পাত্রের গায়ে খুব পাত্‌লা করে ('01 ইঞ্চি পুরু) টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, টিন তৈরির সময় শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ টিন অবিশুদ্ধতার (Scrap) জন্যে বাদ যায়। এই পরিমাণ টিনকে কাজে লাগাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তাই তৎপর হয়েছেন। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে Detinning-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পরিত্যক্ত ইস্পাত কণার রূপান্তরও সাধিত হয় এই পদ্ধতিতে।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ টন টিন ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এই চাহিদা বাড়তে বাড়তে 1970-71 সাল নাগাদ 5 লক্ষ টনে পৌঁছুবে। এই 5 লক্ষ টন অপরিশুদ্ধ টিন থেকে Detinning পদ্ধতিতে 500 থেকে 750 টন টিন পাওয়া যাবে। এর ফলে দেড় কোটি টাকা থেকে 2½ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে। বৈদেশিক মুদ্রার এই সাশ্রয় নেহাৎ কম কথা নয়। টিন প্রস্তুতিতে ক্ষারীয় রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ আগেকার পদ্ধতির চেয়ে সহজ এবং সুলভ। তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হয়েছে। আর একটি পদ্ধতির (অ্যালকালাইন ইলেকট্রোলাইটিক প্রোসেস) চল আজও পৃথিবীর কোন কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ অত্যন্ত বেশী। ক্লোরিন-পদ্ধতি আজকাল অনুসৃত হয় না ঐ একই কারণে। 1936 সালের আগে পর্যন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যানিক ক্লোরাইডের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে, অথচ ক্লোরিন-পদ্ধতিতে টিন সংগ্রহ করা হতো উৎপন্ন

স্ট্যানিক ক্লোরাইড থেকে। রেয়ন শিল্পে প্রচুর পরিমাণে টিন ক্লোরাইডের প্রয়োজন। আগেই বলেছি, ক্লোরিন-পদ্ধতিতে স্ট্যানিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় অনার্দ্র ক্লোরিন ও টিনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে (50°C-এর নীচের তাপমাত্রায়)। অনার্দ্র ক্লোরিনের সঙ্গে লোহার কোন বিক্রিয়া হয় না।

অ্যালকালি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডার দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। পরিত্যক্ত টিনকে অ্যানোড ও বিশুদ্ধ ইস্পাত-দণ্ডকে ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে টিন স্পঞ্জের আকারে ইস্পাত-ক্যাথোডে জমা হয়। তারপর ঐ টিনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পরিশুদ্ধ টিন পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাত্রের প্রয়োজন এই পদ্ধতিতে। এই পাত্রগুলিতে তড়িৎ-বিশ্লেষণের পর্ব সমাধা হয়। সেই জন্যে এই পদ্ধতি খুবই ব্যয়বহুল।

ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক বলে বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রায় সব দেশেই হয়েছে। টিনের সঙ্গে কষ্টিক সোডার বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম স্ট্যানেট ক্রিস্ট্যাল তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত টিন প্রায় শতকরা 99·95 ভাগ বিশুদ্ধ।

Central Electrochemical Research Institute (C. E. C. R. I.) বর্তমানে একটা নতুন পদ্ধতি (Acid chemical process) বের করেছেন। এই পদ্ধতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির চেয়ে সহজসাধ্য এবং লাভজনক। এই পদ্ধতিতে টিন প্রথমে স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। এই টিনকে পরিশোধন করলেই বিশুদ্ধ (29%) টিন পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত টিন কাজে লাগিয়ে খরচ কমানো সম্ভব এবং অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে অনেক কম সময় লাগে। এই পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি প্রয়োজনীয় প্ল্যাণ্ট তৈরির খরচও কম। কাঁচা ও অপরিশুদ্ধ মালের তো অভাব নেই আমাদের দেশে, কাজেই এগুলির সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টিনের ব্যবহারও বাড়ছে। তাই টিন-শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা ভারতবর্ষের পক্ষে আজ একান্ত দরকার।

চঞ্চলকুমার রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা

তোমরা তো অনেক কিছু নিয়েই খেলা কর। কিন্তু সংখ্যা নিয়ে খেলেছ কখনও? সংখ্যা নিয়ে খেলা—মজাদার তো বটেই, সেই সঙ্গে চমকপ্রদও। বিশ্বাস না হয় তো নীচের উদাহরণগুলি দেখ।

(ক) এমন অনেক সংখ্যা আছে যাদের যোগফল যত, গুণফলও তত।

যেমন ধর : 3 এবং $1\frac{1}{2}$

4 এবং $1\frac{1}{3}$

5 এবং $1\frac{1}{4}$

10 এবং $1\frac{1}{9}$

100 এবং 1

1000 এবং 1_{999}

এদের সবাইর যোগফল যত, গুণফলও তত। বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক কষে দেখ।

(খ) এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল হলো—

11,111,111,111,111,111

সেই সংখ্যা দুটি কি কি জান? আচ্ছা আমি বলি।

2,071,723-কে 5,363,222,357 দিয়ে গুণ করে দেখ তো কি পাও।

(গ) আবার এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল বেশ মজাদার অর্থাৎ 12345678987654321। বল দেখি সংখ্যা দুটি কি কি?

সংখ্যা দুটি হচ্ছে 12345679 এবং 99999999।

(ঘ) 45 সংখ্যাটা বড়ই মজাদার, তা জান কি? কি রকম মজাদার তা নীচের অঙ্কগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে।

যোগ

123456789	যোগ করলে 45 হয়
+ 123456789	
246913578	„ করলেও „ „

বিয়োগ

987654321	যোগ করলে 45 হয়
− 123456789	„ „ „ „
864197532	„ করলেও „ „

গুণ

123456789 যোগ করলে 45 হয়

× 2

246913578 „ করলেও „ „

ভাগ

1234567890 যোগ করলে 45 হয়

1234567890 ÷ 2 = 617283945 যোগ করলেও 45 হয়।

আবার 9876543210 যোগ করলে 45 হয়

9876543210 ÷ 2 = 4938271605 যোগ করলেও 45 হয়

তলায় দাগ দেওয়া ভাগফল দুটি যোগ করলে পাওয়া যায়:

617283945

4938271605

5555555550 যোগ করলেও 45 হয়।

(ঙ) বেশ মজাদার একটি রাশিমালা আছে।

সেই রাশিমালাকে তুমি যে কোন সংখ্যা দিয়েই গুণ করতে পার। গুণফলে কিন্তু রাশিমালার অন্তর্গত সব কয়টি সংখ্যাকেই দেখতে পাবে।

বল দেখি সেই মজাদার রাশিমালাটি কি?

—সেটি হচ্ছে 526, 315, 789, 473, 684, 210।

(চ) 999999-কে 7 দিয়ে গুণ করলে পাবে 142857। 2 থেকে 6-এর মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা দিয়ে 142857-কে গুণ করে দেখ তো কি পাও? প্রতিটি গুণফলের মধ্যেই 1 4 2 8 5 7 সংখ্যা কয়টিকেই খুঁজে পাবে।

বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক কষে দেখ।

শ্রীঅমরনাথ রায়

পলিওয়াটার

জলের অপর নাম জীবন। জল যে আমাদের জীবনে কতখানি পরিব্যাপ্ত, তা কারো অজানা নয়। মানুষের শরীরের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জলের পরিমাণই হচ্ছে শতকরা 90 ভাগ। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর তো তিন ভাগই জল আর মাত্র একভাগ স্থল।

অতি পরিচিত জল ছাড়া আরও এক রকম জলের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন। এই নতুন জলের নাম দেওয়া হয়েছে পলিওয়াটার বা অ্যানোমেলাস ওয়াটার অর্থাৎ অস্বাভাবিক জল।

পলিওয়াটারের কথা প্রথম বলেন রাশিয়ার রসায়নবিদ্ Dr. N. N. Fedyakin এবং Dr. Boris V. Deryagin 1962 সালে। তাঁরা বলেন, পলিওয়াটার জমাট বাঁধে সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী মন্থর গতিতে এবং অনেক বেশী মন্থর গতিতে বাষ্পীভূত হয়। শুধু তাই নয়, এই জল সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী।

এই নতুন জলের সংবাদ স্বভাবতঃই রসায়নবিদ্‌দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। 1969 সালে নিউইয়র্কে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় Prof. E. R. Lippicott, Dr. Gerald এবং আরও কয়েক জন মিলে সব সন্দেহের অবসান ঘটান এবং পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করেন। রাশিয়ার রসায়নবিদ্‌গণ যে পলিওয়াটারের কথা বলছিলেন, তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হলো।

পলিওয়াটারের রাসায়নিক উপাদান কিন্তু সাধারণ জলের মতই। দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক সমন্বয়েই পলিওয়াটার উৎপন্ন হয়। তবে সাধারণ জলের চেয়ে এর কতকগুলি পৃথক ধর্ম আছে—সেগুলি ভারী মজার।

জল 0°সে. তাপমাত্রায় জমে বরফের ক্রিস্ট্যালে পরিণত হয়, কিন্তু পলিওয়াটার −40°সে. তাপমাত্রায় কাচের মত অবস্থায় পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পলিওয়াটারের নির্দিষ্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট নেই। চাপের উপর এবং তাপমাত্রা কি হারে কমছে, তার উপর নির্ভর করে −20°সে. −40°সে. অথবা −100°সে. তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

জল 100°সে. তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়; কিন্তু পলিওয়াটারের তাপমাত্রা 500°সে. পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পলিওয়াটারের ঘনত্ব সাধারণ জলের চেয়ে 40% বেশী। সাধারণ জলের মত 4°সে.-এ পলিওয়াটারের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয় না।

পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতি—কোয়ার্টজের তৈরি কৈশিক নলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করে নলের দু-মুখ বন্ধ করে পরিস্রুত জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। সমস্ত

ব্যবস্থাটার চাপমাত্রা খুব কমিয়ে দিয়ে প্রায় 18 ঘণ্টা ফেলে রাখলে কৈশিক নলে পলিওয়াটার তৈরি হয়। কোয়ার্ট্জ অনুঘটকের কাজ করে। তবে ঠিক কোন্ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পলিওয়াটার পাওয়া গেল, বিজ্ঞানীরা এখনও তা জানতে পারেন নি।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস—হয়তো খনিজ পদার্থের মধ্যে পলিওয়াটারের অস্তিত্ব আছে; কারণ কিছু কিছু কাদামাটির মধ্যে সাধারণের চেয়ে কিছু বেশী ঘনত্বসম্পন্ন জলের অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া গেছে।

মানুষের শারীরিক উপাদানের শতকরা 90 ভাগ জল, তাহলে মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে পলিওয়াটারের প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কতটুকু? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজছেন।

শ্রীসুশীলকুমার নাথ

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। আই. কিউ. বলতে কি বোঝায়?

বিজনবিকাশ নাগ, গোপা নাগ
শ্রীরামপুর, হুগলী।

উঃ—Intelligence Quotient শব্দ দুটির প্রথম অক্ষর নিয়ে আই. কিউ. কথাটি এসেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরীক্ষার মানকে এই শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। কোন জিনিষের ভর, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদির যেমন পরিমাপ করা যায়, বুদ্ধিকেও তেমনি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মাপা যায়। বুদ্ধির সংজ্ঞা কি—এর কোনও নির্দিষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নি। তাই শুধু বুদ্ধি না বলে বিজ্ঞানীরা "সাধারণ বুদ্ধি" কথাটাই বেশী প্রয়োগ করেন এবং তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যাও কল্পনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক লোকের বুদ্ধির পরিমাণকে সাধারণ বুদ্ধি বলা হয়।

সমবয়সী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য থাকে। বুদ্ধির এই তারতম্যকে কল্পনা করেই বুদ্ধির একটা গড় মান ধরা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় সাধারণ বুদ্ধি। এভাবেই কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বোকা বলা হয় এবং বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধিমান বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি মাপবার সময় পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স স্থির করেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। একটি পদ্ধতিতে ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যেই সমবয়সী স্বাভাবিক ছাত্রেরা প্রশ্নগুলির বেশীর ভাগ উত্তর যে দিতে পারে, পরীক্ষকের তা আগে থেকে জানা থাকে। পরীক্ষার্থী কত কম সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার উপর ভিত্তি করেই তার মানসিক বয়স স্থির করা হয়। কারও মানসিক বয়স কুড়ি—এর মানে কুড়ি বছরের সাধারণ ছেলে যে প্রশ্নের উত্তর যে সময়ে দেয়, সেও সেই প্রশ্নের উত্তর প্রায় একই সময়ে দেয়। মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের মধ্যে একটা সম্পর্কের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আই. কিউ. মেপে থাকেন।

$$\text{আই. কিউ.} = 100 \times \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}}$$

স্বাভাবিক ব্যক্তিদের আই. কিউ.-এর মান হয় 100। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যারা খুবই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পর্যায়ে পড়েন অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শিশুর মত, মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় তাদের ইম্বেসাইল (Imbecile) বলা হয়। তাদের আই. কিউ. খুবই কম হয়ে থাকে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের মানসিক বয়স আট, তাদের বলা হয় ইডিয়ট (Idiot)। মানসিক বয়স যাদের বারো, তাদের বলা হয় মোরন (Moron)। এসব ব্যক্তিদের বুদ্ধি ঠিকমত বিকশিত হয় না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি প্রায় কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ে। এই বয়সের মধ্যেই মস্তিষ্ক ঠিকমত বিকশিত হয়ে যায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়তে পারে, কিন্তু আই. কিউ. মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বুদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগ যথাযথ ও সুষ্ঠু হবার জন্যে যে মানসিক ও চারিত্রিক বল, অধ্যবসায় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তা হয়তো পূরণ হয় না—তাই আই. কিউ. অপরিবর্তিত থেকে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 13ই অক্টোবর এক পথ-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং 14ই অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 67 বছর।

ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি বাসভূমি ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায়। তিনি হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ—কলিকাতা

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁকে মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় শিল্প-মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কাউন্সিল অব সোস্যাল অ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং শিশুরাজ্য স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল একটি সাইকোলজি-সেল স্থাপন করেছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি অপরাধ-প্রবণ কিশোরদের চিকিৎসা ও চরিত্র-সংশোধনাগার প্রভৃতিতে কয়েকটি নতুন মনস্তাত্ত্বিক সূত্র চালু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা ছিলেন।

1960 সালে ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি এবং সরকারপুল মানসিক হাসপাতালের সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সাইকোঅ্যানালিসিস-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন—ক্যালকাটা অ্যাসোসিয়েসন ফর মেন্টাল হেল্থ, ইনষ্টিটিউট অব চিলড্রেনস ফিল্ম, প্যাভ্লভ ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ব্রেন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েসন, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল, বোধী পীঠ, জে. বি. এন. এস. টি. এস., কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, বালীগঞ্জ ব্রতী সংঘ, শিক্ষা সমস্যা পত্রিকা প্রভৃতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি 'ছোট গল্প' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বিবিধ

1970 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

1970 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে দু-জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন ফ্রান্সের লুই নীল অপর জন সুইডেনের হানস্ আল্‌ফ্‌ভেন। দু-জনই অধ্যাপক। অধ্যাপক নীলের জন্ম 1904 সালে লিয়ঁতে। অধ্যাপক আল্‌ফ্‌ভেনের বয়স 62।

রসায়নশাস্ত্রে 1970 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসের অধ্যাপক লুই এফ. লেলয়র। এঁর জন্ম হয় 1906 সালে ফ্রান্সে।

1970 সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বৃটেনের স্যার বার্নাড কাট্‌জ, সুইডেনের উল্‌ফ্‌ ফন ইউলার এবং আমেরিকার জুলিয়াস অ্যাক্সেলরড।

চাঁদের মাটি নিয়ে লুনা-16 ফিরে এসেছে

মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মনুষ্যবিহীন চান্দ্রযান লুনা-16 চাঁদের মাটি নিয়ে চব্বিশে সেপ্টেম্বর (1970) সোভিয়েট কাজাখস্তান সাধারণ-তন্ত্রের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করেছে বলে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 'টাস' সংবাদ দিয়েছে। এর আগে কখনও মনুষ্য-বিহীন যানে করে চাঁদ থেকে মাটি আনা হয় নি। লুনা-16 ভূপৃষ্ঠে অবতরণের দু-ঘণ্টা পরে এই খবর ঘোষণা করা হয়েছে।

চাঁদের মাটি নিয়ে চান্দ্রযানটি জেজকাজগান সহরের দক্ষিণ-পূর্বে আশী কিলোমিটার দূরে নেমেছে। চাঁদের মাটি বা চান্দ্র শিলাবাহী মডিউলটিকে প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে দেখা যায়। উদ্ধারকারী দলটির চোখের সামনে ক্যাপসুলটি প্যারাসুটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। তারপর একটি হেলিকপ্‌টারে ওটিকে তুলে নেওয়া হয়। ক্যাপসুলটির উদ্ধারে একটা জটিল চন্দ্রাভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটলো।

লুনা-16-কে গত 13ই সেপ্টেম্বর (1970) উৎক্ষেপণ করা হয়।

চাঁদের শিলা খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত

মস্কো থেকে এ. পি. প্রেরিত এক খবরে জানা যায়, গত 24শে সেপ্টেম্বর লুনা-16 চাঁদ থেকে পৃথিবীতে যে শিলা এনেছে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 3রা অক্টোবর তার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে।

সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাস বলেছে যে, ঐ শিলা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র শস্যদানার মত খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত এবং দেখতে ধূসর বর্ণের। বাইরে থেকে মনে হয় কণিকাগুলির সংযুক্তি খুব ঘন এবং তাদের মধ্যে আসঞ্জন শক্তিও (একত্রে এঁটে থাকবার শক্তি) আছে বেশ।

টাস আরও বলেছে, চাঁদের এই শিলায় যে পরিমাণ গামারশ্মি আছে, তা সাধারণ পরিমাণ—প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থসমন্বিত পৃথিবীর শিলার চেয়ে খুব বেশী নয়।

থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233

বোম্বাই থেকে সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. আই. জানাচ্ছে—ভারত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233-কে আলাদা করে নেবার কৌশল আয়ত্ত করেছে।

বোম্বাইয়ের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জ্বালানী বিভাগের ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা এর ফলে পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বৃহৎ কৃতিত্বের অধিকারী হলেন।

ভারতের কেরল উপকূলে যে পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, পৃথিবীর কোথাও তা নেই। এই বিপুল পরিমাণ থোরিয়ামকে অতঃপর ভারতে পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অতি সহজেই ব্যবহার করা চলবে।

ভাবা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেছেন, পরীক্ষামূলক চেষ্টায় আমরা সামান্ত পরিমাণ থোরিয়াম নিয়ে সাফল্যলাভ করেছি এবং সেটা যে কোন পরিমাণ থোরিয়াম সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে।

জোণ্ড-8 ফিরে এসেছে

রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন জোণ্ড-8 সাত দিনের মহাকাশ পরিক্রমা সেরে 27শে অক্টোবর পৃথিবীতে ফিরে এসেছে বলে টাস জানিয়েছে। গত 24শে অক্টোবর জোণ্ড-8 চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

মস্কোর সময় বিকাল 4-55 মিনিটে মহাকাশযানটি ভারত মহাসাগরের পূর্বনির্ধারিত স্থানে নামে। একটি সোভিয়েট উদ্ধারকারী জাহাজ সাজসরঞ্জামসহ যানটিকে তুলে নেয়।

গত 20 অক্টোবর আরোহীবিহীন জোণ্ড-8-কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

বুধ ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1974 সালে একটি 893 পাউণ্ড (405 কিলোগ্রাম) ওজনের আরোহীবিহীন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করবে, যা শুক্র ও বুধ গ্রহদ্বয়কে অতিক্রম করে যাবে। এই সর্বপ্রথম মানুষ বুধকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখতে পাবে।

একটিমাত্র মহাকাশযানের দুটি গ্রহকে অতিক্রম করবার ঘটনা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই দশকের শেষ দিকে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান কর্তৃক সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলি পরিক্রমার ভূমিকা এটি।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ঘোষণা করেছেন যে, 1973 সালের শরৎকালে একটি ক্যামেরাবাহী ম্যারিনার মহাকাশযান শুক্রগ্রহের দিকে উৎক্ষেপণ করা হবে। মহাকাশযানটি 1974 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ গ্রহটির কাছে যাবে। অতঃপর মহাকাশযানটি বুধের দিকে অগ্রসর হবে। 1974 সালের মার্চ মাসে যানটি বুধের 1000 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে আসবে।

টেলিস্কোপসমন্বিত ক্যামেরার সাহায্যে ম্যারিনার 42 সেকেণ্ড অন্তর একবার করে বুধের আলোকচিত্র গ্রহণ করবে এবং অধিকাংশ ছবিই সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাবে। পৃথিবী থেকে বুধের দূরত্ব 10 কোটি কিলোমিটার।

মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন যে, পৃথিবী থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত চাঁদের ছবি যেমন হয়েছিল, বুধের এই ছবিগুলিও অনুরূপ মানের হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নয়টি গ্রহের মধ্যে বুধ সম্পর্কেই সবচেয়ে কম তথ্য জানা গেছে। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এই গ্রহটি সূর্য থেকে মাত্র 5 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহে উত্তাপ এত বেশী যে, সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই।

ক্যামেরাটি ছাড়া ম্যারিনার মহাকাশযানে বুধের আবহমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, বাসার্ধ এবং এর পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করবার জন্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সন্নিবিষ্ট থাকবে।

কাগজ, আখের ছিবড়া ও তুষ প্রভৃতি থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

সেলুলোজের অকেজো উপাদান বা সেলুলোজ ওয়েষ্ট থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরির একটি

পরীক্ষামূলক কারখানা সম্প্রতি আমেরিকার লুই-জিয়ানা ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারেরা তৈরি করেছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই এই কারখানাটি তৈরি হয়েছে। উদ্ভিদের দেহকোষ সেলুলোজ নামে জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। কাঠের মণ্ড বা গুঁড়া, কাগজের মণ্ড, তুলা, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁশ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাইক্রো-অরগ্যানিজম্ বা অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, সেলুলোজ ওয়েষ্টকে পুষ্টিকর প্রোটিনে পরিণত করে। যেসব বিভিন্ন জীবাণু বিভিন্ন সেলুলোজের মূল উপাদানগুলিকে পৃথক করে, তাদের সন্ধান করবার জন্যে ব্যুরো অব সলিড ওয়েষ্ট নামে একটি সংস্থা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

ব্যুরোর ডিরেক্টর রিচার্ড ডি. ভোগান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের পরিত্যক্ত অংশ ও সহরগুলির আবর্জনা ফেলা—একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল আবর্জনা ও কৃষির পরিত্যক্ত অংশ, যেমন আখের ছিব্ড়া, তুষ প্রভৃতি ও অন্যান্য আবর্জনাকে পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্যে পরিণত করলে এই সমস্যার সম্যক সমাধান তো হবেই, তাছাড়া মানুষ ও পশুর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মেটানোতে বিশেষভাবে সাহায্য করা হবে।

বর্তমানে আখের ছিব্ড়াকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ এদের গুঁড়া করা হয়। তারপর ঐ গুঁড়া জীবাণুযুক্ত করে গাঁজানোর একটি যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়। সেখানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ঐ গুঁড়ার মূল উপাদানগুলিকে পৃথক করে দেয় এবং এর রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়।

ঐ রূপান্তরিত বস্তুতে আছে 1 কোষবিশিষ্ট শতকরা 50 ভাগ প্রোটিন, যা খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং এর রং বাদামী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র, কাষ্ঠখণ্ড, খড় ঘাস এবং ভুট্টাগাছ প্রভৃতি থেকেও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বছরের সমাবর্তন উৎসবে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়কে সম্মানসূচক ডকটরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপক রায়ের অবদানের জন্যে তাঁর স্বীকৃতি বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। এই সম্মানে অধ্যাপক রায়ের গৌরব বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানই বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন-1970

পরিষদ ভবন

29শে সেপ্টেম্বর '70
মঙ্গলবার, 5-30টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 32 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1969-'70 সালের জন্যে পরিষদের বিবিধ কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, গত মে '70 মাসে পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটিভাবে 1969-'70 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। সেই জন্য বর্তমান এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভায় তিনি পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা দান, পাঠাগার ও 'হাতে কলমে বিভাগ' পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যেসব আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

2। হিসাববিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

গত 1969-'70 সালের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন।

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের উক্ত পরীক্ষিত হিসাববিবরণী ও উদ্বৃত্ত পত্র মুদ্রিতাকারে সভ্য-গণের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সাধারণভাবে বিবরণীগুলি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সভ্যগণের দ্বারা সেইগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট পত্র সভ্য-গণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়বরাদ্দ

পরেও উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3। কার্যকরী সমিতি গঠন

বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সদস্যের মনোনয়ন পত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সভ্যরূপে উক্ত তালিকা অনুযায়ী সভ্যগণের নিম্নলিখিত নাম সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়:

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী:

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃসভাপতি—শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সাধারণ সদস্য:

1। শ্রীঅজিতকুমার সাহা
2। শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
3। শ্রীঅমূল্যধন দেব
4। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
5। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
6। শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
7। শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়
8। শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
9। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
10। শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
11। শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
12। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
13। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
14। শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
15। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4। সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচন

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত বর্তমান বছরের (1970-'71) জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচিত হন।

5। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের বর্তমান 1970-71 সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী অ্যাণ্ড গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস গত কয়েক বৎসর যাবৎ যথোচিত দক্ষতার সহিত পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন; অতএব উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান বর্ষের জন্যও পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে অতঃপর উক্ত মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

6। অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্ম নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন—

1। শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

2। শ্রীপ্রফুল্লপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

3। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

4। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত

5। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচ জন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্য বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

7। সভাপতির ভাষণ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় গঠনমূলক কাজের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

পরিষদের কাজকর্মের প্রসারের জন্ম সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ সত্যেন বোস
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্বাঃ জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর

স্বাঃ শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
স্বাঃ শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীপ্রফুল্লপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
স্বাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

জন্ম—7ই নভেম্বর, 1888 মৃত্যু—21শে নভেম্বর, 1970

অধ্যাপক রামনের স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | ডিসেম্বর, 1970 | দ্বাদশ সংখ্যা

মহাজাগতিক রশ্মির আলোকে

হীরেন্দ্রকুমার পাল*

দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো আমাদের চোখের সামনে ছোটখাটো এমন সব ঘটনা ঘটে, যাদের আমরা কোন গুরুত্ব দিই না এবং উপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যেও বিরাট সম্ভাব্যতার বীজ নিহিত থাকতে পারে এবং যথোচিত আকৃতি ও নিষ্ঠাসহকারে অনুধাবন করলে এদের মধ্যেও নতুন আলোকের সন্ধান মিলতে পারে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারও এই পর্যায়ে পড়ে।

স্বর্ণপত্র তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্র (Gold leaf electroscope) নামক একটি যন্ত্র আছে, যা পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত হয়। এতে প্রধানতঃ একখানি হাল্কা স্বর্ণপত্র খাড়া ধাতব শলাকার গায়ে যুক্ত থেকে ঝুলে থাকে। শলাকার মাথায় তড়িৎ-আধান আরোপ করলে তা শলাকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পত্রকে আহিত করে এবং উদ্ভূত বিকর্ষণের ফলে তার যুক্ত প্রান্ত শলাকা থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যায়। প্রদত্ত আধান অথবা তজ্জনিত বিভবের উপর বিচ্যুতির পরিমাণ নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। বায়ু অথবা অন্য কোন গ্যাস পরিবেষ্টিত হয়ে শলাকা ও পত্র একটি কু-সংলগ্ন আধারের ভিতরে অন্তরিত হয় এবং সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। তাই স্বভাবতঃ এই যন্ত্র থেকে তড়িৎ-ক্ষরণের

---

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ; বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এক্স-রে সম্পাতে অথবা অন্য কোন প্রভাবাধীন যন্ত্রের মধ্যস্থিত গ্যাস আয়নিত হলে বিপরীত চিহ্নাত্মক আয়ন আকর্ষণ করে আহিত পত্র ও শলাকা উভয়েই নিস্তড়িৎ হয়ে পড়তে পারে। পত্রখানি তখন পুনরায় এসে মিলিত হবে শলাকার গায়ে, যেমন ছিল অনাহিত অবস্থায়।

আসলে কিন্তু দেখা যায়—প্রত্যক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকেই সে যন্ত্র তার আধান হারাতে থাকে। ঘটনাটি ঘটে এত ধীর গতিতে যে, স্বভাবতঃই তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই এককালে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর ফলেই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, যার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আজ কোন দ্বিমত নেই।

প্রথমে মনে করা হতো, ঐ অভাবিত তড়িৎ-ক্ষরণের মূলে রয়েছে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ছিটাফোঁটা। অথবা এ-ও হতে পারে যে, আবহমণ্ডলে অজানা এবং স্বয়ম্ভু কোন আয়নীভবন-প্রক্রিয়া নিত্যই চলেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে 1910 সালে বৈজ্ঞানিক হেস্-ই সর্বপ্রথম বেলুনের সাহায্যে তড়িৎজ্ঞাপক যন্ত্র উর্ধ্বে পাঠিয়ে লক্ষ্য করেন যে, বেলুন যত উপরে ওঠে, তড়িৎক্ষরণের হারও হয় তত বেশী। কিছুকাল পরে কোল্‌হর্স্টার এই বিষয়টি সমর্থন করেন। তিনি দেখেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ছয় মাইল উর্ধ্বে তড়িৎক্ষরণের হার ভূপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ত্রিশ গুণ অধিক। অতএব একথা পরিষ্কার যে, এই ঘটনার উৎস পার্থিব কিছু নয়। হেস্-এর অনুমান, বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা কোন অজ্ঞাত বিকিরণই এর জন্যে দায়ী। বায়ুস্তম্ভের ভর একই প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট 10 মিটার উঁচু জল কিংবা 1 মিটার পুরু সীসার সমান। কাজেই যে বিকিরণ এই বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে পারে, তার ভেদ-শক্তি যে কি বিপুল, তা সহজেই বোধগম্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 1921 সালে পুনরায় বিজ্ঞানীদের মনোযোগ এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার অধ্যাপক মিলিকান ও তাঁর সহকর্মীরা এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন এবং প্রথমে আঁদে পর্বতগুহায় যন্ত্রপাতি রেখে তাঁরা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্যে পর্বতগুহা নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে যন্ত্র সব দিক থেকেই সুরক্ষিত থাকবে এবং কেবল গুহামুখের ভিতর দিয়েই উর্ধ্বাগত সম্ভাব্য বিকিরণ এসে যন্ত্রে প্রবেশ করবে। এই পরীক্ষা থেকে জানা গেল, যন্ত্রের অভ্যন্তরে আয়নীভবনের মাত্রা বিকিরণের দিক-নির্ভর নয়। দুপুর বেলায় সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে থাকে অথবা মধ্য রাত্রে এই মাত্রা সমান। নক্ষত্রমণ্ডলের 'তল' (Galactic plane) দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য যা-ই হোক না কেন, এই মাত্রার কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য বিকিরণ যে সূর্য অথবা সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আগত নয়, তাও অবধারিত। অন্তরীক্ষের সব দিক থেকেই পৃথিবীর উপর—তার উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে সমভাবে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হচ্ছে এই অজানা বিকিরণ। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় এবং ক্যালি-ফর্ণিয়া ও বলিভিয়ায় তুষার-গলা জলে পূর্ণ যে হ্রদ আছে, তার নীচে নানা স্তরে স্বয়ংলেখ তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্র পাঠিয়ে মিলিকান ও তাঁর সহ-কর্মীরা দেখতে পেলেন যে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতম স্তর থেকে সুরু করে নীচের দিকে আয়নীভবনের মাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এর ফলে আরো বিশদভাবে প্রমাণিত হলো যে, উর্ধ্বাকাশ থেকেই এই রশ্মির আগমন হচ্ছে।

তীব্রতম গামারশ্মির তুলনায় এই রশ্মির ভেদ-

শক্তি প্রায় দশ গুণ অধিক। কাজেই তাকে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের গামারশ্মি বলে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। এই রশ্মিও সুষম (Homogeneous) নয়। এর পরিশোষণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এতে ভেদশক্তির তারতম্যানুযায়ী চার রকম উপাদান আছে। তবে গাণিতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির ফল এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হতে পারে না বলে কার্যক্ষেত্রে এই রশ্মিকে দু-ভাগে বিভক্ত মনে করাই সমীচীন। এক অংশকে বলা হবে শক্ত বা তীক্ষ্ণ এবং অন্য অংশকে বলা হবে নরম। তীক্ষ্ণ বলতে এই বোঝায় যে, তিন মিটার পুরু সীসা ভেদ করলে তার প্রাখর্য কমে মাত্র অর্ধেক, আর নরম বলতে বোঝায় মাত্র দশ সেঃ মিঃ সীসাতেই সে নিঃশেষে পরিশোষিত হয়ে যায়। মহাজাগতিক রশ্মির তীক্ষ্ণতম অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 8×10^{-10} সেঃ মিঃ। এই তরঙ্গ উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, তা 150×10^{6} ভোল্টের মত। এত প্রচণ্ড শক্তি উদ্গীরণ কোন জ্ঞাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব নয়। এমন কি, সর্বাপেক্ষা জোরালো তেজস্ক্রিয় বিভাজন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়েও বহু গুণ বেশী এই শক্তি।

1927 সালে হল্যাণ্ড থেকে সমুদ্রপথে জাভা যাবার কালে ক্লে লক্ষ্য করেন যে, চৌম্বক বিষুবরেখায় বিকিরণের তীব্রতা উত্তর অথবা দক্ষিণের উচ্চ অক্ষাংশ থেকে 10 কি 12 শতাংশ কম। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় অগ্রসর হয়ে অধ্যাপক কম্পটন যে বিশ্ব-পর্যবেক্ষণ অভিযান সংগঠিত করেছিলেন, তাতেও এই বর্ণনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাঁরা আরো দেখেছিলেন যে, একই দ্রাঘিমা বরাবর উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে প্রায় 45° পর্যন্ত বিকিরণ-প্রাখর্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, অতঃপর বিষুব-রেখা অবধি ক্রমশঃ কমে যায়। প্রাখর্যের হ্রাস সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রায় 11 শতাংশ এবং 4360 মিটার ঊর্ধ্বে প্রায় 33 শতাংশ। সমপ্রাখর্যের রেখাগুলি ভূচৌম্বক অক্ষরেখার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। এর কারণ এই হতে পারে যে, নভো-মণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির যাত্রাপথ ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং বিকিরণটি ধনাত্মক কণিকা দিয়ে তৈরি।

প্রাখর্য-বিন্যাসের একটা স্থূল ব্যাখ্যার জন্যে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কাল্পনিক ভূ-চুম্বকের ভ্রামক-মান (Moment) $8{\cdot}1 \times 10^{25}$। তড়িৎ-চৌম্বক একক ধরে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চৌম্বক অক্ষাংশ λ-তে পৌঁছুতে হলে কোন আহিত কণিকার ন্যূনতম শক্তি হওয়া চাই $1{\cdot}9 \times 10^{10}$ $\mathrm{Cos}^{4}\lambda$ ইলেক্ট্রন ভোল্ট। অতএব আপাতদৃষ্টিতে চৌম্বক মেরুতে পৌঁছুতে হলে ঐ কণিকার কোন শক্তি না থাকলেও চলে আর থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু ভূচৌম্বক বিষুবরেখায় পৌঁছুবার জন্যে সে শক্তি কম পক্ষে $1{\cdot}9 \times 10^{10}$ ইঃ ভোঃ (e.v.) হওয়া দরকার। কাজেই আপতিত কণিকাগুলির শক্তির মাত্রা যদি একটা বিশেষ পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে বিষুবরেখার চেয়ে ঊর্ধ্বতর অক্ষরেখার উপরই অধিকতর কণিকা বর্ষণের সম্ভাবনা। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। এই ব্যাপারে আর একটি প্রশ্নও বিবেচ্য। সেটা হলো বায়ুমণ্ডলের দ্বারা ঐ কণিকাগুলির পরিশোষণ। তাই ক্ষীণ শক্তির কণিকাগুলি যদিও তাত্ত্বিকভাবে মেরুতে পৌঁছুবার ক্ষমতা রাখে, তথাপি প্রায় 10 মিটার পুরু জলের সমতুল্য বায়ুমণ্ডলে পরিশোষিত হয়ে সেগুলি পূর্বেই বন্দী হয়ে যেতে পারে। তবু গোটা বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে না পারলেও তার ভিতরে অন্ততঃ কিছুটা অগ্রসর হতে বাধা নেই। এতে বেশ বোঝা যায়, কেন বিকিরণ-প্রাখর্য বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরেই অপেক্ষাকৃত বেশী। যে সব কণিকা ভূচৌম্বক বিষুবরেখার উপর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত এসে পৌঁছয়, সেগুলির শক্তির পরিমাণ গড়ে 3×10^{10} ইঃ ভোঃ বলে জানা

গেছে এবং সেগুলির সংখ্যা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে প্রায়.ছুটি করে।

বিকিরণ-প্রাবর্ধ পরিমাপের জন্যে আয়নী-ভবনের-প্রকোষ্ঠকে সাধারণতঃ অধিক চাপের আর্গন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এতে কণিকাগুলি কোন্ দিক থেকে আসছে, কত সেগুলির সংখ্যা, কি-ই বা সেগুলির সঠিক পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় জানবার সুবিধা নেই। এসব তথ্য জানতে হলে আর একটি পৃথক যন্ত্রের প্রয়োজন। তার নাম গাইগার কাউন্টার (Geiger counter)। এই রকম ছুটি যন্ত্র একই লাইনে এবং অল্প ব্যবধানে স্থাপন করে একটি ভাল্‌ব্‌ পরিবর্ধক বর্তনীর সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।

এরূপ যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে দেখা যায় যে, কোন দিঙ্‌মণ্ডলীয় ভূজকোণের (Azimuth) জন্যে পশ্চিম দিক থেকে আগত কণিকার সংখ্যাই সমধিক। আবার বিষুবরেখার উপর এই আধিক্যের মাত্রা 45° থেকে 60° দিঙ্‌মণ্ডলীয় ভূজকোণের জন্যে সর্বোচ্চ, যা 14 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটিও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যদি অন্ততঃ সরলতার খাতিরেও আমরা ধরে নিই যে, আগন্তুক কণিকাগুলি ধনাত্মক এবং খাড়াভাবে বিষুবরেখার উপর এসে পতিত হচ্ছে। এই জন্যে সেগুলিকে অধোমুখী তড়িৎ-প্রবাহরূপে গণ্য করা যেতে পারে। আবার ভূচুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যথাক্রমে ভৌগোলিক দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত থাকায় অনুভূমিক চৌম্বক বলরেখা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরাভিমুখে প্রসারিত। এমতাবস্থায় উল্লিখিত তড়িৎ-প্রবাহ অনুভূমিক চৌম্বক বলরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করছে। তাতে তড়িৎ-বল-বিজ্ঞানের বিধান অর্থাৎ Fleming's left hand rule অনুযায়ী প্রবাহের গতিপথ পূর্বদিকে বেঁকে যাবে এবং এজন্যে কণিকাগুলি পশ্চিম দিক থেকেই আসছে বলে প্রতীতি জন্মাবে। যেহেতু ধনাত্মক, সেহেতু কণিকাগুলিকে সাধারণতঃ প্রোটন বলেই অনুমান করা হয়, যদিও মতান্তরে আল্‌ফা-কণা অর্থাৎ হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই কথাটা এখানেই বলে রাখা ভাল যে, এই সব কণিকা, যেগুলি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বুকে এসে হানা দিচ্ছে, সেগুলি আদি অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। সেগুলি হচ্ছে বায়ু-কেন্দ্রীনের সঙ্গে আদি কণিকার সংঘর্ষজনিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কণিকা। তাহলেও এগুলির উপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রাথমিক কণিকা সংক্রান্ত বহু খবরও মিলতে পারে। কেন না, গতি-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এগুলি প্রাথমিক কণিকার দিক ধরেই ধাবিত হবে। অধিকন্তু সেগুলির উচ্চ শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে সেগুলির যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য নগণ্য বলে তাতে ভূচৌম্বক-বিচ্যুতি হবে খুব সামান্যই। এমতাবস্থায় এগুলির মধ্যেও আদি কণিকার পূর্ব-পশ্চিম বৈসাদৃশ্য (East-west assymetry) অব্যাহত থাকবে।

উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ কণিকাগুলির অনুসৃত পথ দৃষ্টিগোচর করে তোলা যায়। এর পিছনে যে নীতিটি সক্রিয়, সেটি হচ্ছে—এই পথের উপরে উৎপন্ন আয়নের গায়ে জলীয় বাষ্প তরলীভূত হয়ে যে বারিবিন্দু সৃষ্টি করে, সেগুলিরই পর পর সজ্জিত চিহ্নগুলি ফটোপ্লেটে অঙ্কিত হয়ে অনুসৃত পথের নিশানা দেয়। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট গাইগার কাউন্টার ও মেঘ-প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে এমন এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যাতে অনায়াসে অত্যল্প কালের মধ্যেই নির্ভুলভাবে কণিকাগুলির ক্রান্তিপথ ফটোপ্লেটে বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে তোলা ছবি থেকে সংশ্লিষ্ট কণিকার পরিচয় উদ্ধার করা অতটা

সহজ নয়। কেন নয় এবং কি তার প্রতিকার, নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

যদিও তেজস্ক্রিয় পদার্থ-নিঃসৃত বিকিরণের ক্ষেত্রে এই ছবি থেকে আল্‌ফা কণা, প্রোটন ও ইলেকট্রনের পথাঙ্কের পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হয় না—যেহেতু, তৎসংশ্লিষ্ট আয়নীভবনের ঘনত্ব (অর্থাৎ প্রাচুর্য) মোটেই এক নয়, তথাপি মহাজাগতিক রশ্মি-নিহিত কণিকা সম্পর্কে এই বিচার-পদ্ধতি খাটে না। কারণ, এই কণিকাগুলি এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী যে, আয়নীভবনের ঘনত্ব মুখ্যতঃ সেগুলির গতিবেগ এবং আধান-মাত্রার উপরই নির্ভর করে। অতএব বিপুল, সমান বেগে ধাবিত প্রোটন ও ইলেকট্রন-সঞ্জাত এই ঘনত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য হবার কথা নয়। এমতাবস্থায় অতি ক্ষিপ্রগতির কণিকাকে সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে হলে অধিকতর তথ্যের প্রয়োজন।

সে তথ্য মিলবে জ্ঞাত মানের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে আলোচ্য কণিকার ক্রান্তিপথে যে বক্রতা উৎপন্ন হয়, তার পরিমাপ থেকে। চৌম্বক ক্ষেত্র যত জোরদার হবে, বক্রতাও হবে তত বেশী। হরেক রকম পরিচিত কণিকার জন্যে বিভিন্ন শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রজনিত বক্রতা এবং সংশ্লিষ্ট আয়ন-ঘনত্ব পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে লেখচিত্রের সাহায্যে অজ্ঞাত কণিকাকে সনাক্ত করতে হয়; এছাড়া উপায়ান্তর নেই।

এভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্থলেই এই সব কণিকা 10^{11} ইঃ ভোঃ-প্রমাণ শক্তির ইলেকট্রন ছাড়া অন্য কিছু নয়, যদিও মাঝেমধ্যে ছবিতে দু-একটা প্রোটন-পথও ধরা পড়েছে। তবে শেষোক্তটি খুবই দুর্লভ, ঘটনা প্রতি দু-হাজার ইলেকট্রনে একটি মাত্র প্রোটন—এই অনুপাতে। এই প্রোটন হয়তো মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা মেঘ-প্রকোষ্ঠের সন্নিকটে কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলেই উদ্ভূত।

1933 সালে অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন সর্বপ্রথম মেঘ-প্রকোষ্ঠের ফটোগ্রাফে যুগ্ম পথাঙ্ক লক্ষ্য করেন। প্রতিটি যুগ্ম রেখা যেন প্রকোষ্ঠের ভিতরে অথবা তার নিকটে একই উৎস-বিন্দু থেকে নির্গত। রেখাদ্বয়ে আয়ন-প্রাচুর্য সমান। চৌম্বক-বক্রতাও তাই, কিন্তু বিপরীতমুখী। এই ধরণের সমান বক্রতা থেকে সংশ্লিষ্ট পথচারীদ্বয়ের আধানমাত্রাও যে সমান, সেই ইঙ্গিতই বহন করে। কিন্তু বিপরীত বক্রতা থেকে দুটি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে; যথা—(1) যদি উভয় পথচারী একই উৎস-বিন্দু থেকে রওনা হয়, তাহলে তাদের আধান হবে বিপরীত চিহ্নাত্মক, আর (2) যদি কোন বিশেষ এবং দুর্বোধ্য যোগাযোগের ফলে তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তাদের আধান হবে সমচিহ্নাত্মক। সিদ্ধান্ত দুটির কোন্‌টি এস্থলে গ্রহণীয়, তা নির্ণয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা বাহুল্য, অ্যাণ্ডারসন নিজেই অগ্রণী হয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এর জন্যে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা হচ্ছে—প্রকোষ্ঠের ভিতর কণিকা দুটির পথিমধ্যে 6 মিলিমিটার পুরু একখণ্ড সীসার ফলক স্থাপন করে পূর্ব ব্যবস্থাপনাতেই তিনি পুনরায় ছবি তোলেন। এবারে দেখা গেল, ফলকের পশ্চাদ্দিকে উভয় রেখারই বক্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যায় প্রথম সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করতে হয়। কেন না, তাহলে ফলকের ভিতরে পরিশোষণের ফলে উভয় পথচারীরই গতিবেগ পশ্চাদ্দিকে হ্রাস পাবে, আর এটাই হবে বক্রতা বৃদ্ধির হেতু।

অতএব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো যে, কণিকাযুগল একই উৎস-সম্ভূত এবং তন্মধ্যে একটি ধনাহিত, অন্যটি ঋণাহিত। অধিকন্তু, ধনাহিতটি যে প্রোটন নয়, তাও বোঝা গেল ছবিতে তার গতিবেগের বহর দেখে। পক্ষান্তরে এই উত্তাল গতিবেগ ইলেকট্রন-ভরের স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

উপরিউক্ত বৃত্তান্ত থেকে এই সিদ্ধান্তও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে যে, এখন আমরা একটি নতুন কণিকার সন্ধান পেয়েছি, যা ধনাহিত এবং যাকে ইলেকট্রনের প্রতিচ্ছায়া মনে করা যেতে পারে। এই ধনাহিত ইলেকট্রনের নাম হলো পজিট্রন। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের আধান/ভর (e/m) অনুপাত এবং ভরও অভিন্ন।

মনে এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে, এই যমক কণিকার জন্ম হলো কোথায় এবং কিভাবে? আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত ভর-শক্তি সমতুল্যতা নীতির (Equivalence of mass and energy) পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের একটা সুন্দর জবাব মিলে। এই নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ভর $\cdot5\times10^6$ ইঃ ভোঃ শক্তির সমতুল্য। অতএব শক্তির বিনিময়ে এগুলির সৃষ্টি সম্ভব। যেহেতু নিস্তড়িৎ কোন কিছু থেকে ঋণাধান নিষ্কাশিত করতে হলে সমপরিমাণ ধনাধানের আবির্ভাব অপরিহার্য, সেহেতু শক্তির জঠর থেকেও ইলেকট্রন ও পজিট্রন যুগপৎ জন্মলাভ করতে পারে। আর যে পরিমাণ শক্তির বিনিময়ে এই রূপান্তর সংঘটিত হবে, তার ন্যূনতম পরিমাণ হলো $2\times\cdot5\times10^6 = 10^6$ ইঃ ভোঃ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এক নিগূঢ় তত্ত্বের পরিকল্পনায় ডিরাক এই জাতীয় যুগ্মকণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বাহ্লেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অ্যাণ্ডারসনের গবেষণা এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিমূর্ত করে তুললো।

অতএব দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত ব্যবস্থায় 10^6 ইঃ ভোঃ অথবা ততোধিক শক্তিসম্পন্ন ফটোন পরিশোষণের ফলে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল জন্মাতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী ফটোন মহাজাগতিক রশ্মি ভিন্ন অন্য কিছু থেকে সচরাচর লভ্য নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে থোরিয়াম-C''- থেকে উদ্ভূত গামারশ্মির নাম করা যেতে পারে। বস্তুতঃ স্ফাড্উইক, ব্ল্যাকেট এবং ওকচিয়ালিনি এই কণিকাযুগল সৃষ্টির চেষ্টায় থোরিয়াম-C'' ব্যবহার করে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অধুনা কতিপয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও পজিট্রন পাওয়া যাচ্ছে বলে সংবাদ আছে।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের তড়িতাধান বিসদৃশ বলে একে অন্যকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে যে মিলন বা সংঘর্ষ ঘটবে, তাতে উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তখন তাদের ভরের দশা কি হবে? বিজ্ঞানী বলেন, সে ভরের বিনিময়ে দেখা দিবে ফটোন অর্থাৎ বিকিরণরূপী শক্তি। এই কারণে সাধারণ ঘনত্ব-বিশিষ্ট পদার্থেও পজিট্রনের জীবনকাল নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। যমজ ইলেকট্রন-পজিট্রনের আবির্ভাব ও বিলয়—উভয়েই কল্পনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে অধুনা পরীক্ষাগারে নিরীক্ষণসাধ্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্বের শিক্ষা এই যে, পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হলে চলন্ত ইলেকট্রন (অথবা পজিট্রন) তার শক্তি কিছুটা হারিয়ে ফেলে এবং হৃতশক্তির কিয়দংশ আত্মপ্রকাশ করে এক্স-রে-রূপী বিকিরণের মধ্য দিয়ে। দেখা গেছে, ইলেকট্রনের শক্তি $1\cdot5\times10^8$ ইঃ ভোঃ-এর বেশী হলে তার অপচিত শক্তির অধিকাংশই এভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভেদ-শক্তিও বাড়বে। মনে রাখা দরকার, এই ভেদ-শক্তির একটা সর্বোচ্চ সীমা আছে এবং সে সীমা 10 সেঃ মিঃ সীসা দিয়ে সূচিতব্য। যেহেতু গোটা বায়ুমণ্ডল প্রায় 100 সেঃ মিঃ সীসার তুল্য, সেহেতু সহজেই বোঝা যায় যে, মেঘ-প্রকোষ্ঠের ফটোগ্রাফে আমরা যে সকল ইলেকট্রনের সাক্ষাৎ পাই, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের

ভিতরে ভূপৃষ্ঠের অনতিদূরে অর্থাৎ সামান্য কয়েক মাইলের মধ্যেই উৎপন্ন হয়েছে।

এবার আমরা মহাজাগতিক রশ্মির ধারাবর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ধরা যাক, প্রচুর শক্তি নিয়ে কোন ইলেকট্রন আবহমণ্ডলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। এমতাবস্থায় বায়ু-কণার সঙ্গে সংঘর্ষে সেটির শক্তি দ্রুত ক্ষয়িত হয়ে তার বদলে কতিপয় শক্তিশালী ফটোনের সৃষ্টি করবে। এগুলি আবার পদার্থের কেন্দ্রীনে উপস্থিত হলে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে। এই যুগলের শক্তির মাত্রাও বিপুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ফলে বায়ুকণা থেকে প্রতিহত হয়ে সেগুলি উভয়েই পৃথকভাবে আরও ফটোনের সৃষ্টি করবে। প্রক্রিয়াটি পুনঃ পুনঃ চক্রাকারে চলবে এবং তাতে ইলেকট্রন, পজিট্রন ও ফটোন কণিকাত্রয়ের দ্রুত বংশবিস্তার ঘটতে থাকবে। পরিশেষে যখন এই লক্ষ লক্ষ কণিকা ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীতে নেমে আসবে, তখন একমাত্র প্রবল বৃষ্টিধারার সঙ্গেই সেগুলির তুলনা করা চলবে। এরই নাম ধারাবর্ষণ। নিঃসন্দেহে, এই ঘটনা এক বিরাট শক্তির প্রকাশ। এই ধারাবর্ষণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের। কেউ কেউ একে বিস্ফোটন (Burst) আখ্যাও দিয়ে থাকেন। মহাজাগতিক রশ্মির অপেক্ষাকৃত নরম অংশটি সম্ভবতঃ উল্লিখিত তিন রকমের কণিকার সাহায্যেই গঠিত এবং মেঘ-প্রকোষ্ঠের ছবিতে এদেরই পথচিহ্ন বিধৃত হয়। ধারাবর্ষণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ঊর্ধ্বতম সীমায় আরোহণ করবার পর পুনরায় কমতে শুরু করে।

আউগের এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রায় 25 একর জায়গা জুড়ে বহু গাইগার কাউন্টার সন্নিবেশিত করে সেগুলির সাহায্যে যুগপৎ ধারাবর্ষণের প্রকৃতি অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, প্রতি বর্গগজের উপর এই কণিকা-বর্ষণের সংখ্যা হয় প্রায় 25। তার মানে, প্রায় 10 লক্ষ কণিকা এসে পৃথিবীর বুকে একই সঙ্গে হানা দিচ্ছে। হাইসেনবার্গ মনে করেন, এই সব শক্তিশালী বিস্ফোটনের মূলে রয়েছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং সেই বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে দুর্দান্ত শক্তির বাহক কোন কণিকা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মির একটা শক্ত অংশও আছে, যা জলের 240 মিটার অবধি ভেদ করতে সক্ষম। তাই সে অংশ ইলেকট্রন কিংবা ফটোন দিয়ে গঠিত হতে পারে না—এমন কি, প্রোটন দিয়েও নয়। এহেন ভেদশক্তির জন্যে সেগুলির শক্তির মাত্রা এতই বিরাট (বিগ্‌ট) হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে কল্পনাও হার মানবে। হিসাবে দেখা যায়, এর সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্যে চাই এমন এক কণিকা, যার ভর হবে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি। এই কণিকার নাম মেসন। কিন্তু গবেষণাগারে সে ছিল তখনো অজ্ঞাত।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের অবতারণা এখানে এসে পড়ে। সর্বাধুনিক তত্ত্বানুযায়ী পরমাণু কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে রয়েছে কিছু ধনাত্মক প্রোটন ও কিছু নিস্তড়িৎ নিউট্রন। এগুলিকে একত্রে ধরে রাখবার জন্যে এমন একটি আকর্ষণ বলের দরকার, যা প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণকেও পরাভূত করবে। কিন্তু কিভাবে উৎপন্ন হয় সে বল? ঝানু ঝানু তাত্ত্বিকেরা এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। যুকাওয়ার অনুমান হচ্ছে, উল্লিখিত মেসনও কেন্দ্রীনেরই বাসিন্দা এবং সেগুলি ঘন ঘন প্রোটনের অভ্যন্তর থেকে নিউট্রনের অভ্যন্তরে অথবা এর বিপরীত দিকে যাওয়া-আসা করে। এতে প্রোটন নিউট্রনে এবং নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। আবার প্রোটন থেকে প্রোটনে অথবা নিউট্রন

থেকে নিউট্রনেও (নিস্তড়িৎ) মেসনের আনা-গোনা চলে রূপান্তর ছাড়াই। আন্তঃকেন্দ্রীন কণাগুলির মধ্যে এই জাতীয় মেসন-বিনিময়ের ফলেই উদ্ভূত হয় সেই ঈপ্সিত আকর্ষণ, যা বিনিময় বল নামে খ্যাত।

বহু চেষ্টার পর আজ গবেষণাগারে মেসনের সাক্ষাৎ মিলেছে। অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন এবং আরো কয়েক জন বিজ্ঞানী মহাজাগতিক রশ্মির মেঘ-প্রকোষ্ঠ ফটোগ্রাফে মেসনের পথচিহ্ন আবিষ্কারে কৃতকার্য হয়েছেন। অধিকন্তু মাপজোখের দ্বারা এটাও তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, মেসন-কণিকা ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুই শত গুণ ভারী। অবশ্য এই মানের অল্পবিস্তর হেরফেরও হয়ে থাকে। কারো কারো মতে, এই তারতম্য দেখে সন্দিগ্ধ বা বিস্মিত হবার কিছু নেই—কেন না, সেই ভর নির্ভর করে কেন্দ্রীনের রূপান্তরের নমুনা বা ধরণের উপর। ভরের তারতম্য সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, মেসনের আধান-মাত্রা সর্বদাই অভিন্ন। সে মাত্রা হয় ইলেকট্রন-আধানের সমান, নয়তো 0। আধান থাকলে তা ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক দুই-ই হতে পারে। মেসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মুক্তাকাশেও সে অস্থায়ী ও ভঙ্গুর; তাই অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশ্লিষ্ট হয়ে ইলেকট্রন অথবা পজিট্রনে পরিণত হয়। কিন্তু ভরবেগ এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে দ্বিতীয় একটি নিস্তড়িৎ কণিকাও ইলেকট্রনের সহজাত হওয়া দরকার—এটাই তত্ত্বের দাবী। এই আগন্তুকের নাম নিউট্রিনো। বীক্ষণাগারে আজ পর্যন্ত সেটি ধরা দেয় নি। ভবিষ্যতেও হয়তো দেবে না।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বীটারশ্মি নির্গমনের ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা মেসন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে গেছে। এখন এই কথাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বীটাকণিকার আদি রূপ হচ্ছে এই মেসন। কেন্দ্রীন-বিভাজনের সময় মেসনই সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করে নির্গত হয় এবং পরে সে বীটাকণিকা (ইলেকট্রন) ও নিউট্রিনোতে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন ঐ দুটি কণিকা নিজেদের মধ্যে সে শক্তি ভাগাভাগি করে নেয়। আরো জানা গেছে, অস্থায়ী মেসনের গড় পরমায়ু এক সেকেণ্ডের পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আবহমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরে যদি 10^{10} ইঃ ভোঃ শক্তি নিয়ে কোন মেসন বিমুক্ত হয়, তাহলে তার পক্ষে নীচের বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্পষ্টতঃই সে প্রাথমিক পর্যায়ের কথা হতে পারে না। তাহলে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মেসন সৃষ্টির মূলে কি ব্যবস্থা সক্রিয়? যতদূর বোঝা যায়, ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই যে, ঊর্ধ্ব স্তরে বায়ু-কেন্দ্রীনের সঙ্গে বহিরাগত প্রাথমিক বিকিরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রোটন এবং ভারী কেন্দ্রীনগুলির সংঘর্ষের ফলেই কেন্দ্রীন ভেঙে গিয়ে প্রথমে মুক্তি লাভ করে মেসন এবং পরে তাথেকে ইলেকট্রন উপজাত হয়। কিন্তু প্রোটনও ঐ মেসনের সঙ্গী হতে পারে। তখন মেসন স্বয়ং অথবা প্রোটনসহ মহাজাগতিক রশ্মির তীব্র অংশ উৎপাদন করবে আর কোমল অংশটি গঠিত হবে—পূর্বেই বলা হয়েছে—মেসন-সম্ভূত ইলেকট্রন যে ধারাবর্ষণ উৎসারিত করে, তার মাধ্যমে।

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনাকে ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা আজ বিশ্বরহস্যের এক পরম বিস্ময়ের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অবিরত চলেছে যে উদ্দাম শক্তির উদ্গীরণ, কি তার হেতু, কোথায় তার উৎস? এই ভেবে বিজ্ঞানীরা আকুল। সত্য কথা বলতে গেলে, এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি কিছু হতে পারে নি। তবে জল্পনা-

কল্পনারও অন্ত নেই। অধ্যাপক মিলিকান বলেন, মহাশূন্যে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার মিলনে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণু নিত্য নূতন গঠিত হচ্ছে এবং তাতে যে ভর-হ্রাসের উদ্ভব হয়, তা-ই আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত সূত্রানুযায়ী ($E=mc^2$) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক এডিংটন ও অধ্যাপক জীন্স মনে করতেন যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সংস্পর্শের ফলে প্রোটনের বিনাশ ঘটছে এবং তার সমুদয় ভরই শক্তিরূপে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মির ভিতর দিয়ে। মতান্তরে, বিশ্ব-সৃষ্টির গোড়ার দিকে পদার্থজগতের নিয়ম ও সূত্রাদি অন্য রূপ ছিল এবং তখনই এই রশ্মির জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তারপর থেকে এযাবৎ সে আবদ্ধ বিশ্বের অভ্যন্তরে শুধু পরিভ্রমণ করেই চলেছে। রাশিয়ান পদার্থবিদ্ গুইন্সবার্গের ধারণা হলো—প্রাথমিক মহাজাগতিক কণিকা সঞ্জাত হচ্ছে, তারকামণ্ডলীর অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীনবিস্ফোরণের ফলে। অতএব এগুলি নাক্ষত্রধূলি ছাড়া কিছুই নয়; আর এই প্রক্রিয়াতেই নক্ষত্রসমূহের বিয়োজন, বিভাজন ও বিধ্বংসলীলাও সংঘটিত হচ্ছে মহাবিশ্বে।

কৃষি-সমস্যার সমাধানে সংশ্লেষিত উদ্ভিদ-হর্মোনের ভূমিকা

মনোজকুমার সাধু*

বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলির চরম লক্ষ্য হলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। উন্নত ধরণের বীজ, পর্যাপ্ত সার ও জল সরবরাহ, কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি শস্য ফলনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করলেও কতকগুলি সমস্যা এখনও কৃষকদের বিশেষভাবে বিব্রত করে থাকে। তবে ইতিমধ্যে কয়েকটি আশ্চর্যজনক রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কারের ফলে কৃষির ঐ সব জটিল সমস্যা সমাধানের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে প্রায় 40 বছর পূর্বে অক্সিন নামে যে উদ্ভিদ-হর্মোন আবিষ্কৃত হয়, তা আজ কতকগুলি ফসলের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক অক্সিনের মধ্যে ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA) প্রধান এবং প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তথাপি কৃষি-সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অক্সিনের ব্যবহারই সর্বাধিক; কারণ উদ্ভিদের উপর এর প্রভাব বিচিত্র ও অতুলনীয়। অক্সিনের বহুমুখী কর্মক্ষমতা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে বিশদ গবেষণা সুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা এর ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। অক্সিন ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো এই যে, খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করলেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। নীচে কৃষি-সমস্যা ও তার সমাধানে অক্সিনের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

আনারস, লেচু ও বাঁধাকপির গাছে ফুল নিয়ন্ত্রণ—আনারস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলগুলির মধ্যে অন্যতম। আনারস চাষের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, সব গাছে একই সঙ্গে ফুল ধরে না, যার জন্যে আনারসের ক্ষেত থেকে বার বার ফল তোলবার ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম দুনিয়ার প্রগতিশীল দেশগুলিতে

*কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ন্যাপথলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) নামে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত একটি উদ্ভিদ-হর্মোনের ব্যবহারের ফলে বছরের যে কোন সময়ে সব গাছে একই সঙ্গে ফল ধরানো সম্ভব হচ্ছে। একর প্রতি মাত্র 25 গ্র্যাম NAA প্রয়োগ করলেই এই আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়।

আবার কতকগুলি ফসল, যেমন—সেলারি ও বাঁধাকপির গাছে তাড়াতাড়ি ফুল আসা কাম্য নয়। আল্‌ফা ক্লোরোফেনোক্সি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড নামে আর একটি অক্সিনের 100 ppm জলীয় দ্রবণ গাছে স্প্রে করলে অসময়ে ফুল আসা বন্ধ হয়। গাছে ফুল ধরা নিয়ন্ত্রণে অক্সিনের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে এবং এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি।

অনুপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে টোম্যাটো চাষ—শীতপ্রধান দেশে শীতকালে টোম্যাটো চাষ করা বেশ কঠিন। টোম্যাটো গাছের বৃদ্ধি ও ফলন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা দিনের দৈর্ঘ্য কম হলে ফুলের আভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন হয়, পরাগ উৎপাদন হ্রাস পায় ও পরিণামে পরাগ-সংযোগ ব্যাহত হয়। আবার পরাগ-সংযোগ হলেও অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে অনেক সময় পরাগ-নালীকার বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় গর্ভকোষের মধ্যস্থিত ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় না। গর্ভকোষের অক্সিন ফলের প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্যে যথেষ্ট হলেও পরবর্তী বৃদ্ধির পক্ষে অপ্রতুল। নিষিক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর মধ্যে অক্সিন প্রস্তুত হতে থাকে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ফলের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিন সরবরাহ করে এবং ফলটি স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে। কিন্তু অনিষিক্ত ডিম্বাণুর অক্সিন প্রস্তুতির স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকায় গর্ভকোষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ফলটি ছোট অবস্থায় শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এই সমস্যাটি আজ আধুনিক কৃষকদের আর বিব্রত করতে পারে না। বিটা-ন্যাপথক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (β-Napthoxy acetic acid—50 ppm), অথবা প্যারাক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (15 ppm) অথবা ∝-o-chloraphenoxy propionic acid (40 ppm)-এর জলীয় দ্রবণ সময়মত স্প্রে করলে অনুপযুক্ত পরিবেশেও গাছে ফুল ও ফল ধরে।

আবার ঐ সব দেশে বিরাটকায় কাচের ঘরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টোম্যাটো চাষ করে উপরিউক্ত সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টাও চলছে। অবশ্য এই সঙ্গে অন্য আর একটি সমস্যা আবির্ভূত হয়েছে, তা হলো কাচের ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল না থাকায় এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভমুখে পতিত হবার (Cross pollination) সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। পরাগ-সংযোগ ব্যতিরেকে সাধারণতঃ গাছে ফল ধরে না বা ফল ধরলেও বীজের অত্যল্পতাহেতু ফলের আকার অত্যন্ত ছোট হয়। এই ক্ষেত্রেও অক্সিন ব্যবহার করে বিনা পরাগ-সংযোগে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজহীন ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

গাছ থেকে অকালে ফলের পতন রোধ—আপেল, ন্যাসপাতি, অ্যাপ্রিকট ও লেবু বাগানের অন্যতম মুখ্য সমস্যা হলো এই যে, সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হবার পূর্বেই বেশ কিছু ফল গাছ থেকে ঝরে যায়। অনেক সময় 30-50 ভাগ ফল অসময়ে ঝরে যাওয়ায় ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গাছ থেকে ফল ঝরে যাবার সময় দেখা যায় যে, গাছের শাখার সঙ্গে ফলের বোঁটা যেখানে সংযুক্ত থাকে, সেখানে অ্যাবসিসন স্তর (Abscission layer) নামে একটি কোষস্তরের সৃষ্টি হয়। ঐ স্তরটি অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় কোষের সমষ্টি এবং কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত আলগাভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, যার ফলে বায়ু-

প্রবাহের বেগ প্রবল হলে অথবা অনেক সময় আপনার ভারে ফলগুলি সহজেই স্থানচ্যুত হয়। এই অ্যাবসিসন স্তরের সৃষ্টি, ফল ও শাখার অক্সিনের পরিমাণের তারসাম্যের উপর নির্ভর করে। কোন কারণে (যেমন, ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে বা নিষিক্ত ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে গেলে বা ত্রুটি পূর্ণাঙ্গ বীজে পরিণত হলে) ফলের মধ্যে অক্সিনের পরিমাণ কমে গেলে অ্যাবসিসন স্তরের সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয় এবং অবশেষে ফলটি ঝরে পড়ে। সিন্থেটিক অর্থাৎ সংশ্লেষিত অক্সিন 2, 4, 5—ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (245—T) বা 2, 4, 5—ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (2, 4, 5-TP) একর প্রতি 48 গ্রাম হিসাবে প্রয়োগ করলে অকালে ফলের পতন রোধ হওয়া ছাড়াও ফলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, আকার বৃদ্ধি পায় এবং ফলের রং ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ফলের সংখ্যা হ্রাস—অকালে ফল ঝরে যাওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি কোন কোন গাছে অতিরিক্ত ফল ধরাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ—(1) অতিরিক্ত ফল ধরলে ফলের আকার হ্রাস পায় ও উৎকর্ষের অবনতি ঘটে, (2) আপেল, অলিভ ইত্যাদি গাছে কোন এক বছর অতিরিক্ত ফল ধরলে পরবর্তী বছরে মোটেই ফল ধরে না বা অত্যন্ত কম ফল ধরে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছোট থাকাকালীন কিছু কিছু ফল হাত দিয়ে তুলে ফেলে উপরিউক্ত সমস্যাটির মোকবিলা করা হতো। এই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে বর্তমানে আপেল ও ন্যাসপাতি গাছে ন্যাপ্‌থ্যালিন্ অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) ও ন্যাপ্‌থ্যালিন অ্যাসিটামাইড স্প্রে করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

শস্যক্ষেত্রে আগাছা দমন—শস্যের অন্যতম প্রধান শত্রু হচ্ছে আগাছা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—1। এটি শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান ও জল শোষণ করে, 2। শস্যক্ষেত্রে ছায়া সৃষ্টি করে, 3। নানান ধরণের রোগ ও পোকামাকড়কে আশ্রয় দেয়, 4। অনেক সময় মূল থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ নিঃসৃত করে। ঠিক সময় আগাছা দমন করলে ফলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ হাত দিয়ে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা দমন করা হলেও অক্সিনের দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই বিষয়ে 2, 4-ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (2, 4-D) ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। আগাছা নিয়ন্ত্রণে 2, 4-D-এর একটি বিশেষ নির্বাচনী ক্ষমতা রয়েছে, যার জন্যে এর প্রয়োগে সরু পাতার গাছ, যেমন—ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু চওড়া পাতার গাছ সহজেই আক্রান্ত হয়। 2,4-D-র আগাছা নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বহুল প্রচলিত অভিমত হলো—1। এটি উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার গতি অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়, ফলে উদ্ভিদ-কোষে শর্করাজাতীয় খাদ্য সঞ্চয়ের ঘাটতি হয়ে পড়ে 2। এই পদার্থটি দ্বিবীজপত্রী গাছের ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর অনিয়মিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করায় ফ্লোয়েম টিস্যু নষ্ট হয়ে যায়, 3। এটি কোষের প্রোটিন বস্তুর অহেতুক বিশ্লেষণে সহায়তা করে, ফলে সাইটোপ্লাজমের ঘনত্বের হেরফের হয় এবং প্রয়োজনীয় এন্‌জাইম ধ্বংস হয়ে যায় বা এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং 4। এটি উদ্ভিদের দেহে পটাসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ায় বাধা দেয় এবং বিশৃঙ্খল বিপাকক্রিয়ার জন্যে বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এযাবৎ সংগৃহীত তথ্য থেকে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণগুলি একক বা সম্মিলিতভাবে 2,4-D-এর আগাছা দমন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা আবার উদ্ভিদের প্রকার ভেদ, এর বয়স, অক্সিন প্রয়োগের

মাত্রা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

শাখা কলমের দ্বারা গাছের সংখ্যা-বৃদ্ধি—গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রধানতঃ বীজের দ্বারা হয়। তবে এর একটা অসুবিধা হলো এই যে, বীজ থেকে উদ্ভূত গাছটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মদাতা গাছের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। বীজ ছাড়া গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধির সহজতম উপায় হলো কলমের সাহায্য নেওয়া। তবে কিছু কিছু গাছের কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। উদ্যান-বিশারদগণই ইণ্ডোল বিউটিরিক অ্যাসিড (Indole butyric acid) ও ন্যাপথ্যালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং এই দুটি অক্সিনের মিশ্রণ বিভিন্ন গাছের শাখা কলমে ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পেয়েছেন। অক্সিন ব্যবহারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি হলো এই যে, 1। এতে শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়, 2। প্রায় সব কলমেই শিকড় বের হয়, 3। প্রতিটি কলমে অসংখ্য ছোট ছোট শিকড় বের হয়, যেগুলি গাছের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অক্সিন কিভাবে শাখা কলমে শিকড় বের হতে সাহায্য করে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায় নি। বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, অক্সিন শাখা কলমের শর্করা ও নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যবস্তুর সঙ্গে জটিল যৌগিক বিক্রিয়ার সূচনা করে, যার ফলে প্রথমে ক্যালাস টিস্যু ও পরে ঐ ক্যালাস টিস্যু থেকে শিকড় নির্গত হয়।

পশ্চিম আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কোকো গাছের শাখা কলমে IBA ও NAA-মিশ্রণ ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। রবার, কফি 364 ইত্যাদির শাখা কলমেও অক্সিনের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে অক্সিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন—সংরক্ষণকালে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ করা এবং অঙ্কুরের সুপ্তিকাল প্রলম্বিত করা, ক্রীট-মাস গাছের পাতার পতন রোধ, লেবু, বীজহীন আঙুর, ষ্ট্রবেরি ইত্যাদির ফলের আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

উপসংহার—কৃষি-সমস্যার সমাধানে অক্সিনের ভূমিকা নিয়ে এই পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল, তা মূলতঃ শীতপ্রধান দেশের ফসলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসলের উপর এর প্রভাব নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। তাই এর প্রয়োগও এই সব দেশে সীমিত। আম ও লিচু আমাদের পরিচিত ফলগুলির মধ্যে অন্যতম, বিশেষ করে আম স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তবে আপেলের মত এরও সমস্যা হলো এক বছর প্রচুর আম ফলে এবং পরবর্তী বছরে মোটেই আম ফলে না বা অত্যন্ত কম ফলে। তাছাড়া অকালে আম ঝরে যাবার সমস্যাও রয়েছে। আম, লিচু ও পেয়ারা গাছের আর একটা সমস্যা হলো—বীজ থেকে জন্মানো গাছ সাধারণতঃ জন্মদাতা গাছের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না ও নিকৃষ্ট ধরণের ফল দেয়। আবার ঐ সব গাছের শাখা থেকে কলম করাও যায় না, কারণ ঐ কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। এই সম্পর্কে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অক্সিন ছাড়া আরও দুটি উদ্ভিদ-হর্মোন—জিবারেলিন ও কাইনেটিন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে এবং উদ্ভিদের জীবনকালে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই দুটির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন এর সাহায্যে খাদ্য-সমস্যার যথার্থ সমাধান করা সম্ভব হবে।

ট্রেসার পদ্ধতি

মিহিরকুমার কুণ্ডু*

ট্রেসার বা আইসোটোপীয় পদ্ধতি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের অজস্র সমস্যার সহজ অথচ সুনিশ্চিত সমাধানে এর অবদান অনন্য-সাধারণ। জীব-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উন্নতিতে এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ জীব-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের অনেক সমস্যাই অত্যন্ত জটিল, দুরূহ, অথচ সেগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরিসীম। এই সব সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে এসম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ করে এই ধরণের অজস্র সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ অনেক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য ট্রেসার পদ্ধতির সাহায্যে অনেক সহজে, অনেক দ্রুত এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ট্রেসার পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপসমূহ ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনের পর্যায়বলী সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। এটা সম্ভব হয় এগুলির ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দরুণ। আমরা জানি, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু দুটি অংশে বিভক্ত—একটি নিউক্লিয়াস, যার প্রধান কণিকা ধনাত্মক (+) আধানসম্পন্ন প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রন। পরমাণুর ভর কার্যতঃ এগুলির সম্মিলিত ভরের উপর নির্ভরশীল। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে ঋণাত্মক (−) আধানসম্পন্ন ইলেকট্রনের ভর। ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত নগণ্য, একটি প্রোটনের ভরের ১/১৮৩৬ ভাগ মাত্র। ইলেকট্রন ও প্রোটন, উভয়ের আধানের মান সমান, আবার পরমাণু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ। স্পষ্টতঃই, পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম মূলতঃ ইলেকট্রনের সংখ্যা ও বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। আইসোটোপগুলির প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন, অর্থাৎ এগুলির রাসায়নিক ধর্মাবলী অভিন্ন। ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনে এগুলি অবিকল একইভাবে ব্যবহার করে, পার্থক্য কেবল পরমাণুর ভরে। কোন কোন আইসোটোপ আবার অস্থায়ী, এগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, যথা—আল্‌ফা, বিটা এবং গামারশ্মি বিকিরণ করে। স্পষ্টতঃই, স্থায়ী আইসোটোপগুলির পরমাণুর ভরের বিভিন্নতা পরিমাপ করে এবং তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে অস্থায়ী বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। ফলে বিশেষ মৌল বা যৌগের সঙ্গে চিহ্নিত আইসোটোপটি মিশিয়ে ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌল বা যৌগটির পরিবর্তন অনুধাবন বা অনুসরণ করা সহজেই সম্ভব। বস্তুতঃ এই ভাবে বিজ্ঞানীরা বহু জটিল রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। চিহ্নিত মৌলটি অত্যল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়বলী অনুসরণ ও নির্দেশ করে বলে একে ট্রেসার

---

*ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যৌগ (Tracer element) এবং এই পদ্ধতিকে ট্রেসার পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি আলট্রামাইক্রো পদ্ধতি অর্থাৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে অবিশ্বাস্য রকম স্বল্পপরিমাণ পদার্থের সনাক্তকরণ সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থের পরিমাণ 10^{-10} গ্র্যাম পর্যন্ত হতে পারে।

সাধারণতঃ কিভাবে কোন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত আইসোটোপ অনুসন্ধের পদার্থের কোন বিশেষ স্থানে স্থাপিত করা হয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো যায়। একটি কার্বন যৌগের বিষয় কল্পনা করা যাক, যার মধ্যে একাধিক কার্বন পরমাণু রয়েছে, যেমন—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, $CH_3.COOH$। এর মিথাইল ($\underline{C}H_3$) পুঞ্জে রয়েছে একটি কার্বন পরমাণু আর দ্বিতীয়টি রয়েছে কার্বক্সিল ($-\underline{C}OOH$)-পুঞ্জে। মিথাইল বা কার্বক্সিল বা উভয় পুঞ্জের C নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার সাহায্যে চিহ্নিত আইসোটোপ $\overset{*}{C}$-এর (এখানে $\overset{*}{C}$ বলতে C-14 অর্থাৎ 14 পরমাণুভর বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু বোঝানো হচ্ছে) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়:

(i)
$$Ba\overset{*}{C}O_3 \xrightarrow{\text{অ্যাসিড}} \overset{*}{C}O_2 \xrightarrow[\text{বিজারণ}]{H_2/\text{অনুঘটক}} \overset{*}{C}H_3OH \xrightarrow{P/I_2} \overset{*}{C}H_3I$$
$$\xrightarrow{NaCN} \overset{*}{C}H_3CN \xrightarrow[\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}]{H_2O} \overset{*}{C}H_3\ COOH$$

(ii)
$$\overset{*}{C}O_2 \xrightarrow[500^\circ C]{NH_3+K} K\overset{*}{C}N \xrightarrow{CH_3I} CH_3\overset{*}{C}N \xrightarrow{H_2O} CH_3.\overset{*}{C}OOH$$

(iii)
$$\overset{*}{C}H_3I+K\overset{*}{C}N \longrightarrow \overset{*}{C}H_3.\overset{*}{C}N \xrightarrow{H_2O} \overset{*}{C}H_3.\overset{*}{C}OOH$$

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পরিবর্তনের ফলে যৌগের রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক ধর্মের কোন ব্যাঘাত বা পরিবর্তন হয় না। ফলে বিক্রিয়াকালে যৌগটির বিভিন্ন অংশের ব্যবহার অপরিবর্তিত থাকবে এবং তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করে বিক্রিয়ার পর্যায়বলী সহজে অনুসরণ করা যেতে পারে। ধরা যাক, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, যার মিথাইল কার্বন চিহ্নিত ($\overset{*}{C}H_3.COOH$) কোন প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হলো। প্রাণীদেহ থেকে নির্গত দ্রব্যের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসে। প্রশ্ন হলো, এই কার্বন ডাই-অক্সাইড মিথাইল কার্বন, না কার্বোক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত? নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসরিত CO_2 কার্বক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত।

পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, প্রাণীদেহের ক্ষয় অতি মন্থর গতিতে হয়। জীর্ণ খাদ্য থেকে উদ্ভূত শক্তি প্রাণীকে চলাফেরা প্রভৃতির দরুণ নিত্য-প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহে সীমিত থাকে, একটি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র ক্ষয়িত দেহকোষের প্রতিস্থাপনে ব্যয়িত হয়; অর্থাৎ জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়াটি মূলতঃ স্থিতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে। সোয়েনহাইমার ও রিতেনবার্গ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ 1938 সালে এবং পরবর্তী কালে ডয়টেরিয়াম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, D বা H-2) এবং N-15 ট্রেসার যৌগরূপে ব্যবহার করে প্রমাণ করেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেহস্থিত ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেট এবং খাদ্যের সঙ্গে আগত ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্ব-হাইড্রেটের মধ্যে সতত বিনিময় হয়, অর্থাৎ এগুলি গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে। ভিন্নি তেল

সংক্রান্ত এই বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিসির তেলের ফ্যাট অ্যাসিডের অণুগুলি দ্বি বা ত্রি-অসম্পৃক্ত (Di or tri-unsaturated) বন্ধনীযুক্ত। তাঁরা প্রথমতঃ ডয়টেরিয়ামের সাহায্যে এই ফ্যাট অ্যাসিডের অণুগুলি আংশিক সম্পৃক্ত করেন। চিহ্নিত ডয়টেরোফ্যাট প্রাণীদের খাওয়াবার পর তাঁরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, প্রাণীদের দেহ থেকে নিঃসৃত ডয়টেরিয়ামের পরিমাণ, খাদ্য (ডয়টেরোফ্যাট) রূপে প্রবিষ্ট ডয়টেরিয়ামের তুলনায় অনেক কম—ডয়টেরিয়ামের বৃহত্তর অংশই দেহস্থিত ফ্যাটের মধ্যে সঞ্চিত হয়। একটি পৃথক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা খাদ্যের মধ্যে ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো—প্রয়োজনীয় শক্তির জন্যে প্রাণী যেন দেহস্থিত ফ্যাট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ডয়টেরোফ্যাট প্রধানতঃ দেহস্থিত ফ্যাটের অন্তর্ভুক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়িত হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক (চিহ্নিত নয়) ফ্যাট খাওয়ানো আরম্ভ করবার পর দেখা গেল, দেহস্থিত চিহ্নিত ফ্যাটের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। ডয়টেরিয়াম প্রধানতঃ D_2O (ভারী জল) বা DHO (ভারী ও সাধারণ জলের সংমিশ্রণ) রূপে নিঃসরিত হয়। স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জলের পরিবর্তে যদি ভারী জল সাধারণ জলের (H_2O) সঙ্গে এমন অনুপাতে মেশানো হয় যে, দেহস্থিত ডয়টেরিয়াম এবং খাদ্যের সঙ্গে আগত ডয়টেরিয়ামের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়, তাহলে কিন্তু দেহস্থিত ফ্যাটে যে পরিমাণে ডয়টেরিয়াম বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই পরিমাণে দেহে সঞ্চিত ডয়টেরোফ্যাট থেকে ডয়টেরিয়াম হ্রাস পায়। এই সব পরীক্ষা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, প্রাণীদেহে জল ও ফ্যাটের মধ্যে গতিশীল সাম্যাবস্থা বর্তমান। হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম ত্যাগ করে সম্পৃক্ত ফ্যাট অসম্পৃক্ত হয়, পক্ষান্তরে জল থেকে হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম গ্রহণ করে অসম্পৃক্ত ফ্যাট সম্পৃক্ত হয়।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরণের গতিশীল সাম্যাবস্থায় কেবলমাত্র এক-অসম্পৃক্ত বন্ধনীযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অংশগ্রহণ করে। অধিকতর অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, যথা—লিনোলিক বা লিনোলেনিক অ্যাসিড এই ভাবে সম্পৃক্ত হয় না বা সম্পৃক্ত ফ্যাট থেকে উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ দেহ এগুলির সংশ্লেষণে অক্ষম। খাদ্যের সঙ্গে এগুলিকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। এই জন্যে এই ধরণের অ্যাসিডগুলিকে অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয়।

সোয়েনহাইমার এবং রিটেনবার্গের অ্যামিনো অ্যাসিড সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা অ্যামিনো ($-NH_2$) পুঞ্জের নাইট্রোজেন N-15 আইসোটোপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করেন। অতঃপর খাদ্যের সঙ্গে এই সব চিহ্নিত অ্যামিনো অ্যাসিড প্রাণীদের খাওয়ানো হয়। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, খাদ্যের অ্যামিনো অ্যাসিড সরাসরি এবং দ্রুত দেহস্থিত প্রোটিনের (প্রোটিন একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক সমন্বয়ে তৈরি একটি জটিল জৈব যৌগ) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাছাড়া জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের এক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যামিনো নাইট্রোজেনের ($-NH_2$) স্থান বিনিময় হয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন।

প্রাণীদেহের অণু-পরমাণু সতত পরিবর্তনশীল। খাদ্যরূপে আগত মৌলিক কণার সঙ্গে দেহস্থিত সদৃশ মৌলিক কণার অবিরাম বিনিময় চলছে। এই বিনিময় ফস্‌ফরাস এমন কি, অস্থি-র ক্যালসিয়ামের সঙ্গেও হয়ে থাকে। এই ভাবে কালক্রমে প্রাণীর দেহকোষ নতুন নতুন মৌলিক

কণার সমন্বয়ে কার্যতঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি হয়। দেহস্থিত লৌহকণিকা কিন্তু সাধারণভাবে বিনিময় বিমুখ। তেজস্ক্রিয় লৌহ (Fe-59) প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এর একটি নগণ্য অংশমাত্র রক্তের লৌহ-কণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবলমাত্র রক্তে লৌহের পরিমাণ হ্রাস পেলে দেহ বহিরাগত লৌহকণিকা গ্রহণ করে। ট্রেসার পরীক্ষায় জানা গেছে, শরীরের মধ্যে লৌহ ফেরিটিন নামে লৌহ প্রোটিনের জটিল যৌগরূপে সঞ্চিত থাকে এবং এই যৌগটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। শরীরের মধ্যে লৌহ যতই প্রবেশ করানো হোক না কেন, ফেরিটিন এই সীমা ছাড়িয়ে যায় না। কখনো যদি কোন কারণে ফেরিটিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার নীচে নেমে যায়, যেমন—গর্ভাবস্থায় বা দ্রুত বৃদ্ধিকালে, যখন শরীর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখনই কেবল দেহ লৌহ গ্রহণ করে। এই অবস্থায় শরীরে লৌহের যোগান দেওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে ট্রেসার পদ্ধতি অপরিহার্য। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—রক্তের ব্যাহত সঞ্চালন ও দায়ী অংশটির অবস্থান নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম পরমাণুর (Na-24) প্রয়োগ। Na-24 চিহ্নিত খুব সামান্য পরিমাণ লবণজল রোগীর হাতের শিরায় প্রবেশ করানো হয়। এরপর একটি তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র (এক্ষেত্রে গামারশ্মি পরিমাপক যন্ত্র) পায়ের পাতা সংলগ্ন করে স্থাপিত করা হয়। রক্ত-সঞ্চালন স্বাভাবিক হলে সত্বর পায়ের পাতায় তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়বে এবং এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছুবে। কিন্তু যদি রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি মন্থর গতিতে অগ্রসর হবে। তেজস্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। পরিমাপক যন্ত্রটি শরীরের বিভিন্ন অংশের সান্নিধ্যে স্থাপন করে ব্যাহত সঞ্চালনের প্রকৃত অবস্থানটি নির্ণয় করে চিকিৎসা করা সম্ভব। এই একই প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন বা রক্ত-সঞ্চালনে কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে, তা নির্ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্রটি বুকের উপর বা সান্নিধ্যে স্থাপন করা হয় আর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটি স্বয়ংক্রিয় লেখনীযন্ত্র। ফলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সঞ্চালন-প্রক্রিয়াটির একটি স্বয়ংক্রিয় লেখ (Graph) তৈরি হয়ে যায়।

কোন কোন যৌগের কয়েকটি বিশেষ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বা আক্রান্ত টিস্যুতে সঞ্চিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিশেষ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে এই সব যৌগের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে শরীরে অনেক জটিল, দুর্নির্ণেয় রোগের, যথা—ক্যান্সার, টিউমার প্রভৃতির অস্তিত্ব এবং অবস্থান নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—মস্তিষ্কে টিউমার হলে তার অস্তিত্ব বা নির্ভুল অবস্থান নির্ণয়ে সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি প্রায় অসহায়। এই সব ক্ষেত্রে মার্কারি-203 চিহ্নিত নিওহাইড্রিন বা গ্যালিয়াম-68 চিহ্নিত ইথিলীন ডাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের জটিল যৌগ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। উপযুক্ত তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ং তেজস্ক্রিয়তা লেখ (Radioautography বা autoradiography) বা তেজস্ক্রিয়তার আলোকচিত্র তুলে টিউমারের অস্তিত্ব ও নির্ভুল অবস্থানের সংশয়াতীত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

কোষ-জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও ট্রেসার পদ্ধতির অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেহের কোষ দুটি অবিকল সদৃশ কোষে বিভক্ত হতে পারে বলেই প্রাণীদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়িত টিস্যুর প্রতিস্থাপন সম্ভব। কোষের এই বিভাজন জীব-বিজ্ঞানে মাইটোসিস নামে পরিচিত। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে একটি নির্দিষ্ট সময় লাগে; সময়কাল প্রাণী ও কোষের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি কোষে ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা

সংক্ষেপে ডি. এন. এ. থাকে। ডি. এন. এ. কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। প্রাণীর বংশধারা অর্থাৎ বংশপরম্পরায় যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তার সূত্র এই ডি. এন. এ. নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে বিভিন্ন প্রোটিন সংশ্লেষণের সূত্রাবলীও এদের নিয়ন্ত্রণে। ডি. এন. এ. অণুগুলির একটি একক বৈশিষ্ট্য—এগুলির মধ্যে থাইমিন নামে একটি নাইট্রোজেনঘটিত জৈব ক্ষারক অবশ্যই থাকবে। থাইমিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু তেজস্ক্রিয় ট্রাইসিয়াম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ T বা H-3) দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে ডি. এন. এ. চিহ্নিত করা যায়। মাইটোসিসের প্রাক্কালে কোষের ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই জন্যেই নবজাত কোষ ও মাতৃকোষে (সৃজনের অব্যবহিত পরে) ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা সমান থাকে। প্রত্যেক কোষই মাইটোসিসে সক্ষম নয়। কোন্ কোষ মাইটোসিসে সক্ষম, আর কোন্ কোষ নয়—চিহ্নিত ডি. এন. এ. ব্যবহার করে তা জানা গেছে। এই ট্রেসার পরীক্ষায় আরো জানা গেছে যে, সুস্থ টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রতি 100টি সৃষ্ট কোষের মধ্যে প্রায় 50টির বিভাজন হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে কোষের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ক্যান্সার-আক্রান্ত কোষ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, এই সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী সংখ্যক কোষের মাইটোসিস হয় এবং মাইটোসিস প্রক্রিয়ার সময়কালের কিন্তু কোন হেরফের হয় না। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিত টিস্যু প্রতিস্থাপিত করতে শতকরা প্রায় তিনটি কোষের মাইটোসিস হয়।

ট্রেসার পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদ্ভিদের আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলীর উপর উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। সূর্যালোকে সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে জটিল পদার্থ, যথা—সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতির (সমষ্টিগতভাবে যেগুলির নাম কার্বোহাইড্রেট) সংশ্লেষণ করতে পারে। উদ্ভিদের এই ক্ষমতাকে আলোকসংশ্লেষণ বলা হয়। কার্বোহাইড্রেট তৈরির কালে সর্বদাই অক্সিজেন গ্যাস (O_2) নির্গত হয়। কার্বোহাইড্রেটগুলির মধ্যে সরলতম কার্বোহাইড্রেট—গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ। দুটিই উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উভয়েরই সাধারণ সংকেত $C_6H_{12}O_6$। আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এগুলির উৎপাদনের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে:

$$6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি} \xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

আলোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ায় ক্লোরোফিল অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিতে আলোকসংশ্লেষণ হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্গত O_2, CO_2 না H_2O থেকে উদ্ভূত? 1941 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এস. রুবেন ও তাঁর সহকর্মিগণ তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-18 চিহ্নিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা জল ব্যবহার করে দেখান যে, নির্গত অক্সিজেন জল থেকে উৎপন্ন। তাঁরা তেজস্ক্রিয় কার্বন-14 ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের বিভিন্ন রাসায়নিক পর্যায়ের উপরও আলোকপাত করেন। তাঁদের গবেষণা থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র কার্বোহাইড্রেটই উৎপন্ন হয় না, কার্বোহাইড্রেট নিঃসন্দেহে মুখ্য পদার্থ, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ফ্যাটও কিয়ৎ পরিমাণে তৈরি হয়।

বিশুদ্ধ রসায়নে কোন বিশেষ বিক্রিয়ার গতিপথ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে এস্টার তৈরির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রেও ট্রেসার পদ্ধতির উপযোগিতা

উল্লেখযোগ্য। গাছপালার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং তাদের সতেজ ও পুষ্ট করতে প্রায়ই মাটিতে ফস্‌ফরাস সার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের ফস্‌ফরাস সার পাওয়া যায়। কোন বিশেষ জমিতে কোন্‌ ধরণের ফস্‌ফরাস সার সবচেয়ে উপযোগী, তা সব সময় স্পষ্ট নয়। গাছ কতটা ফস্‌ফরাস গ্রহণ করেছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু এই ফস্‌ফরাসের কতটা মাটি থেকে আর কতটা সার থেকে এসেছে, তা বলা অসম্ভব। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস চিহ্নিত সার ব্যবহার করে এই পার্থক্য বা কোন বিশেষ সারের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যায়।

গাছের ক্লোরোফিলে কোন লৌহ নেই, কিন্তু এর উৎপাদনে লৌহের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। মাটিতে এর পরিমাণ কম হলে গাছ ক্লোরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়। ক্লোরোফিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পাতার রং সবুজ না হয়ে হল্‌দে হয়, আলোকসংশ্লেষণ-ক্রিয়াও হ্রাস পায়। আবার কখনো কখনো জমিতে লৌহ উপযুক্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও গাছের ক্লোরোসিস হতে দেখা যায়। ট্রেসার পরীক্ষায় এই সব ক্ষেত্রে জমিতে এক বা একাধিক এমন সব যৌগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলি গাছের লৌহ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়।

শিল্পেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রভূত প্রয়োগ লক্ষণীয়। কয়লার মধ্যে গন্ধক থাকে। গন্ধক জৈব যৌগ আর অজৈব যৌগ সাধারণতঃ পাইরাইট (FeS_2) রূপে থাকে। কয়লা থেকে কোক তৈরির কালে এই গন্ধকের কিছু অংশ সালফার ডাই-অক্সাইডরূপে বেরিয়ে যায়, অবশিষ্টাংশ কোকের অন্তর্ভুক্ত হয়। গন্ধকের কোন্‌ অংশ বেরিয়ে যাবে বা কোন্‌ অংশ কোকের মধ্যে থাকবে, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে, অর্থাৎ এর সঙ্গে গন্ধকঘটিত যৌগের প্রকৃতির কোন সম্পর্ক আছে কি? কয়লার মধ্যে তেজস্ক্রিয় গন্ধক চিহ্নিত পাইরাইট ব্যবহার করে দেখা গেছে, কয়লা এবং কোক উভয়ের মধ্যেই জৈব এবং অজৈব যৌগের গন্ধকের অনুপাত সমান অর্থাৎ যৌগের প্রকৃতির সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

কোন বস্তুর প্রাচীনত্ব, যেমন—পৃথিবীর বয়স কত, কোন্‌ ফসিল কত বছরের পুরনো, কোন্‌ শিলা কত বছর আগে সৃষ্ট হয়েছিল—তা নির্ণয় করতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের জুড়ি নেই। এক্ষেত্রে রহস্য সমাধানের সূত্র রয়েছে অনুসন্ধেয় বস্তুতে, কোন বিশেষ তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবনকালের মধ্যে। তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবন (Half life) বলতে বোঝায়, যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার তীব্রতা অর্ধেক হ্রাস পায়। কার্বন-14-এর অর্ধ-জীবন 5730 বছর অর্থাৎ কার্বন-14-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কোন এক সময়ে ক হলে 5730 বছর পরে এর পরিমাণ হবে $ক/_2$, আরো 5730 বছর পরে তেজস্ক্রিয়তা ঐ বিশেষ সময়ের তুলনায় হবে $(ক/_2)/2$ বা $ক/_4$,—এই ভাবে তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। জীবজন্তুর মৃত্যুর পর কার্বন-14 গ্রহণ করবার ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় প্রতি লক্ষ কোটি কার্বন-12 পরমাণুর সঙ্গে কার্বন-14 থাকে 1টি। সুতরাং কোন প্রাচীন কার্বন যৌগঘটিত বস্তুর কার্বন-14-এর বর্তমান তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে 50,000 বছরের মধ্যে সৃষ্ট বস্তুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। বস্তুতঃ কার্বন যৌগঘটিত বহু বস্তু, যেমন—বহু ফসিলের প্রাচীনত্ব বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরাধ ও অপরাধীর সনাক্তকরণেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে 1936 সালে জি. হেভেসি এবং এইচ. লেভি প্রবর্তিত তেজস্ক্রিয়তা বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

পদ্ধতিটির মূল কথা হলো, অনুসন্ধেয় বস্তুর কোন বিশেষ যৌগ উপযুক্ত পরমাণু-কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার সাহায্যে বা যৌগকণাগুলিকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে রূপান্তরিত করা। অতঃপর এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির স্বরূপ ও পরিমাণ বিকিরিত রশ্মি, যথা—বিটা বা গামারশ্মি এবং আইসোটোপগুলির অর্ধ-জীবনকালের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। এর পর নির্দিষ্ট যৌগ বা যৌগগুলির পরিমাণ জানা আছে, এমন কোন সদৃশ সুপরিজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে অবিকল একই অবস্থায় তুলনা করে বিশ্লেষ্য অজ্ঞাত পদার্থ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী সুনিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব। এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা গেছে যে, মানুষের চুলও তার আঙুলের ছাপের মতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চুলের মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে কয়েকটি যৌগ থাকে। এগুলির পরিমাণ ও অনুপাত ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল। সেন্ট হেলেনা দ্বীপপুঞ্জে নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁর মাথার চুলে অস্বাভাবিক পরিমাণ আর্সেনিকের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এথেকে অনেকের সন্দেহ হয় যে, আর্সেনিক-দুষ্ট হয়ে নেপোলিয়ন মারা যান।

মানব কল্যাণে ট্রেসার পদ্ধতি এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় প্রযুক্ত ট্রেসার পদ্ধতি ব্যবহারের অতি সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। নব নব সমস্যার সমাধানে, অপ্রত্যাশিত জটিলতার গ্রন্থি মোচনে এর উপযোগিতা বলবার অপেক্ষা রাখে না এবং স্পষ্টতঃই ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, মানবের কল্যাণসাধন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এই পদ্ধতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

অবলোহিত রশ্মি

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা—তেশিরা কাচে সূর্যের আলো পড়লে সাতটি রঙের সৃষ্টি হয়। এর কারণ সূর্যালোক সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাতটি রং ছাড়া সূর্যালোকের একটা বিরাট অংশ আমাদের চোখের রেটিনার অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু অদৃশ্য হলেও এই বিরাট অংশের প্রভাব আমাদের উপর কম নয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের জন্যে দায়ী সূর্য থেকে আগত অবলোহিত রশ্মির প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের রেটিনায় না থাকলেও ত্বকের উপর যথেষ্ট আছে। অবলোহিত রশ্মিও দৃশ্য আলোকের মতই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এই দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং মাইক্রো-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে অবস্থিত। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অবলোহিত রশ্মিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—(1) একটি অংশ, যেটি লালের ঠিক পরেই থাকে, (2) আর একটি অংশ, যেটি মাইক্রো-তরঙ্গের নিকটবর্তী এবং (3) এই দুই-এর মধ্যেকার অংশ।

1800 সালে স্যার উইলিয়াম হার্সেল একটি সৌর বর্ণালীতে লাল অংশের পাশে একটি কালো অংশ দেখেন। এই অংশটিতে অবস্থিত একটি থার্মোমিটার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সূচিত করে। এথেকে তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—(1) দৃশ্য আলোকের

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

বর্ণালীর পরে রয়েছে একটি অদৃশ্য বর্ণালী, (2) এই অদৃশ্য বর্ণালীও আলোকের মত কোনও শক্তির প্রকাশ এবং (3) এই বিকিরণ তাপীয় ঘটনার সৃষ্টি করে, এবং এর উৎস কোন তাপীয় বস্তু। 75 বছর পরে এই বিকিরণটির নামকরণ করা হয় অবলোহিত বিকিরণ। অবলোহিত রশ্মি আবিষ্কারের পর বহু বছর পর্যন্ত এটি নির্দেশনের কোনও উপযুক্ত উপায় জানা ছিল না। 1917 সালে টি. ডাব্লিউ. কেস আবিষ্কার করেন যে, থ্যালাস সালফাইড কোষের উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব খুব বেশী। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জার্মেনী ও অপর কয়েকটি দেশ সামরিক প্রয়োজনে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি যন্ত্র তৈরি করে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে অবলোহিত রশ্মির গবেষণা দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে।

উৎস ও প্রকৃতি—অবলোহিত রশ্মির উৎস হলো তাপীয় বস্তু। প্রত্যেক বস্তুই অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে এবং বিকিরণের পরিমাণ বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। আবার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের শক্তি সর্বোচ্চ হয়। তাপমাত্রা যত কম হয়, এই সর্বোচ্চ শক্তি তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। 1নং তালিকা থেকে এটি প্রতীয়মান হবে। তালিকাটি একটি সূত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। সূত্রটি হলো—$\lambda m = \frac{2897}{T}$, এখানে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ হলো মাইক্রোনে (1 মাইক্রোন=10^{-4} সেন্টিমিটার) এবং তাপমাত্রা T হলো তাপমাত্রার চরম স্কেলে, λm হলো $T^{\circ}K$ তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। অবলোহিত রশ্মির আর একটি ধর্ম হলো বস্তুর তাপমাত্রা যত কম হয়, বস্তু থেকে অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ 300°K তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির সর্বনিম্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো 4 মাইক্রোন আর 1000°K তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে তা হলো 1 মাইক্রোনেরও কম।

1নং তালিকা

তাপমাত্রা (চরম স্কেলে)	নির্গত সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (মাইক্রোনে)
11000°	0·45
1000°	3·0
500°	5·0
300°	9·8
373°	7·8
273°	10·5
77°	38·0

তালিকা (1নং) থেকে আরও দেখা যায় যে, বস্তুর তাপমাত্রা যত কমই হোক না কেন, তা থেকে অবলোহিত রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে; অর্থাৎ পৃথিবীর, শুধু পৃথিবীরই বা কেন, সমগ্র বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিনিয়ত অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে চলেছে।

নির্দেশন—অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন প্রধানতঃ দু-ভাবে করা হয়—(1) তাপীয় উপায়ে ও (2) ফটোনের দ্বারা। তাপীয় উপায়ে অবলোহিত রশ্মি যে তাপ সৃষ্টি করে, তার সাহায্য নেওয়া হয় এবং এদের সাড়া দেবার ক্ষমতা তাদের শক্তি শোষণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। থার্মোকাপ্‌ল্, বোলোমিটার প্রভৃতি এই কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়। থার্মোকাপ্‌লের একটি জোড়ামুখ বিকিরণের সাহায্যে উত্তপ্ত হলে যে থার্মোবিভবের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা বিকিরণের পরিমাপ করা যায়। বায়ুশূন্য পাত্রে অবস্থিত বিস্‌মাথ-অ্যান্টিমনি থার্মোকাপ্‌লই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বোলোমিটারের মূল তত্ত্ব তাপমাত্রার সঙ্গে পদার্থের রোধের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত।

ধাতু এবং অর্ধ-পরিবাহী এই কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যন্ত্রটিকে ট্র্যানজিষ্টর বোলোমিটার বলা হয়।

তাপীয় নির্দেশকের সীমাবদ্ধতা হলো—তার সাড়া দেবার দ্রুততা খুব বেশী নয়। এদের সময়-ধ্রুবক হলো কয়েক মিলিসেকেণ্ড।

ফটোনের নির্দেশক যন্ত্রের সাড়া দিবার দ্রুততা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এদের সময়-ধ্রুবক কয়েক মাইক্রো সেকেণ্ড হলেও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্ণালীর সীমাবদ্ধ অংশে এদের ব্যবহার সীমিত। এই সমস্ত যন্ত্রে অর্ধ-পরিবাহীর উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব কাজে লাগানো হয়; যথা—ফটো-পরিবাহক, ফটো-ভোল্টাইক ও ফটো-তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনা।

নিকট অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে কম কাজ-শক্তি (Work function) সম্পন্ন বস্তুর উপর রশ্মি আপাতত হলে বস্তু থেকে ইলেকট্রনের নির্গমন হয় এবং সেই ইলেকট্রনগুলি একটি জিঙ্ক সালফাইডের প্রতিপ্রভ পর্দায় আঘাত করে পর্দার উপর সবুজাভ আলোকের সৃষ্টি করে। এই ধরণের যন্ত্রগুলিকে ইমেজ কনভার্টর বলে। এদের 1·2 মাইক্রোন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আরও একটি উপায়ে ফটো-বৈদ্যুতিক ঘটনার সাহায্যে অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন সম্ভব। তা হলো—যে ইলেকট্রন-গুলি বস্তু থেকে নির্গত হচ্ছে, সেগুলিকে একত্রিত করে ফটো-তড়িতের পরিমাপ করা। 1·3 মাইক্রোন পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন ফটোগ্রাফির সাহায্যে করা যায়। অবশ্য এর জন্যে সায়ানিন রঞ্জকের দ্বারা ফটো-গ্রাফিক প্লেটকে বেশী সুগ্রাহী করা প্রয়োজন।

অবলোহিত রশ্মির বিভিন্ন অংশে যে সব নির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

0·72 মাইক্রোন— 1·5 মাইক্রোন— ফটো-বৈদ্যুতিক কোষ, ডাই-ইলেকট্রিক কোষ, ফটো-গ্রাফিক প্লেট, ইমেজ কনভার্টার টিউব, প্রতিপ্রভ বস্তু এবং লেড সালফাইড কোষ।

1·5 মাইক্রোন—6·0 মাইক্রোন—লেড সাল-ফাইড, লেড সেলেনাইড, ইণ্ডিয়াম অ্যান্টিমোনাইড, লেড টেলুরাইড, ফটো-পরিবাহক, ফটো-ভোল্টাইক ও ফটো-বিদ্যুৎ চৌম্বক নির্দেশক এবং ডপ্‌ড্‌ জার্মেনিয়াম নির্দেশক।

6·0 – 1000 মাইক্রোন—থার্মোকাপ্‌ল্‌, বোলো-মিটার, ডপ্‌ড্‌ জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন নির্দেশক।

ব্যবহার—অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার মূলতঃ সামরিক প্রয়োজনেই হয়। এর গবেষণা এবং উন্নতিও সামরিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই হয়েছে। তবে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনে এর বহুল ব্যবহারও প্রচলিত আছে। সামরিক কার্যে অব-লোহিত রশ্মির ব্যবহারের কারণ প্রধানতঃ দুটি—(1) এটি অদৃশ্য রশ্মি; সুতরাং লক্ষ্যবস্তুর উপর অব-লোহিত রশ্মিপাত করে শত্রুর অগোচরে কোনও বিশেষ ব্যবস্থায় বস্তুটিকে দেখা যেতে পারে। এই ধরণের ব্যবস্থা করা হয় সক্রিয় যন্ত্রে; (2) সমস্ত জিনিষই অবলোহিত রশ্মির উৎস-স্থল একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই উপযুক্ত অবলোহিত নির্দেশকের সাহায্যে সামরিক লক্ষ্যবস্তু (যথা—মানুষ, চিম্‌নি, জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি) থেকে নির্গত অবলোহিত রশ্মির দ্বারা তাদের সনাক্ত করা যায়। এই ধরণের যন্ত্রগুলিকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়।

শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ে আজ রেডারের সঙ্গে সঙ্গে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অবলোহিত রশ্মি রেডার অপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। রেডারের মত এই সব অব-লোহিত রশ্মির যন্ত্রের কোনও সর্বনিম্ন দূরত্বের সীমা-বদ্ধতা নেই। এদের ব্যবহারও রেডার অপেক্ষা অনেক সহজ ও সরল। এর বিশ্লেষী ক্ষমতা

রেডার অপেক্ষা বেশী, অথচ খরচ কম। 1 ফুট ব্যাসের অ্যাণ্টিনাসহ একটি তিন সেন্টিমিটার রেডারের পক্ষে 5 মাইল দূরবর্তী দুটি এরোপ্লেনকে আলাদাভাবে ধরা তখনই সম্ভব, যদি প্লেন দুটির মধ্যে দূরত্ব অন্ততঃ 1 মাইল হয়। কিন্তু একটি অবলোহিত রশ্মি নির্দেশক একটি প্লেনের দুটি ইঞ্জিনের মধ্যেও পার্থক্য ধরতে পারে।

এই সব কাজে যে সব যন্ত্র প্রায়ই প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, সেগুলির দু-একটির কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে সামান্ত কিছু আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(1) প্রতিবিম্ব গঠনকারী সক্রিয় যন্ত্র—এই যন্ত্রে টাংষ্টেন ফিলামেন্ট বাতি কিংবা জেনন আর্ক বাতিকে অবলোহিত রশ্মির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাতির দৃশ্য আলোক উপযুক্ত ফিল্টারের সাহায্যে ছেদন করা হয়। লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে অবলোহিত রশ্মি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। অবলোহিত রশ্মির দূরবীক্ষণ যন্ত্র যখন বন্দুকের সামনে লাগানো থাকে, তখন অন্ধকারেও লক্ষ্যবস্তুকে গুলি করা সম্ভব হয়।

(2) প্রতিবিম্ব গঠনকারী নিষ্ক্রিয় যন্ত্র—পূর্বেই বলা হয়েছে, এই ধরণের যন্ত্রে অবলোহিত রশ্মির কোনও উৎস ব্যবহার করা হয় না এবং লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত রশ্মিই কাজে লাগানো হয়। থার্মোগ্রাফ এবং এভাপোরোগ্রাফ হলো এই ধরণের দুটি যন্ত্র। এভাপোরোগ্রাফে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়, তার প্রতিটি অংশের বর্ণ লক্ষ্যবস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন তাপমাত্রার লক্ষ্যবস্তুর জন্যে প্রতিবিম্বে বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়। এই বর্ণ অবশ্য লক্ষ্যবস্তুর নিজস্ব বর্ণ নয়। তবুও এথেকে তাপমাত্রার প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাপমাত্রা এবং বর্ণের চার্ট থেকে সহজেই লক্ষ্যবস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রটি 1° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। রসায়নশিল্পে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এই যন্ত্রটি আজকাল বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। থার্মোগ্রাফের সাহায্যে দাবানলের কেন্দ্রস্থল এবং তার মধ্যে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করা যায় খুব সহজেই।

অবলোহিত রশ্মির আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হলো—অবলোহিত স্পেক্ট্রোস্কোপি। পদার্থের আণবিক কম্পন, ঘূর্ণন এবং গঠন জানবার কাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া ভারী জল প্রস্তুতে, এন্‌জাইম নির্ধারণে, ভিটামিন, ঔষধ ও খাদ্য বিশ্লেষণে, চিকিৎসাবিজ্ঞায়, কৃষি-গবেষণায়, তন্তু, কয়লা, দুগ্ধ, রবার, প্লাষ্টিক প্রভৃতি শিল্পে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে।

হিমবাহ

সন্তোষকুমার দে

তুষার যুগে (যা আট হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গেছে) পৃথিবীর প্রায় 30% শতাংশ ছিল বরফে ঢাকা। তার পর পৃথিবীর উত্তাপ বাড়বার ফলে বরফ গলে গিয়ে এখন দুই মেরুর কাছে সমভূমিতে প্রায় সারা বছর ধরে তুষারপাত হয় ও বরফ জমে থাকে। পৃথিবীর এই অংশে বরফের স্তূপ যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন তার পাশের কতক অংশ দেখলে মনে হয় যেন বরফের একটা মস্ত বড় জিভ্ বেরিয়ে আছে। এই রকম বড় বড় বরফের অংশ যখন ভূমির ঢালের জন্যে নীচের দিকে চলতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় (গ্ল্যাসিয়ার) বা বরফের নদী। ভারতের উত্তর দিকে কারাকোরাম পর্বতের গ্রেট বালটরো (36 মাইল) পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ। এছাড়াও এভারেষ্টের শৃঙ্গের কাছে আছে রংবুক, কাংশুক প্রভৃতি অনেক হিমবাহ। গঙ্গা থেকে নীলনদ এবং সেখান থেকে রোন নদী পর্যন্ত যত বড় বড় নদী আছে, সবারই উৎপত্তির উৎস হলো এই হিমবাহ। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ স্থলের জল (2 কোটি 90 লক্ষ ঘন কিলোমিটার) এই হিমবাহের বরফের মধ্যে সঞ্চিত আছে এবং সেখান থেকেই তা আহৃত হয়।

হিমবাহের জন্ম—অল্প কথায় বলতে হলে বলা চলে, গ্রীষ্মে যে পরিমাণ বরফ গলে, শীতে সেই পরিমাণ গলনের চেয়ে বেশী তুষারপাত হলে হিমবাহের সৃষ্টি হয়। গলনের পরে এই অতিরিক্ত তুষারপাত বছরের পর বছর জমতে জমতে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পরিবর্তনটা হয় এই ভাবে—হাল্কা তুষার প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণিকায় পরিণত হয়। তার পর সমুদ্রের জলের লবণাংশ কমতে থাকলে এই তুষারকণা তুষার-বটিকায় তাড়িত হয়ে একত্রিত হয় এবং ক্রমশঃ জমাট বেঁধে একটি বিরাট স্তূপে পরিণত হয়। বছরের পর বছর এভাবে তুষারের কাজ চলতে থাকায় তুষারের স্তূপ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

হিমবাহের গতিবেগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে হিমবাহের গতিবেগ স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আল্পস্ অঞ্চলে হিমবাহ প্রতিদিন এক ফুটও এগোতে পারে না, অথচ গ্রীনল্যাণ্ডে তার গতি-বেগ বেশ দ্রুত। হিমবাহ প্রতিদিন সেখানে প্রায় 6 ফুট গতিতে এগিয়ে চলে। আবার লক্ষ্য করা গেছে হিমবাহের পাশের দিকের চেয়ে মাঝখানের গতিবেগ বেশী। সেখানেও আবার নীচের দিকের তুলনায় উপরের দিকের গতিবেগ দ্রুততর। সম্প্রতি একটি অতি বেগবান হিমবাহের খবর পাওয়া গেছে। 1966 সালে একজন বিমান-চালক ক্যানাডার হীল পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় 35 কিঃ মিঃ চওড়া একটি হিমবাহকে, সামনের সবকিছু ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে ঘণ্টায় আধ মিটারের বেশী অর্থাৎ সারা দিনে প্রায় 15 মিটার বেগে চলতে দেখতে পান।

আগেই বলা হয়েছে, মেরুঅঞ্চলের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ অংশে তুষারস্তূপ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জমে থাকে। পৃথিবীর শেষ তুষার যুগের সময় উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে তুষার জমে ছিল। দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলেও অ্যান্টার্কটিক তুষারস্তূপ

বর্তমানের তুলনায় পূর্বে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। ঐ সময়কে কোয়ার্টারনারী বরফযুগ বলা হয়। বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে গ্রীনল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তুষারস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীর 97% শতাংশ হিমবাহ এই দুই জায়গায় অবস্থিত।

অ্যান্টার্টিক তুষারস্তূপের আয়তন 14·25 কোটি বর্গ কিঃ মিঃ; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা-সমেত সমগ্র ইউরোপের সমান। এই সমগ্র মহাদেশ 3,350 মিটার পুরু বরফের স্তূপে আবৃত। শুধু বরফ আর বরফ—মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে আল্পিসের মত উঁচু উঁচু পর্বত মাথা তুলে জেগে আছে।

দ্বিতীয় বৃহৎ বরফস্তূপ হলো উত্তর গোলার্ধের গ্রীনল্যাণ্ড। এখানকার তুষারস্তূপের আয়তন 1·7 মিলিয়ন বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মালভূমি থেকে বড় বড় তুষারশৈল সমুদ্রে নেমে গিয়ে ভেসে বেড়ায়। সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের বিরাট তুষারস্তূপের কতক অংশে মাঝে মাঝে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে এখানে-ওখানে এসে পড়ে। জলের চেয়ে বরফ হাল্কা, তাই হিমবাহের 1/9 অংশ জলের উপর ভেসে থাকে। এই রকম ভাসমান তুষারস্তূপকে বলে হিমশৈল। এই রকম একটি বৃহৎ হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে 1912 সালে 14ই এপ্রিল তখনকার দিনের বৃহত্তম প্রমোদ তরী টাইটানিক, যা কখনও ডুববে না বলে কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে বলেছিলেন—আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়।

আরও অনেক হিমবাহ আছে, কিন্তু সেগুলি গ্রীনল্যাণ্ড ও অ্যান্টার্টিকার হিমবাহের তুলনায় ছোট। এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ডেও সেগুলির দেখা মেলে।

একজন বিজ্ঞানী বলেছেন—যদি অ্যান্টার্টিকার তুষারস্তূপ সবটাই গলে যায়, তাহলে সমুদ্রের উচ্চতা 50 থেকে 60 মিটার বেড়ে যাবে। ফলে লণ্ডন, নিউইয়র্কসমেত পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি ডুবে যাবে। তবে এই তুষারস্তূপের গলবার ভয় আপাতত নেই—যদিও তুষারস্তূপের গলনের জন্যে মানুষ খানিকটা দায়ী। সারা পৃথিবীর কল-কারখানা থেকে যে সব আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ নদীপথে সমুদ্রে এসে পড়ছে, তাতে সমুদ্রের উষ্ণতা খানিকটা বেড়ে যাচ্ছে, আবহাওয়ারও পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়লে এবং তার ফলে হিমবাহগুলি কিছু পরিমাণে গলে গেলেও সমুদ্রের জল এমন কিছু বাড়বে না, যার জন্যে এখন থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হতে হবে। কেন না, দেখা যাচ্ছে যে, গত বারো হাজার বছরে (16,000-4,000 খৃঃ পূঃ) সমুদ্রপৃষ্ঠ মাত্র 100 মিটার উচ্চতায় বেড়েছে। প্রতি 100 বছরে সমুদ্রের জল প্রায় এক মিলিমিটার বাড়ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত বরফরাশিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—(1) মহা-দেশীয় তুষারস্তূপ, (2) উপত্যকার হিমবাহ আর (3) পাদদেশের হিমবাহ (পিডমণ্ট গ্ল্যাসিয়ার)।

প্রথমটির কথা আগেই বলা হয়েছে। উপত্যকার হিমবাহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বহু পূর্বে তুষার যুগে উচ্চভূমিতে তুষার সঞ্চিত হয়ে যে বরফের অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল, তাথেকে বিভিন্ন উপত্যকার ভিতর দিয়ে হিমবাহ নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। একেই বলে উপত্যকা হিমবাহ। পরবর্তী যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বড় বড় পাহাড়-পর্বতে যে বরফের স্তূপ জমে থাকে, তাথেকে আগের বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিম-বাহ প্রবাহিত হয়। এই রকম হিমবাহকে কেউ কেউ পার্বত্য হিমবাহ বলেন। পার্বত্য অঞ্চলে তুষার-স্তূপ যদি কোন কারণে কম জমে বা সেখানকার উত্তাপ বেড়ে যায়, তাহলে হিমবাহের প্রবাহের পরিমাণও কমে যায়। এই রকম অবস্থাকে হিমবাহের পশ্চাদপসরণ বলে। গত 100

বছরের মধ্যে আন্টিস অঞ্চলের হিমবাহগুলির মধ্যেই পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেছে।

পর্বত-পাদদেশের হিমবাহ—পার্বত্য অঞ্চল থেকে যখন কোন হিমবাহ উপত্যকার মধ্য দিয়ে নীচে নেমে আসে এবং পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় পাদদেশের হিমবাহ। আইসল্যাণ্ড ও অ্যান্টার্টিকায় এই রকম হিমবাহ দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার আলাস্কাতে প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল জায়গায় এই রকম একটা হিমবাহ দেখতে পাওয়া গেছে।

আলাস্কা, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দু-একটা জায়গা ছাড়া এই সব বরফের দেশে মানুষের বসবাস নেই। সাধারণ জাহাজ এই সব দেশের তুষার-নদীতে যাতায়াত করতে পারে না। সেখানকার যান হলো বল্গাহরিণের টানা স্লেজগাড়ী। অথচ এই সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আলাস্কার কথাই ধরা যাক—বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে 2 হাজার থেকে 4 হাজার কোটি ব্যারেল তেল সঞ্চিত আছে। এত বেশী তেল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই তেল আনা যাবে কি করে, সেটাই হলো সমস্যা। আলাস্কা থেকে আমেরিকার পূর্বাংশে চেষ্টার সহরের শোধনাগারে এই তেল আনতে হলে কঠিন বরফ ভেঙে প্রায় দশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। এই দীর্ঘ পথে পাইপ-লাইন বসিয়ে তেল আনা যায় বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং প্রচণ্ড শৈত্যে সেই পাইপ-লাইন কত দিন স্থায়ী হবে এবং পাইপের ভিতর তেল জমে গিয়ে পাইপ ফাটিয়ে দেবে কিনা—সে সব কথাও ভাববার বিষয়।

এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে গত বছর আমেরিকার এক তৈল কোম্পানী (হাম্বল অয়েল অ্যাণ্ড রিফাইনিং কোং) একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফল হন। 1005 ফুট লম্বা ম্যানহাটান নামে একটি দেড় লক্ষ টনের তেলবাহী জাহাজ 24 আগষ্ট, 1969 সালে পেনসিলভেনিয়ার চেষ্টার সহর থেকে 95 জন নাবিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিক নিয়ে যাত্রা সুরু করে। বরফের স্তূপ ভাঙতে হবে জেনে সঙ্গে নিয়েছিল দুটি বরফ-ভাঙবার জাহাজ (আইস ব্রেকার) এবং কয়েকটি হেলিকপ্টার—আশেপাশে চারদিকে নজর রাখবার জন্যে। গ্রীনল্যাণ্ডের তটভূমি পার হবার পরেই আরম্ভ হলো পথের দুর্গমতা। কয়েক দিন নরম বরফ ঠেলে জাহাজ অগ্রসর হলো। তারপর আর এগুলো গেল না, যদিও জাহাজের মাথাটা বরফ-ভাঙবার উপযোগী করে বিশেষ ধরণের ইস্পাতে তৈরি ছিল। এবার বরফভাঙবার জাহাজ দুটি জমাট বরফ ভাঙতে আরম্ভ করলো। বিরাট বিরাট বরফের চাং ভেঙে ফেলে ক্রমাগত জাহাজের পথ করে দিতে থাকে। এমনিভাবে ম্যাক ক্লিওর প্রণালীতে এসে জাহাজ 12 ঘণ্টা আটকে পড়ে থাকলো। এখানকার বরফেরস্তূপ বহু বছরের পুরনো হওয়ায় তার কাঠিন্য ছিল অত্যন্ত বেশী। যতদিন যায় ততই সামুদ্রিক বরফের লবণের ত্যাগ করতে থাকে, ফলে বরফ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এই আতঙ্কায় জাহাজটি আর অগ্রসর হতে না পেরে দিক পরিবর্তন করে প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্‌ প্রণালীতে ফিরে যায়। আবার বরফ-ভাঙবার জাহাজ গেল এগিয়ে, বরফের স্তূপ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রধো উপসাগর পর্যন্ত পথ পরিষ্কার করে দিয়ে উত্তর আলাস্কায় পয়েন্ট-ব্যারোস্থিত তৈলস্তূপ পর্যন্ত ম্যানহাটানের পথ করে দিল। তার পর সেখান থেকে তেল নিয়ে নক্ষেবরে ফিরে এলো ম্যানহাটান আমেরিকায়। যাওয়া-আসায় খরচ পড়লো চার কোটি ডলার। এত খরচ করে কোম্পানীর লাভ থাকলো কিনা, জানা যায় নি। তবে পাইপ দিয়ে তেল আনতে হলে ব্যারেলপ্রতি খরচ হতো এর চেয়ে 60 শতাংশের বেশী। এই অভিযান সবত সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভজনক করতে হলে তেল সংগ্রহের ব্যাপারে আরও ব্যয়-সংক্ষেপ করা যায় কিনা তাই এখন ভেবে দেখা হচ্ছে।

হিমাঙ্কের নীচে জীবন

দেবব্রত নাগ এবং জগৎজীবন ঘোষ*

পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সেখানে কত যে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জীবন ছড়িয়ে আছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ওরা সবাই কোন না কোন রকমে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। জীব-জগতের এক-একটি প্রাণী বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে আছে। যারা প্রতিকূল অবস্থা সামলে উঠতে পারে নি, তারা ক্রমশঃ তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এখনও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এমন অনেক জীব বাস করছে, যারা হিম-শীতলের নীচের তাপমাত্রায় থাকতেই অভ্যস্ত। এমন একটি প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে—তা সঠিক বলা শক্ত। তবে মানব-কল্যাণে এর বিশিষ্ট ভূমিকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রবন্ধে আমরা হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতা উপেক্ষা করে কিভাবে বিভিন্ন প্রাণী বেঁচে থাকে, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হিমশীতল অঞ্চল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। উষ্ণতা কোথাও হিমশীতলের নীচে $-70°C$ আবার কোথাও হিমশীতলের অনেক উপরে প্রায় $+40°C$। যদিও ক্রান্তি অঞ্চলের উঁচু জায়গা-গুলি বাদ দিলে সেখানকার উষ্ণতা শীত-গ্রীষ্মে কখনই হিমাঙ্কের নীচে নামে না। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের উষ্ণতা কিন্তু শীত-গ্রীষ্মে সব সময়েই হিমশীতল কিংবা তারও নীচে থাকে।

হিমাঙ্কের নীচে বেঁচে থাকবার প্রকারভেদ—প্রাণীদের দেহে জলের আধিক্য সবচেয়ে বেশী। হিমাঙ্কের নীচে ঐ জল বরফে পরিণত হয়, কিন্তু তবু এমন একটি প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার তাগিদে কিছু কিছু প্রাণীর দেহকোষে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন সব বিবর্তন হয়েছে, যা ওদের বাঁচিয়ে রাখছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় বেঁচে থাকবার কারণগুলি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় যে সব প্রাণী বেঁচে থাকে, তারা মূলতঃ দু-রকমের। একদল হিমশীতলের প্রভাব নানাভাবে এড়িয়ে চলে। অন্য দল জীবন-চক্রের কোন এক সময়ে হিমশীতলের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে প্রচণ্ড সহন-ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

হিমশীতল অবস্থা ভালবাসে যারা—হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় থাকতে যারা অভ্যস্ত তারা অনেক রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের মাছগুলির কথা বলা যায়। ঐ সব অঞ্চলে পাহাড়ের মধ্যে বহু জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে জলাশয়গুলির উপরি-তলের উষ্ণতা $+5°C$-এর বেশী ওঠে না, কিন্তু শীতকালে জলের উষ্ণতা প্রায় $-1.7°C$ নেমে যায়। যে সব মাছ জলাশয়গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে তাদের রক্তের হিমাঙ্ক $-0.6°C$। সুতরাং শীতকালে যখন জলাশয়গুলির উষ্ণতা $-1.17°C$-এ থাকে, তখন তাদের রক্ত

*প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেছে, শীতকালে ওদের রক্তের হিমাঙ্ক −0·8°C-এরও নীচে নেমে যায়। শীতকালে ঐ অঞ্চলে কড্ মাছ এবং ফ্লাউণ্ডার মাছের রক্তের হিমাঙ্ক যথাক্রমে −1·47°C এবং −1·50°C থাকে। কি কি বিশেষ কারণে কড্ এবং ফ্লাউণ্ডার মাছের রক্তের হিমাঙ্ক শীতকালে কম থাকে, তা জানতে গিয়ে দেখা গেল যে, শীতকালে যখন ঐ সব মাছ হিমশীতলের নীচে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের রক্তে বিশেষ এক রকম রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। অনেক পরীক্ষা করেও বৈজ্ঞানিকেরা ঐ মাছগুলির রক্ত থেকে সঠিক পদার্থটি উদ্ধার করতে পারেন নি।

হিমশীতলতা এড়িয়ে চলে যারা—কিছু সংখ্যক প্রাণী দেখা যায়, যারা হিমশীতলতা কিংবা তার নীচের উষ্ণতায় থাকতে পারে না। এরা প্রধানতঃ পাখী এবং স্তন্যপায়ী জীব। বিভিন্ন উষ্ণতার তারতম্য সহ্য করবার জন্যে এদের কারুর দেহে প্রচুর চর্বি থাকে আবার কারুর দেহে প্রচুর লোম থাকে, আর পাখীদের থাকে প্রচুর পালক। এদের মধ্যে যারা শীতকালটা জড়বৎ কাটিয়ে দেয়, তারা সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অনেক কাজকর্ম সেরে রাখে। শীতকাল সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের উষ্ণতা স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে থাকে, যদিও এরা বেশী শীত সহ্য করতে পারে না এবং হিমশীতলতার নীচেও বাঁচতে পারে না। যদি স্থানীয় উষ্ণতা হিমশীতলতার কাছাকাছি নেমে যায়, তবে এরা নিষ্ক্রিয় জড় অবস্থা থেকে আবার জেগে ওঠে এবং অধিক পাচন প্রক্রিয়া থেকে প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করে।

হিমশীতলতায় বেঁচে থাকে কেমন করে—ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের কড্ ও ফ্লাউণ্ডার মাছের কথা আগেই বলেছি। ঐ অঞ্চলে কিছু সংখ্যক জলাশয় আছে, যেখানে আরও একদল মাছ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে বেঁচে আছে। এদের বেঁচে থাকবার উপায়টি বুঝতে গেলে হিমশীতলতার নীচের উষ্ণতা সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, একটি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে তাকে না নেড়ে উষ্ণতা যদি খুব ধীরে ধীরে হ্রাস করা যায়, তবে দেখা যাবে হিমশীতলতার নীচে প্রায় −20°C উষ্ণতায়ও ঐ জল বরফে পরিণত হয় না। এটি জলের অতিশীতল অবস্থা। ঐ অবস্থায় পাত্রটিকে একটু নেড়ে দিলে কিংবা পাত্রে একটি ছোট্ট বরফকণা ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। অতিশীতল অবস্থায় জল জমে বরফ না হবার ঘটনাকে কিছু কিছু মাছ কাজে লাগিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকবার পথ সুগম করে নিয়েছে। সাধারণতঃ ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের জলাশয়গুলিতে যে সব মাছ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের রক্তের হিমাঙ্ক −0·9°C থেকে −1·0°C। কিন্তু জলাশয়ে নীচে যে সব অঞ্চলে মাছগুলি ঘুরে বেড়ায়, সেখানকার উষ্ণতা বছরের সব সময়ই প্রায় −1·7°C-এ থাকে। উল্লেখযোগ্য মাছগুলি হলো—Boregadus saida, Lycodes turneri, Liparis koefoedi, Gymnacanthus tricuspis এবং Icelus spatula। এদের অতিশীতল অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে যদি একটি জলাশয়ে বরফ দিয়ে রাখা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যখন এরা জলাশয়ের নীচে অতিশীতল অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, তখন ওরা বেশ ভালভাবেই বেঁচে থাকে। কিভাবে মাছগুলি বেঁচে থাকে, তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বছরের সব সময় ওরা ওদের রক্তের উষ্ণতা অতিশীতল অবস্থায় রাখতে পারে। যদিও অতিশীতল অবস্থায় সামান্য আলোড়নের ফলে রক্ত জমে কঠিন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক,

তথাপি পরীক্ষা করে মাছগুলির রক্তে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে, যা অতিশীতল অবস্থায় মাছগুলির রক্ত জমতে বাধা দেয়।

হিম-রোধক পদার্থ—কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ রক্তকে অতিশীতল অবস্থায় তরল রাখতে সাহায্য করে, তা জানবার জন্যে বিশেষ রকম পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার উপাদান হিসাবে কিলি ফিস নামক মাছকে কাজে লাগানো হয়। অনেকগুলি মাছকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক-একটি ভাগের মাছকে বিভিন্ন উষ্ণতায় থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়। যে সব মাছ 20°C এবং 10°C-এ থাকতে অভ্যস্ত, তাদের রক্তে বিশেষ কোন রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। যদিও উষ্ণতা আরও কমতে থাকলে রক্তে কতকগুলি পদার্থের আধিক্য লক্ষিত হয়। আবার কতকগুলি পদার্থের পরিমাণের কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায় নি। যে সব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে, সেগুলি হলো সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম যখন মাছগুলিকে প্রায় −1°C-এ থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়, তখন তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তে দেখা যায়। যদিও অন্যান্য পদার্থগুলির বিভিন্ন উষ্ণতা পরিবর্তনের ফলে বিশেষ কোন তারতম্য হয় না বললেই চলে। কেবল গ্লুকোজই নয়, গ্লুকোজের সমজাতীয় আরও কতকগুলি পদার্থ, যেমন—সরবিটল, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, ম্যানিটল ইত্যাদি পদার্থগুলি অতিশীতল অবস্থায় রক্তকে তরল রাখতে সাহায্য করে। পদার্থগুলিকে হিমরোধক (Cryoprotective agents) বলা হয়। কতকগুলি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি দিয়ে দেওয়া গেল।

যদি এই সব জৈব পদার্থের গঠন-প্রকৃতি ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে এদের সবার মধ্যেই বহু সংখ্যক হাইড্রক্সিল বা —OH মূলক আছে। এথেকে ধারণা হয় যে, যে সব পদার্থে −OH মূলক অধিক সংখ্যায় থাকে, সেগুলি অতিশীতল অবস্থায় রক্তকে অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে। যদিও কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি অতিশীতল

কয়েকটি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি।

ইত্যাদির আয়ন এবং প্রোটিন নয় এমন নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ—কোলেস্টেরোল, গ্লুকোজ ইত্যাদি। আর যে সব পদার্থ প্রায় একই পরিমাণে থাকে, সেগুলি হলো পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট, ফস্ফেট আয়ন এবং প্রোটিন। অবস্থায় রক্তকে জমতে দেয় না, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

তবে অনুমান হিসাবে বলা যায় যে, উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জলের অণুগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে জলকে বরফে পরিণত

হয়, কিন্তু উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থগুলিতে একাধিক –OH মূলক থাকায় ওগুলি জলের অণুগুলিকে হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হতে বাধা দেয়।

হিমাঙ্কের নীচে প্রাণীর সহনশক্তি—হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় যে সব প্রাণী নানা কলাকৌশল আয়ত্ত করে বেঁচে থাকে, এপর্যন্ত তাদের কথাই বলা হয়েছে! এবার যাদের কথা বলবো, তারা প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার সহনক্ষমতা অর্জন করেছে। এরা জীবন-চক্রের কোন এক সময় –273°C-এর কাছাকাছি উষ্ণতা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, গাছের অঙ্কুর কিংবা বীজের অতিশীতল অবস্থা সহ্য করতে পারবার কারণ হলো—এরা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি অনার্দ্র হতে পারে। ফলে কোষের ভিতর বরফকণা জমে কোষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর একটি কারণ হলো—যতই এরা অনার্দ্র হতে থাকে, ততই কোষের ভিতরকার পদার্থগুলি ঘনীভূত হতে থাকে, ফলে যদিও বা অল্প পরিমাণ জল থেকে যায়, তার হিমাঙ্ক 0°C-এর অনেক নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়।

কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন?—সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, কোষের ভিতরকার জল বরফে পরিণত হলেই কোষের বেশী ক্ষতি হয়, কিন্তু কোষের বাইরের জল বরফ হলে তা কোষকে সঙ্কুচিত করে বটে, কিন্তু কোষের খুব একটা ক্ষতি হয় না। কোষের ভিতর জল বরফে পরিণত হলে তা কোষের বিভিন্ন সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের গঠন-প্রকৃতি পাল্টে দেয়; ফলে কোষের প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধরণের যুক্তি সব সময় খাটে না। কখনও কখনও দেখা গেছে যে, কোষের বাইরে জল বরফ হওয়ায় কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। বলা হয়েছে যে, উষ্ণতা কমবার সঙ্গে সঙ্গে কোষ ক্রমশঃ অনার্দ্র হতে থাকলে কোষের বাইরে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। কোষের ভিতরে জলের পরিমাণ কমবার ফলে প্রধানতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং কোন এক সময় প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবার জন্যে কোষের প্রোটিন অণুগুলির গঠন-প্রকৃতি পাল্টে যায়; ফলে প্রোটিনগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। প্রোটিন অকেজো হলে কোষের বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বিঘ্নিত হয়। এসব ক্ষেত্রে গ্লিসারল কিংবা অন্যান্য শর্করা জাতীয় পদার্থগুলি কোষের ভিতরকার দ্রবণের হিমাঙ্ক কমিয়ে দেয় বলে জল জমে বরফ হতে পারে না। এমন কি, যে ঘনত্বে সোডিয়াম ক্লোরাইড কোষের ক্ষতিসাধন করে, তাও হতে বাধা দেয়।”

হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থায় জীব-কোষ যে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার আরও একটি কারণ জানা গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রোটিন অণুতে বহু সংখ্যক –SH মূলক থাকে। এগুলিকে থায়োল (Thiol) মূলক বলা হয়। উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোষ যখন অনার্দ্র হতে থাকে, তখন কোন এক বিশেষ উষ্ণতায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর জুড়ে যায়। একটি প্রোটিন অণুর বহু সংখ্যক –SH মূলক অপর একটি প্রোটিন অণুর –SH মূলকের খুব কাছাকাছি এসে ঐ –SH মূলকগুলির মধ্যে বিনিময় কিংবা—SH মূলকগুলি জারিত হয়ে —S—S— বন্ধনী তৈরি হয়। এভাবে দুটি প্রোটিন অণু জুড়ে একটি নতুন প্রোটিন অণু তৈরি হতে পারে। এবার উষ্ণতা কিংবা কোষের আর্দ্রতা বাড়িয়ে দিলে নতুন প্রোটিন অণুটির গঠনে বিকৃতি ঘটে। এমনি করে প্রথমে উষ্ণতা হ্রাস এবং পরে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রোটিন অণুগুলি প্রাণ-রাসায়নিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। গ্লিসারল কিংবা ঐ ধরণের অণুগুলি যে সব

জীব-কোষে পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রোটিন অণুর —SH মূলকের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি করে। ফলে অতিশীতল অবস্থায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হতে পারে না এবং প্রোটিনের প্রাণ-রাসায়নিক গুণাবলীও বজায় থাকে।

হিম-জীববিদ্যার ভবিষ্যৎ—হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থায় প্রাণীদের বেঁচে থাকবার মূলে যে সব কারণগুলির কথা বলা হয়েছে, মানব সমাজে তা কি কি কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে অনেকেই চিন্তা করতে সুরু করেছেন। হিমশীতল অবস্থায় জীবকোষের বহু প্রয়োজনীয় ধর্মগুলি অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষের জীবনকাল সুদীর্ঘ করতে কিংবা মানুষের জরা রোধ করতে এই ধরণের পরীক্ষার যথেষ্ট মূল্য আছে বলে মনে হয়। হিমশীতল কিংবা অতি-শীতল অবস্থার প্রয়োজনীয়তা শল্যচিকিৎসায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

যদিও হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থা সহ্য করে কিছু সংখ্যক প্রাণী বেঁচে থাকে, তথাপি মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে এত কম উষ্ণতা সহ্য করা সম্ভব নয়। হিমশীতল অঞ্চলে যে সব মানুষ বাস করে কিংবা যে সব অতন্দ্র প্রহরী দিনের পর দিন প্রবল শীত সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রায়ই তাদের হাতের আঙুল খসে পড়তে দেখা যায়। এর কারণ হলো আঙুলের surface area বেশী থাকবার দরুণ খুব সহজেই ঐ অঙ্গগুলি শৈত্যের প্রভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে সাধারণভাবে রক্ত চলাচল হতে পারে না—এমন কি, পাচন প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন উপযুক্ত তাপও সরবরাহ হতে পারে না। ফলে ঐ অঙ্গগুলির কোষের সক্রিয়তা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে এবং কোন এক সময় আঙুলগুলি খসে পড়ে।

তবে প্রাণীদের শীত সহ্য করবার ক্ষমতা বাড়ানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে একদল বৈজ্ঞানিক ইতিমধ্যে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরের শীত সহ্য করবার ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। স্ত্রী-ইঁদুরগুলিকে যদি বাল্যাবস্থায় ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত করা যায়, তবে ওদের বাচ্চাগুলি শীত সহ্য করবার ক্ষমতা লাভ করে। শীতপ্রধান জায়গায় যে সব মানুষ বাস করে, তাদের দেহে অধিক তাপ প্রধানতঃ পাচন প্রক্রিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের শীতপ্রধান স্থানে বেশ কিছুদিন রাখলে তাদের সন্তানেরা কতটা শীত সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করবে, তা ভাল ভাবে জানা নেই। এই সম্পর্কে ভালভাবে পরীক্ষা হলে তা হিমশীতল অবস্থা সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করতে মানুষকে সাহায্য করবে। কেবল তাই নয়, হিমরোধক পদার্থগুলি কিভাবে শীতপ্রধান স্থানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন থেকেই সুরু হওয়া উচিত।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল থেকে এখনও কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা অন্য গ্রহে প্রতিকূল অতিশীতল অবস্থায় বেঁচে আছে, এমন একটি জীবসমাজের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

লিউকেমিয়া রোগের ওষুধ আবিষ্কার

বোম্বাই থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, ক্যান্সার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের একজন গবেষক ডাঃ এম এস. সহস্রবুধের পরিচালনায় লিউকেমিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য লাভ করেছেন। লিউকেমিয়া রোগ হলো রক্তের শ্বেত কণিকার ক্যান্সার।

ডাঃ সহস্রবুধ গত 24শে অক্টোবর সাংবাদিকদের জানান যে, তাঁরা অ্যান্টি-লিউকেমিয়া সিরাম উৎপাদনের একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর প্রয়োগে শরীরের স্বাভাবিক কণিকাগুলিতে বা অন্যান্য ব্যাপারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। তিনি বলেছেন, সুস্থদেহের 'ও' গ্রুপের রক্তের শ্বেত কণিকার সঙ্গে উপযুক্তভাবে একটি রাসায়নিক ফ্লুরো-ডি-নাইট্রো-বেঞ্জিন মিশিয়ে সেটি তাঁরা অ্যান্টিজেন হিসাবে ইঁদুর, ঘোড়া ও লিউকেমিয়া রোগগ্রস্ত মানুষের দেহেও ব্যবহার করেছেন।

ধূমপানের কুফল

বেশী সিগারেট খেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রে যে ক্যান্সার হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন পঃ জার্মেনীর হামবুর্গ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাক্তার ওয়াল্টার ডোন্টেনহিল। সেড-খ' ইঁদুরকে একটানা আশীটি সিগারেটের ধোঁয়া শুঁকিয়ে শুঁকিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদের বেশীর ভাগের ফুসফুসে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটে। পঃ জার্মেনীর সিগারেট শিল্পের তরফ থেকে এই গবেষণা চালানো হয়েছিল। সিগারেট কোম্পানীগুলি এখন মৃদু সিগারেট তৈরির কথা চিন্তা করছে। ডাক্তার ডোন্টেনহিলের গবেষণায় দেখা গেছে যে, তামাককে ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে শোধন করলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এজন্যে ভবিষ্যতে নাকি তামাকের রাংতা (ফয়েল) দিয়ে সিগারেট তৈরি হবে।

পারমাণবিক ঘড়ি

লক্ষ বছরে এক সেকেণ্ডের হেরফের হলেও হতে পারে—এরকম একটি পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি হয়েছে পশ্চিম জার্মেনীতে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সেকেণ্ডের ব্যাখ্যা নির্ভুল নয়, 9, 172, 671, 770 সিজিয়াম অ্যাটমের স্পন্দনে যে সময় লাগে, তাকেই প্রকৃত এক সেকেণ্ড বলা চলে। এই ঘড়িতে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক থেকে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্যে এই ঘড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শুক্রগ্রহের রহস্য

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহটি হলো পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। মহাকাশ-যুগে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারে যে সকল গ্রহ মানুষের দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে এই গ্রহটি অন্যতম। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গ্রহাভিমুখে নতুন আর একটি তথ্যসন্ধানী রকেট প্রেরণের পর এই গ্রহ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আরও অনেকখানি বেড়ে গেছে। মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরাও শুক্রের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে কিভাবে কখন এই গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, কি কি উপাদানে এই গ্রহ গঠিত—ইত্যাদি বিষয় জানবার জন্যে খুবই উৎসুক। পৃথিবীসহ সৌরমণ্ডলীর প্রায় সকল গ্রহই ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, তার বিপরীতমুখী হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

নিজের অক্ষদণ্ডের উপরেও ঐ সকল গ্রহ এই ভাবেই আবর্তিত হচ্ছে। শুক্রগ্রহও ঐ সকল গ্রহের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এই গ্রহটি নিজের অক্ষদণ্ডের উপর অন্যান্য গ্রহের মত আবর্তিত হয় না—ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, এটি সেই দিকেই ঘুরছে; অর্থাৎ শুক্রগ্রহে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে দেখবে শুক্রের আকাশে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হচ্ছে আর অস্ত যাচ্ছে পূব দিকে। বিজ্ঞানীরা আজও এই রহস্যের সন্ধান করতে পারেন নি।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'

সম্প্রতি বহরমপুর থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা (55, একজিবিশন বাগান রোড, গোরাবাজার, ডাকঘর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মূল্য প্রতি সংখ্যা 25 পয়সা) প্রকাশিত হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে (1970) পত্রিকাটির এক বছর পূর্ণ হবে। মফঃস্বলে প্রকাশিত এই জাতীয় বিজ্ঞান মাসিকের গুরুত্ব যথেষ্ট। পত্রিকাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধাদি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরও নানা তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দু-একখানা দিতে পারলে পত্রিকাটি সাধারণের কাছে আরও আকর্ষণীয় হতো। আমরা পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শল্যচিকিৎসকদের ব্যবহারোপযোগী লেসার রশ্মির এক রকম আলোর ছুরি। এই ছুরিটিকে যে কোন দিকে নড়ানো যায়। লেসার রশ্মিকে বাহুর উপরে স্থাপিত প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন ভাবে বিচরণ করা যায়।

শোক-সংবাদ

প্রোফেসর সি. ভি. রামন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রোফেঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন গত 21শে নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরে 82 বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

প্রোফেঃ রামন 1888 সালের 7ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করবার পূর্বেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 1906 সালে আলোক-বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় লণ্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সুবিধা ছিল না। কাজেই তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদান করেন এবং পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মাত্র 19 বছর বয়সে গেজেটেড অফিসাররূপে ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হন। 1907 সালের জুন থেকে 1917 সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি কলকাতা, নাগপুর এবং রেঙ্গুনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিরত থাকেন নি। এই সময়ের মধ্যেই নেচার, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

গবেষণার কৃতিত্বের জন্যে তাঁর প্রতি বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং 1915 সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত চেয়ার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বিজ্ঞানের সেবায় পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বলে ভবিষ্যৎ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি স্যার আশুতোষের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে 1917 সালে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। ষোল বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1921 সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি-নিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে যান। তিনি কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারের এই ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েসনের লেবরেটরীতে তাঁর অধিকাংশ গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছিল।

1924 সালে প্রোফেসর রামন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই তিনি যুক্তরাজ্যে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন। তিনি টরোণ্টোতে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন এবং ইটালীর ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ম্যাথেমেটিক্সের অধিবেশনে আলোর বিচ্ছুরণ বা স্ক্যাটারিং সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটের শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার সময় প্রোফেসর রামন প্রোফেঃ আর. কে. মিলিকানের আমন্ত্রণে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে চার মাস অতিবাহিত করেন। 1925 সালে তিনি

ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বছরেই মস্কো ও লেনিনগ্রাড অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের আমন্ত্রণে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন।

1929 সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রোফেসর রামনকে নাইট উপাধিদানে সম্মানিত করেন। 1928 সালে ইটালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্সেস ম্যাটেউচি মেডাল এবং 1930 সালে রয়েল সোসাইটি হিউজেস মেডাল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। 1930 সালে তিনি রামন এফেক্ট নামক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নোবেল পুরস্কারের অর্থের বৃহদংশই তাঁর লেবরেটরীর কাজের জন্যে (ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী) হীরক ক্রয়ে ব্যয় করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্তও তিনি হীরক সংগ্রহ করে গেছেন এবং মোট 700-এর বেশী হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন। 1941 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ করেন। ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং 1948 সালে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

'মলিকিউলার স্পেক্ট্রাম' সম্বন্ধে আলোচনার উদ্বোধনের জন্যে 1929 সালে তিনি ফ্যারাডে সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং এই উপলক্ষে ইউরোপের বহু গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে 1930 সালে, প্যারিসে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ উপলক্ষে 1932 সালে, প্যারিস এবং বলোগ্নায় আন্তর্জাতিক ফিজিক্স কংগ্রেস উপলক্ষে 1937 সালে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স-এর সম্পাদনাও করেছেন।

1933 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন এবং চার বছর পরে পদত্যাগ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1943 সালে তিনি রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অনেক সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন। প্যারিস ইউনিভার্সিটি অনারেরী ডি. এস-সি, গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি এল. এল. ডি., ফ্রেইবার্গ ইউনিভার্সিটি অনারেরী পি-এইচ. ডি ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, বারানসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে অনারেরী ডি. এস-সি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। গ্লাসগোর রয়েল ফিজিক্যাল সোসাইটি, জুরিক ফিজিক্যাল সোসাইটি, মিউনিকের ডয়েট অ্যাকাডেমি, হাঙ্গেরিয়ান সায়েন্স অ্যাকাডেমি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ও ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আমেরিকার অপ্‌টিক্যাল সোসাইটির অনারেরি ফেলো এবং ফরাসী অ্যাকাডেমির করেন অ্যাসোসিয়েট এবং রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের করেস-পণ্ডিং মেম্বর নির্বাচিত হন। 1949 সালে প্রোফেঃ রামন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন। 1954 তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 1961 সালে তিনি পন্টি-ফিক্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে নির্বাচনের জন্যে ভ্যাটিকান কর্তৃক মনোনীত হন। 1957 সালে তিনি আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার লাভ করেন।

প্রোফেসর রামন অন্তরের কামনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জীবনসায়াহ্নেও সেই গবেষণা চালিয়ে গেছেন—এটাই হলো

হলো তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদেশের গবেষণাগারসমূহে শিক্ষালাভ না করেও নিজের চেষ্টায় তিনি বিজ্ঞানীমহলে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নীরস পদার্থবিজ্ঞায় গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও প্রোফেঃ রামনের সৌন্দর্যস্পৃহা এবং রসবোধও কম ছিল না। সঙ্গীত যন্ত্র, আলোক-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি, সমুদ্রের রং, পাখীর পালকের বর্ণ-বৈচিত্র্য, শামুক-ঝিনুকের খোলার রামধনুর রং, স্ফটিকের কম্পন, বিশেষ করে ফ্লোরেসেন্স, ফস্‌-ফোরেসেন্স প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌসাদৃশ্য বিষয়ে বিবিধ গবেষণার মধ্যেও তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাকশন এবং ফুলের রং সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। প্রোফেঃ রামন এবং তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করলেও মূলতঃ সেগুলি আলোক-বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। ক্রিষ্ট্যাল-ফিজিক্স, বিশেষতঃ ডায়মণ্ড-ফিজিক্সের উপরই তাঁর অনুরাগ ছিল বেশী। বিজ্ঞানীমহলে ডায়মণ্ড-ফিজিক্স সম্বন্ধে প্রোফেঃ রামন ছিলেন একজন অবিসম্বাদী বিশেষজ্ঞ।

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি, অবিভক্ত বাংলার কৃষি বিভাগের শারীরবৃত্তির রসায়নবিদ্ এবং ভারত সরকারের সহ-কৃষি কমিশনার ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় গত 27শে অক্টোবর 1970, ভোরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 85 বৎসর। সম্প্রতি তাঁর জামাতা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজি ও সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ জে. বি. মুখার্জীর অকাল মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান।

তিনি বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও নাগপুরের কৃষি কলেজে শিক্ষালাভ করবার পর শিক্ষানবীশ হিসাবে নাগপুর এবং পরে পুসার ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে Dr. J. W. Heathe-এর তত্ত্বাবধানে কৃষি-রসায়ন এবং জীবাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেন। Sabour Agricultural Callege-এ কৃষিবিষয়ক শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্ম-জীবন শুরু করেন (1912—1915)। অতঃ

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক Agricultural Chemist-এর বিভাগে তিনি যোগদান করেন। তাঁকে 1932 সালের জানুয়ারী মাসে অবিভক্ত বাংলার Physiological Chemist হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি Agricultural Chemist হিসাবেও কিছুকাল কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি Indian Institute of Dairing and Animal Husbandry-তে (ব্যাঙ্গালোরে) প্রখ্যাত গবেষক Dr. F. J. Warth-এর তত্ত্বাবধানে প্রাণীর পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা করেন। 1943 সালে

এই কাজ থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ভারত সরকারের সহকারী কৃষি অধ্যক্ষরূপে এবং 18 মাস এগ্রিকালচার্যাল কমিশনারের অনুপস্থিতিতে কমিশনারের গুরু দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি সর্বপ্রথম এই পদের অধিকারী হন। এর পর তাঁর বার্ধক্য সত্ত্বেও ডক্টর পি. সি. মহলানবীশ তাঁর ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষণামূলক কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও 75-80 বছর বয়স পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

Physiological Chemist থাকবার সময় তিনি তাঁর সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রাণীদের পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় নিয়োগ করেন এবং প্রাণীদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর উদ্ভাবিত পরিপাক পরিমাণ নিরূপণের পদ্ধতি (Special method of estimating digestibility) ভারতের বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া তিনি চুনের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবদেহে কম্প্লেক্টের রাসায়নিক রূপান্তর বা বিপাক সম্বন্ধীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পুষ্টি ও কৃষি এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে এই সব বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। এই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বসুন্ধরা ইত্যাদিতে খাদ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর "Is our country really deficeit in food" নামক পুস্তিকা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তিনি কর্মজীবনে কৃষি ও পুষ্টি সম্বন্ধে যথাক্রমে পনেরো ও একুশটি, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে উনিশটি, একটি হিন্দীসহ আঞ্চলিক ভাষায় উনত্রিশটি এবং প্রখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী বিষয়ে চারটি—মোট অষ্টআশীটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

তিনি নিজের গবেষণা ও অনুরূপ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Dept. of Agr. West Bengal, Indian Science Congress ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি ভারত সরকারের Imperial Council of Agricultural Research এর সদস্য এবং পরে Indian Council of Agricultural Research-এর সদস্য ছাড়াও Nutrition paper-এর Specialist Refree ছিলেন। তিনি West Bengal Board of Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary, State Agricultural Research Committee, Faculty of Agriculture, Indian Dairy Science Association, Indian Science Congress, Socio-Economic Research Institute, Calcutta Science Club, Bharatiya Sanskrit Parishad এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

রেডিও-ফটো

খবরের কাগজ বা কোন সাময়িক পত্রিকা খুলে যখন চোখ বুলিয়ে দেখ, তখন চোখে পড়বে হঠাৎ একটা ছবি, যার তলায় ছোট করে লেখা আছে—রেডিও ফটো। এই সম্পর্কে তোমাদের জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না, যে ক্যামেরা সাধারণতঃ তোমরা দেখে থাক তাতে ছবি তোলা খুবই সহজ—তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠানো খুবই শক্ত ব্যাপার। এই সব ক্ষেত্রে যে আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাকে বলে বেতারচিত্র বা Radio-photographic পদ্ধতি। এখানে মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির সঙ্গে টেলিভিশনের তফাৎ আছে। বেতারচিত্র প্রেরণ পদ্ধতিতে প্রেরিত চিত্রটির সঙ্কেত কোন দূরবর্তী স্থানে পাঠাবার পর তার একটি নিখুঁত স্থির চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে হবে ঠিক তার বিপরীত; অর্থাৎ চলমান চিত্রটি বেতারে প্রেরণ করবার পর দর্শক তার সামনে ঠিক সেই দৃশ্যটির চলমান অবস্থার তাৎক্ষণিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। যাহোক, রেডিও ফটোগ্রাফিতে তোলা ছবি বেতার-তরঙ্গ মারফৎ এসে ধরা দেয় একটা বিশেষ ধরণের গ্রাহক-যন্ত্রে এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রকার কাগজে তার ছাপার কাজ সরাসরি সংঘটিত হয়। এই ধরণের প্রত্যেক ক্যামেরার সঙ্গে একটি করে ফটো-ইলেকট্রিক সার্কিট থাকে, যা এর তোলা ছবি দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে সক্ষম হয়। যতটা সহজে বলা হলো এর গঠন-কৌশল কিন্তু ততটা সরল নয়। সেটা বুঝতে গেলে প্রথমতঃ ফটো-সেল সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হবে। এই ফটো-সেল বা আলোক-কোষের ব্যবহার আজকের যুগে অত্যন্ত ব্যাপক। রেডিও-ফটো ছাড়াও, বিভিন্ন প্রকার টেলিভিসন এবং দূরপাল্লার ক্ষেত্রে যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুর সরাসরি সঙ্কেত প্রেরণে এর জুড়ি নেই। ফটো-সেল এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে এক প্রকার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আলোর বিকিরণ ক্রিয়ার ফলে। এই বিদ্যুৎকে বলা হয় আলোক-বিদ্যুৎ বা ফটো-ইলেকট্রিসিটি।

সাধারণতঃ তিন রকমের ফটো-সেল আমরা দেখতে পাই—(1) ফটো-এমিসন জাতীয়, যার মধ্যে যে কোন একটি ইলেকট্রোডের উপর বিকিরিত আলো এসে পড়লে ইলেকট্রন

কণিকা নির্গত হয়; (2) ফটো-কণ্ডাক্টিভ জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো এসে পড়লে সেলের Ohmic বাধার সৃষ্টি করে। (3) ফটো ভল্টাইক জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো একটি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স উৎপন্ন করে। এর মধ্যে ফটো-ভল্টাইক জাতীয় সেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তার কারণ প্রধানতঃ তিনটি: (1) প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপত্তি, (2) যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন এবং (3) বাইরের কোন ব্যাটারীর সাহায্য ব্যতিরেকেই কর্মক্ষম। এছাড়া সকল প্রকার দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রেই এই সেলটিকে ব্যবহার করা চলে।

বেতার আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে এই কোষকে ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় কোষগুলির অবশ্য উন্নত সংস্করণের ইলেকট্রোডগুলি নানা প্রকার ধাতু এবং ধাতব যৌগিক দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে পাশাপাশি অবস্থিত থাকে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সাজানো থাকে: তামা এবং তামার অক্সাইড (Cu_2O) ঘটিত, রৌপ্য-লৌহের সেলেনাইড জনিত, লৌহ-সেলেনিয়াম জাতীয়।

এই ফটো-সেলের সঙ্গে বেতার আলোকচিত্র বা অন্য কথায় নিখুঁৎ চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রেডিও-ফটো যন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ আছে—একটির কাজ প্রেরণ করা আর অপরটির কাজ প্রেরিত চিত্র গ্রহণ করা।

1নং চিত্র
প্রেরক-যন্ত্র

1নং চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, প্রেরক-যন্ত্রের মুখ্য অংশগুলির মধ্যে আছে—(1) একটি নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণায়মান কম্পক (R. C. Osclillator), (2) একটি ছোট মোটর, যেটা গিয়ারের সাহায্যে স্যাফ্ট-এর সঙ্গে যুক্ত, (3) একটি লেড স্ক্রু, (4) একটি স্ক্যানিং বা বিশ্লেষক ড্রাম, (5) একটি উত্তেজক আলো এবং (6) একটি ফটো-টিউবের ব্যবস্থা।

এই যে ফটো-টিউব সার্কিট, এতে আছে একটি ফটো-সেল, যার একমাত্র কাজ

হলো, কোন বস্তু থেকে আসা আলো-কে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই এবার জানতে ইচ্ছা হয়, কেমন করে এই ছবি পাঠানো যায়। প্রথমে মোটরের সাহায্যে আবর্তিত স্যাফ্‌ট-এর সঙ্গে লাগানো বিশ্লেষক ড্রামটিকে স্যাফ্‌ট-এর চারদিকে ঘোরাতে হবে। এই ড্রামটির ঘূর্ণনকাল হবে প্রতি সেকেণ্ডে 1 পাক। এটা হবে নিজের চারদিকে। অপর দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর হবে প্রতি পাকে 1 ইঞ্চির 100 ভাগের এক ভাগ। এই ভাবে দৃশ্যটির বা ছবিটির প্রতিটি অংশ সরতে থাকবে এবং তার সামগ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থেকে আসা আলো ফটো-টিউবকে ক্রমাগত উত্তেজিত করবে। এইভাবে টিউবটি একটি নির্দিষ্ট হারে সমগ্র চিত্রটিকে বিভক্ত করবে। এই হারটি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে 1000টি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ। সুতরাং যদি চিত্রটিতে 500,000 মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থাকে, তবে ফটো-টিউবটি তাকে মাত্র 8 মিঃ সামগ্রিকভাবে ভাগ করতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম সময়ে এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকবে। সুতরাং ছবিটির নির্দেশ প্রেরণের কাজও খুব দ্রুতগতিতে হবে। এখন ছবি থেকে যে সঙ্কেত গেল, গ্রাহক-যন্ত্র তাকে ধরলো এবং প্রথমেই তাকে বর্ধিত করে নিল। ফলে একটি নির্দেশক নিওন আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোক রশ্মিকে একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পাঠানো হলে সেটা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবে একটি আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের উপর। এই কাগজটি জড়ানো থাকে একটি ড্রামের উপর। সমগ্র গ্রাহক-যন্ত্রটি প্রেরক-যন্ত্রের অনুরূপ। তবে এই যন্ত্রটি সাধারণতঃ একটি অন্ধকার ঘরে

2নং চিত্র
গ্রাহক-যন্ত্র

অথবা চতুর্দিক ঢাকা এমন একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যেখানে ঐ নিওন ল্যাম্পের আলো ছাড়া আর কোন বাইরের আলো প্রবেশ না করে। এখন গ্রাহক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামটি প্রেরক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামের সঙ্গে ঠিক সমহারে আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের একটি বিশেষ মৌলিক ক্ষেত্রাংশে পড়া আলোর তীব্রতা নির্ভর করে

সেই মুহূর্তে রেকর্ডার ল্যাম্পের উপর আসা আলোক-সঙ্কেতের তীব্রতার উপর। তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে, এই সংকেতের তীব্রতা নির্ভর করে ঐ মুহূর্তে প্রেরিত ছবিটির বিশ্লেষিত মৌলিক ক্ষেত্রাংশের ঔজ্জ্বল্যের উপর। অতএব চিত্র গ্রহণের কাগজটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বিভিন্ন তীব্রতার আলোক রশ্মির দ্বারা আলোকিত হয়। যখন বিশ্লেষণ-ক্রিয়া শেষ হয়, তখন কাগজটি ডেভেলপ করা হলে একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্তমানে সরাসরি প্রতিচ্ছবি গ্রহণের অনেকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, যার ফলে ফটোগ্রাফীর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, অন্ধকার প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির আর প্রয়োজন হয় না। পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটিতে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হয় একটি বিশেষ ধরণের কাগজের উপর দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে। গ্রাহক ল্যাম্পের পরিবর্তে সেখানে একটা ষ্টাইলাস অথবা অনুরূপ সুচালো কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটি জোরালো আলোক-সঙ্কেত গ্রহণ করবার পর প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-স্বরের সৃষ্টি হয় ড্রাম এবং ষ্টাইলাস প্রান্তের মধ্যে এবং লব্ধ বিদ্যুৎ-প্রবাহ কাগজটির সাদা অংশকে দহন করে আর সঙ্গে সঙ্গে কালো আস্তরণের সৃষ্টি হয়। এই আস্তরণের ঘনত্ব নানা জায়গায় নানা রকম হবার ফলে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের পর একটি নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন সঙ্কেতগুলির উপযুক্ত পরিবর্ধন এবং তাদের আপেক্ষিক প্রসারতা নির্দিষ্ট করলে তার ফলে পছন্দমত সাদা-কালোয় মেশানো একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়া যায়। তবে ঐ সঙ্কেতগুলিকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোন কোন সময় ছবি অস্পষ্ট হয়। কেন না, সে ক্ষেত্রে সঙ্কেতগুলির আসবার পথ খুব দীর্ঘ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নানা প্রকার গোলমালজনিত বাধা ছবির মধ্যে অসাম্য এবং দাগের সৃষ্টি করে। সেই কারণে একটি কম্পন-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বেতার আলোকচিত্র প্রেরণে কম্পন-নিয়ন্ত্রকটিকে 88 মেগা সাঃ থেকে 108 মেগা সাঃ ব্যাণ্ডে কাজ করানো হয়। আধুনিক কালে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি হয়েছে। এখন এক জোড়া নিয়ন্ত্রকের দ্বারা কম্পন-নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং গ্রাহক-যন্ত্রে কোন রকম অস্পষ্টতা বা এলোমেলো ভাব অনেকাংশে দূর করা হয় একটি Limiter-এর সাহায্যে। সঙ্কেতগুলির ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের ফলে একটি পরিষ্কার নিখুঁৎ আলোকচিত্র পাওয়া যায়।

এই ধরণের চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতি মিলিটারীতে এবং খবরের কাগজের অফিসে ব্যবহার করা হয়। আলোকচিত্র, লেখা বা ছাপানো কোন বিষয়, চার্ট বা মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি তাড়াতাড়ি পাঠাবার কাজ এর দ্বারা সহজে সম্ভব হয়। বড় হলে বিষয়টি আরও বেশী করে জানতে পারবে, তখন তোমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল

ভারতের জাতীয় পাখী—ময়ূর

অপরূপ রূপলাবণ্য এবং বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ময়ূর যে ভারতের জাতীয় পাখী, সে কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। ময়ূরকে ভারতের নিজস্ব পাখী বললে ভুল হয় না। এদেশের কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে প্রায় সব অঞ্চলেই ময়ূর পাওয়া যায়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এদের প্রায় সর্বত্রই দর্শন মেলে। পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ময়ূর দুর্লভ নয়। ভারত ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও এদের দেখা মেলে। ভারতে যে ময়ূর দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক নাম পাভো ক্রিস্টেটাস। আর মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে যে ময়ূর দেখা যায়, তাদের বলা হয়—পাভো মিউটিকাস।

ভারতীয় ময়ূর এদেশ থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যায়—আলেকজাণ্ডারের সময় এদেশ থেকে ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রীসে। সেখান থেকে যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। প্রায় দু-হাজার বছর আগে ইরানেও ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়।

ময়ূর সমতল ভূমি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে পারে, তবে তারা খুব উঁচু পাহাড়ে বাস করে না। পাহাড়, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়ের কাছে যদি জলের উৎস থাকে, তবে সেই সব জায়গা এদের পছন্দ। এরা খুব জল খায়, তাই বোধ হয় জলাশয়ের কাছাকাছি বাস করবার দিকেই ঝোঁক। ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের কাছে নদী-নালা আছে—এমন সব অঞ্চলেই তারা বাসা তৈরি করে।

ময়ূর সামাজিক পাখী। বনে-জঙ্গলে এরা ঘুরে বেড়ায় দলবেঁধে। একটি ময়ূর তিন-চার বা কিছু বেশী স্ত্রী-ময়ূর নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। দিনের বেলায় এরা মাটির উপর চরে বেড়ায়, তবে গাছের উপর যে থাকে না, তা নয়। দুপুরে কড়া রোদ উঠলে ঝোপ-ঝাড় বা বন-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সাধারণতঃ ভোরের আলো ফুটে উঠলে বা বিকেলের দিকে এরা বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে। এরা প্রায় সর্বভুক্—নানা রকম শস্য. ফলমূল, ফুলের কুঁড়ি, কচি পাতা, ঘাস-পাতা, ছোট ছোট সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী প্রভৃতি এদের খাদ্য। গৃহপালিত ময়ূর ধান, চাল, গম, যব, কপির পাতা, ফল ইত্যাদি খেয়ে থাকে। রাত্রিবেলায় এরা গাছের ডালে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং দলবল নিয়ে সারারাত সেখানেই কাটায়। ভোরের আলো ফুটে উঠলে আর সূর্য ডুবে গেলে এরা এক রকম শব্দ করে, যাকে বলা হয় কেকাধ্বনি। তবে ভয় পেলে এরা যে শব্দ করে, তা কিন্তু কেকাধ্বনি নয়।

ময়ূরের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর। শোনবার ক্ষমতাও বেশ আছে। সর্বদাই এরা খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করে। বনের মধ্যে কোন শত্রুর আগমন হলে এরা সহজেই তা বুঝতে পারে এবং চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর বিপদ-সঙ্কেত জানাতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে এক রকম শব্দ করে। এরা বেশ লাজুক পাখী। অনেক সময় ময়ূরের আওয়াজ পেলেও তাদের দেখা মেলা ভার। লোকালয়ের কাছাকাছি যে সব ময়ূর থাকে, তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবে অনেক সময় তাদের গ্রামের মধ্যে বা লোকালয়ে ঘোরাফেরা করতেও দেখা যায়। এরা পোষও মানে। পোষ মানলে ময়ূর মালিকের হাত থেকে খাবার নিয়ে খায় আর তার পিছনে পিছনে ঘোরে। তবে এরা অন্য কোন পোষা পাখীদের উপর বড় একটা সদয় ব্যবহার করে না।

প্রয়োজনমত ময়ূর হাঁটা-চলা বা ওড়া দুই-ই করতে পারে। নদী-নালা, জলাশয় প্রভৃতি তারা উড়ে পার হয়। আবার বিপদের সময় ছুটে পালাতেও পারে। মজবুত পা-দুটি তাদের একাজে সহায়তা করে। পুরুষদের পা-দুটি শত্রুকে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পা দিয়ে মাটি খোঁড়া, আঁচড়ানো প্রভৃতি কাজও হয়। অনেক সময় অসতর্ক মুহূর্তে মানুষকেও এরা আক্রমণ করে থাকে।

স্ত্রী-ময়ূর বছরে একবার করে ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ এরা তিনটি থেকে আটটি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। গাছের কোটরে বা শুকনো লতা-পাতা, ঘাস বা খড়কুটা দিয়ে তৈরী বাসায় এরা ডিম পাড়ে। পোষা ময়ূরী বাগানে বা তার আশেপাশে লতা-পাতা, ঘাস ইত্যাদি জমা করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে বলে জানা যায়। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা ডিমগুলির রং সাদা, পীতাভ বা হাল্কা বাদামী। বাচ্চা অবস্থায় অন্ততঃ বেশ কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা শক্ত। পুরুষদের পুচ্ছ সম্পূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে দু-তিন বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে বাচ্চাদের ঝুঁটি বা শিখা থাকে। ময়ূর দীর্ঘজীবী পাখী।

রামধনুর মত বর্ণবিকাশী অপরূপ পুচ্ছ আর নৃত্যের জন্যে ময়ূরের সবচেয়ে বেশী খ্যাতি। কিন্তু এই পুচ্ছ বা পেখমের বাহার শুধু পুরুষ ময়ূরদেরই আছে, ময়ূরীদের পেখম নেই। বর্ষা-সমাগমে যখন তারা পেখম তুলে নাচে, তখন তা অপরূপ দেখায়। পুচ্ছটি বেশ লম্বা। পুরুষ ময়ূর লম্বায় প্রায় ছ-ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে আর তার পুচ্ছটি হয় প্রায় চার ফুটের মত। ঝোপ-ঝাড়ে চলাফেরা করবার সময় এই পুচ্ছ কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এদের পুচ্ছ বেশ হাল্কা ও নমনীয়, তবে বেশ মজবুত ও শক্ত। ময়ূরপুচ্ছ কিন্তু আসলে লেজ নয়, লেজের আচ্ছাদন বলা যেতে পারে। আসল লেজ থাকে এর তলায়। ময়ূর ইচ্ছামত পুচ্ছ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। পেখমতোলা পুচ্ছে বিচিত্র রঙের ঝিকিমিকি দেখা যায়। পুচ্ছের সব পালক কিন্তু সমান নয়। এই পালকে থাকে চক্র আঁকা। ময়ূরকে সংস্কৃতে সহস্রলোচন পাখী বলা হয়। এদের পেখমের পালকের চক্রগুলির জন্যেই এই নাম। শিখা আছে বলে এদের শিখীও বলা হয়।

খাদ্য হিসাবেও ময়ূর একদিন জনপ্রিয় ছিল। প্রাচীন রোম, ইউরোপের ভোজ সভায়, বড়দিনের সময় ইংল্যাণ্ডে ও আরও নানা স্থানে ময়ূরের মাংসের কদর ছিল। সম্রাট অশোকও একদিন ময়ূরের মাংসের ভক্ত ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়েই পরে ময়ূর-হত্যা নিষিদ্ধ হয়। মহাভারত ইত্যাদিতে দেখা যায় যে—অভিষেক, ভোজসভায় ময়ূরের মাংসের এক বিশেষ স্থান ছিল। কথিত আছে—ঋতুভেদে ময়ূরের মাংস খেলে নাকি দেহের উপকার হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে ময়ূরের মাংস খাওয়ার চলন নেই। তবে এই সেদিন পর্যন্তও হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর সম্মানিত অতিথীদের ময়ূরের মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। ভারতে ময়ূর পবিত্র পাখীরূপে সম্মানিত, কারণ এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। তাছাড়া তোমরা নিশ্চয় শুনেছ সাহাজানের ময়ূর সিংহাসনের কথা, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের কথা। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরের পাখা শোভা পায় বা দেব সেনাপতির বাহন যে ময়ূর, তাও তোমাদের অজানা নয়। জৈন সন্ন্যাসীরাও ময়ূরের পালক ধারণ করতেন। দেব-দেবীর অঙ্গসজ্জায়, রাজমুকুটে ও বীর যোদ্ধাদের উষ্ণীষেও শোভা পেত একদিন ময়ূরের পালক। দেবালয়ে, রাজপ্রাসাদে, উদ্যানে, ধনীগৃহে, ঋষির আশ্রম ও তপোবনে ময়ূর-ময়ূরী একদিন মহাউল্লাসে বিরাজ করতো। আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া গানে, কবিতায় ও সাহিত্যে ময়ূর বহু উল্লেখিত এবং সমাদৃত হয়েছে নানা শিল্পকলায়। এদেশের কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে আমাদের জাতীয় পাখী ময়ূর এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, যার তুলনা বিরল।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ট্যাকিওনস্

তোমরা জান আলোই সবচেয়ে দ্রুতগামী। আর এও জান যে, এর গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বা 2 লক্ষ 97 হাজার 6 শ' কিলোমিটার। একবার চিন্তা করে দেখ তো—কি প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আলো ছুটে চলছে।

আলোর চেয়েও দ্রুতগামী কণিকা আছে—এই কথা শুনে চমকে উঠলেন বৈজ্ঞানিকেরা। এতদিন ধরে আমরা যা জেনে এসেছি, সে কথা তাহলে ভুল? বিজ্ঞান-জগতের সকলে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন—কি সে জিনিষ?

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর জেরাল্ড ফেনবার্গ (J. Feyn-

berg) আলোর চেয়ে দ্রুততর কণিকার কথা বলেছেন। নাম তার ট্যাকিওন্‌স্ (Tachyons)। শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ হলো দ্রুতগতি।

ট্যাকিওন্‌সের গুণাগুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে ডক্টর ফেনবার্গ যা বলেছেন, সেকথা এবার বলছি। এই বিরাট বিশ্বের সব জায়গাতেই এই কণিকার অবাধ গতি। প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে কণিকাগুলি ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন সময় এদের গতিবেগ এমন প্রচণ্ড হয় যে, তা অসীমে (Infinity) গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণ বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সে অনুপাতে বেড়ে যায়, কিন্তু এই কণিকাগুলির ধর্ম তার ঠিক উল্টো রকমের; অর্থাৎ গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সেই অনুপাতে কমে যেতে থাকে।

আমরা জানি, সাধারণ বস্তু আলোর গতি পেলে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, তখন তাদের ভর (mass) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুযায়ী শক্তিকে E, ভরকে m এবং শূন্যে আলোর গতিবেগকে c ধরলে—

$E=mc^2$ অর্থাৎ শক্তি তখন বস্তুর ভর ও আলোর গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান হয়; অর্থাৎ আলোর গতিতে বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ বস্তুর গতির যেখানে শেষ, ট্যাকিওন্‌সের গতির সেখান থেকেই সুরু। তাই এই কণিকাগুলিকে বের করতে হলে আলোর চেয়ে বেশী গতির মধ্যে তাদের খুঁজে নিতে হবে।

গবেষণাগারে ট্যাকিওন্‌সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার প্রধান বাধা হলো, তার এই প্রচণ্ড গতি, যা আলোর চেয়েও বেশী। আর এক বাধা কণিকাগুলি তড়িৎ-আশ্রিত নাও হতে পারে বলে ডক্টর ফেনবার্গের ধারণা।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতেই ডক্টর ফেনবার্গ এই কাল্পনিক কণিকার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তত্ত্বগতভাবে অঙ্কশাস্ত্রের জটিল হিসাব দেখিয়ে তাঁর সূত্রটিকে তিনি প্রমাণ করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ট্যাকিওন্‌সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে ইতিমধ্যে গবেষণাগারে বেশ কয়েক বার চেষ্টা করা হয়েছে। এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানের পরিধি যে আরও বিস্তৃত হবে, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ট্যাকিওন্‌সের গুণাগুণ বা ধর্ম আমাদের পরিচিত বস্তুকণিকা থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। অনেক পদার্থ-বিজ্ঞানী আশা করেন যে, গবেষণাগারে ফেনবার্গের নতুন এই তত্ত্বটি প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হবে।

ডক্টর ফেনবার্গের নাম দেওয়া এই নতুন কণিকা ট্যাকিওন্‌সের বিষয় জানবার জন্যে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

কারণ এই তত্ত্বটি প্রমাণিত হলে কেমন করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো, তা হয়তো আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে ডক্টর ফেনবার্গের সূত্র ধরে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ-শক্তির আদান-প্রদান করা যাবে, যা এখন অসম্ভব। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের দূরত্ব আলোক-বর্ষ (আলো এক বছরে যতটা দূরত্বে যায়) দিয়ে না মেপে এই নতুন ট্যাকিওন্স্ দিয়ে মাপা হবে। গ্রহগুলির পারস্পরিক যোগাযোগও করা যাবে অনেক কম সময়ে।

আগামী দিনে বিজ্ঞান-জগতে নতুন দ্বার খুলে যাবে ট্যাকিওন্স্ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে।

অজয় গুপ্ত

গতিশীল মহাদেশ

আশ্চর্য মনে হলেও কথাটা সত্য যে, মহাদেশও গতিশীল; এই বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মতে, এখন আমরা দেশ, মহাদেশ ও মহাসাগরগুলিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে-সেখানে দেখতে পাই। প্রথমে কিন্তু সে রকম মোটেই ছিল না; কয়েক কোটি বছরের ব্যবধানে আদি অবস্থান থেকে বর্তমানে এরা অনেকখানি সরে গেছে। গতিশীল মহাদেশের এই তত্ত্বটির প্রথম আভাস দেন ফ্রান্সিস বেকন, প্রায় সাড়ে তিন-শ' বছর আগে। এরপর 1907 সালে আমেরিকার অধ্যাপক ডবলিউ. এইচ. পিকারিং এবং 1910 সালে এফ. বি. টেলর এই তত্ত্বটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। 1928 সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকে টেলর একটি চমকপ্রদ সংবাদ দেন। তাঁর মতে, ক্রিটেশাস যুগে চাঁদ ধরা পড়েছিল পৃথিবীর আকর্ষণে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত সমুদ্র ইত্যাদিতে প্রচণ্ড জলস্ফীতি দেখা দেয়। এই আলোড়নের ধাক্কায় মূল ভূখণ্ড কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে যায়। ফলে বর্তমান গ্রীনল্যাণ্ড থেকে উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য অ্যাটলান্টিক অঞ্চল থেকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মহাদেশগুলির আদি অবস্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন, বহু কোটি বছর আগে বর্তমান বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি বিরাট ভূখণ্ড বা মহাদেশ ছিল। এর প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে লোরেসিয়া এবং অপরটির নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। বর্তমান সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া, গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকা ছিল লোরেসিয়ার অন্তর্গত, আর গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের মধ্যে ছিল এখনকার আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং

মেরু অঞ্চল। ভারতবর্ষ ছিল অবশ্য শেষোক্ত মহাদেশের অন্তর্গত। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত বিরাট টেথিস সাগর। স্বাভাবিক কারণে এই সাগর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বটে, তবে বর্তমান ভূমধ্যসাগর সেই প্রাচীন টেথিসেরই একটা অংশ বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

গতিশীল মহাদেশের তত্ত্বটি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন জার্মেনীর বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ আলফ্রেড ওয়েগ্নার। 1915 সালে তাঁর 'দি অরিজিন অফ কন্টিনেন্টস এ্যাণ্ড ওশান্স' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ওয়েগ্নার এসম্বন্ধে বহু তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, আদিতে বিশ্বে ছিল কেবলমাত্র একটি বিরাট ভূভাগ বা Pengoea। মেসোজোয়িক যুগে সেটি ভাঙতে সুরু করে; উত্তপ্ত প্রাথমিক শিলার উপর দিয়ে এই সব টুক্রা ভূখণ্ড ভেসে যাবার সময় সামনে জমে-ওঠা আবর্জনাগুলিকেও ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী যুগে এইসব আবর্জনাই সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি করেছে হিমালয়, আল্পস্ ইত্যাদি পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। ওয়েগ্নার বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে মহাদেশগুলির পশ্চিম অভিমুখী গতির ফলে।

সাম্প্রতিক কালে এ নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। কয়েক মাস আগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর লরেন্স গৌল্ড তাঁর দলবল নিয়ে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গিয়েছিলেন এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে; সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে আছে লিস্ট্রোসউরা নামক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, দক্ষিণ মেরু থেকে 400 মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে এটি পাওয়া গেছে। কঙ্কালটি লম্বায় প্রায় আড়াই হাত, প্রাণীটির আকৃতি বড় বিচিত্র, এর চোখ দুটি কিছু উত্তোলিত এবং নাক দুটি চোখজোড়ার মাঝখানে মাথার খুলির উপর অবস্থিত অর্থাৎ এর শ্বাসকার্য চলতো মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে। জন্তুটি যে জলচর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া অভিযাত্রীদল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসরের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণিত থিয়োকোড্যান্ট-এর ফসিলও এখানে পেয়েছেন। ইতিপূর্বে এই জন্তুটির ফসিল দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উরুগুয়েতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূল্যবান আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন—এক সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল একটি বিরাট ভূভাগ। বিজ্ঞানীরা সেটির নাম দিয়েছেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। বর্তমানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বৃক্ষবিরল হলেও দক্ষিণ মেরু এক সময় উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল এবং ঘন অরণ্যও দেখা যেত এর বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া বর্তমান অবস্থানে আসবার আগে দক্ষিণ মেরু যে এককালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল, এটি তারই অকাট্য প্রমাণ।

হিমবাহ নিয়ে গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড জুড়ে ছিল বরফ ও হিমবাহের বিস্তীর্ণ রাজত্ব। বর্তমান গ্রীষ্মমণ্ডলের

যে সব অংশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রচণ্ড গরম হলেও সে সব অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কিন্তু এখনো হিমবাহের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রাচীন মহাদেশের হিমবাহিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি নিরক্ষরেখা থেকে দূরে সরে এসেছে অথচ আমরা জানি, বরফের স্বাভাবিক গতি সব সময় উষ্ণতর অঞ্চলের দিকে। এথেকে এমন সিদ্ধান্ত করলে বোধ হয় ভুল হবে না যে, অতীতে কোন এক সময়ে এই অঞ্চলটি হিমমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, তারপর সরে গিয়ে বর্তমান স্থানে উপস্থিত হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞেরা একটানা লম্বা উচ্চভূমির সন্ধান পেয়েছেন। এর প্রথমটি আছে মধ্য অ্যাটলাণ্টিক অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝামাঝি ভারত মহাসাগরের তলদেশে, তৃতীয়টি অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলিই হচ্ছে প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সীমা। মহাদেশটির উত্তর প্রান্ত মধ্য হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক সময় বিরাট টেথিস সাগর বয়ে যেত হিমালয়ের উপর দিয়ে, সেখানকার বিভিন্ন চূড়ায় পাওয়া বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক সময় বিরাট হিমালয় পর্বত মগ্ন ছিল সমুদ্রগর্ভে।

ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে—এখানকার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তের ভূমি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালে গঠিত। তাঁদের মতে, এর গঠনকাল কার্বনিফেরাস এবং মেসোজোয়িক যুগের মধ্যবর্তী সময়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ম্যাডাগাস্কার এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলের মাটির যথেষ্ট মিল আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ডায়নোসরের যে ফসিল পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সুদূর ম্যাডাগাস্কার, ব্রেজিল, উরুগুয়ে এবং প্যাটাগোনিয়ায় আবিষ্কৃত একই ফসিলের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন।

মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার ক্রিয়া এখনো পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে চলছে। আফ্রিকার রিফ্ট উপত্যকা অঞ্চলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আরব ও ম্যাডাগাস্কার যেমন একদিন মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তেমনি সুদূর ভবিষ্যতে পূর্ব আফ্রিকাও একদিন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া গ্রীনল্যাণ্ডের দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়েও একটা বিচিত্র জিনিষ বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন, দেশটি প্রতি বছর ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে 25 থেকে 30 গজ করে সরে যাচ্ছে, সুতরাং কয়েক লক্ষ বছর পরে এটি বেশ কয়েক মাইল দূরে সরে আসবে—এমন অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়।

বিনতি সেন

সূর্যশিশির

সূর্যশিশির—আসলে একটি গুল্মজাতীয় ছোট্ট উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজীতে একে বলে Sun dew আর জীব-বিজ্ঞানীয় ভাষায় এর নাম Drosera। এদের বাস সাধারণতঃ আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে—খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ে, আর দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ে; তাছাড়া বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে বালুকাকীর্ণ এলাকায় এদের সাক্ষাৎ মেলে। এদের দূর থেকে দেখলে পানের পিক বা লাল লাল থোকা বলে মনে হয়।

দেখতে ছোট হলেও এরা কাজে মোটেই ছোট নয়। এরা এক-একটি ক্ষুদে রাক্ষস, ছোট ছোট পোকা-মাকড় ধরে সহজেই হজম করে ফেলে। নেহাৎ জীবন-রক্ষার তাগিদেই এদের পোকা-মাকড় ধরে খেতে হয়। কারণ প্রত্যেক জীবদেহই প্রোটিন নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না এবং এই জটিল পদার্থ গঠনকারী উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন অন্যতম। কিন্তু সূর্য-শিশির যে মাটিতে জন্মায়, সে মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে না; কাজেই এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। এই কারণেই এরা জীবদেহ থেকে প্রোটিন সংগ্রহের এক বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।

ইঞ্চি চারেক লম্বা ছোট ছোট গাছ ভোরের আলোয় ঝলমল করে, মনে হয় পাতার উপর যেন শিশির জমে রয়েছে। পাতাগুলি মাটির উপর গোলাকারে সাজানো থাকে আর তাদের মাঝখান থেকে ফুলসমেত ডাঁটা বেরিয়ে আসে। এই পাতাগুলিই হচ্ছে এক-একটি ফাঁদ। এদের উপরের গা থেকে খাড়াভাবে কতকগুলি শুঁড় সাজানো থাকে। এই শুঁড় থেকে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা মধুর মত মিষ্টি রস বেরিয়ে এসে মাথায় জমা হয়। এই ফোঁটাগুলিই সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে, আর পোকা-মাকড়েরা মধুর লোভে ভুল করে পাতার উপর এসে বসে। তখন তো ওরা জানে না যে, ওগুলি মধুমাখা আঠালো পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শুঁড়গুলি পোকাটাকে ধীরে ধীরে পাতার গায়ে আটকে ফেলে জারক-রস দিয়ে সম্পূর্ণ হজম করে ফেলে। মৃতদেহটার রস শুষে নেবার পর আবার ফাঁদ পেতে বসে নতুন শিকারের আশায়। এমন কি, এও দেখা গেছে যে, এক টুকরা মাংস পাতার উপর ফেলে দিলেও একই রকম ব্যাপার ঘটে থাকে।

কুহুলা মৌলিক*

*কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, হাওড়া-3

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। সাইক্লোট্রোন কি ?

মলয় ভদ্র, বারাসত

প্রশ্ন 2। ডাবের জলের উপকারিতা কি ?

অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
হালিশহর

উঃ 1। বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। গবেষণাগারে বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করবার কাজে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সাইক্লোট্রোন সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই যন্ত্রে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করা হয় ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে এর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ ভারী বস্তুকণিকাকেই এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমশঃ বৃত্তাকার পথে আবর্তনের সাহায্যে ত্বরান্বিত করা হয়। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার গবেষণায় পরমাণুর রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটনে এই সমস্ত শক্তিশালী কণিকা কাজে লাগে।

উঃ 2। আমাদের শরীর গঠনের কাজে বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই সমস্ত ধাতব লবণ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। ডাবের জলকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে সাধারণতঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, পটাসিয়াম, লোহা, তামা, ফস্‌ফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদি আছে। এগুলি ছাড়াও ডাবের জলে প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ভিটামিনের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে। ডাবের জলে যে সমস্ত ভিটামিন পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে ভিটামিন বি-2, ভিটামিন বি-6, ভিটামিন-3, ভিটামিন-সি ইত্যাদি।

ডাবের জলে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে সোডিয়াম পাকস্থলীতে পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনে ও দেহকোষগুলির স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম দাঁত, অস্থি ইত্যাদির গঠন ও জৈব-অনুঘটকের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুকেন্দ্রিকের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ক্ষেত্রে

পটাশিয়ামের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোহা ও তামা রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করে। এইভাবে ডাবের জলের বিভিন্ন মৌলিক উপাদান আমাদের শরীর গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ডাবের জলে উপস্থিত খাতব পদার্থগুলি ছাড়া অন্যান্য পদার্থগুলি, অর্থাৎ শর্করা, প্রোটিন, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও আমাদের সুস্থ শরীর গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। দেহকোষগুলির সজীবতার জন্যে জল খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ছাড়াও ডাবের জলের জলীয় অংশটুকুও ফেলা যায় না।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

চাঁদের বুকে সচল সোভিয়েট মহাকাশযান লুনোখোদ-1

ইতিপূর্বে চাঁদের বুকে দু-বার মানুষ তাদের পদচিহ্ন রেখে এসেছে। মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-11 এবং অ্যাপোলো-12-র দু-জন করে মহাকাশচারী সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের বুকে পদার্পণ করেন এবং সেখানে নানা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এটি এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ যেসব মহাকাশযান পাঠিয়েছিল, সেগুলি চাঁদের বুকে নেমে এক স্থানে অবস্থান করে যথানির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। গত 17ই নভেম্বর মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো। সেদিন ভারতীয় সময় সকাল 9টা 17 মিনিটে সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-17 থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় আট চাকার যান লুনোখোদ-1 চাঁদের বর্ষণ সাগর অঞ্চলে নেমে পৃথিবী থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা সুরু করে।

চাঁদের বুকে লুনোখোদ-1-এর এই সচল কার্যকলাপ মহাকাশ প্রযুক্তিবিতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূপৃষ্ঠস্থ মহাকাশকেন্দ্র থেকে যে সব নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, লুনোখোদ তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছে। লুনোখোদকে একটি ট্যাক্সিও বলা যেতে পারে। ঐ ট্যাক্সীতে রয়েছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক, লেনিনের প্রতিকৃতি, বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা,

টেলিভিশন যন্ত্র এবং নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হচ্ছে, ফ্রান্সে নির্মিত একটি লেসার প্রতিফলক। মহাকাশ-বিজ্ঞানে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতার চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স এই যন্ত্রটি দিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে চলমান যানের চাকার সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে চলমান লুনোখোদের চাকার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই, যদিও সেগুলির কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। চন্দ্রপৃষ্ঠে চলমান যানকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বায়ুশূন্যতা ও তাপমাত্রার বিরাট তারতম্যের মধ্যে সে সঠিকভাবে কাজ চালাতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠের সংযুক্তি ও গঠন ভূপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের; কাজেই এই সব বিষয় বিবেচনা করেই লুনোখোদকে নির্মাণ করা হয়েছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর লুনোখোদ-1 লুনা-17 মহাকাশযান থেকে নেমে আসছে। (শিল্পীর পরিকল্পিত)

লুনোখোদ চন্দ্রপৃষ্ঠের টেলিভিশন ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছবিগুলি চমৎকার—সূর্য দৃষ্টের সে সব ছবিতে চাঁদের বুকে লুনোখোদের চলাচলের দাগগুলিও স্পষ্ট বোঝা গেছে। ছবিতে লুনোখোদ তার যন্ত্রাংশগুলিকেও পৃথিবীকে দেখিয়েছে

লুনোখোদ পাঁচ দিন ধরে যথানির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের পর চাঁদের দেশে দীর্ঘ শীতরাত্রি (পৃথিবীর সময়ের হিসাবে 14 দিন) নেমে আসায় নিষ্ক্রিয় ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে যায়। কারণ সূর্যরশ্মিই এতদিন লুনোখোদের সকল শক্তি জুগিয়ে এসেছিল। 8ই ডিসেম্বর চাঁদের বর্ষণ সাগরের আকাশে আবার সূর্য উঠলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লুনোখোদকে সক্রিয় করবার চেষ্টা করবেন।

লুনোখোদ-1 পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে

না। কারণ ফিরে আসবার উপযোগী রকেট নিয়ে সে চাঁদে যায় নি। লুনোখোদের এই সাফল্য ভবিষ্যতে দূরান্তরের গ্রহে যন্ত্রচালিত যান প্রেরণের পথ প্রশস্ত করবে। ভাবীকালে লুনোখোদের অনুগামীরা মঙ্গল, শুক্র বা আরও দূরবর্তী গ্রহে গিয়ে সেখানকার তথ্য পৃথিবীর মানুষকে জানাতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

করোনারী অক্লুশন সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা

5ই অগাষ্ট '70 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে 'করোনারী অক্লুশন' সম্বন্ধে একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তৃতাটি প্রদান করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। ঐ বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। করোনারী অক্লুশনের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকারের পন্থা প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ মৈত্র শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন। বক্তৃতার শেষে কলিকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে ঐ বিষয়সংশ্লিষ্ট দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি

লণ্ডন থেকে এ. পি. ও এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—বৃটিশ জীব-বিজ্ঞানী জেম্‌স্ ড্যানিয়েল্লি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রাগারে 'জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছেন।' বৃটিশ বেতারে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভার্সিটির জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগারে তিনি অন্য জীব-কোষের অংশ জুড়ে দিয়ে আর একটি নতুন জীব-কোষ সৃষ্টি করেছেন। শেষোক্ত এই জীব-কোষ শুধু বেঁচেই থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে। ডক্টর ড্যানিয়েল্লি উক্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ।

ডক্টর ড্যানিয়েল্লি বলেছেন, দরজির দোকানে ইচ্ছামত মাপ ও আকৃতির পোষাক তৈরির মত দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে মানুষ নির্দিষ্ট নক্শা অনুযায়ী গুণসম্পন্ন জীব সৃষ্টি করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন—অবশ্য কৃত্রিম মানব প্রজাতি সৃষ্টির দিকে না গিয়ে মানুষের বংশগত ব্যাধিগুলি দূর করবার দিকেই আপাততঃ মন দিতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে এ. পি. আরও জানিয়েছেন যে, নিউইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক দল কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জীব-কোষের সংশ্লেষণ ঘটাতে পেরেছেন। তাঁরা এককোষী অ্যামিবার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং অতঃপর অন্য অ্যামিবার দেহাংশ জুড়ে নিয়ে নতুন অ্যামিবার সৃষ্টি করেছেন। নবজাত অ্যামিবা শুধু প্রাণেই বেঁচে থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে।

এই গবেষণার উদ্যোক্তা হচ্ছেন মার্কিন মহাকাশ-পরিক্রমা সংস্থা। তাঁদের বিশেষজ্ঞ দল এই আবিষ্কারকে জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত করেছেন। অবশ্য নিউইয়র্ক টাইমস বিশেষজ্ঞদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু

থাকলেও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে প্রতীক্ষা করা উচিত হবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়—এণ্ডোস্কোপি

হামবুর্গ থেকে ইউ. এন. আই. এবং ডি. পি. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দেহাভ্যন্তরবীক্ষণ পদ্ধতি, ইংরেজী নাম এণ্ডোস্কোপি—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নতুন ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়। অতঃপর চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে দেহাভ্যন্তরে রোগ নির্ণয়ের জন্যে আদৌ অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না।

নানা দেশে, বিশেষ করে জাপানে এই পদ্ধতিটির অনুসরণ করা সুরু হয়েছে। পদ্ধতিটি হচ্ছে এরূপ—মানবদেহের যে সকল স্বাভাবিক দ্বারপথ রয়েছে—চোখ, কান, নাক ইত্যাদি, সেগুলির মধ্য দিয়ে মিনি-ক্যামেরা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে রঙীন ছবি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। ক্যামেরাটির চেহারা হাতের কড়ে আঙুলের মত, স্বচ্ছন্দে গলার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মিনি-মাইক্রোস্কোপও রয়েছে, শরীরে সামান্য একটু আঁচড় কেটে এটিকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলে সেটি নির্ভুলভাবে রোগ-যন্ত্রণার উৎসটি দেখে নিতে পারে।

পেটের ভিতরে টিউমারটির অবস্থান আসলে কোথায় এবং তার অবস্থানটিই বা কিরূপ, ক্যামেরা তার নির্ভুল ছবি তুলে এনে ডাক্তারকে দেবে।

পৃথিবীর সেরা এণ্ডোস্কোপিস্ট জাপানের ডাঃ হিরোমি ওনিসো রোগীর পাকস্থলীর প্রাচীরের ঠিক কোন্ স্থানটিতে কতটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা দেখিয়ে দিতে পেরেছেন।

অনুরূপভাবে মূত্রনালী দিয়ে সিস্টোস্কোপ প্রবেশ করিয়ে রোগীর গলস্টোনের অবস্থান দেখে নিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

কৃত্রিম রক্ত

চারলট্‌ভিল (ভার্জিনিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত ব্যবহার করেছেন। ক্যাষ্টর অয়েল, জিলাটিন ও সোডা জলের মিশ্রণে এই রক্ত তৈরি করা হয়েছে।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর নিলেন্ড সাংবাদিকদের জানান—আসল রক্ত এই পরীক্ষায় অনুপযোগী। সেটা ব্যয়সাধ্য তো বটেই, তাছাড়া খোলা জায়গায় রাখলে জমাট বেঁধে যায়।

পান্না অধ্যুষিত অঞ্চল

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—রাজস্থানের উদয়পুর ও আজমীরের মধ্যে একটি সেভ্‌-শ' মাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় পান্না পাওয়া যাবে বলে রুশ বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন। এমন কি, রাশিয়ার বিখ্যাত পান্না এলাকা থেকে যে পরিমাণ পান্না পাওয়া যায়, এখান থেকেও সেই পরিমাণ পান্না পাওয়া যাবে বলে রুশ বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একদল রুশ ভূতত্ত্ববিদ্ সম্প্রতি এই অঞ্চলটি ঘুরে গিয়েছেন। এঁরা

এখানে আসেন জাতীয় খনি উন্নয়ন কর্পোরেশনের উত্তোলনে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্থানের পাহাড় [illegible] পাথর আছে এবং এথেকে হীরকের চেয়েও বেশী স্বর্ণ পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানীর 1970 সালের শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ

সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের গম ও ভুট্টা আবিষ্কারের জন্যে 1970 সালে আমেরিকার কৃষি-বিজ্ঞানী ডাঃ নরম্যান আর্নেষ্ট বরলগকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানে এই সব গম ও ভুট্টা খুবই সহায়ক হতে পারে, কারণ এই সব গমের ফলন খুব বেশী হয়ে থাকে। দূরপ্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে অতিরিক্ত ফলনশীল ধান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও পরোক্ষভাবে এই আবিষ্কারের ফল।

এই নতুন ধরণের গমের চাষ ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, তুরস্ক, ইজরায়েল, জর্ডন, টিউনিসিয়া, সুদান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে [illegible] পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে এই নতুন গম ও ভুট্টা চাষ করে যে পরিমাণে ফসল পাওয়া গেছে, ঐ পরিমাণ জমিতে আগেকার ভুট্টা ও গম চাষ করে তাঁর অর্ধেক আর পাওয়া যায় নি।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়

13ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছেন। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাতিয়া, রামগতি, ভোলা ও চরজব্বর—এই চারটি দ্বীপ। পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সাম্প্রতিক কালের প্রচণ্ডতম বিপর্যয়। ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ এখন পর্যন্তও সঠিক নির্ণীত হয় নি।

ভ্রম সংশোধন :—নভেম্বর '70 সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র 686 পৃষ্ঠার (ভ) চিহ্নিত পংক্তিতে '7 দিয়ে গুণ করলে' এই স্থলে 'গুণের' পরিবর্তে 'ভাগ' হবে।

শ্রী[illegible] কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত